ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

শ্রীতারকচন্দ্র রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

মূল্য ঃ দশ টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে শ্রীকুমারেশ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত এবং ৩৮, শিবনারায়ণ দাস লেনস্থ রাণীশ্রী প্রেস হইতে শ্রীবামাচরণ মণ্ডল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

ওঁ তৎ সৎ

পশ্চিম বঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের
ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য, বিদ্যোৎসাহী, দেশহিতব্রত,
দরিদ্রের বন্ধু, ভিষক্‌প্রবর ডাঃ বিধানচন্দ্র
রায় এম. ডি., এম. আর. সি. পি.,
এফ্. আর. সি. এস্.-কে আমার
আন্তরিক শ্রদ্ধা ও প্রীতির
নিদর্শনস্বরূপ এই গ্রন্থ
উৎসর্গ করিলাম।

মুখবন্ধ

আমার পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস তিন খণ্ডে প্রকাশিত হইবার পরে আমার দুই জন শ্রদ্ধেয় সাহিত্যিক বন্ধু আমাকে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস বাংলা ভাষায় রচনা করিতে অনুরোধ করেন। তাঁহাদের অনুরোধে আমি এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হই। বর্ত্তমান গ্রন্থ ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড। অবশিষ্ট দুই খণ্ড যদিও লেখা হইয়াছে, তাহা প্রকাশিত করিবার সময় পাইব কিনা সন্দেহ-স্থল। দর্শনের ইতিহাস-রচনার জন্য আমার প্রচেষ্টার পিছনে একটু ইতিহাস আছে। তাহা বলিয়া রাখাই ভাল।

১৯০০ অব্দে আমি জেনারল এসেম্‌ব্লিজ ইন্‌স্টিটিউশান হইতে দর্শনে ও ইংরেজিতে অনার্স সহ বি. এ. পাশ করি। তখন তদানীন্তন বিদ্বন্মণ্ডলী ও ছাত্র-সমাজের অশেষ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার রায় (Dr. P. K. Ray) ছিলেন প্রেসিডেন্সি কলেজের দর্শনের অধ্যাপক। ঐ সালের মাঝামাঝি সিটি কলেজে আহূত এক সভায় ডাঃ রায়ের সহিত আমার পরিচয় হয়। তখন আমি এম. এ. পড়িতেছিলাম। ডাঃ রায় আমাকে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে বলেন। নির্দ্দিষ্ট দিনে আমি তাঁহার বাড়ীতে তাঁহার সহিত দেখা করি। তখন তিনি আমাকে বিশেষ আদর ও স্নেহের সহিত গ্রহণ করেন। সে দিন দর্শন-সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হয়। বিদায় লইবার সময় ডাঃ রায় আমাকে বলেন, "Remember that you owe much to Philosophy and that Philosophy expects something in return from you." (মনে রেখো দর্শনের নিকট তুমি বিশেষ ঋণী এবং দর্শন তোমার নিকট কিছু প্রতিদান প্রত্যাশা করে)। আমি নত মস্তকে তাঁহার উপদেশ ও আশীর্ব্বাদ লইয়া চলিয়া আসি। এম. এ. পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বেই আমি চাকুরীতে প্রবিষ্ট হই এবং ৩৩ বৎসর চাকুরীর পরে ১৯৩৫ সালে অবসর গ্রহণ করি। "দর্শন আমার নিকট কিছু প্রত্যাশা করে", ডাঃ রায়ের এই কথা আমার অবচেতন মনের মধ্যে বরাবরই ছিল। মাঝে মাঝে তাহার উপরে উঠিত, কিন্তু ঋণ-পরিশোধের কোনও উপায় খুঁজিয়া পাইতাম না। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণ করিবার পরে কথাটী বারংবার মনে হইতে লাগিল। তখন বাংলা ভাষাকে উচ্চ শিক্ষার বাহন করিবার কথা উঠিয়াছিল।

ভাবিলাম দার্শনিক মৌলিক কোনও চিন্তা সমাজকে উপহার দিবার আমার না থাকিলেও পাশ্চাত্ত্য দর্শন বাঙ্গালী পাঠকের নিকটে বাংলা ভাষায় উপস্থাপিত করিবার ক্ষমতা আমার আছে। আমি তাহার ব্যবহার করিয়া দর্শনের নিকট আমার ঋণ কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে পারি। এই চিন্তা হইতে পাশ্চাত্ত্য দর্শনের ইতিহাসের উৎপত্তি। ইহার পরে আমি ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস লিখিতে অনুরুদ্ধ হই। দেখিলাম বয়স অধিক হইলেও তখনও মানসিক সামর্থ্যের সম্পূর্ণ বিলোপ হয় নাই। সাহস করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলাম। বর্ত্তমান খণ্ডে বৈদিক যুগ হইতে মহাকাব্যের যুগের শেষ পর্য্যন্ত ভারতীয় দার্শনিক চিন্তার ইতিহাস বর্ণিত হইল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে ষড়দর্শন ও অন্যান্য দর্শন বিবৃত হইবে।

আমি যে "প্রাংশু-লভ্যে ফলে লোভাৎ উদ্‌বাহু বামন"-এর ন্যায় "দার্শনিক-যশঃপ্রার্থী" হইয়া দর্শনের ইতিহাস-রচনায় প্রবৃত্ত হই নাই, তাহা প্রমাণ করিবার উদ্দেশ্যে ডাঃ প্রসন্নকুমার রায়ের উপদেশের উল্লেখ করিলাম।

এই গ্রন্থ-রচনায় আমাকে বহু গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ডাঃ সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণের Indian Philosophy এবং ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের History of Indian Philosophy বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থের অনেক স্থলে উক্ত দুই গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃতি আছে। আমি বিশেষরূপে তাঁহাদের নিকট আমার ঋণ স্বীকার করিতেছি। ইতি—

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

উপক্রমণিকা

দর্শন শব্দ "দৃশ" ধাতু হইতে উৎপন্ন। দর্শন শব্দের অর্থ সাক্ষাৎকার। যে শাস্ত্র পাঠ করিয়া সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়, তাহাই দর্শনশাস্ত্র। এই সাক্ষাৎকার কেবল বুদ্ধি ও যুক্তি-তর্ক দ্বারা লব্ধ সত্যের ব্যবহিত জ্ঞান নহে, বোধিতে উদিত অব্যবহিত অপরোক্ষ জ্ঞানও বটে—ইন্দ্রিয়ে যেরূপ অব্যবহিত জ্ঞান হয়, বোধিতে সেই রূপ জ্ঞানও। প্রমা-বিজ্ঞান[১] অর্থাৎ জ্ঞানবিজ্ঞান—জ্ঞানের স্বরূপ, উৎপত্তি এবং মানবীয় জ্ঞানের সীমার নির্দ্ধারণও দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্গত।

"দর্শনে"র ইংরাজি প্রতিশব্দ Philosophy, যাহার অর্থ জ্ঞানে অনুরাগ। এই জগতের স্বরূপ কি, ইহার উৎপত্তি কিরূপে হইল, ইহার কোনও স্রষ্টা কর্ত্তা আছে কিনা, মানুষের স্বরূপ কি, মানুষকে কি কেহ সৃষ্টি করিয়াছে, ন্যায় অন্যায় বলিয়া কিছু আছে কিনা, থাকিলে কাহাকে ন্যায় বলিব, কাহাকে অন্যায় বলিব, মানুষ কি পঞ্চভূতে নির্ম্মিত দেহমাত্র, অথবা সেই দেহের মধ্যে চৈতন্যস্বরূপ কোনও বস্তু আছে, যদি থাকে, তাহা হইলে তাহা কি দেহের সঙ্গে বিনষ্ট হয়, অথবা দেহের মৃত্যুর পরেও তাহার অস্তিত্ব থাকে, প্রভৃতি বিষয় দর্শনশাস্ত্রে আলোচিত হয়। ভারতবর্ষের ঋষিগণ ও পণ্ডিতগণ এই সকল এবং এতদনুরূপ এবং ইহাদের সহিত সম্বদ্ধ অন্যান্য বহু প্রশ্নের যে সকল উত্তর দিয়াছিলেন, ভারতীয় দর্শনে তাহা পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষে নানাজাতীয় লোকের বাস। ইহাদিগকে সাধারণতঃ আর্য্য ও অনার্য্য এই দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের মতে আর্য্যগণ ভারতের আদিম অধিবাসী নহেন। তাঁহারা ভারতের বহিঃস্থ কোনও স্থান হইতে আসিয়া ভারতে বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন, এইরূপ কোনও কিংবদন্তী না থাকিলেও, তাঁহারা যে বর্ত্তমান পারসীক ও ইয়োরোপীয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ-দিগের সহিত এক সময় একত্র বাস করিতেন এবং একই ভাষায় কথা বলিতেন, ভাষাতাত্ত্বিকদিগের গবেষণার ফলে তাহা পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়াছে।

---

১ Epistemology.

কিন্তু এই মত সকলে গ্রহণ করেন নাই। আর্য্যগণ যে বহিঃস্থ কোনও দেশ হইতে ভারতে আসিয়াছিলেন, শ্রীঅরবিন্দ সে সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

আর্য্যজাতির ভারতে আগমনের পূর্ব্বে যে সকল জাতি ভারতে বাস করিত, তাহাদিগের মধ্যে দ্রাবিড়গণ সভ্যতায় উন্নত ছিল। মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পায় ভূগর্ভে যে দুইটি নগরের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। অনেকগুলি "সীল" পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে লিখন আছে। এই লিপি প্রাচীনতম আর্য্যলিপি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকারের। এখন পর্য্যন্ত তাহার পাঠোদ্ধার সম্ভবপর হয় নাই। দ্রাবিড়গণ যে কোনও সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। জগৎসম্বন্ধে তাহাদের ধারণা কি ছিল, ধর্ম্মমতই বা তাহাদের কি ছিল, তাহাও জানা যায় নাই। অনেকের মতে মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পায় যে সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রাক্-আর্য্য দ্রাবিড় সভ্যতা। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। *

---

* "হুইলার Indus civilization গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে মহেঞ্জোদারো সভ্যতা খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন যে, ঋগ্বেদ খৃঃ পূঃ ১৫০০তে রচিত হইয়াছিল এবং ঐ সময় আর্য্যেরা ভারতে প্রবেশ করিয়া মহেঞ্জোদারো সভ্যতা ধ্বংস করিয়াছিল। কিন্তু Winternitz বলিয়াছেন যে ইহা নিঃসংশয়ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে ঋগ্বেদের রচনার তারিখ খৃঃ পূঃ ১৫০০-র বহু পূর্ব্বে, খুব সম্ভব খৃঃ পূঃ ২৫০০। বালগঙ্গাধর তিলক এবং Prof Jacobi ঋগ্বেদে উল্লিখিত জ্যোতিষিক ঘটনা হইতে স্বতন্ত্রভাবে গণনা করিয়া উভয়েই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ঋগ্বেদ খৃঃ পূঃ ৪০০০-এর পূর্ব্বে রচিত। সুতরাং মহেঞ্জোদারোর ধ্বংস হইবার বহু পূর্ব্বে বেদ রচিত হইয়াছিল। ইহা হইতে মনে হয় যে, মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা বৈদিক সভ্যতাই। ঋগ্বেদে রুদ্রের উপাসনার উল্লেখ আছে, এবং রুদ্রকে শিব বলা হইয়াছে। বেদে যে শিশ্নদেবদের নিন্দা আছে, তাহা শিবলিঙ্গ-পূজকের নিন্দা নহে, যাহারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ, তাহাদের নিন্দা। শিবলিঙ্গ-পূজার উল্লেখ বেদে আছে। মহেঞ্জোদারোতে শিবলিঙ্গ উপাসনা প্রচলিত ছিল মনে হয়। এ কারণেও মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা এবং বৈদিক সভ্যতা উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য দেখা যায়। শক্তি-পূজার উল্লেখ বেদে পাওয়া যায় (দেবীসূক্ত ও রাত্রিসূক্ত)। মহেঞ্জোদারোতেও শক্তিপূজা প্রচলিত ছিল মনে হয়। ইহাও আর একটী সাদৃশ্য। বেদে উরুক্ষিতি এবং উরুতে আর্য্য উপনিবেশের উল্লেখ আছে। মেসোপোটেমিয়ার প্রাচীন নগর উর এবং কিশ নামক স্থানে মহেঞ্জোদারোর শীলমোহর পাওয়া গিয়াছে। এজন্য মনে হয় উরু এবং উরুক্ষিতি হইতে উর এবং কিশের উৎপত্তি। উরু হইতে, উর হইয়াছে; এবং ক্ষিতি (=কৃষিতি) হইতে কিশ হইয়াছে। উর এবং কিশ ব্যতীত উরু, উরুক, উর কাশডেম নামে প্রাচীন স্থান মেসোপোটেমিয়াতে ছিল, তাহাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সব নামগুলি উরুক্ষিতি শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়।" (বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়)।

ভারতীয় দর্শন শত শত বৎসরের চিন্তার ফল। তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল বেদে। বৈদিক ঋষিগণকর্ত্তৃক বেদের সূক্তগুলি বিভিন্ন সময়ে রচিত। তাহাদের রচনাকাল নিশ্চিতরূপে নির্দ্ধারণ করা অসম্ভব। গ্রীসের দর্শনে থালিশ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল গ্রীক দার্শনিকেরই জন্মস্থান ও আবির্ভাব কাল লিখিত বিবরণ হইতে জানা গিয়াছে। কিন্তু বৈদিক ঋষিদিগের নাম ভিন্ন তাহাদের জীবনের অন্য কিছু নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। কেন না তাহার কোনও লিখিত বিবরণ নাই।

প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতে যাঁহারা শাশ্বত অপরিবর্ত্তনীয় সত্যের ধারণা করিতে পারেন, তাঁহারাই দার্শনিক। যে বিচিত্র সদা পরিবর্ত্তমান জগৎ আমাদের সম্মুখে প্রসারিত, তাহার বৈচিত্র্য ও পরিবর্ত্তনরাজির অন্তরালে যে সনাতন স্থাণু সৎপদার্থ বিদ্যমান আছে, তাহাই দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়। উইন্‌ডেলবান্দের মতে এই বিশ্ব ও মানবজীবন সম্বন্ধে সাধারণ প্রশ্নসমূহের বৈজ্ঞানিক আলোচনাই দর্শন। হেগেলের মতে পদার্থের বিচারপূর্ব্বক আলোচনার নাম দর্শন। প্রকৃতপক্ষে জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই দর্শন শাস্ত্রের আলোচ্য হইলেও, দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্র বর্ত্তমানে সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। জ্ঞানের এক এক বিভাগের জন্য স্বতন্ত্র বিজ্ঞানের সৃষ্টি হইয়াছে, এবং তাহাদের মীমাংসা দর্শনশাস্ত্রের অধিগত হওয়ার ফলে তাহাদের আলোচিত বিষয়ের দর্শনশাস্ত্রে পুনরালোচনার প্রয়োজন আর নাই। কিন্তু যে সকল স্বতঃসিদ্ধ স্বীকৃতির[১] উপরে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত, তাহাদের আলোচনা দর্শনশাস্ত্রের অধিকারভুক্ত আছে।

বারট্রাণ্ড রাসেলের মতে দর্শনশাস্ত্র ভৌতিক বিজ্ঞান ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের[২] মধ্যবর্ত্তী। যে সকল বিষয়ের অসন্দিগ্ধ জ্ঞানলাভ এখন পর্য্যন্ত সম্ভবপর

মহেঞ্জোদারোর সভ্যতাকে প্রাক্‌বৈদিক মনে করিবার একটা কারণ মহেঞ্জোদারোতে অশ্বের কোনও মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই। কিন্তু বেদে অশ্বের উল্লেখ আছে। ইহা হইতে মনে করা যায়, অশ্ব ভারতবর্ষে অপরিচিত ছিল, এবং আর্য্যগণকর্ত্তৃক ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল। কিন্তু একজন সমালোচক (শঙ্করানন্দ) লিখিয়াছেন বেদে যে অশ্বের উল্লেখ আছে, সায়নাচার্য্যের মতে তাহার অর্থ বলীবর্দ্দ। সায়নের সময় অশ্বশব্দের অর্থ যে ঘোটক ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি তিনি যে বেদে উক্ত শব্দের অর্থ বলীবর্দ্দ বলিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই বেদব্যাখ্যার ঐতিহ্যানুযায়ী। সুতরাং বেদের সময়ও ভারতে অশ্ব ছিল কিনা তাহা সন্দেহস্থল। আর মহেঞ্জোদারোতে অশ্বের মূর্ত্তি পাওয়া যায় নাই বলিয়াই যে তখন ভারতে অশ্ব ছিল না, তাহাও বলা যায় না।

১ Postulates. ২ Theology.

হয় নাই, ব্রহ্মবিজ্ঞানের বিষয় তাহাদের অন্তর্গত। দর্শনশাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়সমূহেরও নিশ্চিত জ্ঞানলাভ এখন পর্য্যন্ত সম্ভবপর হয় নাই। এইদিক হইতে দেখিলে দর্শন ও ব্রহ্মবিজ্ঞানের মধ্যে সাদৃশ্য আছে। কিন্তু দর্শনে পরম্পরাগত বিশ্বাস[১] ও প্রত্যাদেশের এবং আপ্তবাক্যের[২] স্থান নাই। ইহা রাসেলের মত। কিন্তু ভারতীয় অনেক দর্শনে আপ্তবাক্য ত্রিবিধ প্রমাণের অন্তর্গত। যে সকল ঋষির বাক্যে ভ্রম, প্রমাদ ও বিপ্রলিপ্সার সম্ভাবনা নাই, তাহাদের বাক্যই আপ্তবচন। এই সকল বচন ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া গৃহীত হয়। ব্রহ্মবিজ্ঞান ও ভৌতিক বিজ্ঞানের মধ্যে যে অনধিকৃত স্থান বর্ত্তমান, তাহাই দর্শনশাস্ত্রের ক্ষেত্র। চিন্তাশীল লোকের মনে জগৎ-সম্বন্ধে যে সকল প্রশ্ন উদিত হয়, ভৌতিক বিজ্ঞান তাহাদের অধিকাংশের সন্তোষজনক উত্তর দিতে অক্ষম। ব্রহ্মবিজ্ঞানে ঐ সকল প্রশ্নের যে উত্তর পাওয়া যায়, ভৌতিক বিজ্ঞান তাহা গ্রহণ করিতে অসমর্থ। জগতের মধ্যে কি কোনও উদ্দেশ্য আছে, অথবা তাহা অন্ধ জড়শক্তির ক্রীড়া-ভূমি; জগতে প্রাকৃতিক নিয়ম বলিয়া কি কিছু আছে, অথবা আমাদের স্বকীয় প্রকৃতি শৃঙ্খলার জন্য লালায়িত বলিয়া আমরা প্রাকৃতিক নিয়মের কল্পনা করি? মহৎ ও হীন জীবনের মধ্যে কি বাস্তবিক কোনও ভেদ আছে, অথবা মহৎ ও হীন কেবল কথামাত্র, উভয়বিধ জীবনই অর্থহীন? এই সকল ও এইরূপ অনেক প্রশ্নের উত্তর বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষাগারে মিলিবে না। ব্রহ্মবিজ্ঞান ইহাদের উত্তর দিয়াছে, কিন্তু বিজ্ঞান তাহা গ্রহণ করিতে পারে নাই। এই সকল উত্তরের বিশ্বস্ত ও দৃঢ় নৈশ্চিত্যই বৈজ্ঞানিকের সন্দেহের কারণ। এই সকল প্রশ্নের আলোচনা ও উত্তরদান দর্শনশাস্ত্রের কাজ।

সভ্যতার প্রারম্ভ হইতে মানুষের মনে উপরিউক্ত ও ঐরূপ বহু প্রশ্ন উদিত হইয়াছে, এবং বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত মানুষ ঐ সকল সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করিতেছে। আলোচনার নিবৃত্তি হয় নাই। মানুষের কৌতূহল আজিও অপরিতৃপ্ত রহিয়াছে। এক যুগে যে মীমাংসা গৃহীত হইয়াছে, পরবর্ত্তী যুগে তাহাতে সন্দেহ জাগিয়াছে। নূতন নূতন মীমাংসার সন্ধানে মানুষের মন ব্যাপৃত আছে। আদিম নীহারিকা হইতে কিরূপে এই বিচিত্র জগতের উদ্‌ভব হইল, তাহা জড়জগতের ইতিহাসের বিষয়। কিরূপে ক্ষুদ্র জীবাণু হইতে ক্রমে ক্রমে সুগঠিত মানব-শরীরের উদ্ভব হইল, প্রাণ-বিজ্ঞান তাহা আবিষ্কার করিয়াছে। কিন্তু কেবল নীহারিকাই বিচিত্র বিশ্বে এবং জীবাণু মানব-শরীরে পরিণত হয়

১ Tradition. ২ Revelation.

নাই। অভিব্যক্তি-ধারার এক মুহূর্ত্তে এই শরীরের সহযোগিরূপে বুদ্ধির আবির্ভাব হইয়াছিল। সেই বুদ্ধি আজি জাগতিক যাবতীয় রহস্যের সমাধানে নিযুক্ত। জ্ঞানের বিকাশের ইতিহাস আছে। কিরূপে অজ্ঞানের অন্ধকার ক্রমে ক্রমে বিদূরিত হইয়াছে, এবং জ্ঞান ক্ষিপ্রপদসঞ্চারে অগ্রসর হইয়াছে, তাহার ইতিহাস আছে। জ্ঞান-বিকাশের সেই ইতিহাস মানবীয় বুদ্ধির ও চিন্তার অভিব্যক্তির ইতিহাসই—দর্শনের অভিব্যক্তির ইতিহাস। এই ইতিহাসের প্রতিষ্ঠা করেন পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকপ্রবর হেগেল উনবিংশ শতাব্দীতে। এই ইতিহাস কেবল দার্শনিক মতাবলীর সংগ্রহ নহে। হেগেল ইহাকে জগতের অভিব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া গণ্য করিতেন। জড় ও চিৎ উভয়ের সমবায়ই জগৎ। জড়ের অভিব্যক্তির সঙ্গে চিতেরও অভিব্যক্তি হইয়াছে। জ্ঞানের বিকাশ জগতের অভিব্যক্তিরই অন্তর্গত। সুতরাং দর্শনের ইতিহাস যাহা জ্ঞানের বিকাশের অন্তর্ভুক্ত, তাহাও জগতের অভিব্যক্তির ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত। দেশ ও কালের অতীত প্রজ্ঞার[১] দেশ ও কালে প্রকাশই জগৎ। ন্যায়ের বন্ধনে সম্বদ্ধ[২] পদার্থ বা প্রকারদিগের[৩] সমবায়কে হেগেল "বিশুদ্ধ প্রজ্ঞা" বলিয়াছেন, কেননা তাহারা ইন্দ্রিয়াতীত। দেশ ও কালের অতীত এই সকল "প্রকারের" দেশ ও কালে ইন্দ্রিয়ের বিষয় ও চিৎরূপে আবির্ভাবই জগৎ। ন্যায়ের ক্রমে[৪] সংবিদে তাহাদের ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হওয়ার ইতিহাসই দর্শনের ইতিহাস।

অনেক পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত গ্রীস দেশকে দর্শনের আদি জন্মভূমি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু গ্রীসে দার্শনিক আলোচনা আরব্ধ হয় খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতাব্দীতে। তাহার পূর্ব্বেই যে ভারতে দার্শনিক আলোচনা আরব্ধ হইয়াছিল, বেদে ও উপনিষদে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপনিষদে অনেক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ব্রহ্মণ, আত্মা, মহৎ, যোগ, মীমাংসা প্রভৃতি শব্দের ব্যবহার হইতে অনুমান করা যায় যে উপনিষৎ যুগের বহু পূর্ব্ব হইতে ভারতে দর্শনের আলোচনা চলিয়া আসিতেছিল। শ্বোয়েগ্‌লার বলিয়াছেন, এই সকল আলোচনাকে দার্শনিক আলোচনা বলা যায় না। ইহারা ঈশ্বরবিজ্ঞান অথবা পৌরাণিক কাহিনী মাত্র। তাঁহার মতে সত্তার মৌলিক তত্ত্বের আবিষ্কারের জন্য চেষ্টা যখন প্রথম আরব্ধ হইয়াছিল, তখনই দর্শনের জন্ম হইয়াছিল। গ্রীসে থালিশ হইতেই সেই চেষ্টা আরব্ধ হয়। কিন্তু

---

১ Reason. ২ Logically Connected. ৩ Categories.
৪ Logical process.

উপনিষদেও এই চরম মৌলিক তত্ত্বের আবিষ্কারের প্রচেষ্টা লক্ষিত হয়। 'যাহা হইতে ভূতসকলের উৎপত্তি হয়, যাহাদ্বারা জাত বস্তু জীবিত থাকে, এবং যাহার মধ্যে তাহারা অন্তিমে প্রবেশ করে," তাহার অনুসন্ধানই চরম তত্ত্বের অনুসন্ধান। "কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতগণ অথবা পুরুষ অথবা ইহাদের পরস্পরের সংযোগ জগতের কারণ কি না" এই প্রশ্নের আলোচনাও চরম তত্ত্বের অনুসন্ধান। এই সকল আলোচনা উপনিষদে আছে, সুতরাং উপনিষদকে দর্শন না বলিবার কারণ নাই। উপনিষদে পৌরাণিক কাহিনী আছে সত্য। কিন্তু প্লেটোও তাহার দর্শন বিবৃত করিতে পৌরাণিক কাহিনীর ব্যবহার করিয়াছেন। তাহার জন্য উপনিষৎকে দর্শন না বলা যুক্তিসম্মত নহে।

পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাসে দর্শনের অভিব্যক্তির ক্রম সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতীয় দর্শনে এই অভিব্যক্তির বিভিন্ন ক্রম অস্পষ্ট। বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন বর্ত্তমানে আমরা প্রাপ্ত হই সূত্রাকারে। এই সকল বিভিন্ন দর্শন-সূত্রাবলীর উপর বহুসংখ্যক ভাষ্য, টীকা ও বৃত্তি রচিত হইয়া বিরাট দার্শনিক সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু এই সকল দর্শনের কোন্‌টি কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী তাহা নির্ণয় করা সহজসাধ্য নহে; প্রত্যেক দর্শনেই অন্যান্য দর্শনের উল্লেখ আছে। প্রাচীন ভারতে বহুসংখ্যক দার্শনিক মত উদ্ভূত হইয়াছিল। তখন লিপিবিদ্যার প্রচলন না থাকায় সেই সকল মত মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। যে সকল পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যখ্যাতি বিস্তৃত হইত, তাহাদের নিকট নানা স্থান হইতে ছাত্র শিক্ষার জন্য সমাগত হইত। শিক্ষা সম্পূর্ণ হইলে শিষ্যগণ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া অধীত বিদ্যার বিস্তার করিতেন। কালক্রমে এই সকল বিদ্যা সূত্রাকারে গ্রথিত হইয়া প্রথম গুরুর নামে প্রচারিত হয়। এই সকল দর্শনের প্রতিষ্ঠাতাদিগের কালনির্ণয় এই জন্যই কঠিন ব্যাপার।

ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্য বেদ। বেদে যে দার্শনিক চিন্তার পরিচয় লাভ করা যায়, তাহা অপেক্ষাকৃত উন্নত ধরণের। খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতাব্দীতে গ্রীস দেশে আনক্সাগোরাস্ গ্রীক-দর্শনে Nous বা প্রজ্ঞাবাদের প্রবর্ত্তন করেন। জগতের উপাদান Homoiomeriae নামক অতি সূক্ষ্ম কণিকাদিগের মধ্যে গতিসঞ্চারের জন্য তিনি Nous-এর কল্পনা করিয়াছিলেন। এই Nous-ই তাঁহার মতে বিশ্বের স্রষ্টা। তাঁহার বহুপূর্ব্বে ঋগ্বেদের পুরুষ-সূক্তে এক "পুরুষ"কে বিশ্বের সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত এবং বিশ্বাতিগ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল, এবং গায়ত্রী মন্ত্রে মানুষের বুদ্ধি (ধী) তাহা হইতে প্রাপ্ত বলা হইয়াছিল। এত

প্রাচীন যুগে ভারতে দার্শনিক আলোচনা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু তখন জীবন-সংগ্রাম কঠোর ছিল না। দেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হইত, এবং তাহার জন্য কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত না। লোকের অভাব বেশী ছিল না, এবং জীবন-ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্যই স্বল্পায়াস-লভ্য ছিল। প্রচুর অবসরের মধ্যে চিন্তাশীল ব্যক্তির মনে জগৎসম্বন্ধীয় নানাবিধ প্রশ্নের উদয় হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না। জীবনযাত্রা দুষ্কর না হইলেও দুঃখের অসদ্ভাব ছিল না। ব্যাধি, জরা ও মৃত্যু অপরিহার্য্য ছিল। জীবনের সঙ্গী এই ব্যাধি জরা ও মৃত্যুকে জয় করিবার চিন্তাও চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মনে উদিত হইত। ইহা হইতেই দর্শনের উদ্ভব সম্ভবপর হইয়াছিল।

দার্শনিক চিন্তার উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই দর্শন একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। তখন দর্শন ও বিজ্ঞানের ভেদ অনুভূত হয় নাই। ক্রমে জ্ঞানের এক একটি বিভাগ স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে, যেমন আয়ুর্বেদ ও জ্যোতিষ। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে, সনৎকুমার কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নারদ বলিয়াছিলেন, তিনি চতুর্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিত, বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র) নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি কুড়িটি শাস্ত্র অবগত আছেন। ইহা হইতে মনে হয়. উপনিষদের যুগেও অনেক বিদ্যার স্বতন্ত্রভাবে চর্চ্চা হইত।

বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ভারতে বহুবিধ দর্শনের আবির্ভাব হইয়াছিল। ব্রহ্মজালসূত্তে বুদ্ধ ৬২টি দর্শনের উল্লেখ করিয়াছিলেন। এক সম্প্রদায়ের মতে এই বিশ্ব ও জীবাত্মা উভয়ই সনাতন, কিন্তু কাহারো কাহারো মতে তাহাদের অংশবিশেষ সনাতন, অংশবিশেষ নহে। আর এক সম্প্রদায়ের মতে প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে। এই মত জৈন স্যাৎ-বাদের সদৃশ। এই মতাবলম্বী যাহারা, তাহারা ভাল ও মন্দের ভেদ স্বীকার করিতেন না। পরলোকসম্বন্ধে হাঁ বা না তাঁহারা কিছুই বলিতেন না। তৃতীয় সম্প্রদায়ের মতে জীবাত্মা ও জগৎ যদৃচ্ছা-সম্ভূত। তাহারা যুক্তিদ্বারা প্রমাণ করিতে চাহিতেন যে আত্মা ও জগতের কোনও কারণ নাই। মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল। উপনিষদ যুগের পরেই যে বহুসংখ্যক দার্শনিক মতের উদ্‌ভব হয়, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভারতীয় দর্শনকে প্রধানতঃ চারি স্তরে বিভক্ত করা যায়ঃ

(১) **বৈদিক যুগঃ** বেদের আবির্ভাব হইতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৭০০ বৎসর পর্য্যন্ত এই যুগ বিস্তৃত। কাহারও কাহারও মতে খৃঃ পূঃ ১৫০০ অব্দে আর্য্যগণ ভারতে আসিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে খৃঃ পূঃ ২০০০ বৎসরে।

কাহারও মতে তাহারও পূর্ব্বে। মহেঞ্জোদারো ও হারাপ্পায় তাহাদের মতে আর্য্য সভ্যতার নিদর্শনই পাওয়া গিয়াছে, অনার্য্য সভ্যতার নহে। সে যাহাই হউক, বেদের এক অংশ যে আর্য্যগণ ভারতে আসিবার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, ইহা খুব সম্ভবপর। সুতরাং ভারতীয় দর্শনের বৈদিক যুগ কবে আরব্ধ হইয়াছিল, তাহা অনিশ্চিত। খৃঃ পূঃ ২০০০ হইতে ৭০০ বৎসর পর্য্যন্ত বৈদিক যুগ বিস্তৃত, ইহা মনে করিলে বিশেষ ভুল হইবে না। বৈদিক যুগকে তিন স্তরে বিভক্ত করা হয়: (১) সংহিতা যুগ, (২) ব্রাহ্মণ যুগ ও (৩) আরণ্যক-উপনিষদ্ যুগ। সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও প্রাচীন উপনিষৎসকল এই যুগে রচিত হইয়াছিল।

(২) **মহাকাব্যের যুগ**ঃ খৃঃ পূঃ ৭০০ হইতে খৃষ্টীয় ২০০ অব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগে শ্বেতাশ্বতর ও পরবর্ত্তী অনেক উপনিষৎ, এবং রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয়। বৌদ্ধ, জৈন, শৈব ও বৈষ্ণব ধর্ম্মও এই যুগে উদ্‌ভূত হয়। শ্রীমৎভগবৎগীতাও এই যুগে রচিত হয়। ঋষিদিগের দার্শনিক চিন্তা গীতা, রামায়ণ ও মহাভারতের মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হয়। বিভিন্ন দর্শন এই যুগে সুসম্বদ্ধ রূপ ধারণ করে। বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাবের সমকালেই অধিকাংশ দর্শন আবির্ভূত হইয়াছিল। তাহারা ক্রমে পরিণতি লাভ করিয়া সুসম্বদ্ধ দর্শনে পরিণত হয়।

(৩) **সূত্র যুগ**ঃ খৃষ্টীয় ২০০ অব্দে আরব্ধ, সমাপ্তিকাল অনিশ্চিত। এই যুগে দর্শনসকল সূত্রাকারে গ্রথিত হয়। বহু যুগ ধরিয়া বেদ, উপনিষৎ প্রভৃতি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা হইত, তখন লিপিবিদ্যার প্রচলন হয় নাই। এই কণ্ঠস্থ করিবার নিয়ম প্রাতিশাখ্যে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত আছে। মাক্সমূলার বলেন যখন এই ভাবে কণ্ঠস্থ সাহিত্য লিপিবিদ্যার প্রচলনের পরে লিপিবদ্ধ হয়, তখন খুব সম্ভবতঃ তাহা সূত্রাকারে লিখিত হইয়াছিল। কাগজ তখন ছিল না। কণ্ঠস্থ সাহিত্য ছিল বিপুলায়তন। লিখিতে সক্ষম লোকের সংখ্যাও ছিল অতি সামান্য। সুতরাং কণ্ঠস্থ বিষয় অতি সংক্ষেপে লিখিবার প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছিল। ইহা হইতেই সূত্র সাহিত্যের উদ্‌ভব হয়। উপনিষৎ যুগ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই যে সূত্রের উদ্‌ভব হইয়াছিল, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। বিশুদ্ধি মার্গে (বৌদ্ধ শাস্ত্র) সাংখ্য দর্শনের উল্লেখ আছে। তখন হয়তো সূত্রাকারে সাংখ্য দর্শন প্রচলিত ছিল।

সূত্রাকারে পরিণত দর্শনদিগের মধ্যে কোনটি কাহার পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। যোগদর্শনে সাংখ্যের চতুর্বিংশতি তত্ত্ব স্বীকৃত, বৈশেষিক দর্শন ন্যায় ও সাংখ্য মত গ্রহণ করিয়াছে। ন্যায় দর্শনে সাংখ্য ও বেদান্তের

উল্লেখ আছে। মীমাংসা ও বেদান্ত দর্শনে মুখ্য বা গৌণ ভাবে অন্যান্য দর্শনের অস্তিত্ব স্বীকৃত। অধ্যাপক গার্বের মতে সাংখ্য দর্শন সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, তাহার পরে যোগ, যোগের পরবর্ত্তী পূর্ব্ব মীমাংসা ও বেদান্ত, বৈশেষিক ও ন্যায় সকলের পরবর্ত্তী।

(৪) **সাম্প্রদায়িক যুগ**: ইহাকে কেহ কেহ Scholastic Period ও বলিয়াছেন। এই যুগে বিভিন্ন দর্শনানুবর্ত্তিগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হন, এবং বহু ভাষ্য রচিত হয়। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত এই যুগ বিস্তৃত। প্রত্যেক দর্শনের অধ্যাপনার জন্য স্বতন্ত্র চতুষ্পাঠী ছিল এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অধ্যাপকগণ অন্যান্য সম্প্রদায়ের মতবাদ খণ্ডনের জন্য বিশেষ চেষ্টিত ছিলেন। গৌড়পাদ, কুমারিলভট্ট, শংকর, রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বাচস্পতি, উদয়ন, ভাস্কর, শ্রীহর্ষ, জয়ন্ত, বিদ্যারণ্য, বিজ্ঞান ভিক্ষু, মধুসূদন প্রভৃতি এই যুগের ভাষ্যকার। এই যুগের সর্ব্বশেষ দার্শনিক শ্রীঅরবিন্দ।

ভারতীয় দর্শন-সংগ্রহ গ্রন্থ কয়েকখানা বর্ত্তমান আছে। কিন্তু তাহাদিগকে দর্শনের ইতিহাস নামে অভিহিত করা যায় না। তাহারা দার্শনিক মতসমূহের সংগ্রহ মাত্র। ষড়দর্শন বলিতে সাধারণতঃ পূর্ব্বমীমাংসা ও বেদান্ত, সাংখ্য ও যোগ, ন্যায় ও বৈশেষিক এই ছয় দর্শন বুঝায়। সিদ্ধর্ষি রচিত "উপমিতি-ভব-প্রপঞ্চ কথা"য় (৯০৬ খৃঃ অঃ) এই ছয় দর্শনের বিবরণ আছে। এই সকল দর্শন সংগ্রহের মধ্যে হরিভদ্রের "ষড়-দর্শন সমুচ্চয়" প্রাচীনতম। কিংবদন্তী আছে ৫২৯ খৃষ্টাব্দে হরিভদ্রের মৃত্যু হয়। কিন্তু বার্থের মতে তিনি নবম শতাব্দীর লোক, কিথ্‌এর মতে অষ্টম শতাব্দীর। এই গ্রন্থে বৌদ্ধ দর্শন, ন্যায়, সাংখ্য, বৈশেষিক, পূর্ব্বমীমাংসা, জৈন দর্শন, চার্বাক দর্শন, এই সাতটি দর্শনের বর্ণনা আছে (যদিও গ্রন্থের নাম ষড়-দর্শন সমুচ্চয়)। শংকরাচার্য্যের নামে প্রচারিত "সর্ব্বদর্শনসিদ্ধান্ত-সার-সংগ্রহ" গ্রন্থে লোকায়ত, এবং জৈন, মাধ্যমিক, যোগাচার, সূত্রান্তিক, বৈভাষিক, এই চারিটি বৌদ্ধ দর্শনের, বৈশেষিক, ন্যায়, পূর্ব্বমীমাংসা (প্রভাকর ও কুমারিল মতের), সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদব্যাস (অর্থাৎ মহাভারত) এবং বেদান্তের বর্ণনা আছে। ইহাতে ভাগবত পুরাণের উল্লেখ আছে, কিন্তু রামানুজের নাম নাই। এই গ্রন্থ শংকরের রচিত কিনা, সন্দেহের বিষয়। ইহার রচনাকাল অনিশ্চিত। দিগম্বর জৈন সামন্ত ভদ্র ষষ্ঠ শতাব্দীতে "আপ্ত মীমাংসা" নামক গ্রন্থে বিভিন্ন দার্শনিক মতের বর্ণনা ও সমালোচনা করিয়াছিলেন। ভববিবেক নামে এক মাধ্যমিক বৌদ্ধ লেখক "তর্ক বিবেক" নামক

গ্রন্থে মীমাংসা, সাংখ্য, বৈশেষিক ও বেদান্ত দর্শনের সমালোচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যানন্দ ও মেরুতুঙ্গ নামে দুইজন দিগম্বর জৈন বিভিন্ন গ্রন্থে (অষ্ট সাহস্রী ও ষড়-দর্শন বিচার) ত্রয়োদশ শতাব্দীতে হিন্দু দর্শন সমূহের সমালোচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ মাধবাচার্য্য "সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহ" নামক যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাই সংগ্রহ গ্রন্থাবলীর মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থে দর্শনসকল নিকৃষ্ট হইতে উৎকৃষ্টতর ক্রমে সজ্জিত। প্রথমে চার্বাক দর্শন, পরে বৌদ্ধদর্শন, পরে জৈন, রামানুজ, তাহার পরে নানাবিধ শৈবদর্শন, তাহাদের পরে বৈশেষিক, ন্যায়, পূর্ব্বমীমাংসা, পাণিনীর ব্যাকরণ দর্শন, তাহার পরে সাংখ্য ও যোগ, সর্ব্বশেষে বেদান্ত। কিথ্‌এর মতে বেদান্ত অধ্যায় প্রথমে গ্রন্থের মধ্যে ছিল না, পরে মাধবের পিতা সায়ন কর্তৃক গ্রন্থে সংযোজিত হয়। কেহ কেহ বলেন, সায়নই সম্পূর্ণ গ্রন্থের রচয়িতা। "সর্ব্ব-মত সংগ্রহ" নামক গ্রন্থে (গ্রন্থকারের নাম ও কাল অজ্ঞাত) প্রথমে তিনটি বৈদিক দর্শন, পরে বৌদ্ধ, জৈন ও জড়বাদী মত, তাহার পরে বৈশেষিক এবং ন্যায় ('তর্ক' নামে), পরে সেশ্বর ও নিরীশ্বর সাংখ্য, তাঁহার পর পূর্ব্বমীমাংসা এবং বেদান্ত বিবৃত হইয়াছে। মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার 'প্রস্থান ভেদে" ষড়-দর্শনের (ষোড়শ শতাব্দী) বর্ণনা করিয়াছেন। ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ও ডাক্তার সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ইংরেজি ভাষায় ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার গ্রন্থকে ভারতীয় দর্শনের ইতিহাস নামে অভিহিত না করিয়া "ভারতীয় দর্শন" বলিয়াছেন, যদিও তাহাতে বিভিন্ন দর্শনের ঐতিহাসিক ক্রম বর্ণিত হইয়াছে। মাক্সমুলার প্রণীত Six Systems of Indian Philosophy নামক গ্রন্থ উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল।

ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে মানবমনে জগৎ ও মানুষ সম্বন্ধে প্রথম কৌতূহল ও তাহা হইতে উদ্ভূত প্রশ্নসমূহের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই সকল প্রশ্নের আলোচনা ও মীমাংসার জন্য রাজসভায় বিদ্বৎ-জন-সমাগম হইত। তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীলোকও থাকিতেন। বিচারে যিনি জয়লাভ করিতেন, রাজা তাঁহাকে পুরস্কৃত করিতেন। যজ্ঞদ্বারা কিরূপে মানুষ মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করে যে মৃত্যু, তাহাকে গ্রাস করে কোন্ দেবতা, মৃত্যুর পরে প্রাণের কি হয়, মৃত্যুকালে যাহা মানুষকে ত্যাগ করে তাহা কি; মৃত্যুর পরে মানুষের কি হয়; কে তিনি, যিনি সকল বস্তু নিয়ন্ত্রিত করেন, অথচ সকল বস্তু হইতে ভিন্ন; এই সকল ও এইরূপ বহু প্রশ্ন এই সকল সভায় আলোচিত

হইত। এই সকল প্রশ্নের উত্তর সন্তোষজনক না হইতে পারে। কিন্তু বুদ্ধের জন্মের বহু পূর্ব্বে এতাদৃশ প্রশ্নসকল উত্থাপিত হওয়া আশ্চর্য্যজনক বলিয়া মনে হয়। মাক্সমূলার জিজ্ঞাসা করিয়াছেন এমন অন্য কোনও দেশের কথা কি আমরা জানি, যেখানে এইরূপ দর্শনসভার কল্পনা করা যাইতে পারে? "বিশ্বের মূল কারণ যেমন জড়জগতে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও দ্যৌঃরূপে প্রকাশিত, তেমনি মানুষের অন্তরেও তিনি ধীরূপে প্রকাশিত।" "যাহা ভূত ও যাহা ভব্য, সকলই সেই পুরুষ; সেই পুরুষের তিন পাদ পৃথিবীর উর্দ্ধে" (তিনি immanent and transcendent) এই সকল উক্তি আরও আশ্চর্য্যজনক।

ভারতীয় সমাজের একটি বিশেষত্ব এই, যে ভারতের সর্ব্বোচ্চ দার্শনিক চিন্তা জনসমাজে বিস্তৃত হইয়াছিল। রামায়ণ, মহাভারত, ভগবদ্গীতা ও পুরাণের মাধ্যমে দর্শনের শিক্ষা ন্যূনাধিক সমাজের সর্ব্বস্তরে প্রচারিত হইয়াছিল। বেদের দ্বার সকলের পক্ষে উন্মুক্ত না হইলেও বেদেরই শিক্ষা পুরাণের সাহায্যে সর্ব্বত্র বিস্তৃত করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। ভারতের সমাজ এই শিক্ষার ফলেই সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ বহু বৈদেশিক আক্রমণ ও পরাজয় সত্ত্বেও আপনার অস্তিত্ব বজায় রাখিতে পারিয়াছিল, এবং বহু বিজাতীয় ও বিধর্ম্মী লোককেও আপনার অঙ্গীভূত করিয়া শান্তিতে বাস করিয়াছিল। বহু বিপর্য্যয়ের মধ্যে ভারতের আত্মা অপরাজিত ছিল। আজ নূতন অবস্থার মধ্যে ভারতীয় সমাজের পুনর্গঠনের প্রয়োজন অনস্বীকার্য্য। কিন্তু এই পুনর্গঠন ভারতের সংস্কৃতির অনুযায়ী হওয়াই উচিত। তাই ভারতীয় দর্শনের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় শিক্ষিত ভারতবাসীর পক্ষে অত্যাবশ্যক।

বর্ত্তমান কালে অনেকের ধারণা দর্শনশাস্ত্রের আলোচনা নিরর্থক। দর্শন কোনও নিশ্চিত মীমাংসায় কখনও পৌঁছিতে পারে নাই, পারিবেও না। দর্শন বর্জন করিয়া নিশ্চিত বিজ্ঞানের অনুশীলনই কল্যাণের পথ। কিন্তু বর্ত্তমানে কোথায় বিজ্ঞানের শেষ এবং দর্শনের আরম্ভ, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। বিজ্ঞান ক্রমশঃই দর্শনের নিকটে অগ্রসর হইতেছে, এবং বর্ত্তমানে এমন স্থানে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে, যাহা বহু দিন দর্শনেরই অধিকৃত ছিল। তাই বিজ্ঞানের মীমাংসার উপরই দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিবার চেষ্টা হইতেছে। সেই প্রচেষ্টার সফলতা নির্ভর করিতেছে সংস্কারমুক্ত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের উপর। অভিজ্ঞতার একাধিক ক্ষেত্র বিজ্ঞান বহু দিন অবজ্ঞার সহিত পরিহার করিয়াছে (যেমন Psychical Society's research)। তাহাদের যথোচিত অনুশীলনের প্রয়োজন। বিজ্ঞানে মূল্যের (Value) স্থান অতি সংকীর্ণ—

নাই বলিলেও চলে। কিন্তু মূল্যের অনুভূতি দর্শনের আলোচ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অভিব্যক্তি বাদে তাহার সম্পূর্ণ সুসংগত ব্যাখ্যা হয় না। সৌন্দর্য্যতত্ত্ব (aesthetics) ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রের মধ্যে পড়ে না। তাহাও বর্ত্তমানে দর্শনের একটি প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই সকল কারণে দর্শনশাস্ত্রকে নিরর্থক বলা যায় না। মানব-সভ্যতার বর্ত্তমান সংকট মুহূর্ত্তে, যখন বিজ্ঞানদত্ত ক্ষমতা মানবের কল্যাণবুদ্ধিকে অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তখন দর্শনের, বিশেষতঃ ভারতীয় দর্শনের আলোচনার প্রয়োজন অস্বীকার করা অসম্ভব।

কেহ কেহ বলিয়াছেন, ভারতীয় দর্শনে সিদ্ধান্ত আছে, কিন্তু উপপত্তি নাই, সিদ্ধান্ত প্রমাণ করিবার চেষ্টা নাই। বেদান্তদর্শন উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। উপনিষদের সিদ্ধান্তের অর্থ বেদান্ত দর্শনে বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্ত সম্বন্ধে উপরিউক্ত আপত্তি কথঞ্চিৎ সত্য হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যকারগণ বেদান্ত-সিদ্ধান্ত যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ভাষ্যকারগণ স্ব স্ব দর্শনের অনুযায়ী ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুতরাং বেদান্ত সম্বন্ধেও উপরিউক্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য নহে। প্রায় প্রত্যেক দর্শনের প্রথমেই আছে প্রমাণের কথা, কিরূপে আমরা জানিতে পারি তাহার কথা। প্রমাণের উপরই প্রত্যেক দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। ষড়্-দর্শনে অবশ্য বেদ বা আপ্ত বচন ত্রিবিধ প্রমাণের একটি বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু জৈন ও বৌদ্ধ-দর্শনে নহে। আপ্তবাণীর প্রামাণ্য-স্বীকার দ্বারা ষড়্-দর্শনে স্বাধীন চিন্তা প্রতিহত হয় নাই। সাংখ্য দর্শন স্পষ্টই প্রমাণাভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছে, যদিও উক্ত দর্শনে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত। অন্যান্য দর্শনেও আপ্তবাণী স্বাধীন চিন্তার গতিরোধ করে নাই। শ্রুতিবাক্যের বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিভিন্ন দার্শনিক করিয়াছেন। যাহাদের ভ্রম, প্রমাদ অথবা প্রবঞ্চনা করিবার ইচ্ছার সম্ভাবনা নাই, এইরূপ ঋষিদিগের বাক্যই আপ্তবাণী। সেই সকল বাক্য ঋষিদিগের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং আপ্তবাক্যকে যুক্তিহীন বলা যায় না।

ভারতীয় দর্শনকে কেহ কেহ অমঙ্গলবাদী দর্শন বলিয়াছেন। কিন্তু এই অভিযোগ সত্য নহে। হিন্দু-দার্শনিকগণ এই জগৎকে সর্ব্ববিধ সম্ভাব্যমান জগতের মধ্যে সর্ব্বোত্তম বলিয়া স্বীকার করেন নাই, ইহা সত্য। জগতে অমঙ্গলের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ব্যাধি, জরা, মৃত্যু, আশাভঙ্গ প্রভৃতি দুঃখভার বহন করিয়া মানবজাতি অগ্রসর হইয়াছে। সুখ যে নাই, তাহা নহে ; কিন্তু যে সুখ আছে, তাহা দুঃখ-সংভিন্ন বলিয়া ভারতীয় দর্শনে তাহার অধিক মূল্য দেওয়া হয়

নাই। কিন্তু জাগতিক দুঃখ অনতিক্রমণীয় নহে। ভারতীয় দর্শনে তাহা হইতে নিষ্কৃতির উপায় অনুসন্ধান করা হইয়াছে। ভারতীয় দর্শনের সিদ্ধান্ত জগতে দুঃখ আছে, কিন্তু তাহা হইতে মুক্তিলাভের উপায়ও আছে। বেদান্তের মুক্তি আনন্দময় অবস্থা। বৌদ্ধ থেরী গাথায় নির্ব্বাণের মনোহারী রূপ বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্য ও যোগ দর্শনের মুক্তি দুঃখ-বিযুক্ত অবস্থা। সুতরাং ভারতীয় দর্শনকে অমঙ্গলবাদী[১] বলা সঙ্গত নহে। মাক্ষমূলার লিখিয়াছেন "যে শব্দে আদিতে সত্তা বা সত্য বুঝাইত (সৎ), সেই শব্দ যাহারা "উত্তম" (উৎকৃষ্ট) অর্থেও ব্যবহার করে, তাহারা যাহার অস্তিত্ব আছে, তাহার অস্তিত্ব না থাকা উচিত বলিয়া যে গণ্য করিত, ইহা সম্ভবপর নহে। ভারতীয় দার্শনিকগণ যে সর্ব্বদাই জীবনের দুঃখের কথা বলেন এবং জীবনের কোনও মূল্য নাই বলেন, তাহা নহে। জগতে দুঃখের অস্তিত্ব হইতেই তাঁহারা দার্শনিক চিন্তার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, ইহাই কেবল তাঁহারা বলেন।" ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরের অবিচারের কথা নাই, এবং জগৎ দুঃখময় বলিলেও সেই দুঃখ-মুক্তির জন্য আত্মহত্যার সমর্থন করে না। ভারতীয় দর্শনের মতে দুঃখ অবিদ্যার ফল, এবং জ্ঞানের দ্বারা দুঃখ নাশ করাই দর্শনের উদ্দেশ্য।

একজন সমালোচক বলিয়াছেন, হিন্দু দর্শনের মধ্যে নৈতিকদর্শন বলিয়া কিছু নাই, অথচ দর্শনশাস্ত্র পাঠ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে নৈতিক গুণাবলী অর্জ্জন করা অপরিহার্য্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মানবের সমগ্র জীবন দার্শনিক সিদ্ধান্ত অনুসারে পরিচালিত করা দর্শনশাস্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং সে সিদ্ধান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে ধর্ম্মজীবনযাপন অত্যাবশ্যক।

ভারতীয় দর্শন ভারতেই উদ্ভূত হইয়াছিল এবং ভারতেরই নিজস্ব। তাহার উপর কোনও বৈদেশিক প্রভাবের প্রমাণ নাই। গ্রীক দর্শনের সহিত ভারতীয় দর্শনের কোনও কোনও বিষয়ে সাদৃশ্য অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে এবং আলেকজান্দ্রিয়ার নব প্লেটনিক দর্শন যে ভারতীয় চিন্তা কর্তৃক প্রভাবিত, তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু প্রাচীন গ্রীক দর্শনের উপর ভারতীয় চিন্তার প্রভাব মাক্ষমূলার স্বীকার করেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন "ভারতীয় ও গ্রীক দর্শনের একের নিকট হইতে অন্যের কিছু ধার করিবার অথবা উভয়ের পরস্পরের উপর কোনও প্রভাবের যে প্রমাণ আছে, তাহা আমি স্বীকার করিতে পারি না"।* কিন্তু ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ তাঁহার Eastern Religions and

১ Pessimism.

* Six systems of Indian Philosophy, P. 76 (1899 Edition)

Western Thought গ্রন্থে এই সম্বন্ধে যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন, তাহা হইতে গ্রীক চিন্তার উপর ভারতীয় চিন্তার প্রভাব খুবই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয়।*

বর্ত্তমান কালে অনেক ইয়োরোপীয় ও আমেরিকান মনীষীর রচনায় বেদান্তের প্রভাব লক্ষিত হয়। স্বামী বিবেকানন্দের ইয়োরোপে ও আমেরিকায় বেদান্ত-প্রচারের ফলে পাশ্চাত্য দেশে বেদান্ত দর্শনের সমাদর হইয়াছে। বিবেকানন্দ কর্তৃক বেদান্ত প্রচারের পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও কোনও দার্শনিকের চিন্তাতেও বেদান্তের প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। এমারসনের উপর গীতা ও বেদান্তের প্রভাব সুস্পষ্ট। সোপেনহর উপনিষৎকে তাঁহার জীবনের সান্ত্বনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ব্রাড্‌লে ও বোসাংকেটের উপরও বেদান্তের প্রভাব দেখা যায়।

ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে বেদান্তের প্রভাবই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং সাধারণতঃ বেদান্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন বলিয়া পরিগণিত। অনেকের মতে অন্যান্য দর্শন বেদান্তের সত্যে উপনীত হইবার ক্রমবদ্ধ সোপানাবলী মাত্র। মাধবাচার্য্য (১৪শ শতাব্দী) তাঁহার সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে যে ১৬টি দর্শনের বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে তাঁহার মতে দর্শনের শেষ মীমাংসা বেদান্তেই পাওয়া যায়। "প্রবোধ চন্দ্রোদয়" নামক দার্শনিক নাটকে আছে, যে ষড়দর্শন পরস্পরের বিরোধী নহে; পরন্তু বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হইতে তাহারা ঈশ্বরের মহিমাই প্রমাণ করে। কেহ কেহ বলেন, যাহা পরম সত্য, তাহা অন্যান্য দর্শনে আংশিক ভাবে এবং বেদান্তে পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। বিজ্ঞান ভিক্ষু (১৬শ শতাব্দী) তাঁহার সাংখ্যদর্শনের ভাষ্যে বিস্তারিত ভাবে এই বিষয়ের আলোচনা করিয়াছেন। সাংখ্য নিরীশ্বর এবং বহু পুরুষবাদী, কিন্তু বেদান্ত মতে ব্রহ্মই একমাত্র পুরুষ, এবং তাঁহা হইতে জগতের উদ্ভব হইয়াছে। স্পষ্টতঃ সাংখ্য ও বেদান্তের মত বিভিন্ন। ইহা সত্ত্বেও বিজ্ঞান ভিক্ষু উভয় দর্শনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে সাংখ্যের নিরীশ্বরবাদ উদ্দেশ্যমূলক, এবং যাহাতে কেহ তপস্যা দ্বারা ঈশ্বরত্ব-লাভের জন্য চেষ্টিত না হয়, সেই জন্যই সাংখ্যে প্রমাণাভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ বলা হইয়াছে। মধুসূদন সরস্বতী "প্রস্থানভেদ" গ্রন্থে প্রথমে ষড়দর্শনের অন্তর্গত বিভিন্ন দর্শনের বর্ণনা করিয়া, পরে বলিয়াছেন, "প্রকৃতপক্ষে এই মুনিদিগের (দর্শনকারদিগের) সকলেই এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন এবং তাঁহাদের শেষ মীমাংসা বিবর্ত্তবাদ।

* মৎপ্রণীত পাশ্চাত্য দর্শনের ইতিহাস, প্রথম খণ্ড ২২৪-৩০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

তাঁহারা ছিলেন সর্ব্বজ্ঞ ; সুতরাং তাঁহাদের ভ্রম হওয়া অসম্ভব। তাঁহারা যে বিভিন্ন মত খ্যাপন করিয়াছেন, তাহার উদ্দেশ্য যাবতীয় বৈনাশিক মত পরাহত করা। তাঁহাদের বিশ্বাস ছিল যে জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি বশতঃ মানুষ পরমার্থের জ্ঞান প্রথমেই লাভ করিতে পারে না। মুনিদিগের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাদের অনুবর্ত্তিগণ ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে।" দর্শনসমূহের এই প্রকার ব্যাখ্যা ইতিহাসের দিক হইতে সমর্থনযোগ্য কি না, তাহাতে সন্দেহ আছে। পরন্তু সাংখ্য ও বেদান্তের মধ্যে বিরোধ মৌলিক এবং এতই সুস্পষ্ট যে সাংখ্যের গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন ভিন্ন উভয়ের সমন্বয় সম্ভবপর হয় না।

ভারতে দর্শন জীবন হইতে বিশ্লিষ্ট ছিল না। প্রত্যেক দর্শনের সিদ্ধান্ত অনুসারে জীবন গঠনের প্রচেষ্টা হইত। ঈশ্বরের স্বরূপ ও তাঁহার সহিত মানবের সম্বন্ধ এবং মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি, তাহা জানিবার জন্য ভারতের মন চিরকালই উৎসুক। দর্শনশাস্ত্র ব্রহ্মবিদ্যা নামেও অভিহিত এবং পবিত্র শাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। শঙ্কর ব্রহ্মসূত্রের প্রথম সূত্রের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, যাহাদের নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামূত্র ফলভোগ বিরাগ (ইহলোক ও পরলোকে সকল প্রকার বিষয়ভোগ আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ), শম, দম, 'ইন্দ্রিয় সংযম', উপরতি (নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্মত্যাগ), তিতিক্ষা (শীত, গ্রীষ্ম, সুখ, দুঃখাদি সহন ক্ষমতা), সমাধান (সকল প্রকার বৈষয়িক চিন্তা ত্যাগ করিয়া, মনকে স্থির রাখা), শ্রদ্ধা (শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস) এবং মুমুক্ষুত্ব (মোক্ষলাভের ইচ্ছা) হইয়াছে, তাঁহারাই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে, "পরমেশ্বরে যাহার পরাভক্তি, এবং পরমেশ্বরে যেমন, তেমনি ভক্তি গুরুতেও আছে, তাহাকেই ব্রহ্মতত্ত্ব কথিত হইলে, তাহা প্রকাশিত হইবে (বোধগম্য হইবে)। উক্ত উপনিষদে অশান্তমন ব্যক্তিকে এবং অযোগ্য পুত্র ও অযোগ্য শিষ্যকে ব্রহ্মজ্ঞান দান নিষিদ্ধ হইয়াছে। দর্শন বা ব্রহ্মবিদ্যা অনুযায়ী জীবন গঠনই দর্শন পাঠের লক্ষ্য ছিল। দর্শন সাধনার বস্তু ছিল। কোনও দর্শন যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইত, তাহার অনুবর্ত্তিগণ তদনুসারে জীবন গঠনের জন্য চেষ্টা করিত। দর্শন কেবল বুদ্ধিবৃত্তির বিলাসের বিষয় ছিল না।

প্রচলিত ধর্ম্মবিশ্বাস ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান ভারতে স্বাধীন চিন্তার প্রতিবন্ধক হয় নাই। সামাজিক বিধি পালন করিয়া স্বাধীন চিন্তাবলে যে কোনও মীমাংসা অবলম্বনে কোনও বাধা ছিল না। বেদের দেববাদ ও দ্রব্য-যজ্ঞ

উপনিষদের ব্রহ্মবাদও ধ্যানযজ্ঞে পরিণত হইয়াছিল। নিরীশ্বর সাংখ্য এবং বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের আবির্ভাবও সম্ভবপর হইয়াছিল। জড়বাদী দৈহিক-সুখসর্ব্বস্ব চার্বাকদর্শনও শ্রেণীবিশেষের মধ্যে প্রচারিত হইতে পারিয়াছিল।

জগৎ দুইভাগে বিভক্ত—বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সম্মুখে বিস্তৃত বহির্জগৎ[১], এবং অন্তরিন্দ্রিয় মনের বিষয়রূপে বর্ত্তমান অন্তর্জগৎ[২]। জগতের ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা বা দর্শন এই দুই জগতের যে কোনটি হইতে সুরু হইতে পারে। পাশ্চাত্ত্য দেশে বহির্জগতের মূলতত্ত্ব অনুসন্ধানে এই প্রচেষ্টা আরব্ধ হইয়াছিল। কিন্তু ভারতে উভয় দিক হইতেই এই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা প্রায় সমকালেই উদ্‌ভূত হইয়াছিল। বেদের ঋষি বহুধা বিভক্ত বহির্জগতে এক ভূমার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, এবং জগতের যাবতীয় বস্তু, জড় ও চেতনা সকলই তাঁহার অংশরূপে দেখিয়াছিলেন। এই ভূমার অসংখ্য শির, অসংখ্য অক্ষি ও অসংখ্য পদ, তিনি সমগ্র জগতে ব্যাপ্ত এবং জগতের বাহিরেও অবস্থিত। ভূমাকে ঋষি জড় ও অচেতন বলিয়া মনে করেন নাই, তাহাকে "পুরুষ" বলিয়াছেন। এই বৃহৎ সর্ব্বব্যাপী পুরুষকে ব্রহ্ম নামে অভিহিত করা হইয়াছিল। জীবের অন্তর্হৃদয়ে দহরাকাশে ব্রহ্মপুরে* এই ব্রহ্মই আত্মারূপে বর্ত্তমান। আত্মার মধ্যে দহরাকাশে দ্যৌঃ, পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র, বিদ্যুৎ—যাহা আছে, যাহা নাই সকলই—বর্ত্তমান। এই "একে"র চিন্তা অতি প্রাচীন কালেই ভারতীয় মনীষীদিগের মন অভিভূত করিয়াছিল। জগতে "নানা"র অস্তিত্ব তাঁহারা অস্বীকার করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী কালে বিরোধী মতের আবির্ভাব হইলেও আত্মাদ্বৈতবাদই ভারতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দর্শন বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে, এবং আত্মার অনুসন্ধানই (আত্মানং বিদ্ধি) দর্শনের লক্ষ্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখী, তাহারা বাহ্যবিষয়ই দেখিতে পায়, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। ইন্দ্রিয়দিগকে অন্তর্মুখী করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি অন্তরাত্মার সাক্ষাৎলাভ করেন। এই আত্মসাক্ষাৎকারের উপরই ভারতীয় অদ্বৈতবাদ প্রতিষ্ঠিত।

ভারতীয় দর্শনগুলির মধ্যে চার্বাক, জৈন ও বৌদ্ধ নিরীশ্বর। উহারা বেদের প্রামাণ্যও স্বীকার করে না, এইজন্য এই দর্শনগুলি নাস্তিক দর্শন বলিয়া পরিচিত। ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসায় বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত। এইজন্য ইহারা আস্তিক দর্শন, যদিও সাংখ্যে প্রমাণ্য-

১ Macrocosm. ২ Microcosm.

* ছান্দোগ্য উপনিষৎ ৮।১।১ দহর = ক্ষুদ্র

ভাবে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকৃত। এই শেষোক্ত ছয়খানি দর্শন ষড় দর্শন বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু হরিভদ্র সূরি নামক জৈন গ্রন্থকার বৌদ্ধ, ন্যায়, সাংখ্য, জৈন, বৈশেষিক ও পূর্ব্বমীমাংসা এই ছয়টি দর্শনকে আস্তিক ষড় দর্শন বলিয়াছেন, কেননা এই সকল দর্শনে পাপ, পুণ্যের ভেদ এবং পরলোকের অস্তিত্ব স্বীকৃত।

ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, পূর্ব্বমীমাংসা ও উত্তরমীমাংসা, আস্তিক দর্শন হইলেও প্রথম চারিটি দর্শনের উপর বেদের প্রভাব অধিক নহে। ঈশ্বর উপনিষদে নানাভাবে কীর্ত্তিত হইলেও, এক উত্তরমীমাংসা বা বেদান্তই উপনিষদের উপর প্রতিষ্ঠিত। বৈশেষিক দর্শনে ঈশ্বরের নাম পর্য্যন্ত উল্লিখিত হয় নাই; কেবল একটি সূত্রে (তৎবচনাৎ আম্নায়স্য প্রামাণ্যং) ঈশ্বরের গৌণভাবে উল্লেখ আছে। উদ্ধৃত সূত্রে "তৎ" শব্দের অর্থ ব্রহ্ম বলিয়া গৃহীত হয়। কেহ কেহ কিন্তু বলেন "তৎ" শব্দ বেদবক্তা ঋষির বাচক। ন্যায় দর্শনে ঈশ্বর জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকৃত হইলেও, তিনি জগতের উপাদান কারণ নহেন, উপাদান কারণ পরমাণু, এবং পরমাণু নিত্য। পূর্ব্ব মীমাংসায় ঈশ্বর স্বীকৃত নহেন। জগৎ অনাদি, তাহার কোনও স্রষ্টার অপেক্ষা নাই। কর্ম্ম হইতে অপূর্ব্ব-নামক এক শক্তির উদ্ভব হয়, তাহাই কর্ম্মের ফল প্রদান করে; কর্ম্মফলদাতারূপে কোনও ঈশ্বর কল্পনা করিবার প্রয়োজন নাই। এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, যে বেদের প্রামাণ্য ষড়দর্শনে স্বীকৃত হইলেও তাহা দ্বারা দার্শনিক চিন্তা অবরুদ্ধ হয় নাই।

ভারতীয় দর্শন-সম্বন্ধে মাক্সমূলার লিখিয়াছেন "ইয়োরোপে আমরা প্রায় সম্পূর্ণ ভাবে গ্রীক ও রোমক চিন্তা এবং সেমেটিক জাতীয় ইহুদীদিগের চিন্তার মধ্যে বর্দ্ধিত হইয়াছি। কিন্তু আমাদের আভ্যন্তরীণ জীবনকে পূর্ণতর, বৃহত্তর এবং সাবিকতর করিবার জন্য, বস্তুতঃ তাহাকে অধিকতর মানবীয় করিবার জন্য, তাহাকে পরিবর্ত্তিত করিয়া শাশ্বত জীবনে পরিণত করিবার জন্য, আমাদের জীবনে যে সংশুদ্ধির প্রয়োজন, তাহা কোন্ সাহিত্য হইতে আমরা পাইতে পারি, ইহা যদি আমি নিজেকে জিজ্ঞাসা করি, তাহা হইলে ভারতবর্ষের দিকেই অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে হইবে।" "যে সকল জাতির স্বকীয় দর্শন আছে এবং দার্শনিক আলোচনায় স্বাভাবিক রুচি আছে, যাহা বর্ত্তমানকালে জার্মানিতে এবং অতীতে গ্রীসে ছিল, তাহাদের মধ্যে কালের দিক হইতে হিন্দুস্থানের স্থান সকলের উচ্চে।" ফরাসী দার্শনিক ভিক্টর্ কুজ্যাঁ লিখিয়াছেন, "প্রাচ্যের বিশেষতঃ ভারতের

কাব্য-দর্শনাদি যখন আমরা মনোযোগের সহিত পাঠ করি, তখন তাহার মধ্যে আমরা এত গভীর তত্ত্বের আবিষ্কার করি এবং ইয়োরোপীয় প্রতিভা যেখানে আসিয়া সময় সময় স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই সব সিদ্ধান্তের ক্ষুদ্রতার সহিত তাহাদের তুলনা করি, তখন প্রাচ্য প্রতিভার সম্মুখে নতজানু হইতে আমরা বাধ্য হই, এবং মানবজাতির শৈশবের এই লীলাভূমিই যে উচ্চতম দর্শনের জন্মভূমি ইহা দেখিতে পাই।"

ভারতীয় দর্শনের অগ্রগতি বহুদিন রুদ্ধ হইয়াছিল, বহুদিন যাবৎ ভারতীয় দার্শনিকগণ কেবল ষড়দর্শনের উপরই টীকা ও বৃত্তি রচনা করিয়া আসিতেছিলেন ; স্বাধীন চিন্তা কোনও নূতন খাতে আত্মপ্রকাশ করে নাই। শ্রীঅরবিন্দের আবির্ভাব ভারতীয় দর্শনে নূতন যুগের সূচনা করিয়াছে। সমগ্র পাশ্চাত্ত্য ও প্রাচ্য দর্শন আয়ত্ত করিয়া তিনি ভারতীয় দর্শনে নবজীবন সঞ্চার করিয়াছেন। প্রাচীন মুনিদিগের দর্শনের মতোই তাঁহার দর্শন যুক্তিসমর্থিত স্বীয় অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত। স্বাধীন ভারতে আবার বড় বড় দার্শনিকের আবির্ভাব হইবে, এবং তাঁহাদের মৌলিক চিন্তাধারা দার্শনিক সাহিত্য সমৃদ্ধ হইবে, ইহা দুরাশা নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

বৈদিক দর্শন

১

বেদ

ভারতীয় আর্য্যদিগের প্রধান এবং প্রাচীনতম ধর্ম্মগ্রন্থ বেদ। বেদ আর্য্য-জাতির যাবতীয় শাখার মধ্যে প্রাচীনতম সাহিত্য। এই বেদ আর্য্যজাতির ভারতে আগমনের পরে রচিত, অথবা তাহার কোনও অংশ তাহার পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল, এবং আর্য্যগণ তাহা লইয়া ভারতে আসিয়াছিলেন, তাহা বলা যায় না। তখন আর্য্যদিগের মধ্যে যে লিপিবিদ্যা ছিল না, তাহা নিশ্চিত। যদি বেদের কোনও অংশ ভারতের বাহিরে রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা আর্য্যদিগের মধ্যে অনেকেরও কণ্ঠস্থ ছিল। "বেদ" লিখিত হয় তাহার বহু পরে। "বেদ" শব্দ "বিদ্" ধাতু হইতে নিষ্পন্ন। ইহার অর্থ জ্ঞান। অতি প্রাচীন কাল হইতে সঞ্চিত ভারতীয় আর্য্যদিগের জ্ঞান বেদে নিবদ্ধ আছে। বেদকে অপৌরুষেয় বলা হয়। "অপৌরুষেয়" শব্দের অর্থ যাহা কোনও পুরুষকর্ত্তৃক রচিত নহে। পুরুষ অর্থে কেবল মানুষ নহে, ঈশ্বরও পুরুষ। বেদ ঈশ্বর-রচিতও নহে, মানুষের রচিতও নহে। তাহা নিত্য। বেদের মন্ত্র সকল বৈদিক ঋষিদিগের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল। ঋষিগণ তাহাদিগকে মানস চক্ষুতে দর্শন করিয়াছিলেন। ইহা এক মত। আবার কাহারও-কাহারও মতে বেদ ঈশ্বর-প্রণীত। কিন্তু বেদে নানা দেবতার স্তুতি আছে। ঈশ্বর দেবতাদিগের স্তব রচনা করিয়াছিলেন, একথা অশ্রদ্ধেয়। তাই কেহ কেহ বেদকে নিত্য বলিয়াছেন। তাহা ঈশ্বর-রচিত নহে, মানুষের রচিতও নহে, চির বর্ত্তমান।*

---

* সাংখ্য মতে বেদ নিত্য নহে, কেননা বেদের মধ্যেই বেদের উৎপত্তির কথা আছে। বেদ কাহার রচিত, তাহা কেহই বলিতে পারে না, এইজন্যই বেদ অপৌরুষেয়। মুক্তপুরুষ বীতস্পৃহ বলিয়া, এবং অমুক্ত পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ নহেন বলিয়া উভয়েই বেদ রচনায় অসমর্থ। অঙ্কুরাদি অনিত্য হইলেও যেমন পুরুষ-কৃত নহে, সেইরূপ বেদ অনিত্য হইলেও অপৌরুষেয়। বেদের স্বাভাবিক জ্ঞানোৎপাদিকা শক্তিবশতঃ স্বতঃপ্রমাণ। হিরণ্যগর্ভ বেদের প্রকাশক। বৈশেষিক-ও-ন্যায়দর্শন-মতে বেদ অপৌরুষেয় নহে। তাহাদের মতে বেদবাণী বাক্য, এবং বাক্যমাত্রই পুরুষোচ্চারিত; সুতরাং বেদ পুরুষ-রচিত। বেদ আপ্তবাক্য, ভ্রম-প্রমাদ-বিপ্রলিপ্সাহীন পুরুষের বাক্য বলিয়াই

বেদ একদিনে রচিত বা প্রকাশিত হয় নাই। বেদ যখন রচিত হয়, তখন লিপির আবিষ্কার হয় নাই। বেদের মন্ত্রগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা হইত। বেদের এক নাম শ্রুতি। যাহা গুরুর নিকট শ্রুত হয়, তাহাই শ্রুতি। যত মন্ত্র, যত স্তব রচিত হইয়াছিল, তাহাদের সকলগুলিই যে স্মৃতিতে রক্ষিত হইয়াছিল, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। অনেকগুলি যে বিস্মৃতির অতল জলে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে সময়ে বেদ লিপিবদ্ধ হয়, তখন যে ঋক্ বা মন্ত্রগুলি স্মরণে ছিল, তাহারাই রক্ষিত হইয়াছে।

বেদ বিভাগ

বেদ-মন্ত্রগুলি আদিতে সংহত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ ছিল না। কালক্রমে তাহারা তিন ভাগে বিভক্ত হয়। এই জন্য বেদকে ত্রয়ী বলিত। পদ্য রচনাগুলি একত্র সংগৃহীত হইয়া ঋগ্বেদ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। গানের উপযুক্ত রচনাগুলি একত্রিত হইয়া সামবেদ নামে প্রচারিত হয়। যজুর্ব্বেদে পদ্য ও গদ্য উভয়ই আছে। বৈদিক যাগযজ্ঞের পদ্ধতি এই ভাগে বর্ণিত আছে। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন, এবং বেদের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া তিনি বেদব্যাস আখ্যা-প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা কথিত আছে। বেদের আর একটি ভাগ পরবর্ত্তী-কালে সংকলিত হয়। এই ভাগের নাম অথর্ব্ববেদ। অঙ্গিরাবংশীয় অথর্ব্বণ-নামক ঋষি এই বেদের সংকলন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। মোহন, উচাটন প্রভৃতির উপযোগী মন্ত্রগুলি অথর্ব্ববেদে অন্যান্য মন্ত্রের সঙ্গে সংকলিত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। সাম-বেদের প্রায় সমস্ত মন্ত্রই (৭৫টি ব্যতীত) ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। যজুর্ব্বেদেও ঋগ্বেদের সকল ঋক্ সংগৃহীত হইয়াছে। তদতিরিক্ত অনেক গদ্য রচনাও তাহাতে আছে। যজ্ঞে মন্ত্রগুলি যে ক্রমে ব্যবহৃত হইত, ক্রমানুসারেই তাহারা যজুর্ব্বেদে সজ্জিত হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ নামও এই অর্থবোধক। (যজুঃ = যজ্ঞ)। ঋগ্বেদে এক এক ঋষিরচিত এক এক দেবতা-সম্বন্ধীয় ঋক্‌মন্ত্রগুলি একত্র সজ্জিত আছে। অথর্ব্ববেদের স্থান অন্যান্য বেদের নিম্নে।

তাহার প্রামাণ্য। পূর্ব্বমীমাংসামতে বেদ নিত্য, কেননা বেদ অক্ষরময়, এবং অক্ষর নিত্য। ঋষিগণ বেদের দ্রষ্টা মাত্র। সুতরাং বেদ অপৌরুষেয়। শঙ্করের মতে পরমেশ্বরই বেদের রচয়িতা, কেননা শ্রুতি বলিয়াছেন, চতুর্বেদ মহাপুরুষের নিঃশ্বাস। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ" এই সূত্রে ব্যাসদেব ব্রহ্মকেই বেদের কারণ বলিয়াছেন। পুরুষোত্তম স্বেচ্ছায় বেদ-বাক্যের কোনও পরিবর্ত্তন করিতে পারেন না। এইজন্যই বেদ অপৌরুষেয়।

প্রত্যেক বেদের চারিভাগ—সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ্। প্রত্যেক বেদের সংহিতায় সেই বেদের মন্ত্রগুলি সংগৃহীত আছে। ব্রাহ্মণ ভাগে বিবিধ যজ্ঞের পদ্ধতির বর্ণনা আছে। আরণ্যক বানপ্রস্থাবলম্বী বৃদ্ধদিগের জন্য উদ্দিষ্ট। বেদের যে অংশ বানপ্রস্থাশ্রমে পঠিত হইত, তাহাই আরণ্যক। তাহাতে যাগযজ্ঞের রূপক ব্যাখ্যা ও ধ্যানের ব্যবস্থা আছে। উপনিষদ্ বেদের শেষ ভাগ। তাহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচিত হইয়াছে।

ঋষি ও দেবতা

যাস্ক বলিয়াছেন "যস্য বাক্যং স ঋষিঃ।" আর "যা তেন উচ্যতে, সা দেবতা।" অর্থাৎ এক একটি বৈদিক মন্ত্র যাঁহার বাক্য, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি, এবং সেই বাক্যে যাহার কথা বলা হইয়াছে, তিনি বা তাহা সেই মন্ত্রের দেবতা। প্রচলিত অর্থে যাহাকে দেবতা বলা হয়, অনেক সূক্ত এমন আছে, যাহাতে সেরূপ কোনও পুরুষের কথা নাই। যাস্ক আরও বলিয়াছেন "যো দেবঃ স দেবতা"—অর্থাৎ যাহা দীপ্তিমান্ (দিব্ ধাতু দীপনে বা দ্যোতনে) তাহাই দেবতা। আকাশ, সূর্য্য, অগ্নি প্রভৃতি দ্যুতিমান, তাই তাহারা দেব এবং দেবতা। পরে যাহারা দ্যুতিমান নহে, তাহাদের সম্বন্ধেও সূক্ত রচিত হওয়ায়, তাহারাও দেবতা পদ-বাচ্য হইয়াছিলেন।

সংহিতা

ঋগ্বেদ সংহিতায় ১০১৭ কবিতা আছে। এই কবিতাগুলিকে সূক্ত বলে। এক এক সূক্তে নানা ঋক্ আছে। সকল সূক্তে ঋক্-সংখ্যা ১০৬০০। এক ঋষিকর্ত্তৃক এক এক দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত ঋক্গুলি একত্রিত হইয়া সূক্ত-আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের মতে এই সকল ঋকে প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তিতে দেবত্ব আরোপ করিয়া তাহাদের স্তব করা হইয়াছে। কিন্তু নিরুক্তকার যাস্কের মতে "পরমাত্মার মহত্ত্ব-বশতঃ একই আত্মাকে বহুরূপে স্তব করা হইয়াছে। বিভিন্ন দেবতা একই আত্মার বিভিন্ন নাম।" ঋগ্বেদের অনেক সূক্তে যে বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদ ঘোষিত হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করেন না। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের মতে এই সকল সূক্ত অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তীকালে রচিত। প্রথমে আর্য্যগণ বহু দেবতার উপাসনা করিতেন। বেদের সূক্তগুলি যে বিভিন্ন সময়ে রচিত, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৈদিক ঋষিদিগের অনেকের মধ্যে শত শত বৎসরের

ব্যবধান ছিল। যাস্কের সময় বৈদিক দেবতাগণ পরমাত্মার বিভিন্ন নাম বলিয়া গৃহীত হইলেও, অনেক সূক্ত যে ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, তাহা অস্বীকার করা যায় না। অনেক সূক্ত আছে, যাহাদিগকে স্তব বলা যায় না। তাহারা গীতিকবিতা মাত্র। অনেকগুলি স্তুতি বলিয়া গণ্য হইলেও তাহারা প্রকৃতির শক্তির সম্মুখে কবির ভাবোচ্ছ্বাস ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। ১০ম মণ্ডলের ৯৫ সূক্ত পুরূরবা ও উর্ব্বশীর মধ্যে কথোপকথন। ইহা রূপক বর্ণনা, কিন্তু স্তব নহে। উক্ত মণ্ডলের ৩৪ সূক্তকে যদি স্তব বলিতে হয়, তাহা হইলে উহা দ্যূতক্রীড়ার পাশার স্তব। উক্ত মণ্ডলের ১০৭ ও ১১৭ সূক্তে স্বাধীনতা ও দানের গৌরব খ্যাপিত হইয়াছে। সপ্তম মণ্ডলের ১০৩ সূক্তে যাজকদিগের প্রতি শ্লেষবাণ বর্ষিত হইয়াছে এবং তাহাদিগকে ভেক বলা হইয়াছে। দশম মণ্ডলের ১৩ সূক্ত দুইখানি গোরুর গাড়ীর প্রতি উক্তি। অনেকগুলি সূক্তে দার্শনিক গবেষণা আছে। দেবতার স্তুতি নহে, এরূপ বহু সূক্ত আছে।* অনেক সূক্তে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ আছে। অনেক-গুলিতে কে জগৎ সৃষ্টি করিল, সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল, প্রভৃতির অনুসন্ধান আছে। বৈদিক সূক্তগুলিকে মোটামুটি ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: (১) দেবস্তুতিমূলক, (২) সত্যানুসন্ধানী, (৩) দার্শনিক গবেষণামূলক, (৪) ঐতিহাসিক ঘটনামূলক, (৫) একেশ্বরবাদমূলক, ও (৬) বিবিধ সাংসারিক বিষয়ক।

দেবতাদিগের শ্রেণী বিভাগ

বৈদিক দেবতাদিগকে মুখ্যতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়: (১) আকাশের দেবতা, (২) অন্তরীক্ষের দেবতা, (৩) পৃথিবীর দেবতা। আকাশের দেবতা—দ্যৌঃ, মিত্র (আলোকিত আকাশ ও দিনের দেবতা), বরুণ (আলোকবিহীন আকাশ ও সন্ধ্যাকালের দেবতা), সূর্য্য, সবিতা (জীবনশক্তিবর্দ্ধক প্রাতঃ সূর্য্যের দেবতা), অশ্বিনীদ্বয় (প্রাতঃ ও সন্ধ্যার দেবতা), এবং উষা (প্রত্যূষকালের দেবতা)। অন্তরীক্ষের দেবতা—ইন্দ্র (বায়ুমণ্ডল ও মেঘ-বৃষ্টির দেবতা), মরুৎগণ (ঝটিকার দেবতা), বায়ু ও বাত (বাতাসের দেবতা), পর্জ্জন্য (বৃষ্টির ও মেঘের দেবতা), রুদ্র (ঝটিকা ও বজ্রের দেবতা) প্রভৃতি। পৃথিবীর দেবতা—অগ্নি, পৃথিবী, সরস্বতী প্রভৃতি নদী।

---

* Vedic Literature by Bankim Chandra Chatterji Centenary Edition of his works. P. 141. দ্রষ্টব্য।

বৈদিক দেবতার সংখ্যা কোথাও তিন এগারো তেত্রিশ, কোথাও তিনসাত একুশ, * বলিয়া বেদে উক্ত হইয়াছে। শতপথ ব্রাহ্মণে দেবতাদিগকে দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র ও আট বসুতে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহাদের অতিরিক্ত দ্যাবা ও পৃথিবী এবং প্রজাপতিকে লইয়া দেবতা-সংখ্যা শতপথ ব্রাহ্মণের মতে হয় ৩৪টি। এই শ্রেণী-বিভাগ ঋগ্বেদের বিভাগের সঙ্গে মিলে না। দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, সবিতা ও অগ্নির প্রাধান্য খুব বেশী। দেবতাদিগের এই বিভাগ-সম্বন্ধে যাস্ক বলেন "তিস্র এব দেবতা ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো, বায়ুর্বা ইন্দ্রোবা অন্তরিক্ষস্থানঃ, সূর্য্যো দ্যুঃস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাদ্ একৈকস্যাপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপি বা কর্ম্মপৃথকত্বাৎ, যথা হোতা অধ্বর্য্যু ব্রহ্ম উদ্‌গাতা ইত্যপ্যেকস্যসতঃ।" অর্থাৎ নৈরুক্তদিগের মতে বেদের দেবতা তিনজন। পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু বা ইন্দ্র, এবং আকাশে সূর্য্য। তাহাদের মহাভাগত্বের জন্য এক এক জনের অনেকগুলি নাম। অথবা তাহাদের কর্ম্মের পার্থক্য জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম, যথা হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্‌গাতা, একজনেরই নাম। অন্যত্র যাস্ক যাবতীয় দেবতাই এক পরমাত্মার নাম বলিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিতে পাইব। †

ঋগ্বেদ ও তাহার দেবতাগণ

ঋগ্বেদ সংহিতা আট অষ্টকে বিভক্ত। প্রত্যেক অষ্টকে আট অধ্যায় আছে। প্রত্যেক অধ্যায় আবার কয়েক বর্গে বিভক্ত। কখনও কখনও সমগ্র সংহিতাকে দশ মণ্ডলেও বিভক্ত দেখা যায়। প্রথম মণ্ডলে ১৯১ সূক্ত, পনের জন ঋষি-রচিত। অগ্নির স্তোত্র মণ্ডলের প্রথমে স্থাপিত। অগ্নিস্তোত্রের পরে ইন্দ্রস্তোত্র, তাহার পরে অন্যান্য দেবতার স্তোত্র। পরবর্ত্তী ছয়টি মণ্ডলের প্রত্যেকটি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঋষি কর্ত্তৃক রচিত এবং একই ভাবে সজ্জিত। অষ্টম মণ্ডল কয়েকজন বিভিন্ন ঋষিকর্ত্তৃক রচিত। নবম মণ্ডলে কেবল সোম দেবতার স্তোত্র আছে। অষ্টম ও নবম মণ্ডলের অনেক সূক্ত সামবেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। দশম মণ্ডলে বৈদিক যুগের শেষ ভাগে প্রচলিত অনেক বিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায়; দার্শনিক চিন্তাও স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়। জগতের সৃষ্টিসম্বন্ধে কল্পনার বিকাশও এই মণ্ডলের সূক্তদিগের মধ্যে পাওয়া যায়।

---

* যে ত্রিষপ্তা পরিয়ন্তি বিশ্বা রূপাণি বিভ্রতঃ
বাচস্পতির্বলা তেষাং তন্বো অদ্য দধাতুমে।

† বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম শত বার্ষিকী সংস্করণ ২৫৫ পৃষ্ঠা।

এতদ্ব্যতীত অথর্ব্ব বেদের যুগের অনেক যাদুমন্ত্রও এই মণ্ডলে আছে। ইহা হইতে মনে হয় এই মণ্ডলরচনার সময় ভারতের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে প্রচলিত মত ও বিশ্বাসের সহিত আর্য্যদিগের পরিচয় সংঘটিত হইয়াছিল।*

মিত্র ও বরুণ

বেদে মিত্র কোথায়ও সূর্য্যের সহিত অভিন্ন, কোথায়ও আলোকের দেবতা-রূপে কল্পিত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্বদর্শী, সত্য তাঁহার অতি প্রিয়। বহু স্থলে মিত্র ও বরুণের নাম এক সঙ্গে যুগল দেবতারূপে দেখিতে পাওয়া যায়। মিত্র ও বরুণ এক সঙ্গে ঋতের রক্ষক এবং পাপের মার্জ্জনাদাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পরে মিত্র উষার আলোকের এবং বরুণ নৈশ আকাশের দেবতারূপে বর্ণিত হইয়াছেন। উভয়কেই অদিতির পুত্র বলা হইয়াছে।

"বৃ" ধাতু (আবরণ করা) হইতে "বরুণ" শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। যিনি সমগ্র আকাশ আবৃত করিয়া আছেন, তিনিই বরুণ—আকাশের দেবতা। গ্রীক দেবতা ঔরেনস্ এবং আবেস্তার অহুরমজ্দা ও বরুণ অভিন্ন। মিত্র বরুণের নিত্য সঙ্গী। মিত্র ও বরুণ রাত্রি ও দিনের, অন্ধকারও আলোকের দেবতা। বরুণের আদেশে নদীসকল প্রবাহিত হয়, তাঁহার ভয়ে চন্দ্র ও নক্ষত্রগণ স্ব স্ব পথে ধাবিত হয়। তাঁহারই নিদেশে পৃথিবী ও আকাশ (দ্যাবা-পৃথিবী) পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বর্ত্তমান। সমগ্র জড়জগৎ ও বিশ্বের নৈতিক ব্যবস্থা (moral order) তিনিই ধারণ করিয়া আছেন। অন্যান্য দেবতাগণ তাঁহার অধীন। তিনি সর্ব্বজ্ঞ। একটি চড়ুই পাখীর মৃত্যুও তাঁহার অজ্ঞাতসারে হয় না। তিনি দেবতাদিগের মধ্যে পরমদেবতা—মহেশ্বর, পাপীর শাস্তা, অনুতপ্তের প্রতি প্রসন্ন, নৈতিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও ধারক হইলেও পাপীর প্রতি অনুকম্পাশীল। পাপী যদি তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তিনি তাহাকে ক্ষমা করেন। অধিকাংশ বরুণ-স্তোত্রে পাপস্বীকৃতি, অনুতাপ ও ক্ষমাভিক্ষা দৃষ্ট হয়। ম্যাকডোনাল্ড বলেন, উন্নত ঈশ্বরবাদের ঈশ্বর ও বরুণের চরিত্র একরূপ।† অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণনের মতে ভাগবতধর্ম্মের ঈশ্বরবাদের মূল বরুণ-চরিত্র। বরুণ স্থানে স্থানে জলের দেবতা ও জলেশ্বর বলিয়াও অভিহিত হইয়াছেন।

---

* Dr. Radha Krishnan, Indian Philosophy. vol. I. p. 68.

† Vedic Mythology. p. 3.

সূর্য্য ও সবিতা

কোনও কোনও সূক্তে সূর্য্য ও সবিতা অভিন্ন বলিয়া স্তুত হইয়াছেন। কোনও কোনও সূক্তে তাহাদের মধ্যে পার্থক্যও সূচিত হইয়াছে। সূর্য্য মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষু, তিনি দ্যাবা-পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পূর্ণ করিয়া আছেন। তিনি স্থাবর-জঙ্গম জগতের (জগতঃ তস্থুষশ্চ) আত্মা। তিনি দেবতাদিগের অনীক (তেজ)। তাঁহার এক নাম জাতবেদ (সর্ব্বজ্ঞ—সকল জাতবস্তু যিনি জানেন। এই নাম অগ্নিকেও প্রদত্ত হইয়াছে)। তিনি বিশ্বচক্ষু (বিশ্বদ্রষ্টা), তিনি তরণি, তিনি জ্যোতিষ্কৃৎ (জ্যোতিষ্কদিগের স্রষ্টা)।

দিবাভাগের জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য ও রাত্রির অদৃশ্য সূর্য্য উভয়েরই বাচক "সবিতা"। অনুতপ্ত পাপী তাঁহার নিকট পাপের মার্জ্জনা ভিক্ষা করে।

সূর্য্যের উপাসনা প্রাচীন গ্রীসে ও পারস্য দেশেও প্রচলিত ছিল। প্লেটো তাঁহার Republic গ্রন্থে সূর্য্যকে পরম শ্রেয়ের সন্তান (offspring of the Chief Good)* এবং তৎকর্ত্তৃক আপনার সাদৃশ্যে উৎপন্ন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং পরম শ্রেয়ের সহিত বুদ্ধিজগতে বিশুদ্ধপ্রজ্ঞা এবং তাহার বিষয়দিগের যে সম্বন্ধ সূর্য্যের সহিত দৃষ্টিশক্তিও দৃশ্য বিষয়ের সেই সেই সম্বন্ধ, বলিয়াছেন। সূর্য্যকে তিনি এই প্রসঙ্গে দেবতা বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। বেদে সূর্য্যকে আলোকের এবং প্রাণের স্রষ্টা ও সর্বদ্রষ্টা বলা হইয়াছে। তিনি সকল জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করেন (কর্ম্মদায়ী), তিনি মানবের কৃত পাপ ও পুণ্য দর্শন করেন, তিনি "সবিতা" (জগৎ স্রষ্টা) এবং জগতের শাসনকর্ত্তা।

প্রাচীন মিশরবাসীরা অসাইরিস্, হার্পোক্রাটিস্ প্রভৃতি নানা নামে সূর্য্যের উপাসনা করিতেন। প্রাচীন সিরীয় ও আসিরীয়গণও সূর্য্যের উপাসনা করিতেন।

সূর্য্যের উপাসনা রোমেও প্রসারিত হইয়াছিল। সেখানে সূর্য্যের নাম হইয়াছিল এলোগবল্। এলোগবলের হেলিওগবল্স নামক এক পুরোহিত রোমের সম্রাট হইয়াছিলেন। রোম খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পরেও খৃষ্টের উপাসনার সঙ্গে কিছুকাল সূর্য্যের উপাসনাও চলিয়াছিল। খৃষ্টমাস উৎসবে সূর্য্যোপাসনার চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান। বেদুইন আরবেরা মুসলমান হইলেও এখনও সূর্য্যের উপাসনা করে।

---

* Plato' Republic, Book VI.

সূর্য্যের আর এক নাম পুষণ। তিনি মানুষের বন্ধু, পশুদিগের রক্ষক, পথিক ও কৃষকদিগের দেবতা। ঈশোপনিষদে সূর্য্যকে পুষণ, একর্ষি (একাকী গমনশীল) যম (সংযমনকর্ত্তা) ও প্রাজাপত্য নামে সম্বোধন করা হইয়াছে।

দ্যাবা-পৃথিবী

বেদের দ্যৌঃ আকাশ দেবতা। বরুণ, অদিতি, এবং ইন্দ্রও আকাশ দেবতা। বৃষ্টিবর্ষী আকাশ ইন্দ্র, অনন্ত আকাশ অদিতি এবং আবরণরূপী আকাশ বরুণ। দ্যৌঃ জনক মূর্ত্তি। বেদে আকাশ ও পৃথিবী উভয়ে দ্যাবা-পৃথিবী এই যুক্ত নামে স্তত হইয়াছেন। ইহারা দম্পতী এবং সমস্ত জীবের পিতা ও মাতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। পিতা দ্যৌঃ গ্রীকদিগের Zeus Pater এবং রোমকদিগের Jupiter। আকাশ বা দ্যৌঃপিতা হইতে যে সকল ভুতের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহা ঋগ্বেদে আছে। দ্যৌঃ স্বামী, পৃথিবী স্ত্রী। গ্রীক পুরাণে পৃথিবী (Gaia – গো = পৃথিবী) Ouranos এর পত্নী। Ouranos বরুণ (আবরক আকাশ) *

চীন দেশেও আকাশকে পিতা এবং পৃথিবীকে মাতা বলা হইয়াছে। চৈনিক দার্শনিকদিগের মতে সৃষ্টিতে দুই তত্ব, একটি পুরুষ (স্বর্গীয়,) দ্বিতীয়টি স্ত্রী (পার্থিব)—(আমাদের প্রকৃতি ও পুরুষের মতো) একটির নাম ইন্, অন্যটীর নাম ইয়ং।

ইন্দ্র

বেদে ইন্দ্র আদিত্য বা অদিতির পুত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। অদিতি শব্দের অর্থ মাক্সমূলারের মতে অসীম। পুরাণে ইন্দ্র অদিতি ও কশ্যপের পুত্র। বেদে কচ্ছপ অর্থে কশ্যপ শব্দের প্রয়োগ আছে। কচ্ছপ = কূর্ম্ম। কূর্ম্ম শব্দের অর্থ কর্ত্তা। সুতরাং কচ্ছপ অর্থ কর্ত্তা, সর্ব্ববস্তর স্রষ্টা, প্রজাপতি। শতপথ ব্রাহ্মণে (৭।৪।১৫) আছে "প্রজাপতি এই রূপ ধারণ করিয়া প্রজা সৃষ্টি করিলেন। যাহা তিনি সৃষ্টি করিলেন, তাহা তিনি করিলেন বলিয়া তিনি কূর্ম্ম।" কশ্যপও কূর্ম্ম। সুতরাং বলা যায় প্রজাপতিই কশ্যপ।

ইন্দ্ ধাতুর অর্থ বর্ষণ করা। সুতরাং ইন্দ্র বর্ষণকারী, বর্ষণকারী আকাশ। অনন্ত আকাশ অদিতি। বৃষ্টিকারী আকাশ ইন্দ্র, আলোকময় আকাশ দ্যৌঃ। আবরক আকাশ বরুণ।

* বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—দেবতত্ত্ব (সাহিত্য-পরিষৎ প্রকাশিত গ্রন্থাবলী)।

ঋগ্বেদে আছে ইন্দ্র বৃত্র, নমুচি, সম্বর প্রভৃতি অসুরদিগকে বধ করিয়াছিলেন। এই সকল অসুর যে বৃষ্টিরোধকারী প্রাকৃতিক শক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইন্দ্র যখন বজ্রপাত করিয়া বৃষ্টি আরম্ভ করেন, তখন অসুরদিগের মৃত্যু হয়। বৃত্রাসুর হত হইলে রুদ্ধগতি নদী সকল সবেগে সমুদ্রে প্রবাহিত হইয়াছিল।" (১৩২।২)

আর্য্য জাতির অন্য কোনও শাখায় ইন্দ্রদেবতার পূজার উল্লেখ নাই। কিন্তু পর্জন্যের নাম পাওয়া যায়। লুথিনীয়গণ আর্য্য জাতির এক শাখা। তাহারা পারকুনাস নামে এক দেবতার উপাসনা করিত। পারকুনাস বজ্রধ্বনি ও বজ্রের দেবতা। তিনি জগতের অধীশ্বর। যাবতীয় দেবতাদিগের উপরে তাঁহার স্থান। তিনি বায়ু, মেঘ, বজ্র, বজ্রধ্বনির প্রভু। নয় জন পারকুনাসের অস্তিত্বে লিথুনিয়ানগণ বিশ্বাস করিত। এই পারকুনাস যে ভারতবর্ষে পর্জন্য এবং পরে ইন্দ্র হইয়াছিলেন ইহা অনুমিত হয়। বেদে পর্জন্য আকাশের নাম। অথর্ব্ববেদে পৃথিবীকে পর্জন্যের স্ত্রী বলা হইয়াছে। তিনি স্থাবর জঙ্গম সকলের প্রভু। পর্জন্য শব্দ মেঘ এবং বৃষ্টি অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে। বেদে ইন্দ্রের বহু স্তোত্র আছে। ভারতবর্ষে বৃষ্টির উপরই কৃষি নির্ভর করিত। এইজন্য বৃষ্টির দেবতার স্থান অতি উচ্চে।* গ্রীসে জিউসের যে স্থান ভারতবর্ষে ইন্দ্রের স্থান সেইরূপ ছিল। দেবতাদিগের মধ্যে তিনিই এক সময় শ্রেষ্ঠ ছিলেন। পরে বৃষ্টি ও মেঘের সহিত ইন্দ্রের সম্বন্ধ চাপা পড়ে এবং ইন্দ্র আত্মারূপে এবং বিশ্বের প্রভুরূপে উপাসিত হন। তখন আর্য্যগণ অনার্য্যদিগের সহিত যুদ্ধে তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করিতেন এবং তিনি আর্য্য জাতির রক্ষাকর্ত্তা ও জয়দাতা বলিয়া পূজিত হইতে থাকেন। তিনি পৃথিবী ও পর্ব্বতসমূহ স্ব স্ব স্থানে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন ও আকাশকে ধারণ করিয়া আছেন। যিনি সর্পকে (বৃত্রকে) বধ করিয়াছিলেন, সপ্ত নদীকে বন্ধনমুক্ত করিয়া গাভীদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যুদ্ধে (শত্রুদিগকে) বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন, তিনিই ইন্দ্র। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত জয়লাভ করা যায় না। তাঁহার সঙ্গে যুদ্ধে দুর্ব্বৃত্তগণ নিহত হয়। ইন্দ্র ক্রমে ক্রমে বরুণকে স্থানচ্যুত করিয়া শ্রেষ্ঠ দেবতারূপে পরিগণিত হন।

যে সকল অসুরের সহিত ইন্দ্র যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহাদের অনেকে অন্যান্য জাতির দেবতা। বৃত্রাসুর (অহি) সম্ভবতঃ অনার্য্যদিগের দেবতা।

* হিন্দুধর্ম্মের অভিব্যক্তি—সুরেশচন্দ্র সিংহরায় রচিত শৈবধর্ম্ম—পৃষ্ঠা ৫।

পুরাণে শ্রীকৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের বিরোধের এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ইন্দ্র-যজ্ঞের নিষেধের কথা আছে। ঋগ্বেদে কৃষ্ণনামা এক জাতির দেবতা কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের শত্রুতার কথা বর্ণিত আছে। অংশুমতী (যমুনা) নদীর তীরে ছিল কৃষ্ণের নিবাস। তাহার দশ সহস্র সৈন্য ছিল। ইন্দ্র সেই সৈন্যদিগকে বিনষ্ট করেন। পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ইন্দ্রযজ্ঞের নিষেধ সংক্রান্ত-উপাখ্যানের মূল হয়তো এইখানে।

সোম

আবেস্তার "হওমা" এবং গ্রীসের ডায়োনিসাস্ ও বেদের সোম একই দেবতা। বেদে সোমরসের কথা বহুস্থানে আছে। সোমরস পানে মন উৎফুল্ল হয় ও দুঃখ-শোক দূরে যায়। সোমপান হইতে উদ্‌ভূত নেশাকে মনের একটা উন্নততর অবস্থা মনে করা অস্বাভাবিক নহে। যাহাকে দিব্যদৃষ্টি বলে, যে অবস্থায় অপার্থিব অলৌকিক বস্তু ও ব্যাপারের দর্শন হয় এবং অন্তর্দৃষ্টিলাভ হয়, বুদ্ধির প্রসার বর্দ্ধিত হয়, তাহা চিত্তের আবিষ্ট অবস্থা। সোমপানে যে অবস্থা উদ্‌ভূত হইত, তাহাকে একটি পবিত্র ও উন্নত অবস্থা গণ্য করিয়া 'সোম'কে দেবত্বে উন্নীত করা হইয়াছিল। হুইট্‌নি লিখিয়াছেন, "যাহাদিগের ধর্ম্ম ছিল প্রকৃতির আশ্চর্য্যজনক শক্তি এবং ব্যাপারের উপাসনা, সেই সরলমতি আর্য্যগণ যখনই দেখিতে পাইলেন যে এই তরল পদার্থের (সোমরসের) মনকে উল্লসিত এবং প্রবলভাবে উত্তেজিত করিবার শক্তি আছে, এবং সেই শক্তিবলে সাধারণ মানুষের পক্ষে অসাধ্য কর্ম্ম করিবার প্রবৃত্তি এবং সামর্থ্য উৎপন্ন হয়, তখন তাহারা তাহার মধ্যে ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ বর্ত্তমান বলিয়া মনে করিলেন। তাহাদের বুদ্ধিতে সোমলতা দেবতারূপে প্রতিভাত হইল এবং ইহা হইতে দৈবশক্তি লাভ হয় বলিয়া তাঁহারা ধারণা করিলেন। সোমলতা উদ্ভিদদিগের রাজা এবং তাহা হইতে রসনিষ্কাশন প্রণালী যজ্ঞ বলিয়া পরিগণিত হইল। সোমরস প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যবহার্য্য দ্রব্যসকলও পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হইল। সোমলতা হইতে রস-নিষ্কর্ষণের সময় সোমের স্তোত্রপাঠ করা হইত। একমন্ত্রে আছে "সোমং অপাম, অমৃতা অভূম" আমরা সোমপান করিয়া অমর হইয়াছি। কালক্রমে সোমরসের পীড়াশান্তি করিবার শক্তি আছে, এবং সোমপানে অন্ধ দৃষ্টিশক্তি লাভ করে, খঞ্জ চলিতে পারে, এই বিশ্বাসও উৎপন্ন হয়।

আধ্যাত্মিক-অনুভূতিলাভের জন্য শারীরিক মত্ততাজনক পদার্থের ব্যবহার

কেবল বৈদিকযুগেরই বিশেষত্ব নহে। উইলিয়াম জেম্‌স্‌ বলেন, মনের যে অবস্থায় অতীন্দ্রিয় পদার্থের জ্ঞান হয় (Mystic Consciousness) মদ্য কর্তৃক উৎপন্ন উন্মত্ত মানসিক অবস্থা তাহারই একটা ক্ষুদ্র অংশ।*

অগ্নি ও রুদ্র

ঋগ্বেদে অগ্নির স্থান কেবল ইন্দ্রের নিম্নে। অন্ততঃ দুইশত সূক্তে অগ্নির স্তোত্র আছে। অগ্নির উৎপত্তির নানা স্থান—সূর্য্যতাপ, মেঘ (বিদ্যুৎ-অগ্নির স্থান), অরণি কাষ্ঠ, প্রস্তর (চকমকি পাথর)। মাতরিশ্বন্‌ অগ্নিকে আকাশ হইতে আনিয়া ভৃগুদিগের নিকট রাখিয়াছিলেন। স্বর্ণবর্ণ শ্মশ্রুধারী অগ্নির দন্ত তীক্ষ্ণ। কাষ্ঠ এবং ঘৃত তাহার খাদ্য। সূর্য্যের মত তিনি দীপ্তিমান, বজ্রধ্বনির ন্যায় তাহার কণ্ঠস্বর। ধূম তাহার পতাকা, তাই তিনি ধূমকেতু। আকাশ হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত তিনি বিস্তৃত। তিনিই যজ্ঞে প্রদত্ত উপহার দেবতাদিগের নিকট বহন করেন। তিনি দেবতাদিগের মুখ (অগ্নিঃ মুখং দেবতানাম্‌) তিনি দেবতাদিগের মধ্যে মুখ্য (অগ্নির্বৈ দেবানামবমঃ)।

এই অগ্নি পরে রুদ্র দেবতার সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। পৃথিবীর দেবতা অগ্নি, দ্যুঃলোকের দেবতা মিত্র, উভয়ে স্বরূপে এক। উভয় লোকের মধ্যবর্ত্তী অন্তরীক্ষলোকে অগ্নি বিদ্যুৎরূপে বর্ত্তমান। এই বিদ্যুদগ্নিই রুদ্র। প্রকৃতির মঙ্গলময় মূর্ত্তির পশ্চাতে যে ভীষণ মূর্ত্তি বর্ত্তমান, তাহাই রুদ্র। রুদ্র অতি কোপন-স্বভাব। "ইমা রুদ্রায় তবসে কপর্দিনে ক্ষয়দ্‌বীরায় প্রভবামহে মতীঃ"। মহৎ কপর্দী (জটাধারী) বীরনাশী রুদ্রকে আমরা স্তুতি করিতেছি। সায়নের মতে রুদ্র শব্দের অর্থ ক্রূর। যাস্ক বলেন "অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে।" রুদ্রের কোপানল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য অনেক স্তুতি বেদে আছে। সকল অমঙ্গল রুদ্রের কোপ হইতে উদ্‌ভূত হয়। "হে রুদ্র, বৃদ্ধদিগকে বধ করিও না, বালকদিগকে, সন্তান-জনয়িতাকে, গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করিও না। আমাদের পিতাকে, আমাদের মাতাকে বধ করিও না, আমাদের শরীরের অনিষ্ট করিও না।" "আমাদিগের পুত্রকে, তাহার সন্তানকে, অপরাপরকে, হে রুদ্র, তুমি হিংসা করিও না, আমাদের গো অশ্বদিগকে হিংসা করিও না, তোমার ক্রোধানল যেন আমাদের বীরদিগকে হিংসা না করে।" এমন কোনও অশুভ নাই, যাহা রুদ্রের ক্রোধ হইতে

---

* Quoted in Radhakrishnan's Indian Philosophy vol. 1 P, 83-84.

উদ্‌ভূত না হইতে পারে। রুদ্রের প্রসন্নতা লাভ করিয়া মনু রোগমুক্ত হইয়াছিলেন। তাহার ক্রোধ হইলে "বীরক্ষয়কারী" রোগের আবির্ভাব হয়। তিনি সন্তুষ্ট হইলে সে রোগ হইতে আরোগ্যলাভও হয়। ফলে রুদ্র চিকিৎসকরূপে পরিগণিত ও পরে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক হন। "ভেষজেভিঃ ভিষকতমং ত্বা ভিষজাং শৃণোমি" (২৪-৩৩ সূ) সহস্র ঔষধি তাঁহার জানা আছে।

এই রুদ্র দেবতারও একটা প্রশান্ত মূর্ত্তির কথা আছে। "তিনি স্তুতিপালক, যজ্ঞপালক, ঔষধিনাথ, দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান, হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল। তিনি মানুষ, গো, অশ্ব, মেষাদি সকলকে সুখ প্রদান করেন।"*

বৈদিক যজ্ঞ

বেদে অগ্নিহোত্র, জ্যোতিষ্টোম, অশ্বমেধ প্রভৃতি বহু যজ্ঞের বিধান আছে। যজ্ঞে দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়া হবিঃ ও অন্যান্য উপহার দ্বারা তাঁহাদিগের তুষ্টিবিধান করা হইত। একেশ্বরবাদের উদ্ভবের পরেও যজ্ঞ অবাধে চলিয়াছিল এবং যজ্ঞের জটিলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। যজ্ঞে ভক্তি অপেক্ষা অনুষ্ঠানবিধির যথাবিধি পালন অধিকতর প্রয়োজনীয় বলিয়া গণ্য হইত। প্রত্যেক যজ্ঞের নির্দিষ্ট ফলপ্রাপ্তি তাহার যথাবিধি অনুষ্ঠানের উপর নির্ভর করিত। যান্ত্রিক নিয়মেই যজ্ঞের ফল উৎপন্ন হয়। যজ্ঞ যথারীতি অনুষ্ঠিত হইলে দেবতাগণ তাহার ফল দিতে বাধ্য। নির্দিষ্ট বিধি হইতে কিছুমাত্র স্খলন হইলে, ফল উৎপন্ন হয় না। যজ্ঞের নিজের শক্তিতেই তাহার ফল উৎপন্ন হয় এক অচিন্তনীয় উপায়ে; তাহার জন্য দেবতার অনুগ্রহের প্রয়োজন হয় না। যজ্ঞ "কর্ম্ম" নামেও অভিহিত হইত। যজ্ঞের এই ফলোৎপাদিকা শক্তি শাশ্বত ঋতেরই ফল। যজ্ঞ ভিন্ন অন্যান্য কর্ম্মের ফলও এই অখণ্ডনীয় ঋতবশতঃ এক অনির্ব্বচনীয় উপায়ে উৎপন্ন হয়। পূর্ব্ব মীমাংসাদর্শনে যজ্ঞের ও দেববাদের দার্শনিক ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছিল।

ঋত

সমগ্র বিশ্বে বেদের ঋষি এক শাশ্বত অব্যভিচারী নিয়মের অস্তিত্বের আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই নিয়মকে তাহারা বলিতেন ঋত। ঋতই সত্য। বিশ্বের যাবতীয় বস্তু ও যাবতীয় ঘটনা এই নিয়মে বিধৃত এবং এই নিয়ম আছে বলিয়াই পরস্পর সম্বদ্ধ। বাহ্যজগতে ও অন্তর্জগতে উভয়ত্রই এই

* সুরেশচন্দ্র সিংহরায়ের "হিন্দুধর্ম্মের অভিব্যক্তি"—শৈবধর্ম্ম পৃষ্ঠা—১২।

নিয়ম বর্ত্তমান। প্রাকৃতিক শৃঙ্খলা যেমন আছে, তেমনি এক নৈতিক ব্যবস্থার (Moral order) অস্তিত্বও আছে। এই ব্যবস্থা আছে বলিয়াই সৎকর্ম্ম পুরস্কৃত হয় এবং অসৎ কর্ম্মের শাস্তি ভোগ করিতে হয়। ঋতের ধারণা হইতেই কর্ম্মবাদের এবং জন্মান্তরবাদের উদ্ভব হইয়াছিল।

"ঋতে"র রক্ষক বরুণ। যে নিয়মে বিশ্ব পরিচালিত, তাহাই ঋত। ঋত বিশ্বে অনুস্যূত। সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্রগণ, সকলের গতিই নিয়ন্ত্রিত। দিনের পরে রাত্রি আসে, রাত্রির পরে দিন। ছয় ঋতু একটির পরে একটি নিয়মানুসারে আসে, ব্যতিক্রম হয় না। প্রত্যেক মাসেই কৃষ্ণপক্ষের পরে শুক্লপক্ষ, অমাবস্যার পরে পূর্ণিমা, নিয়মানুসারে আসে ও যায়। সর্ব্বত্রই নিয়মের রাজত্ব। এই নিয়মই ঋত। অধ্যাপক ডাঃ রাধাকৃষ্ণের মতে প্লেটোর সামান্যগণের (Universals, Ideas) সহিত ঋতের সাদৃশ্য আছে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ঋতেরই প্রকাশ—ঋতের ছায়া বা প্রতিফলন। ঋত পরিণামশীল জগতের অন্তরালে অবস্থিত অপরিণামী তত্ত্ব। সার্ব্বিক বিশেষের পূর্ব্ববর্ত্তী। বৈদিক ঋষির মতে যাবতীয় সমুৎপাদের আবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ঋত। সদা পরিবর্ত্তমান জাগতিক ঘটনাবলীর মধ্যে সনাতন ঋতেরই প্রকাশ। ঋতই সেইজন্য জগতের পিতা। দূরস্থিত ঋতের নিবাস হইতে মরুৎগণ আগমন করে। স্বর্গ ও মর্ত্ত ঋত হইতেই উদ্‌ভূত। ঋতই অপরিণামী সৎ বস্তু। অপরিবর্ত্তনীয় নিয়মই সৎ। যাহা দেখা যায়, তাহা সেই সতের অপূর্ণ প্রকাশ। সৎ এক ও নিরংশ এবং অপরিণামী। কিন্তু যাহা নানা, তাহা পরিবর্ত্তনশীল ও ক্ষণস্থায়ী। অপরিবর্ত্তনীয় চিরস্থায়ী সতের ধারণা ইহা হইতেই উদ্‌ভূত হইয়াছিল। এই ঋতই পরে ঈশ্বরের ইচ্ছারূপে কল্পিত হইয়াছিল এবং সুনীতি ও ধর্ম্মের নিয়ম ইহার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। ঋতকে উল্লঙ্ঘন করা দেবতাদিগেরও সাধ্য ছিল না। "উষা ঋতের মার্গ অনুসরণ করে, সূর্য্য ঋতের মার্গ অনুসরণ করে।" বহির্জগতে যে নিয়ম তাহাই নৈতিক জগতেরও ধর্ম্ম (virtue)। বিশ্বনিয়মের ধারক বরুণ নৈতিক ব্যবস্থারও (moral order) ধারক। তিনি "ঋতের গোপ" (রক্ষাকর্ত্তা) এবং পাপের শাস্তা। "হে ইন্দ্র, আমাদিগকে ঋতের পথে, মঙ্গলের পথে চালিত কর।"

দেববাদই প্রথম দর্শন

বেদের দেববাদ ঋষিদিগের জগৎ ব্যাখ্যার প্রচেষ্টার ফল। পণ্ডিতেরা দর্শন ও ধর্ম্মের (Religion) মধ্যে একটা ভেদের কল্পনা করিয়া থাকেন।

কিন্তু জগৎ-ব্যাপারের ব্যাখ্যার প্রচেষ্টাই দর্শন, এবং কোনও জাতির জগৎ-ব্যাপারের ব্যাখ্যার প্রথম প্রচেষ্টাই তাহার প্রাচীনতম ধর্ম্ম। বেদের দেবতাগণ আর্য্যজাতির জগৎ-ব্যাপার-ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা হইতেই উদ্‌ভূত। প্রাকৃতিক ব্যাপার সকল আকস্মিক ব্যাপার নহে, তাহারা চৈতন্য-বিশিষ্ট এক বা একাধিক পুরুষের—ইচ্ছাশক্তিমান পুরুষের—ক্রিয়া, এই চিন্তা হইতেই তাহাদের উদ্‌ভব হইয়াছিল। আকাশে মেঘ হয়, মেঘ হইতে বৃষ্টি হয় দেখিয়া ও মেঘ-গর্জ্জন শুনিয়া তাঁহারা দৃশ্যমান মেঘ ও বৃষ্টির মধ্যে এক অদৃশ্য পুরুষের হস্ত দেখিতে পাইয়াছিলেন এবং সেই পুরুষকে ইন্দ্র নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। অগ্নির মধ্যে সর্ব্ব-অপবিত্রতানাশক জ্যোতির্ম্ময় এক পুরুষকে দেখিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক যাবতীয় ব্যাপারের পশ্চাৎভাগে তাহাদের কারণস্বরূপ তাহারা এক একজন কর্ত্তার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়াছিলেন। এই সকল কর্ত্তাই বেদের দেবতা। কার্য্য হইতে কারণের আবিষ্কার দার্শনিক চিন্তা।

প্রথমে বহু দেবতার অস্তিত্ব কল্পিত হইলেও এই মীমাংসায় ঋষিদিগের মন বহুদিন সন্তুষ্ট থাকিতে পারে নাই। বিভিন্ন দেবতার বিভিন্ন কার্য্যের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা তাহাদিগকে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছিলেন। বিভিন্ন কার্য্যের কর্ত্তা, বিভিন্ন নামে স্তুত, কয়েকটি দেবতা যে বস্তুতঃ এক, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। সবিতা, সূর্য্য ও মিত্র এইরূপে এক দেবতায় পরিণত হইয়াছিলেন। পরিশেষে যাবতীয় দেবতাই যে একই দেবতার বিভিন্ন নাম, এই চিন্তা তাহাদের মনে উদিত হইয়াছিল। যে সকল দেবতার তাহারা স্তব করিতেন, তাহাদের একজন হয়তো অন্যান্য দেবতা-দিগের প্রভু, তিনিই হয়তো জগতের স্রষ্টা ও সর্ব্বশক্তিমান, এই চিন্তাও তাহাদের মনে উদিত হইয়াছিল। তাই ইন্দ্রের অলৌকিক কর্ম্মসকলের উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে শতক্রতু (সর্ব্বশক্তিমান) ও অভিভূ (বিজেতা), বিশ্বকর্ম্মা, বিশ্বদেব ও মহান্ বলা হইয়াছিল (ঋ, বেদ ৮ম-৮৯), বিশ্বকর্ম্মা শব্দের অর্থ বিশ্বের সৃষ্টিকর্ত্তা। এই বিশেষণ আর একজন দেবতার প্রতিও প্রযুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার নাম ত্বষ্টা। তাহাকে স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের, এমন কি অগ্নি, ইন্দ্র এবং ব্রহ্মণস্পতিরও সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছিল। তাহাকে সবিতাও বলা হইয়াছিল। বরুণ ও অগ্নির স্তব করিবার সময় তাহাদিগকে সকল দেবতার ঊর্দ্ধে স্থান দেওয়া হইয়াছিল। সূর্য্যকে মিত্র বরুণ ও অগ্নির চক্ষু, জগৎ (গমনশীল) ও তস্থিবান (স্থিতিশীল) সকল বস্তুর আত্মা বলা হইয়াছে। বহু দেবতার সমষ্টিরূপে

"বিশ্বদেব" নামে এক দেবতাশ্রেণীর কল্পনা ইহার পূর্ব্বে ঋষিগণ করিয়াছিলেন। বিশ্বদেবগণ আদিত্য, বসু ও মরুৎদিগের মতই এক শ্রেণীর দেবতা। ইন্দ্রকে এই দেবতাদিগের জ্যেষ্ঠ বলা হইয়াছে। প্রায় সকল দেবতাই কোনও না কোনও সূক্তে বিশ্বদেবদিগের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছেন। তাহা সত্ত্বেও কোথাও কোথাও অন্য দেবতাদিগের সহিত স্বতন্ত্রভাবেও তাহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ, সত্যঃ এই সপ্ত ব্যাহৃতির দেবতারূপে অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ, বৃহস্পতি ও ইন্দ্রের সঙ্গে বিশ্বদেবগণও উল্লিখিত হইয়াছেন।

নাসদীয় সূক্ত

জগৎ-রহস্য আবিষ্কারের জন্য উৎসুক ঋষি-মনের সুস্পষ্ট পরিচয় নাসদীয় সূক্তে পাওয়া যায়। সেই সূক্তে আছে—"তখন সৎ ছিল না, অসৎ ছিল না, আকাশ ছিল না, তাহার উপরিস্থ ব্যোম ছিল না। কিসের দ্বারা সকল আচ্ছাদিত ছিল? কোথায় ইহা ছিল? কাহার আশ্রয়ে ছিল? ইহা কি গভীর জলের মধ্যে ছিল?" সংশয়াকুল মনের প্রশ্ন এই সূক্তে ধ্বনিত হইয়াছে।

"একং সৎ—তদেকং"

ইন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দেবতাদিগের মাহাত্ম্য যতই অধিক বলিয়া বর্ণিত হউক না কেন, তাঁহারা যে সসীম, এ ধারণা ঋষিদিগের ছিল। সসীমে—অল্পে—ঋষিমন তৃপ্ত হয় নাই। তাই প্রথম হইতেই তাঁহারা অসীমের সন্ধানে ছিলেন। অসীম একের অধিক হইতে পারে না। তাই অনেক সূক্তে "একের" কথা দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও ঋকে ইন্দ্রকে বিশ্বকর্ম্মা, শতক্রতু (সর্ব্বশক্তিমান্) এবং সর্ব্বজ্ঞ বলা হইয়াছে। অন্যত্র ত্বষ্টাকে বিশ্বভুবনের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে। কিন্তু এই বিশ্বকর্ম্মাও অনেক স্থলে বহু দেবতাদিগের মধ্যে একজন। দেবতারা প্রকৃতপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন নহেন। তাঁহারা যে একই পুরুষের বিভিন্ন নাম, কোনও কোনও ঋষির মনে তাহাও উদিত হইয়াছিল। এক ঋষি বলিয়াছেন "একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ।" (ঋগ্বেদ—১।১৬৪।৪৬) এখানে সেই এক দেব "একং সৎ" নামে উল্লিখিত হইয়াছে। অন্যত্র (১ম মণ্ডল, ১৬৪।৬) তাহাকে "তৎ একং" বলা হইয়াছে। নাসদীয় সূক্তে এই একেরই অনুসন্ধান দেখিতে পাওয়া যায়। দীর্ঘতম সূক্তে (১ম মণ্ডল, ১৬৪।৬) ঋষি বলিতেছেন, "অজ্ঞ আমি জ্ঞানীগণকে (যাহারা সত্য কি তাহা জানেন) জিজ্ঞাসা করিতেছি, সেই "এক" কে, যিনি

জগতের ছয় অংশ ধারণ করিয়া আছেন?" ঋষিগণ কেবল সেই একের অনুসন্ধান করেন নাই, কিরূপে, কোন্ উপাদানদ্বারা তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, এ সকল প্রশ্নও তাঁহাদের মনে উঠিয়াছিল। "কোথায় দাঁড়াইয়া, কি অবলম্বন করিয়া, কি প্রকারে, কিসের দ্বারা সর্ব্বদর্শী বিশ্বকর্ম্মা নিজ শক্তিবলে পৃথিবী সৃষ্টি করিয়া আকাশকে বিস্তৃত করিয়াছিলেন?" (ঋ, বে, ১০ম ৮১, ২, ৪) এই সকল উক্তি হইতে ঋষিদিগের মনে গভীর দার্শনিক চিন্তার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। "যাঁহার অস্থি (রূপ) নাই, তিনি যখন যাহার অস্থি (রূপ) আছে, তাহাকে প্রসব করিয়াছিলেন, তখন সেই প্রথম জাতককে কে দেখিয়াছিল? পৃথিবীর নিঃশ্বাস, শোণিত ও আত্মা কোথায়? যিনি তাহা জানেন, তাঁহার নিকট জিজ্ঞাসা করিতে কে গিয়াছিল?" *

হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতি

তার পরে একদিন ঋষি হিরণ্যগর্ভ বা প্রজাপতিকে আবিষ্কার করিলেন। "হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ। স দধার পৃথিবীং দ্যাম্ উত ইমাং। কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম।" (ঋঃ বেঃ ১ম ৮।৭।৩।১) হিরণ্যগর্ভ প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতের পতিরূপে আবির্ভূত হন। তিনি পৃথিবী ও আকাশ ধারণ করিয়াছিলেন। কোন্ † দেবতাকে আমরা হবিদ্বারা অর্চ্চনা করিব? এই মন্ত্রে স্পষ্টই ঈশ্বরের কথা বলা হইয়াছে। এই সূক্তের অন্যান্য ঋক্গুলিতে ঈশ্বরের মাহাত্ম্য-খর্ব্বকারী কোনও কথাই নাই। বরং ঈশ্বরের সমস্ত গুণই হিরণ্যগর্ভে আরোপিত হইয়াছে। "তিনি আমাদের নিশ্বাসের বায়ু ও বল দিয়াছেন, সকল জীবজগৎ ও দেবতারাও তাঁহার আদেশ পালন করেন। তিনিই মানুষ ও পশুদিগের সনাতন প্রভু। তাঁহার শক্তি ও ঐশ্বর্য্য তুষারাবৃত পর্ব্বতমালা, মহাসাগর ও নদীগণ ঘোষণা করিতেছে। তিনি একাই সকল দেবের অধিদেব। তিনি পৃথিবীর সৃষ্টি করিয়াছেন, আকাশের সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি ন্যায়বান্" ইত্যাদি। একেশ্বর বাদের জন্য আর কি চাই? এই সূক্ত কোনও সসীম দেবতার স্তব নহে, ঈশ্বরের স্তব।

---

* গ্রীক দার্শনিক Parmenides জগতের মূল সত্তাকে "এক" (One) বলিয়াছেন। প্লোটিনাস্ও তাহাকে "One" বলিয়াছিলেন। কোনও নাম দেন নাই।

† এই সূক্তের "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম" ইহার অর্থ কেহ কেহ করেন "ক"-নামক আদি দেবতাকে অর্চ্চনা করিব। কিন্তু কিম্ শব্দের চতুর্থী বিভক্তিতেই "কস্মৈ" হয়। "ক" শব্দ বিশেষ্য পদ, তাহার চতুর্থীতে "কস্মৈ" হয় কিরূপে?

একেশ্বরবাদ

বহু দেবতার মধ্যে একজনকে সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করাকে মাক্ষমূলার Henotheism বলিয়াছেন। অন্য দেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরকে স্বীকার করাই তাঁহার মতে একেশ্বরবাদ। বেদে অন্য দেবতার অস্তিত্ব স্বীকৃত বলিয়া তাহার ঈশ্বরবাদ পূর্ণ একেশ্বরবাদ (Monotheism) নহে, ইহাই মাক্ষমূলারের মত। কিন্তু বহু দেবতার ভিন্ন ভিন্ন অস্তিত্ব প্রথমে স্বীকৃত হইলেও পরে এই সকল দেবতা যে এক অদ্বিতীয় ঈশ্বরেরই বিভিন্ন নাম এবং তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, একথা বেদে বলা হইয়াছে। ম্যাকডনেল সাহেব বেদের ঈশ্বরবাদকে Henotheism বলিতেও স্বীকৃত হন নাই। তাঁহার মতে এক এক দেবতার স্তবের সময় তাঁহাকে যে ঈশ্বরত্বে উন্নীত করা হইয়াছে, তাহাতে কবির ভাবোচ্ছ্বাসের আতিশয্যই সূচিত হয়, প্রকৃত একেশ্বরবাদ সূচিত হয় না। কিন্তু ম্যাকডনেলের এই উক্তি যুক্তিসহ নহে। "একং সদ্বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ" এই ঋকে ভাবোচ্ছ্বাসের কোনও প্রমাণ নাই। "মূর্দ্ধা ভুবো ভবতি নক্তম্ অগ্নিঃ, ততঃ সূর্য্যো জায়তে প্রাতরুদ্যন্" (ঋ, বে, ১০।৮৮) - অগ্নি রাত্রিকালে পৃথিবীর মস্তক, প্রাতে তিনি সূর্য্য হইয়া উদিত হন। এই মন্ত্রে অগ্নি ও সূর্য্য যে একই দেবতা, তাহা বলা হইয়াছে। অথর্ব্ববেদে আছে "যে বরুণঃ সায়ং অগ্নির্ভবতি, স মিত্রো ভবতি প্রাতরুদ্যন্। স সবিতা ভূত্বা অন্তরিক্ষেণ যাতি, স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবং।" ইহাতে অগ্নি, বরুণ, মিত্র, সবিতা ও ইন্দ্র যে একই দেবতার বিভিন্ন নাম তাহা স্পষ্ট বোঝা যায়। এখানেই বা উচ্ছ্বাস কোথায়? তারপরে যাস্ক বলিলেন, "মাহাত্ম্যাং দেবতায়াঃ এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে। একস্য আত্মনঃ অন্যে দেবতাঃ প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি।" একই আত্মা বহু দেবতা স্বরূপে স্তুত হন। সকলেই এক আত্মার প্রত্যঙ্গ মাত্র। (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম্ম—শতবার্ষিক সংস্করণ—২১৮ পৃঃ) এই অর্থেই যদি বৈদিক দেবতাগণ ভারতীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক স্বীকৃত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে বেদের ধর্ম্মকে একেশ্বরবাদ না বলিবার কারণ নাই। মাক্ষ-মূলার লিখিয়াছেন, যে সকল ঋষি একেশ্বরবাদের মহান্ সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বকীয় প্রযত্নদ্বারাই অজ্ঞানান্ধকার হইতে বাহির হইয়া মহত্তর সত্যের আবিষ্কারের জন্য চেষ্টিত হইয়াছিলেন। সৎ ও অসতের মধ্যে, দৃশ্য ও অদৃশ্যের মধ্যে, প্রতিভাস ও সতের মধ্যে কি সম্বন্ধ, এবং যে "এক"

উৎপত্তিহীন, যিনি পুরুষও নহেন স্ত্রীও নহেন, দেবতাদিগের স্বরূপ হইতে যাঁহার স্বরূপ একান্ত ভিন্ন, তাঁহার ও সাধারণের উপাস্য বহু দেবতার মধ্যে কি সম্বন্ধ, তাহা তাঁহাদিগের মধ্যে বিজ্ঞ যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা অন্তরের মধ্যে অনুভব করিয়াছিলেন। সেই "একে" তাহারা যে ব্যক্তিত্বের (Personality) আরোপ করিয়াছিলেন, তাহা গ্রীকদিগের জিউস্ এবং ইহুদী ও খৃষ্টানদিগের জিহোবার ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা ভিন্ন। বেদের ঋষিগণ ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন আলেক্‌জান্দ্রিয়ার কয়েকজন খৃষ্টান দার্শনিক সেই ধারণায় পৌঁছিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বর্ত্তমানে যাহারা আপনাদিগকে খৃষ্টান বলিয়া অভিহিত করেন, তাহাদের অনেকের পক্ষে তাহা অনধিগম্য। ঋষিগণ ঈশ্বরে যে ব্যক্তিত্বের আরোপ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাতে ইচ্ছার আরোপের অতিরিক্ত কিছু নহে। তাহা মানবের ব্যক্তিত্ব হইতে একান্ত ভিন্ন, দেবতাদের ব্যক্তিত্বের বহু উর্দ্ধে "তাহা অবস্থিত।"

পুরুষ-সূক্ত

ইহুদী ও খৃষ্টধর্ম্মের ঈশ্বর জগদতীত। কিন্তু বেদের ঋষিগণ যে ঈশ্বরের ধারণা করিয়াছিলেন, তিনি জগতের মধ্যে ও বাহিরে বর্ত্তমান—তিনি জগতে অনুস্যূত ও জগতের অতীত উভয়ই। ঋগ্বেদের পুরুষ সূক্তে যে পুরুষের বর্ণনা আছে, তিনি সহস্র-শীর্ষ, সহস্রাক্ষ, সহস্রপাৎ, তিনি সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত এবং তাহার দশ অঙ্গুলি উর্দ্ধেও অবস্থিত। এই সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য মস্তক, অক্ষি ও চরণ বিশ্বের অসংখ্য জীবের মস্তক, অক্ষি ও চরণ। পুরুষ যেমন সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত, তেমনি জীবশরীরেও অধিষ্ঠিত। এই বিরাট পুরুষই "সর্ব্ব"। যাহা ভূত তাহাও তিনি, যাহা ভবিষ্যতের গর্ভে, তাহাও তিনি, তিনিই অমৃতের অধিপতি। যাবতীয় ভূতগণ তাহার এক "পাদ", অন্য তিন পাদ আকাশে, ইত্যাদি। ঋষিদিগের মন যে একত্বের অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল, তাহারই পরিণতি এই সূক্তে। এই অদ্বৈত দর্শন স্ফুটতর হইয়াছে উপনিষদের অদ্বৈত ব্রহ্মবাদে। গায়ত্রীমন্ত্রেও এই অদ্বৈতবাদই দেখিতে পাওয়া যায়—যিনি আমাদের 'ধী' প্রেরণ করেন, গায়ত্রী তাঁহারই উপাসনামন্ত্র। "আমাদের ধী প্রেরণ করেন," ইহার অর্থ যাঁহার ধী-প্রস্রবণ হইতে ধী আমাদের মধ্যে প্রবাহিত। আমাদের ধী সেই অসীম ধীর অংশ।

ব্রহ্মণ

শতপথ ব্রাহ্মণে "ব্রহ্ম" শব্দ জগতের মূল তত্ত্ব অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। তাহাতে আছে "আদিতে এই বিশ্ব ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান ছিল। ইহা (ব্রহ্মণ্) দেবতাদিগকে সৃষ্টি করিয়া তাহাদিগকে এই সকল লোকের উপর তুলিয়াছিল; অগ্নিকে পৃথিবীর উপরে, বায়ুকে বাতাসের উপরে, সূর্য্যকে আকাশের উপরে। ব্রহ্মণ ইহার পরে এই সকল লোকের উপরিস্থ লোকে গিয়াছিলেন। তখন তিনি চিন্তা করিলেন 'কিরূপে আমি এই সকল লোকে অবতরণ করিব?' তখন তিনি নাম ও রূপের সাহায্যে অবতরণ করিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণে অন্যত্র ব্রহ্ম বিশ্বের মূলতত্ত্ব এবং প্রজাপতি, পুরুষ এবং প্রাণের সহিত অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাহাকে স্বয়ম্ভু বলা হইয়াছে। কিন্তু ঋগ্বেদ সংহিতায় এই অর্থে ব্রহ্ম শব্দের ব্যবহার হয় নাই। ঋগ্বেদ সংহিতায় উপনিষদে যে অর্থে ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই অর্থে ব্রহ্ম শব্দের ব্যবহার দেখা যায় না, কিন্তু আত্মন্ শব্দের ব্যবহার আছে।

বৈদিক ঋষি যে "একের" সন্ধান পাইয়া, তাহাকে প্রথমে "তদেকং" বলিয়াছিলেন, সেই 'একই' পরে ব্রহ্ম ও আত্মা নামে অভিহিত হইয়াছিলেন। বৈদিক দেবতাগণ সসীম। ঋষিগণ অসীমকে যখন আবিষ্কার করিলেন, তখন তাঁহার উপযোগী কোনও নাম খুঁজিয়া পান নাই। প্রজাপতি বা বিশ্বকর্ম্মা নামও তাঁহার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তাই প্রথমে তাঁহাকে "একং সৎ" বা "তদেকং" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। যদিও ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি প্রভৃতিকে ঋষি একই দেবতার বিভিন্ন নাম বলিয়া জানিয়াছিলেন, তথাপি এই সকল নামের কোনটি গ্রহণ না করিয়া বলিলেন, "একং সৎ বিপ্রাঃ বহুধা বদন্তি অগ্নিং যমম্ মাতরিশ্বানম্ আহুঃ—বিজ্ঞেরা "এক সৎকে" অগ্নি, যম, মাতরিশ্বন্ নামে অভিহিত করেন। ঋষি এখানে এই "এক" ও বিভিন্ননামের দেবতার মধ্যে ভেদের নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই "একই" ব্রহ্ম। "ব্রহ্ম" শব্দ "বৃহ" ধাতু হইতে উৎপন্ন। "বৃহ" ধাতুর অর্থ বৃদ্ধি পাওয়া। "বৃহৎ" শব্দও 'বৃহ' ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ যাহা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে। মাক্ষ-মূলারের মতে 'বৃহ' ধাতুর আর একটা অর্থ ছিল "কথা বলা, শব্দ উচ্চারণ করা।" বৃহস্পতি ও বাচস্পতি একার্থক। বৃহস্পতি শব্দের অর্থ বৃহতাম্ (বাচাম্) পতি, বাক্যের পতি। ইহা হইতে 'বৃহ' ধাতুর এক অর্থ যে কথা বলা এবং বৃহৎ শব্দের এক অর্থ যে "বাক্", তাহাতে সন্দেহ থাকে না। ব্রহ্ম

শব্দের এক অর্থ উপাসনা বা আরাধনা। উপাসনা হয় বাক্যদ্বারা। তাই উপাসনা অর্থে ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছিল। তাই বৈদিক মন্ত্র বা বেদ ব্রহ্ম। "বৃংহতি" বা "বৃংহয়তি" শব্দে "বৃহ" ধাতুর অর্থ "মুখে শব্দ করা" বা কথা বলা। ইহা হইতেই মৌখিক উপাসনা অর্থে ব্রহ্ম শব্দের প্রয়োগ হইয়াছিল মনে হয়। বাক্ বা শব্দ যখন উচ্চারিত হয়, তখন এক অব্যক্ত অতীন্দ্রিয় শক্তি মুখ দিয়া বাহির হইয়া শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। এই সাদৃশ্য হইতে যে সার্ব্বিক শক্তি দর্শনেন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা ব্রহ্ম নামে অভিহিত হইয়াছিল। এই ভাবে মাক্সমূলার বিশ্বস্রষ্টা অর্থে ব্রহ্ম শব্দের ব্যবহারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'বৃহৎ' শব্দের অর্থ প্রকাণ্ড বা বিরাট ধরিয়া সেই অর্থেই ব্রহ্ম শব্দ বিশ্বস্রষ্টা বুঝাইতে প্রথম ব্যবহৃত হইয়াছিল, ইহাও বলা যায়। যিনি বিরাট বা অসীম, তিনিই ব্রহ্ম। পুরুষ সূক্তে যে পুরুষের কথা আছে, তিনিই ব্রহ্ম। তাহার এক পাদ পৃথিবীতে। তিন পাদ তাহার ঊর্দ্ধে। এই সূক্ত-রচনার সময় বোধ হয় ব্রহ্ম শব্দের আবিষ্কার হয় নাই। পরে হইয়াছিল।

কিন্তু ব্রহ্ম শব্দের এক অর্থ বাক্। ভর্তৃহরির ব্রহ্মকাণ্ডে নিম্নলিখিত শ্লোক পাওয়া যায়।

অনাদি-নিধনং ব্রহ্ম শব্দতত্ত্বং যদক্ষরং
বিবর্ত্ততেঽর্থভাবেন প্রক্রিয়া জগতো যথা।

জন্মমৃত্যুহীন ব্রহ্ম শব্দতত্ত্ব এবং অক্ষর। ব্রহ্মই জগতের অভিব্যক্তিতে বস্তুরূপে পরিণত হন। এই শ্লোকে ব্রহ্মকে শব্দতত্ত্ব অর্থাৎ শব্দের স্বরূপ বলা হইয়াছে। ব্রহ্মকাণ্ড অবশ্য বেদের বহুকাল পরে রচিত। কিন্তু বেদেও বাক্‌কে অতি উচ্চস্থান দেওয়া হইয়াছে। ঋগ্বেদের ১০ম মণ্ডলে যে দেবী সূক্ত আছে, তাহাতে বাক্ বলিতেছেন "আমি রুদ্র, বসু, আদিত্য ও বিশ্বদেবগণের সহিত (অথবা রুদ্র, বসু, আদিত্য ও বিশ্বদেব রূপে) বিচরণ করি; মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও অগ্নি এবং অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে ধারণ করি। আমি দেবশত্রুহন্ত্রী। আমি সোমকে, ত্বষ্টাকে, পুষণ ও ভগকে ধারণ করি। যজমানের যজ্ঞফলের বিধান আমিই করি। আমি জগতের ঈশ্বরী, ধনদায়িনী, তত্ত্বদ্রষ্ট্রী এবং উপাস্যদিগের মধ্যে প্রধানা। বহু ভাবে অবস্থিতা সর্ব্বভূতে প্রবিষ্টা আমাকে দেবগণ আরাধনা করে। আমারই শক্তিতে যে দেখে, যে নিশ্বাস ছাড়ে, যে শোনে, সে অন্ন আহার করে।......আমি জগতের শীর্ষে পিতাকে (দ্যৌঃ) প্রসব করিয়াছি, সমুদ্রে জলের মধ্যে আমার উৎপত্তি। আমি সেখান হইতে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছি এবং গগন স্পর্শ করিতেছি।" কোলব্রুক বলেন, এই বাক্ ব্রহ্মের শক্তি।

ইহার সহিত বাইবেলের Logos বা Word (বাণী) এর সাদৃশ্য সুস্পষ্ট। এই Logos সৃষ্টির পূর্ব্বে ঈশ্বরের সঙ্গে ছিলেন এবং ইহাদ্বারাই সকল পদার্থ সৃষ্ট হইয়াছে। তৈত্তিরীয় আরণ্যকে আছে (৩, ১২, ১৭) "আমি সেই আদিত্যবর্ণ পুরুষকে জানি ; যিনি তমসের পারে উপবিষ্ট থাকিয়া সমস্ত রূপের চিন্তাপূর্ব্বক তাহাদিগকে নাম দিয়াছিলেন।" ইহার অর্থ যাবতীয় বস্তুর রূপ ঈশ্বরের চিন্তা হইতে উদ্‌ভূত এবং নামের (বাক্যের) সহিত প্রকাশিত। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে (৭ম-৫, ২, ২১) "বাক্ জন্মহীন। বাক্ হইতে বিশ্বকর্ম্মা সকল জীবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।" উক্ত ব্রাহ্মণে আরও আছে "বাক্ বৈ ব্রহ্ম" (২য়, ১, ৪, ১০)। যোগবাশিষ্ঠের "ব্রহ্ম বৃংহৈব হি জগৎ জগৎচ ব্রহ্ম বৃংহনম্" (জগৎ ব্রহ্মের বৃংহন বা শব্দ) জগৎ। ব্রহ্মের চিন্তার শব্দরূপে ব্যক্ত রূপ। এই সকল হইতে "কথা বলা" অর্থে "বৃহ" ধাতু হইতে জগৎস্রষ্টা অর্থে ব্রহ্ম শব্দের উৎপত্তি খুবই সম্ভবপর মনে হয়।

আত্মন্

"আত্মা" শব্দের ব্যুৎপত্তি-সম্বন্ধে মাক্ষমূলার লিখিয়াছেন, শব্দটি সম্ভবতঃ প্রাক্-বৈদিক। ইহার অর্থ প্রথমে ছিল নিঃশ্বাস। ঋগ্বেদের এক সূক্তে (১০ ম ১৬।৩) মৃত ব্যক্তিকে সম্বোধন করিয়া বলা হইয়াছে "সূর্য্যং চক্ষুর্গচ্ছতু, বাতম্ আত্মা।"—তোমার চক্ষু সূর্য্যে গমন করুক, তোমার নিঃশ্বাস বায়ুতে প্রবেশ করুক। পরে ইহা প্রাণবায়ু অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল, পরে জীবাত্মা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সূর্য্যকে যে "জগৎ ও তস্থিবান্" সকলের আত্মা বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এক সূক্তে আছে "জগতের প্রাণবায়ু (অসু), রক্ত (অসৃক্) এবং আত্মা কোথায় ছিল ?" (ঋ, বে, ১ম, ১৬৪।৪)। পরে ইহা পরমাত্মা অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছিল।

গায়ত্রী

ঋগ্বেদের গায়ত্রী মন্ত্র অতি পবিত্র বলিয়া পরিগণিত। ইহাকে বেদ-মাতা (ছন্দসাম্ মাতা) বলা হইয়াছে। দ্বিজাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের) ইহাই প্রধান উপাসনা মন্ত্র।

ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৬২ সূক্তের ১০ম ঋক্ গায়ত্রী মন্ত্র। প্রচলিত গায়ত্রীর প্রথম অংশ "ওঁ ভূ র্ভুবঃ স্বঃ" (প্রণব ও মহাব্যাহৃতি)-র উল্লেখ সেখানে নাই। "তৎ সবিতু র্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"—ইহাই উপরি-উক্ত ঋক্। প্রণব ও মহাব্যাহৃতি পরে ঋক্ মন্ত্রের পূর্ব্বে যুক্ত

হইয়াছে। প্রণব ও ব্যাহৃতি-যুক্ত মন্ত্রের পরেও একবার প্রণব উচ্চারণ করিতে হয়।

প্রাণায়াম-কালে সপ্রণব সব্যাহৃতি গায়ত্রীমন্ত্রের পরে "গায়ত্রী-শিরঃ" নামক অংশও পাঠ করিতে হয়। সে অংশ এই: ওঁ আপোজ্যোতী রসোঽমৃত ব্রহ্ম ভূ র্ভুবঃ স্বরোম্। প্রাণায়াম কালে মহাব্যাহৃতির সহিত আরও চারিটি ব্যাহৃতির নাম উচ্চারণ করিতে হয়। ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জনঃ, তপঃ ও সত্যম্। ইহারা সপ্তব্যাহৃতি। ইহাদের মধ্যে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ মহাব্যাহৃতি।

যিনি যে মন্ত্রের দ্রষ্টা, তিনি সেই মন্ত্রের ঋষি। মন্ত্রে যাঁহার কথা উক্ত হয়, তিনি সেই মন্ত্রের দেবতা। গায়ত্রী মন্ত্রে ওঁকারের ঋষি ব্রহ্মা, সপ্তব্যাহৃতির ঋষি প্রজাপতি এবং গায়ত্রীর (এই অংশকে শংকরাচার্য্য শুদ্ধা গায়ত্রী বলিয়াছেন) ঋষি বিশ্বামিত্র। গায়ত্রীর দেবতা সবিতা বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। এই সবিতা কে, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে।

ঋগ্বেদে কোনও কোনও স্থলে "সূর্য্য" ও "সবিতা" একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনও কোনও স্থলে ঐ দুই শব্দদ্বারা বিভিন্ন দেবতা সূচিত হইয়াছেন। সায়নাচার্য্যের মতে উদয়ের পূর্বে সূর্য্যের যে মূর্ত্তি, তাহাই সবিতা। সূর্য্য ও সবিতা যে একই দেবতার দুই মূর্ত্তি, তাহা বলা যায়।

সায়নাচার্য্য গায়ত্রী মন্ত্রের চারি প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এক প্রকার ব্যাখ্যায় সবিতা-শব্দ তিনি সূর্য্য অর্থে, অন্যতর ব্যাখ্যায় "জগৎস্রষ্টা পরমেশ্বর" অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। মহীধর সবিতা-শব্দ "আদিত্যান্তর পুরুষ" অথবা ব্রহ্ম অর্থে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যোগী যাজ্ঞবল্ক্য যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা এই—"দেবস্য সবিতুঃ (ভর্গস্বরূপাৎসূর্য্যামিব্রহ্মণঃ) বরেণ্যম্ (বরণীয়ম্, উপাসনীয়ম্) ভর্গঃ ধীমহি (সোঽহমস্মি ইত্যনেন চিন্তয়ামঃ)—তিনিই আমি—এই ভাবে চিন্তা করি।*

* আহ্নিকতত্ত্বে সমগ্র গায়ত্রী মন্ত্র এই ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে:

"দেবস্য সবিতুর্বর্চ্চো ভর্গমন্তর্গতং বিভুম্।
ব্রহ্মবাদিন এবাহুঃ বরেণ্যঞ্চাস্য ধীমহি।
চিন্তয়ামো বয়ং ভর্গং, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।
ধর্মার্থকামমোক্ষেষু বুদ্ধিবৃত্তিঃ পুনঃ পুনঃ।
বুদ্ধেশ্চোদয়িতা যস্তু, চিদাত্মা পুরুষো বিরাট্।
বরেণ্যং বরণীয়ঞ্চ জন্মসংসার-ভীরুভিঃ।
আদিত্যান্তর্গতং যচ্চ ভর্গাখ্যং ভমুমুক্ষুভিঃ।
জন্মমৃত্যুবিনাশায় দুঃখস্য ত্রিবিধস্য চ।
ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রষ্টব্যঃ সূর্য্যমণ্ডলে।
মন্ত্রার্থমপি চৈবাহং জ্ঞাপয়ত্যেবমেব হি।

রাজা রামমোহন রায় সবিতা-শব্দ সূর্য্য অর্থে গ্রহণ করিয়াও ব্রহ্মপক্ষে সমগ্র মন্ত্রের ব্যাখা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা এইরূপ :

"ওঁ ভূর্ভুবঃস্বঃ"—এখানে ওঁ-শব্দের অর্থ জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কর্ত্তা পরব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে জগৎ হইতে পৃথক্ নহেন, এই কথা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম ভূঃ (পৃথিবী), ভুবঃ (অন্তরীক্ষ) ও স্বঃ (স্বর্গ), এই তিন লোকে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি, ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ", ইহার অর্থ— দেবস্য (দীপ্তিমান্) সবিতুঃ (সূর্য্যের) বরেণ্যং (প্রার্থনীয়) ভর্গ (জ্যোতিঃস্বরূপ) ধীমহি (আমরা চিন্তা করি)। তিনি যে কেবল সূর্য্যের অন্তর্যামী, তাহা নহে। যঃ (যিনি) নঃ ধিয়ো (আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে—আমাদের অন্তর্যামী হইয়া) প্রচোদয়াৎ (বিষয়ে প্রেরণ করিতেছেন)।

শংকর ব্রহ্ম-অর্থেই সবিতা-শব্দ গ্রহণ করিয়াছেন। ৺সীতানাথ তত্ত্বভূষণ লিখিয়াছেন, "প্রথমে ছিল ইহা (গায়ত্রী) সূর্য্যের ধ্যান। জ্ঞানী ব্যক্তি ইহাকে ব্রহ্ম-ধ্যানে পরিণত করিয়াছেন।" বঙ্কিমবাবুও এই কথা বলিয়াছেন। কিন্তু ইহা স্বীকার না করিবার পক্ষে কারণ আছে।

গায়ত্রী মন্ত্রে সবিতা-শব্দের অর্থ সূর্য্য, স্বীকার করিলেও মন্ত্রের উপাস্য সূর্য্য নহেন। যিনি সূর্য্যেরও বরেণ্য, তিনিই এই মন্ত্রের উপাস্য। উপরি-উক্ত সকল ব্যাখ্যাতেই 'সবিতুঃ' ও 'দেবস্য' এই দুই শব্দে সম্বন্ধে ষষ্ঠী ধরিয়া "সবিতুঃ ভর্গো দেবস্য" এর অর্থ করা হইয়াছে "দেব সবিতার ভর্গ বা তেজ।" কিন্তু "সবিতুঃ" শব্দে কর্ত্তায় ষষ্ঠী বলিতে বাধা নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের

> যদা তমঃ তৎ ন দিবা ন রাত্রিঃ
> ন সন্ ন চাসন্ শিব এব কেবলঃ।
> তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
> প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী ॥৪।১৮

সূর্য্যদেবের অভ্যন্তরে যে বচ্চকে ব্রহ্মবাদিগণ বিভু, ভর্গ ও বরেণ্য বলেন, আমরা তাঁহার ধ্যান করি। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ বিষয়ে যে ভর্গ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি পুনঃ পুনঃ প্রেরণ করেন, আমরা সেই ভর্গকে চিন্তা করি। যিনি বুদ্ধির প্রেরক তিনি চিদাত্মা, বিরাট পুরুষ। তিনি জন্ম-সংসারভীত জনগণ কর্তৃক বরণীয়। যিনি আদিত্যের অন্তর্গত ভর্গাখ্য পুরুষ, তিনি জন্ম-মৃত্যু ও ত্রিবিধ দুঃখের বিনাশের জন্য বরণীয়। যে পুরুষ ধ্যানে সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্ট হন, তিনিই বরণীয়। ইহাই মন্ত্রের অর্থ। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় যে, গায়ত্রী মন্ত্রদ্বারা উপাস্য সূর্য্য নহেন, সূর্য্যের মধ্যে অধিষ্ঠিত চিদাত্মা বিরাট পুরুষ।

কিন্তু বহুদিন পূর্ব্বে বঙ্কিমচন্দ্র এই বিষয়ের আলোচনা করিয়া বলিয়াছিলেন, নিরপেক্ষ হইয়া বলিতে গেলে সূর্য্যই আদিতে গায়ত্রীর উপাস্য দেবতা ছিলেন, পরে সবিতা-শব্দ 'পরমেশ্বর' অর্থে গৃহীত হইয়াছে।

এই শ্লোকে যে কেবল "সবিতুর্বরেণ্যং" শব্দ দুইটি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নহে, ইহার অর্থের সহিত গায়ত্রীর অর্থেরও প্রচুর সাদৃশ্য আছে। ইহার অর্থ এই :

যখন তমঃ (মনুসংহিতার "আসীদিদং তমোভূতং" শ্লোকে যে তমঃ বর্ণিত হইয়াছে তাহা) ছিল, তখন দিনও ছিল না, রাত্রিও ছিল না। তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, ছিলেন কেবল শিব। তিনিই অক্ষর, তিনিই সবিতার বরেণ্য; তাঁহা হইতে পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হয়। একটু সূক্ষ্মভাবে দেখিলেই "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" এবং "প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী" যে একই অর্থবোধক, তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। অমর-কোষ অনুসারে প্রজ্ঞা, ধী ও বুদ্ধি সমার্থক। "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"—অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারই ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "যিনি আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিষয়ে প্রেরণ করেন"। কিন্তু ইহার অর্থ—যে অনন্ত ধী-সমুদ্র হইতে প্রতিজীবে প্রতিক্ষণে ধী আগমন করিতেছে- ইহা বলিতে বাধা কি? পৃথিবীর উপরিভাগস্থ যাবতীয় কূপ যেমন পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ অসীম জলভাণ্ডারের সহিত সংযুক্ত এবং সেই জলভাণ্ডার যেমন প্রতি কূপে অনুক্ষণ জল প্রেরণ (সরবরাহ) করিতেছে, তেমনি অনন্ত ধী-ভাণ্ডাররূপী ব্রহ্ম অনুক্ষণ প্রতিজীবে তাঁহার ধী সরবরাহ করিতেছেন; ইহাই "ধিয়ঃ প্রচোদয়াৎ" শব্দদ্বয়ের অর্থ। জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার ভেদ আছে বা নাই, সে প্রশ্ন না তুলিয়াও বলা যায় আমরা জ্ঞানময় পরমাত্মার মধ্যে অবস্থিত। আমাদের ধী তাঁহারই ধী।

শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন, "মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ"—তাঁহা হইতে স্মৃতি, জ্ঞান ও তাহাদের অপায় হয়। উপনিষদের "প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী"-র অর্থও ইহাই। প্রসৃতা কোথায়? না জীবে। গায়ত্রীর সহিত এই শ্লোকের এতাদৃশ সাদৃশ্য দেখিয়া মনে করা অসঙ্গত নহে যে, উপনিষদের শ্লোকটিতে ঋষি গায়ত্রী-তত্ত্বই নিহিত করিয়াছেন। এই শ্লোকে "সবিতুর্বরেণ্যং"-এর অর্থ সবিতার বরেণ্য, সবিতা যাঁহার ভজনা করেন। এখানে ষষ্ঠী কর্ত্তায়। গায়ত্রীতেও কর্ত্তায় ষষ্ঠী ধরিলে অর্থ হইবে সবিতা যে ভর্গের (জ্যোতির্ময় ব্রহ্মের) উপাসনা করেন, আমরা তাঁহার ধ্যান করি। সেই ভর্গ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ও সবিতৃমণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী যেমন, তেমনি আমাদের মধ্যেও অবস্থিত—অথবা আদিত্য ও আমরা সকলেই তাঁহার মধ্যে অবস্থিত। এই ভাবে ব্যাখ্যা করিলে সবিতা-শব্দ গায়ত্রীতে প্রথমে "সূর্য্য" অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল, পরে জ্ঞানবৃদ্ধির সহিত "ব্রহ্ম" অর্থে গৃহীত হইয়াছিল—ইহা কল্পনা করিবার প্রয়োজন হয় না।

"তৎসবিতুর্বরেণ্যং" ইহার 'তৎ'-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ওঁ তৎ সৎ ইতি নির্দেশঃ ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ" (১৭।২৩); ওঁ, তৎ ও সৎ—ব্রহ্মের এই ত্রিবিধ নির্দেশ বা নাম। বেদে ও উপনিষদে বহুস্থলে তৎ-শব্দ ব্রহ্ম-অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। "তৎ ত্বমসি" এই বাক্যের তৎ-শব্দের অর্থ ব্রহ্ম। গায়ত্রীর তৎ-শব্দও ব্রহ্ম-অর্থে গ্রহণ করা যায়। "দেবস্য সবিতুঃ বরেণ্যং ভর্গঃ তৎ ধীমহি" এই ভাবে অন্বয় করিলে অর্থ হয় "দীপ্তিমান্ সবিতৃদেবের ভজনীয় ভর্গস্বরূপ তৎ বা ব্রহ্মকে আমরা ধ্যান করি।"

'ছান্দোগ্য' উপনিষদে গায়ত্রীকে ব্রহ্ম অর্থে গ্রহণ করিয়া বলা হইয়াছে, যাহা কিছু আছে সকলই গায়ত্রী। গায়ত্রীই এই পৃথিবী। গায়ত্রীর চারিটি চরণ। সমুদয় ভূত ইহার একপাদ, অবশিষ্ট তিন পাদ স্বর্গে অমৃতরূপে প্রতিষ্ঠিত। এখানে উপনিষদের ঋষি ঋগ্বেদের পুরুষসূক্ত হইতে দুই পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করিয়াছেন এবং গায়ত্রীকেই পুরুষ বলিয়াছেন। এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয় উপনিষদের যুগেও ব্রহ্মই গায়ত্রীর লক্ষ্য ছিলেন।*

---

* গায়ত্রীর যে সকল ব্যাখ্যা প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে শঙ্করাচার্য্যের ব্যাখ্যাই প্রাচীনতম। তিনি অদ্বৈত মতেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যা এই:

ভূঃ ইতি সন্মাত্রং উচ্যতে। ভুবঃ ইতি সর্ব্বং ভাবয়তি প্রকাশয়তি ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চিদ্রূপম্ উচ্যতে। সুব্রিয়তে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা স্বঃ ইতি সুষ্ঠু সর্বৈঃ ব্রিয়মাণং সুখস্বরূপম্ উচ্যতে।—ভূঃ-শব্দের অর্থ সৎ। ভুবঃ-শব্দের অর্থ চিৎ এবং স্বঃ-শব্দের অর্থ আনন্দ। সকল প্রকাশ করে বলিয়া ভুবঃ অর্থে চিৎ। সকলেই ভাল বলিয়া বরণ করে বলিয়া স্বঃ অর্থ আনন্দ। সুতরাং "ভূর্ভুবঃ স্বঃ" অর্থে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম।

তারপরে শঙ্কর বলিয়াছেন, "শুদ্ধগায়ত্রী প্রত্যক্ ব্রহ্মৈকবোধিকা" অর্থাৎ প্রত্যক্ আত্মা (জীবাত্মা) ও ব্রহ্ম যে এক—তাহাই শুদ্ধগায়ত্রী দ্বারা বোঝা যায়। "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" ইতি নঃ (অস্মাকং) ধিয়ঃ (বুদ্ধীঃ) যঃ প্রচোদয়াৎ (প্রেরয়েৎ) ইতি সর্ব্ববুদ্ধি-সংজ্ঞান্তঃকরণ-প্রকাশকঃ সর্ব্বসাক্ষী প্রত্যগ্ আত্মা ইতি উচ্যতে—অর্থাৎ সকল জীবের বুদ্ধি-নামক অন্তঃকরণের প্রকাশক সর্ব্বসাক্ষী প্রত্যক্ আত্মা—(প্রতি শরীরে অবস্থিত আত্মা) ইহাই কথিত হইয়াছে।

তস্য প্রচোদয়াৎ-শব্দনির্দিষ্টস্য আত্মনঃ স্বরূপ-ভূতং পরব্রহ্ম তৎসবিতুরিত্যাদি-পদৈঃ নির্দিশ্যতে—অর্থাৎ প্রচোদয়াৎ-শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট সেই প্রত্যক্ আত্মার স্বরূপভূত যে, পরব্রহ্ম, তিনি "তৎ সবিতুঃ" ইত্যাদি শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট হইয়াছেন। তত্র "ওঁ তৎ সৎ ইতি নির্দেশো ব্রহ্মণঃ ত্রিবিধঃ স্মৃতং" (গীতা) ইতি তৎ-শব্দেন প্রত্যগ্‌ভূতং স্বতঃসিদ্ধং পরং ব্রহ্মোচ্যতে।—অর্থাৎ গীতোক্ত বচন অনুসারে তৎ-শব্দ দ্বারা প্রতিশরীরস্থ স্বতঃসিদ্ধ পরব্রহ্মকে বুঝাইতেছে।

"সবিতুঃ ইতি সৃষ্টিস্থিতিলয়লক্ষণস্য সর্ব্ব-প্রপঞ্চস্য সমস্তদ্বৈতবিভ্রমস্য অধিষ্ঠানম্ লক্ষ্যতে।" "সবিতুঃ"-পদ দ্বারা সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় যাঁহার লক্ষণ সেই সর্ব্বপ্রপঞ্চের ও সমস্ত দ্বৈতভ্রমের

প্রণব-মহাব্যাহৃতি ও গায়ত্রীশিরঃ-সমন্বিত গায়ত্রীর মুখ্যার্থ এইভাবে করা যায়:

(যিনি) ওঁ (তিনিই) ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ-রূপে প্রকাশিত। (বেদে যাঁহাকে "তৎ" শব্দ দ্বারা প্রকাশ করা হইয়াছে) তিনি দীপ্তিমান্ সবিতারও সম্ভজনীয়, সেই দেবতার ভর্গ (জ্যোতি বা জ্ঞান) আমরা ধ্যান করি (বা ধারণ করি)। যাঁহার অনন্ত ধী হইতে সসীম ধী প্রবাহিত, তিনি আপঃ (সর্বব্যাপী), তিনি জ্যোতিঃ (জ্ঞান), তিনি রস (রসো বৈ সঃ—উপনিষৎ), তিনি অমৃত, তিনি ব্রহ্ম, তিনি ভূঃ-ভুবঃ-স্বঃ-রূপে প্রকাশিত ওম্।

বেদের অর্থ

বেদের অর্থ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। শ্রীঅরবিন্দের মতে বেদের মধ্যে এমন অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায়, যাহা হইতে মনে হয় যে, বেদ গুহ্যবাদ ও দার্শনিক মতে পূর্ণ। তাঁহার মতে বৈদিক দেবতাগণ মানসিক ক্রিয়ার (Psychological functions) প্রতীক; সূর্য্য বুদ্ধির প্রতীক, অগ্নি ইচ্ছার প্রতীক, এবং সোম অনুভূতির প্রতীক; এবং প্রাচীন গ্রীসের অর্‌ফিক এবং এলিউসিনীয় মতের ন্যায় একটি গুহ্য ধর্ম্ম বেদে প্রকাশিত। মানব-চিন্তার আদিম অবস্থার কিঞ্চিৎ পরিচয় অর্‌ফিক এবং এলিউসিনীয়

অধিষ্ঠান যে ব্রহ্ম তিনিই লক্ষিত হইতেছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে শংকর সবিতা-শব্দ ব্রহ্ম অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

"বরেণ্যমিতি সর্ববরণীয়ম্, নিরতিশয়ানন্দরূপম্"—'বরেণ্য' পদ সকলের বরণীয়, অসীম আনন্দ বাচক।

"ভর্গ ইতি অবিদ্যাদোষ-ভর্জনাত্মক-জ্ঞানৈক-বিষয়ত্বম্"—'ভর্গ' শব্দ দ্বারা অবিদ্যানাশক আত্মজ্ঞানের বিষয়ত্ব লক্ষিত হইতেছে।

"দেবস্ত ইতি সর্বদ্যোতনাত্মক-অখণ্ড-চিদেক রসম্"—"দেবস্ত" শব্দের অর্থ সর্ব্বপ্রকাশক অখণ্ড একরস 'ব্রহ্মের'।

"সবিতুঃ দেবস্ত ইত্যত্র ষষ্ঠ্যর্থো 'রাহোঃ শিরো'বৎ ঔপচারিকঃ"।—শির ভিন্ন রাহুর অন্য অঙ্গ নাই। তবু "রাহুর শির" বলা হয়। রাহুর শিরই রাহু। তেমনি "সবিতুর্দেবস্ত" এখানে যে ষষ্ঠী বিভক্তি তাহা ঔপচারিক। সবিতা ও ভর্গ একই।

"বুদ্ধ্যাদি-সর্ব্ব-দৃশ্য-সাক্ষি-লক্ষণং যৎ মে স্বরূপং তৎ সর্বাধিষ্ঠানভূতং পরমানন্দং নিরস্ত-সমস্তা-নর্থরূপং স্বপ্রকাশং চিদাত্মকং ব্রহ্ম ইত্যেবং ধীমহি ধ্যায়েম"—ইহাই শঙ্করের মতে গায়ত্রীর অর্থ: আমার যে স্বরূপ বুদ্ধি-আদি সমস্ত দৃশ্য বস্তুর সাক্ষী, তাহা সর্বাধিষ্ঠানভূত পরমানন্দ নিরস্তসমস্তা-নর্থ স্বপ্রকাশ চিৎস্বরূপ ব্রহ্ম—ইহাই ধ্যান করি।

গুহ্যবাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল। বর্ত্তমানে ঋগ্বেদই তাহার একমাত্র ঐতিহাসিক লিখিত প্রমাণ। আধ্যাত্মিক এবং মনস্তাত্বিক মানবীয় জ্ঞান কি জন্য স্থুল জড় মূর্ত্তি ও প্রতীকরূপ যবনিকার অন্তরালে সাধারণ লোকের অনধিগম্য করিয়া কেবলমাত্র দীক্ষিতদিগের বোধগম্য করিয়া রাখা হইয়াছিল, বর্ত্তমানে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। গুহ্যবাদিগণের মতে আত্মতত্ত্ব ও দেবতত্ত্বের জ্ঞান অতিগুহ্য, সাধারণ বুদ্ধির অগম্য। অসংস্কৃত সাধারণ মনের নিকট এই জ্ঞান প্রকাশিত হইলে ইহার অসৎ ব্যবহার এবং ফলে ধর্ম্মহানি সম্ভবপর। এইজন্য ঋষিগণ দুই প্রকার উপাসনার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন—একটি বাহ্য, সাধারণের জন্য, নির্দোষ না হইলেও ফলদায়ক। অন্যটি আন্তর—দীক্ষিতদিগের জন্য। তাঁহাদের ভাবপ্রকাশের জন্য তাঁহারা যে সকল শব্দের এবং কাল্পনিক রূপের ব্যবহার করিয়াছিলেন, দীক্ষিতগণ আধ্যাত্মিক অর্থেই তাহাদিগকে বুঝিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণ উপাসকগণ তাহাদিগকে স্থুল অর্থে গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রীঅরবিন্দের এই মত ডাক্তার রাধাকৃষ্ণণ গ্রহণ করেন নাই। কেননা পূর্ব্ব-মীমাংসা এবং সায়নভাষ্যের সহিত এই মতের সামঞ্জস্য নাই। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণও এইভাবে বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করেন নাই। সর্ব্বোত্তম আধ্যাত্মিক সত্য বেদমন্ত্রে নিহিত আছে, কিন্তু বুঝিতে না পারিয়া ভারতীয় চিন্তা তাহা হইতে ক্রমশঃ দূরে সরিয়া আসিয়াছে, ইহা সম্ভবপর নহে। বেদের পরবর্ত্তী ধর্ম্ম ও দর্শনসকল প্রাচীনকালের স্থূল ইঙ্গিত ও সুনীতির প্রাথমিক ধারণা এবং আধ্যাত্মিক আস্পৃহা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, ইহা মনে করাই সহজ। মানবচিন্তার বিকাশের সাধারণ প্রকৃতি-সম্বন্ধে যাহা জানা গিয়াছে, তাহার সহিত এই ধারণার সামঞ্জস্য আছে।*

শঙ্কর গায়ত্রী-শিরের ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

"আপো জ্যোতিঃ রসোঽমৃতং ব্রহ্ম ভূর্ভুবঃ স্বঃ ওম্"। আপঃ=আপ্নোতি (ব্যা.প্রাপ্তি) অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী। জ্যোতিঃ=প্রকাশস্বরূপ। রসঃ=সর্ব্বোৎকৃষ্ট। অমৃতং=সংসার-নির্মুক্ত। ভূর্ভুবঃ স্বঃ=সৎ-চিৎ-আনন্দস্বরূপ। সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানস্বরূপ সর্ব্বোৎকৃষ্ট নিত্যমুক্ত ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ওঁ। তিনিই আমি।

শঙ্করের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করা হউক বা না হউক, বেদের যে অদ্বৈতবাদ পুরুষসূক্তে এবং উপনিষদে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত, তাহাই যে গায়ত্রীতেও প্রতিফলিত, তাহাতে সন্দেহ নাই।

* Vide Indian Philosophy by Radhakrishnan. Vol I. P. 69-70.

২

ব্রাহ্মণ

বেদের "ব্রাহ্মণ" ভাগ সংহিতার পরবর্ত্তী। এই ভাগে যাগযজ্ঞের পদ্ধতি বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ এবং শতপথ ব্রাহ্মণ "ব্রাহ্মণ"-দিগের মধ্যে প্রধান। ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের কথা আছে। ব্রাহ্মণযুগে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, যাগযজ্ঞের গুরুত্বও বৰ্দ্ধিত হয়, বেদের সনাতনত্ব কীর্ত্তিত হয়।

সংহিতাযুগে প্রত্যেক গৃহস্থ নিজেই তাঁহার পুরোহিত ছিলেন, স্বতন্ত্র পুরোহিত-শ্রেণীর সৃষ্টি হয় নাই। ঋকমন্ত্রগুলি যখন রচিত হয়, তখনও যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। সে যজ্ঞ প্রত্যেক গৃহস্থ নিজেই সম্পন্ন করিতেন। কিন্তু যজ্ঞের জটিলতা ক্রমেই বৰ্দ্ধিত হইতে থাকে এবং নানা বিধি উদ্‌ভাবিত হয়। এই সকল বিধি অধিগত করিবার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন হইল, এবং একজনের পক্ষে বিধি-অনুসারে যজ্ঞ সম্পাদন করা অসম্ভব হইয়া পড়িল। প্রত্যেক যজ্ঞে অন্ততঃ চারিজন পুরোহিতের প্রয়োজন উপলব্ধ হইল। ইহার ফলেই পুরোহিত-সম্প্রদায়ের উদ্‌ভব হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণভাগে কয়েকটি নূতন দেবতার নাম পাওয়া যায় এবং প্রাচীন দেবতাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হয়। ঋগ্বেদে রুদ্র দেবতার প্রকৃতি ছিল ভীষণ। কিন্তু "ব্রাহ্মণে" তাঁহার মঙ্গলময় রূপ প্রকটিত হয়। যজুর্ব্বেদে বিষ্ণুর উল্লেখ আছে। শতপথ ব্রাহ্মণে তাঁহাকেই "যজ্ঞ" বলা হয়। এই ব্রাহ্মণে নারায়ণের উল্লেখও আছে, কিন্তু বিষ্ণুর সহিত তাঁহার অভিন্নতা ব্যক্ত হয় নাই। ঋগ্বেদের প্রজাপতি "ব্রাহ্মণে" জগতের স্রষ্টা বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। ঋগ্বেদে ঋকমন্ত্র অথবা স্তোত্রকেই "ব্রহ্ম" বলা হইয়াছে। "ব্রাহ্মণে" ব্রহ্মশব্দ জগতের স্রষ্টৃ-শক্তি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণ" ভাগে মন্ত্রশক্তিতে দৃঢ় বিশ্বাস দেখিতে পাওয়া যায়। মন্ত্র যথাযথ উচ্চারিত হইলে তাহার দ্বারা নির্দ্দিষ্ট ফলপ্রাপ্তি অবশ্যম্ভাবী। দেবগণ যজ্ঞদ্বারা অমর হইয়াছিলেন। যজ্ঞ করিয়া অমর হইবার আকাঙ্ক্ষাতেই এবং পার্থিব সম্পৎলাভের উদ্দেশে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইত। বিশ্ব-জগৎ যজ্ঞকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। যজ্ঞ অনুষ্ঠিত না হইলে সূর্য্য উদিত হইবে না। একশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারিলে ইন্দ্রকেও স্বর্গরাজ্য হইতে বিচ্যুত করিতে পারা যায়। দেবগণ যজ্ঞে তুষ্ট হইয়া অভিলষিত ফল প্রদান করেন। পূর্ব্বে যজ্ঞ উপাসনার একটি

অঙ্গমাত্র ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণযুগে যজ্ঞই প্রধান হইয়া দাঁড়ায়। ইহার ফলে সমাজে পুরোহিতদিগের মর্য্যাদা-বৃদ্ধি হয়, এবং পৌরোহিত্য বংশানুক্রমিক বৃত্তিতে পরিণত হয়। যজমান যজ্ঞের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও উপকরণ সরবরাহ করিতেন। অবশিষ্ট যাহা কিছু, তাহা করিতেন পুরোহিতগণ। পুরোহিতগণ দেবতার সম্মান দাবি করিতেন। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে, "দুই প্রকারের দেবতা আছেন—দেবতারা তো দেবতাই বটেন, যাঁহারা বেদবিৎ ও বেদ শিক্ষা দেন, তাঁহারাও দেবতা"।

কিন্তু পুরোহিত ব্রাহ্মণদিগের মর্য্যাদাবৃদ্ধির প্রধান কারণ বৈদিক সাহিত্যের সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা। ব্রাহ্মণদিগের উপর এই ভার ন্যস্ত ছিল। তাঁহারা সমগ্র বেদ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। প্রত্যেক ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদাধ্যয়ন অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বহুদিন ধরিয়া ব্রাহ্মণ-সন্তানকে বেদবিদ্যা আয়ত্ত করিতে হইত। পার্থিব সুখসম্পদের দ্বার তাহাদের নিকট রুদ্ধ ছিল। এই কর্ত্তব্য ব্রাহ্মণগণ যে সুষ্ঠুভাবে পালন করিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মণযুগে বেদের সনাতনত্ব ও অপৌরুষেয়ত্ব বিনা প্রতিবাদে স্বীকৃত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী কালে ইহা অস্বীকৃত হয় এবং দর্শনশাস্ত্র আস্তিক ও নাস্তিক দুইভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। কিন্তু "ব্রাহ্মণ"যুগে কেহই ইহা অস্বীকার করে নাই। বেদের অপৌরুষেয়ত্বের বিভিন্ন ব্যাখ্যা শাস্ত্রকারগণ দিয়াছেন। বৈদিক ঋষিগণ আপনাদিগকে সত্যের দ্রষ্টা বলিতেন, বৈদিক মন্ত্রসকল তাঁহাদের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল, এবং তাঁহারা মানস চক্ষুতে তাহাদিগকে দর্শন করিয়াছিলেন, বলিতেন। যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে তাঁহারা বেদের সত্য লাভ করেন নাই। এই অর্থেই তাঁহারা বেদকে অপৌরুষেয় বলিতেন। অপ্রাকৃত কিছু ইহার মধ্যে আছে বলিতেন না। ব্রাহ্মণযুগে বেদের প্রতি শ্রদ্ধা বর্দ্ধিত হয়, এবং বেদ অভ্রান্ত ও পবিত্র গ্রন্থ বলিয়া স্বীকৃত হয়। শতপথব্রাহ্মণে (এবং পুরুষসূক্তে) বেদকে স্বয়ম্ভূ হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় নির্গত বলা হইয়াছে। ঈশ্বরই বেদ ঋষিদিগের নিকট প্রকাশ করিয়াছেন, এই মতও পরে ব্যক্ত হইয়াছিল। বেদসম্বন্ধে এই ধারণাদ্বারা ভারতীয় দর্শন বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। বেদের সঙ্গে সংগতি-রক্ষার জন্য বেদবচনের বিভিন্ন ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল।

"ব্রাহ্মণে" চরিত্র-নীতি

ব্রাহ্মণে গৃহস্থের কর্ত্তব্য বলিয়া যাহা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা অতি উন্নত নৈতিকবোধের পরিচায়ক। প্রত্যেক মানুষেরই ঋষি, দেবতা, ভূত, মনুষ্য ও পিতৃগণের প্রতি কর্ত্তব্য আছে। এই কর্ত্তব্য 'ঋণ' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই ঋণ পরিশোধ করিয়াই মানুষ জগতের সহিত শান্তিরক্ষা করিয়া বাস করিতে সমর্থ হয়। বেদাধ্যয়নদ্বারা ঋষিঋণ, যজ্ঞদ্বারা দেবঋণ, তর্পণ ও শ্রাদ্ধ দ্বারা পিতৃঋণ, এবং জীবে দয়াদ্বারা মনুষ্য-ও-ভূত-ঋণের পরিশোধ হয়। মানুষের অধিকারের দিকে "ব্রাহ্মণে"র ঋষিদিগের ততটা দৃষ্টি ছিল না, যতটা ছিল তাহার কর্ত্তব্য ও দায়িত্বের দিকে। সত্যকে তাঁহারা মানুষের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। ত্যাগ তাঁহাদের মতে পরম ধর্ম্ম। শতপথ ব্রাহ্মণে সর্ব্বমেধযজ্ঞে সর্ব্বস্বত্যাগের মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। কেবল যাগযজ্ঞ ধর্ম্ম নহে। সৎকর্ম্ম এবং উপাসনাই ধর্ম্ম। পরদার-গমন ভয়ানক পাপ এবং পাপের স্বীকার পাপক্ষয়ের একটি উপায় বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সত্য, পবিত্রতা, পিতৃমাতৃভক্তি, জীবে দয়া, চৌর্য্য ও নরহত্যা এবং পরদারগমন হইতে নিবৃত্তি ধর্ম্মজীবনের জন্য অপরিহার্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যজ্ঞে পশুবধের বিধি থাকিলেও, অন্যত্র জীবহিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে।

কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদ ঋষিদিগের নৈতিকবোধের প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক কর্ম্মেরই শুভ অথবা অশুভ ফল আছে। ইহজন্মে সে ফলভোগ না হইলে জন্মান্তরে হয়। অধ্যাপক ডয়সেন বলেন, ঋগ্বেদ সংহিতায় জন্মান্তরবাদের কোনও পরিচয়প্রাপ্ত হওয়া যায় না। কিন্তু ইহা ঠিক নহে। ঋগ্বেদ সংহিতায় জন্মান্তরবাদের ইঙ্গিত আছে। ঋগ্বেদের ৪।২৭।১ মন্ত্রে আছে, বামদেব ঋষি মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে বলিয়াছিলেন, "এই সকল দেবতার সমস্ত জন্ম আমি জানিয়াছি।" এই মন্ত্রের ব্যাখ্যায় শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন, "জন্মান্তরীণ সংস্কারশুদ্ধির ফলে বামদেব এইরূপ বলিয়াছিলেন।" উক্ত বেদের ৪।২৬।১ শ্লোকে আছে "আমি মনু হইয়াছি"। ঋষি পূর্ব্বজন্মে মনু হইয়াছিলেন, ইহাই ইহার অর্থ। শতপথব্রাহ্মণে জন্মান্তরবাদ স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে। জন্মান্তরবাদ যে বেদের সময় হইতে প্রচলিত আছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যজ্ঞে যে সকল মন্ত্রের ব্যবহার হইত ঋগ্বেদ সংহিতা

তাহাদেরই সংকলনমাত্র, ঋষিদিগের অধ্যাত্ম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংকলন নহে। আরণ্যক ও উপনিষৎ অংশে তাহা সংকলিত হইয়াছিল।*

পাপের শাস্তি অনন্ত-নরক-বাস এবং পুণ্যের পুরস্কার অনন্ত স্বর্গবাস নহে। পাপ ও পুণ্যের ফল, শাস্তি ও পুরস্কার, উভয়ই জন্মজন্মান্তরের ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এই জন্ম-মৃত্যু-চক্র হইতে মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি। আত্মার সত্যজ্ঞানদ্বারা এই মুক্তি লাভ হয়।

৩
উপনিষদ

জগৎ-সম্বন্ধে মানব-চিন্তা নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন যুগে মানুষ যেভাবে জগতের ব্যাখ্যা করিয়াছে, ভারতীয় উপনিষদে তাহার এক রূপ পরিস্ফুট। সামান্য প্রভেদ থাকিলেও বিভিন্ন উপনিষদে একই মত ব্যক্ত হইয়াছে। ঋষিদিগের চিন্তা তর্কশাস্ত্রের নিয়মানুসারে লিপিবদ্ধ হয় নাই, যুক্তিদ্বারাও তাহাদের মীমাংসা সমর্থিত হয় নাই।

হিন্দুদর্শনের প্রারম্ভেই প্রমাণের আলোচনা আছে,—আমরা কিরূপে জানি, তাহার বর্ণনা আছে। প্রথমে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া ভারতীয় দার্শনিকগণ দর্শনের আলোচনা আরম্ভ করেন। উপনিষদের ঋষিগণ প্রমাণের আলোচনা করেন নাই। যুক্তিবলেই হউক অথবা ধ্যানবলেই হউক, তাঁহারা যে সত্য লাভ করিয়াছিলেন, তাহা মানবের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বচনাবলী শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে সজ্জিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের প্রত্যেক বচনের মধ্যে আত্মপ্রত্যয়ের সুর ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা যে তাঁহাদের প্রচারিত সত্যের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন, পাঠকের সে-সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না। ইয়োরোপ প্রথমে যখন উপনিষদের পরিচয় লাভ করে, তখন বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল। উপনিষদের পারসীক ভাষায় অনুবাদ পাঠ করিয়া জার্ম্মাণ দার্শনিক সোপেনহর বলিয়াছিলেন, "সমগ্র জগতে যত বিদ্যা আছে, তাহাদের মধ্যে "ঔপনেখদে"র (উপনিষদের পারসীক অনুবাদ) ন্যায় উপকারী ও মনের উন্নতিবিধায়ক

* হীরেন্দ্র নাথ দত্তের উপনিষৎ—জড় ও জীবতত্ত্ব ৪২৪-৪২৭ দ্রষ্টব্য।

কোনও বিদ্যা নাই। ইহা আমার জীবনে সান্ত্বনা দিয়াছে, মৃত্যুতেও সান্ত্বনা দিবে।" এই উক্তি উদ্ধৃত করিয়া মাক্সমূলার লিখিয়াছেন, "সোপেনহর গুহ্য ও অস্পষ্ট চিন্তার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিবার লোক ছিলেন না। আমিও একথা বলিতে ভীত ও লজ্জিত নহি যে, বেদান্ত-সম্বন্ধে তাঁহার উৎসাহপূর্ণ মনোভাব আমিও পোষণ করি এবং জীবনপথে বেদান্ত হইতে প্রচুর সাহায্য-লাভের জন্য আমিও ইহার নিকট কৃতজ্ঞ। দেশরক্ষা অথবা দেশশাসন, অর্থসঞ্চয় অথবা পাথর ভাঙ্গিবার কার্য্যে সক্রিয় ভাবে আত্মনিয়োগের জন্য আহ্বান সকলের নিকট আসে না। চিন্তাশীল, শান্ত ও সমাহিত জীবন-যাপনের জন্য লোককে উপযুক্ত করিবার বেদান্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কোনও উপায়ের কথা আমি জানি না।" অধ্যাপক জে, এস, ম্যাকেন্‌জি লিখিয়াছেন, "উপনিষদে যে বাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাই বিশ্ব-সম্বন্ধে সংগঠনমূলক বাদ-প্রণয়নের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রচেষ্টা। সে-সম্বন্ধে যত মতবাদ আছে, ইহা তাহাদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক ও উল্লেখযোগ্য।" উপনিষদ-সম্বন্ধে ভিন্নমত পোষণ করেন গফ। তিনি বলেন, "উপনিষদে আধ্যাত্মিক বিষয় অতি অল্পই আছে। এই শূন্যগর্ভ বুদ্ধিজাত ধারণার (intellectual conception) মধ্যে আধ্যাত্মিকতা নাই। ভারতীয় মনের ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ।" গফের এই মত বিস্ময়ের উদ্রেক করে এবং তিনি আধ্যাত্মিকতা বলিতে কি বোঝেন, তাহা জানিতে কৌতূহল হয়। উপনিষদে যুক্তিবিহীন ভক্তির উচ্ছ্বাস নাই, ইহা সত্য। কিন্তু আত্মজ্ঞানই ইহার প্রধান আলোচ্য বিষয়। এই পরমাত্মা রসস্বরূপ। তাঁহাকে পাইবার জন্য প্রবল আগ্রহ ইহার সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়। আধ্যাত্মিকতা আর কাহাকে বলে?

উপনিষদে আলোচিত বিষয়

উপনিষদে প্রধান আলোচিত বিষয় আত্মা বা ব্রহ্ম। নানাভাবে নানা উপমা ও উপাখ্যানের সাহায্যে এই ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের প্রথম শ্লোক এই—

> কিং কারণং ব্রহ্ম, কুতঃ স্ম জাতাঃ,
> জীবাম কেন, ক্ব চ সম্প্রতিষ্ঠাঃ।
> অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু,
> বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাং।

কালঃ, স্বভাবো নিয়তি, র্যদৃচ্ছা,
ভূতানি যোনিঃ, পুরুষ ইতি চিন্ত্যম্।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবাৎ,
আত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ।

ব্রহ্মই কি এই জগতের কারণ (অথবা অন্য কিছু)? কোথা হইতে আমরা আসিলাম? কাহাদ্বারা বাঁচিয়া আছি, আমাদের প্রতিষ্ঠা (প্রলয়কালে) কোথায়? হে ব্রহ্মবেত্তাগণ, সুখ ও দুঃখে অধিষ্ঠিত হইয়া ব্যবস্থা করিয়া আমরা কি প্রকারে বর্ত্তমান আছি? কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতগণ অথবা পুরুষ, ইহাদের কে জগতের কারণ, তাহা চিন্তনীয়। এই সকলের সংযোগকে কারণ বলা যায় না, কেননা সংযোগ আত্মসাপেক্ষ। সুখ ও দুঃখের অধীন বলিয়া আত্মাও সৃষ্টিকার্য্যে অসমর্থ।

কেন উপনিষদে প্রথম প্রশ্নেই

"কেনেষিতং পততি প্রেষিতং মনঃ,
কেন প্রাণঃ প্রথমঃ প্রৈতি যুক্তঃ।
কেনেষিতং বাচমিমাং বদন্তি,
চক্ষুঃ শ্রোত্রং ক উ দেবো যুনক্তি?"

মন যখন তাহার বিষয়ে পতিত হয়, তখন কাহাকর্ত্তৃক প্রেরিত ও চালিত হয়? প্রথম প্রাণ কাহাকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া নিজ বিষয়ের দিকে গমন করে? কাহার প্রেরণায় বাক্য উচ্চারিত হয়? কোন্ দেবতা চক্ষু ও কর্ণকে নিজ নিজ বিষয়ে নিযুক্ত করেন? এখানে ঋষি শারীরিক ও মানসিক ব্যাপারের মূল কারণের অনুসন্ধান করিয়াছেন, সকল ব্যাপারের নিম্নে চরম তত্ত্বের অনুসন্ধান করিয়াছেন। যাহা চোখে পড়ে, যাহা প্রত্যক্ষ, তাহাতে সন্তুষ্ট হন নাই।

প্রশ্নোপনিষদের প্রথম প্রশ্ন "প্রাণীসকল কোথা হইতে উৎপন্ন হয়?" দ্বিতীয় প্রশ্ন "প্রাণীশরীর ধারণ করে কতসংখ্যক শক্তি?" তৃতীয় প্রশ্ন "প্রাণ কোথা হইতে উৎপন্ন হয়, কিরূপে শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে?" চতুর্থ প্রশ্ন "(নিদ্রাবস্থায়) জীবদেহে কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় স্ব স্ব কার্য্য হইতে উপরত এবং কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় জাগরিত থাকে? কোন্ শক্তি স্বপ্ন দেখে। সুখ ভোগ করে কে? কাহাতে সকল প্রতিষ্ঠিত?" পঞ্চম প্রশ্ন "মরণকাল পর্য্যন্ত ওঁকারের ধ্যান করিলে কোন্ লোক প্রাপ্ত হওয়া যায়?" ষষ্ঠ প্রশ্ন (ষোড়শ কলা যুক্ত) পুরুষ সম্বন্ধে।

কঠোপনিষদে নচিকেতা মৃত্যুর পরে কি হয়, যমকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, এবং যম শ্রেয়ঃ ও প্রেয়ঃ সম্বন্ধে উপদেশ দিতেছেন।

অমরত্ব কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়, ইহা সকল উপনিষদেরই আলোচ্য।

কিরূপে জগতের সৃষ্টি হইল, সৃষ্টির পূর্ব্বে কি ছিল, সৃষ্টির উপাদান কি, সকলই উপনিষদে আলোচিত হইয়াছে। জীবাত্মার জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত ও তুরীয়, এই চারি অবস্থার বিস্তারিত বর্ণনাও আছে।

উপনিষৎ এই জগৎকে আত্মা হইতে উদ্‌ভূত বলিয়াছেন। এই জগৎ পূর্ব্বে আত্মারূপেই বর্ত্তমান ছিল—আত্মা হইতেই তাহা নির্গত হইয়াছে। এই চৈতন্যবাদ উপনিষদের মূল কথা। এই জগৎ চৈতন্যস্বরূপ পরমাত্মা হইতে উদ্‌ভূত। "যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশ-লোমানি, তথা অক্ষরাৎ সম্ভবতি ইহ বিশ্বম্"। পুরুষ হইতে যেমন কেশ-লোমের উদ্‌ভব, তেমনি অক্ষর পুরুষ হইতে বিশ্বের উদ্‌ভব। বিশ্ব স্বরূপে পুরুষের সজাতীয়। "যিনি সর্ব্বভূত আত্মাতে দর্শন করেন এবং সর্ব্বভূতে আত্মাকে দর্শন করেন, তিনি কিছুই ঘৃণা করেন না।" ব্রহ্ম বিশ্বরূপ। এই সর্ব্বেশ্বরবাদ উপনিষদের সর্ব্বত্র ব্যক্ত। কিন্তু এই সর্ব্বেশ্বরবাদের প্রকার-ভেদ আছে। অতি প্রাচীন কাল হইতে উপনিষদের বহু ভাষ্য রচিত হইয়াছে। তাহাদের অনেকগুলির বিলোপ হইয়াছে। বর্ত্তমান কালে যে সকল ভাষ্য পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যে শঙ্করাচার্য্য প্রণীত ভাষ্যই প্রধান। ইয়োরোপীয় পণ্ডিতগণ এই ভাষ্যকেই উপনিষদের খাঁটি ব্যাখ্যা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। Philosophy of the Upanishads গ্রন্থের রচয়িতা গফ্ বলেন, "উপনিষৎ দর্শনের শ্রেষ্ঠতম ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য। শঙ্করের ব্যাখ্যাই উপনিষদের স্বাভাবিক এবং যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা।" মাক্সমূলার বলেন, "বেদান্তের প্রকৃত মত অভিব্যক্তি নহে (Evolution), তাহা বিবর্ত্ত (illusion); ব্রহ্মের পরিণাম প্রচলিত মতের বিরোধী। বিবর্ত্তবাদই প্রচলিত বেদান্ত (orthodox)। প্রচলিত বেদান্ত মতে, বীজ হইতে যেরূপ বৃক্ষ বহির্গত হয়, বিশ্ব সেইরূপ ব্রহ্ম হইতে বহির্গত হয় নাই। সূর্য্যরশ্মি হইতে যেরূপ মরীচিকার সৃষ্টি হয়, জগৎও তেমনি ব্রহ্ম হইতে উদ্‌ভূত হয়। ডয়সেনও এই মত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু এ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে সম্বন্ধ-বিষয়ে শঙ্কর ও রামানুজের মধ্যে প্রচুর পার্থক্য বর্ত্তমান। রামানুজের মতে জীবাত্মা ব্রহ্মের সজাতীয়, ব্রহ্মের অংশ। "সুদীপ্ত পাবক হইতে যেরূপ সহস্র সহস্র সজাতীয় স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই গমন করে।" "সর্ব্বদা সহযোগী

ও সখ্য বদ্ধ দুই পক্ষী (পরমাত্মা ও জীব) একই বৃক্ষ (দেহ) আশ্রয় করিয়া বর্ত্তমান।" উপনিষদে এইরূপ বহু শ্লোক আছে, যাহাতে ব্রহ্ম হইতে জীবের পার্থক্য স্বীকৃত হইয়াছে। শঙ্কর এই সকল শ্লোকের অদ্বৈত মতে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু স্থানে স্থানে সে ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত বলিয়া মনে হয়।

বেদের ঋষিগণ, প্রধানতঃ প্রকৃতির মধ্যে যে সকল শক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদিগের কথাই বলিয়াছিলেন; কিন্তু উপনিষদের ঋষিগণ মানুষের অন্তরের মধ্যে যে চিৎশক্তি বর্ত্তমান, মুখ্যতঃ তাহার দিকেই বদ্ধদৃষ্টি ছিলেন। "স্বয়ম্ভূ মানুষের ইন্দ্রিয়দিগকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য মানুষ বিপরীত দিকে (বহির্দিকে) দৃষ্টিপাত করে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কোন কোন বাহ্য-বিষয়-বিনিবৃত্ত-চক্ষু জ্ঞানী ব্যক্তি প্রত্যক্ আত্মাকে দেখিয়াছেন।" এই প্রতি হৃদয়ে অধিষ্ঠিত প্রত্যক্ আত্মা ও বাহির বিশ্বের আত্মারূপে বর্ত্তমান পরমাত্মা স্বরূপে এক। উভয়ের মধ্যে ঐকান্তিক অভিন্নতা অথবা ভেদ আছে, তাহা বিভিন্ন ভাষ্যকার বিভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। হৃদয়গুহাশায়ী আত্মার পরিচয় প্রাপ্ত হইবার পরে যাগযজ্ঞদ্বারা দেবগণের পূজা অপেক্ষা আত্মার উপাসনা অধিকতর গুরুত্ব লাভ করিয়াছিল।

"এই জগৎ অগ্রে অসৎ (নাম-রূপ-বিশেষত্বহীন অব্যক্ত রূপে) ছিল। সেই অসৎ হইতে ব্যক্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছিল।" "তিনি রসস্বরূপ। এই রস প্রাপ্ত হইয়া লোকে আনন্দপ্রাপ্ত হয়। যদি হৃদয়াকাশে এই আনন্দস্বরূপ না থাকিতেন, তাহা হইলে কেই বা অপান ও প্রাণ কার্য্য করিত?" (তৈত্তিরীয়)।

এই আত্মা অন্তরে ও বাহিরে উভয়ত্র বর্ত্তমান থাকিলেও অন্তরেই তাহাকে খুঁজিতে হইবে। "দেহরূপ ব্রহ্মপুরে ক্ষুদ্র পদ্মাকার গৃহ-মধ্যে এক ক্ষুদ্র আকাশ আছে। সেই আকাশের মধ্যে যাহা, তাহাকে অন্বেষণ করিতে হইবে। সেই আকাশ পরিমাণে বাহিরের আকাশের সমান। দ্যাবাপৃথিবী ইহার অভ্যন্তরে নিহিত। অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র প্রভৃতি সকলই ইহার মধ্যে নিহিত। ইহাই ব্রহ্মপুর। দেহের জরা হইলে এই আকাশ জীর্ণ হয় না। দেহ নষ্ট হইলে ইহা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। ইনিই আত্মা, অপহতপাপ্মা, বিজর, বিমৃত্যু আত্মা।" (ছান্দোগ্য)।

সুখের স্বরূপ সম্বন্ধে উপনিষৎ (ছান্দোগ্য) বলেন, "যাহা ভূমা, তাহাই সুখ। যাহা অল্প, তাহাতে সুখ নাই। যেখানে অন্য কিছু দেখা যায় না,

অন্য কিছু শোনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা। ভূমা নিম্নে, ঊর্দ্ধে, পশ্চাতে, সম্মুখে, দক্ষিণে, উত্তরে। ভূমাই এই সমস্ত। (ভূমা ও আমি এক) আমিই অধঃতে, আমিই ঊর্দ্ধে, আমিই সম্মুখে, আমিই পশ্চাতে। আমিই উত্তরে, আমিই দক্ষিণে। আমিই এই সকল। আত্মাই ঊর্দ্ধে, অধঃতে ইত্যাদি। আত্মাই এই সকল।"

জীব ও ব্রহ্ম যে অভিন্ন, এখানে তাহা উক্ত হইয়াছে।

বেদের মধ্যে উপনিষদের স্থান

বেদের ব্রাহ্মণ-অংশের শেষ ভাগের নাম আরণ্যক। প্রাচীন উপনিষৎগুলির অধিকাংশই ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তর্ভুক্ত। সাধারণতঃ প্রত্যেক আরণ্যকের শেষে একটি করিয়া উপনিষৎ আছে। কিন্তু অধিকাংশ উপনিষৎ ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তর্ভুক্ত হইলেও কোনও কোনও উপনিষৎ মন্ত্রভাগের মধ্যেও সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। ঈশ-উপনিষৎ শুক্ল-যজুর্ব্বেদ-সংহিতার (মন্ত্রভাগের) অন্তর্ভুক্ত। কঠোপনিষৎও যজুর্ব্বেদের কঠ-শাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়।

উপনিষৎকে দর্শন বলা যায় কিনা ?

সোয়েগ্‌লার বলিয়াছেন, যেখানে এবং যে সময়ে একটি চরম তত্ত্বের এবং যাবতীয় সত্ত্বার চরম ভিত্তির অনুসন্ধান দার্শনিক উপায়ে করা হইয়াছিল, সেইখানে এবং সেই সময়েই দর্শনের আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার মতে গ্রীস দেশে থালিশ্‌কর্ত্তৃকই উক্ত উপায়ে ঐ অনুসন্ধান প্রথমে আরব্ধ হয়। কিন্তু থালিশের বহু পূর্ব্বেই ভারতীয় ঋষিগণ যে চরম তত্ত্বের ও সত্ত্বার চরম ভিত্তির অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, উপনিষৎ পাঠ করিলে তাহাতে সন্দেহ থাকে না। সেই অনুসন্ধানের ফলে তাঁহারা যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের বহু কাল পরে অনেক পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক সেই মীমাংসাতে উপনীত হইয়াছেন। কিন্তু কোন্ উপায়ে কোন্ যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা সেই মীমাংসায় পৌঁছিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ তাঁহারা দিয়া যান নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে "শ্বেতাশ্বতর তপঃপ্রভাবে এবং দেব-প্রসাদে ঋষিগণ-সেবিত ব্রহ্মকে অবগত হইয়া আশ্রমিগণ সমীপে তাঁহাকে কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।" (৬।২১)। এখানে শ্বেতাশ্বতরের অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকেই তাঁহার ব্রহ্মবাদের ভিত্তি বলা হইয়াছে। উক্ত উপনিষদের প্রথমেই আছে, "ঋষিগণ ধ্যানযোগ-পরায়ণ হইয়া স্বগুণ অর্থাৎ স্ব-সৃষ্ট বিষয়দ্বারা প্রচ্ছন্ন ঈশ্বরের আত্মভূত শক্তিকে

দর্শন করিয়াছিলেন (১৩)। ইহা হইতে প্রতীত হয়, যে উপনিষদের ঋষিগণ অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ বিষয়ের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন এবং ব্রহ্ম-বিষয়ে তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহারা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। আধুনিক দর্শনে অতীন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের স্থান নাই। কিন্তু অতীন্দ্রিয় ও অতি-মানস অনুভূতিই উপনিষদের ভিত্তি। এই অনুভূতির স্থান যদি দর্শনে না থাকে, তাহা হইলে উপনিষৎকে দর্শন বলা চলে না, রহস্য-মূলক (Mystic) শাস্ত্র বলিতে হয়। কিন্তু ঐন্দ্রিয়িক হউক অথবা অতীন্দ্রিয় হউক, উপনিষদের ঋষিদিগের অনুভূতি অন্য দেশের সাধকদিগেরও হইয়াছে, এবং সে অনুভূতিকে অগ্রাহ্য করিবার সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। যুক্তিদ্বারা লব্ধ না হইলেও, সেই অনুভূতিলব্ধ বিষয়ের সহিত যুক্তির বিরোধ নাই। সুতরাং উপনিষৎকে দর্শন না বলিবার কারণ নাই। ভারতীয় ষড়দর্শনে এই অনুভূতির প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে।

বৈদিক যুগেই ভারতীয় আর্য্য-সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। আর্য্য-বালকগণ ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রমে বেদের মন্ত্রভাগ বা সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। গৃহস্থাশ্রমে বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে গৃহস্থের জন্য উপদিষ্ট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত। প্রৌঢ় বয়সে গৃহ ছাড়িয়া বনে বাস করিতে হইত। তখন তাহাদিগকে আরণ্যক বলিত। বাণপ্রস্থ-আশ্রমে যাগ-যজ্ঞের প্রয়োজন ছিল না। তখন বেদের আরণ্যক অংশ পাঠ করিতে হইত। আরণ্যকে কায়িক যজ্ঞের স্থলে মানসিক যজ্ঞের বিধি আছে। বৃহদারণ্যকোপনিষদে অশ্বমেধ যজ্ঞের মানসিক অনুষ্ঠান বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বকেই অশ্বরূপে কল্পনা করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে। ঊষা এই অশ্বের মস্তক, সূর্য্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, বৈশ্বানর [অগ্নি] ইহার বিবৃত মুখ, সংবৎসর দেহ, দ্যৌঃ পৃষ্ঠ, অন্তরীক্ষ উদর, চারি দিক্ ইহার দুই পার্শ্ব, অবান্তর দিক সকল পার্শ্বাস্থি ইত্যাদি। আরণ্যকে মানসিক যজ্ঞ (ধ্যান) গৃহস্থাশ্রমে উপদিষ্ট যজ্ঞের স্থান গ্রহণ করিয়াছিল। সূর্য্য, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি জড় বস্তুকে যেমন, তেমনি দৈহিক ইন্দ্রিয়দিগকেও ধ্যানের বিষয়রূপে গ্রহণ করা হইয়াছিল। বর্ণমালার বর্ণদিগকেও ধ্যানের প্রতীকরূপে গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা ছিল।

বাণপ্রস্থাশ্রমের পরে ছিল সন্ন্যাস। এই আশ্রমাবলম্বী ভিক্ষু নামে অভিহিত হইতেন। ভিক্ষুদিগের পঠনীয় শাস্ত্রের নাম উপনিষৎ। উপনিষৎ বেদের শেষ ভাগ। এই জন্য তাহাদের নাম বেদান্ত। শঙ্করাচার্য্য বলেন, ব্রহ্মবিদ্যাই উপনিষৎ শব্দ-বাচ্য। সদ্ ধাতুর অর্থ নাশ করা। অজ্ঞান নাশ করিয়া মুক্তির সন্ধান দেয় বলিয়া ব্রহ্মবিদ্যার নাম উপনিষৎ। কিন্তু সদ্ ধাতুর

অর্থ "যাওয়া"ও (অথবা পাওয়া) হয়। উপ উপসর্গের অর্থ "সমীপে।" গুরুর সমীপে গমন করিয়া তাঁহার নিকট হইতে যে বিদ্যালাভ করা যায়, তাহাকেও উপনিষৎ বলা যায়। মাক্ষমূলার এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। ডয়সেনের মতে উপনিষৎ শব্দের অর্থ গুপ্ত বিদ্যা। উপনিষৎ বিদ্যা সকলকে দান করিতে নিষেধ আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে এই বিদ্যাকে পরম গুহ্য বলা হইয়াছে, এবং "অপ্রশান্ত", "অপুত্র" (অযোগ্য পুত্র) এবং অশিষ্যকে (অযোগ্য শিষ্যকে) দিতে নিষেধ করা হইয়াছে।

উপনিষদের সংখ্যা

উপনিষদের সংখ্যা ১০৮ বলিয়া কথিত আছে। কিন্তু ১১২ খানা উপনিষৎ বোম্বাই হইতে প্রকাশিত হইয়াছে।* তাহাদের নাম পাদটীকায় লিখিত হইল।

---

* ১। ঈশ, ২। কেন, ৩। কঠ, ৪। প্রশ্ন, ৫। মুণ্ডক, ৬। মাণ্ডুক্য, ৭। তৈত্তিরীয়, ৮। ঐতরেয়, ৯। ছান্দোগ্য, ১০। বৃহদারণ্যক, ১১। শ্বেতাশ্বতর, ১২। কৌষীতকি, ১৩। মৈত্রেয়ী, ১৪। কৈবল্য, ১৫। জাবাল, ১৬। ব্রহ্মবিন্দু, ১৭। হংস, ১৮। আরুণিক, ১৯। গর্ভ, ২০। নারায়ণ (পূর্ব্ব), ২১। পরমহংস, ২২। নারায়ণ (উত্তর), ২৩। ব্রহ্ম, ২৪। অমৃতনাদ, ২৫। অথর্ব্বশিরঃ, ২৬। অথর্ব্বশাখা, ২৭। মৈত্রায়ণী, ২৮। বৃহৎ জাবাল, ২৯। নৃসিংহ পূর্ব্বতাপিনী, ৩০। নৃসিংহোত্তর-তাপিনী, ৩১। কালাগ্নিরুদ্র, ৩২। সুবাল, ৩৩। ক্ষুরিকা, ৩৪। যন্ত্রিকা, ৩৫। সর্ব্বসার, ৩৬। নিরালম্ব, ৩৭। শুকরহস্য, ৩৮। বজ্রসূচিকা, ৩৯। তেজোবিন্দু, ৪০। নাদবিন্দু, ৪১। ধ্যানবিন্দু, ৪২। ব্রহ্মবিদ্যা, ৪৩। যোগতত্ত্ব, ৪৪। আত্মবোধ, ৪৫। নারদপরিব্রাজক, ৪৬। ত্রিশিখি-ব্রাহ্মণ, ৪৭। সীতা, ৪৮। যোগ-চূড়ামণি, ৪৯। নির্ব্বাণ, ৫০। মণ্ডল ব্রাহ্মণ, ৫১। দক্ষিণা-মূর্ত্তি, ৫২। শরভ, ৫৩। স্কন্দ, ৫৪। ত্রিপাদ-বিভূতি-মহানারায়ণ, ৫৫। অদ্বয়-তারক, ৫৬। রামরহস্য, ৫৭। রামপূর্ব্বতাপিনী, ৫৮। রামোত্তরতাপিনী, ৫৯। বাসুদেব, ৬০। মুদ্গল, ৬১। শাণ্ডিল্য, ৬২। পৈঙ্গলঃ, ৬৩। ভিক্ষুক, ৬৪। মহ, ৬৫। শারীরক, ৬৬। যোগশিখা, ৬৭। তুরীয়াতীত, ৬৮। সন্ন্যাস, ৬৯। পরমহংস পরিব্রাজক, ৭০। অক্ষমালা, ৭১। অব্যক্ত, ৭২। একাক্ষর, ৭৩। অন্নপূর্ণা, ৭৪। সূর্য্য, ৭৫। অক্ষি, ৭৬। অধ্যাত্ম, ৭৭। কুণ্ডিকা, ৭৮। সাবিত্রী, ৭৯। আত্মন্, ৮০। পাশুপত-ব্রহ্ম, ৮১। পরব্রহ্ম, ৮২। অবধূত, ৮৩। ত্রিপুরাতাপিনী, ৮৪। দেবী, ৮৫। ত্রিপুরা, ৮৬। কঠরুদ্রঃ, ৮৭। ভাবনা, ৮৮। রুদ্রহৃদয়, ৮৯। যোগকুণ্ডলী, ৯০। ভস্ম জাবাল, ৯১। রুদ্রাক্ষ জাবাল, ৯২। গণপতি, ৯৩। জাবালদর্শন, ৯৪। তারসার, ৯৫। মহাবাক্য, ৯৬। পঞ্চব্রহ্ম, ৯৭। প্রাণাগ্নিহোত্র, ৯৮। গোপালপূর্ব্বতাপিনী, ৯৯। গোপালোত্তর-তাপিনী, ১০০। কৃষ্ণ, ১০১। যাজ্ঞবল্ক্য, ১০২। বরাহ, ১০৩। শাট্যায়নী, ১০৪। হয়গ্রীব, ১০৫। দত্তাত্রেয়, ১০৬। গরুড়, ১০৭। কালিসন্তরণ, ১০৮। জাবালি, ১০৯। সৌভাগ্য লক্ষ্মী, ১১০। সরস্বতীরহস্য, ১১১। বহ্বৃচ, ১১২। মুক্তিক।

মুক্তিক উপনিষদে ১০৮খানা উপনিষদের নাম আছে। দারা সেকো (সাজাহানের পুত্র) আর্য্যদর্শনের অনুরাগী ছিলেন। তিনি ৫০খানা উপনিষদের ফার্সীভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন।

উপনিষদের কাল-নির্ণয়

উপনিষৎগুলির রচনার কাল-নির্ণয় করা কঠিন। কতকগুলির ভাষা প্রাচীন, কতকগুলির ভাষা অপেক্ষাকৃত পরবর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। উপরি উক্ত তালিকার প্রথম ১০খানি উপনিষৎ যে অন্যান্যগুলির পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। পরবর্ত্তী উপনিষদগুলির অধিকাংশেই প্রাচীন উপনিষদগুলিতে যাহা আছে, তাহাই পুনরুক্ত হইয়াছে। শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, বৃহৎ আরণ্যক, প্রশ্ন, মুণ্ডক ও মাণ্ডূক্য উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন। এইগুলি যে প্রাচীন উপনিষৎ, তাহাতে সন্দেহ নাই। কঠ উপনিষৎ ইহাদের মধ্যে অন্যান্য উপনিষদের পরবর্ত্তী বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদও তাহাদের পরবর্ত্তী। সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন উপনিষৎগুলি গদ্যে লিখিত। তাহারা যে বুদ্ধের জন্মের (খৃঃ পূঃ ৭ম শতাব্দী) পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কতকগুলি যে বুদ্ধের পরবর্ত্তী, তাহাও নিশ্চিত। খৃঃ পূঃ ১০০০ হইতে ৫০০ অব্দের মধ্যে প্রাচীন উপনিষৎগুলি রচিত হইয়াছিল। ইহাই অনেকের মত। অনেক উপনিষৎ চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতেও রচিত হইয়াছিল।

উপনিষদের শ্রেণী-বিভাগ

উপনিষৎগুলিকে কেহ কেহ চারি ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—বৈদিক, আর্ষ, সাম্প্রদায়িক ও কৃত্রিম। বেদের মন্ত্র, ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকের অঙ্গীভূত উপনিষদগুলি বৈদিক। ঈশ, কেন, কঠ, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, কৌষীতকি, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক বৈদিক। বৈদিক উপনিষৎগুলির অনুসরণ করিয়া প্রসিদ্ধ ঋষি-প্রণীত উপনিষৎ আর্ষ। শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি সাম্প্রদায়িকগণের রচিত উপনিষৎ সাম্প্রদায়িক। এই সকল উপনিষদে কোনও দেবতা অথবা মহাপুরুষকে ব্রহ্মের অবতার বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। জাবাল, নৃসিংহ-তাপিনী প্রভৃতি এই শ্রেণীর। কৃত্রিম উপনিষদে আর্য্যধর্ম্ম-বহির্ভূত মত সমর্থিত হইয়াছে। "আল্লোপনিষৎ" নামে একখানা গ্রন্থ আছে। তাহা

এই শ্রেণীর অন্তর্গত। সম্ভবতঃ মুসলমান-ধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব কিভাবে আলোচিত হইয়াছে, নিম্নে প্রদত্ত কয়েকখানা প্রাচীন উপনিষদের প্রধান প্রধান অংশের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ হইতে তাহা বোধগম্য হইবে।

বৃহদারণ্যকোপনিষৎ

শুক্ল যজুর্বেদের দুই শাখা—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন। প্রত্যেক শাখাতেই "শতপথ" নামে একখানা "ব্রাহ্মণ" আছে। কাণ্বশাখার ব্রাহ্মণের ১১ কাণ্ডের শেষ কাণ্ডই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ। এই উপনিষদের প্রধান বক্তা ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য। জনক, অজাতশত্রু, আরুণি, উষস্ত, প্রবাহণ প্রভৃতি নামের উল্লেখ এই উপনিষদে পাওয়া যায়।

এই উপনিষদের আরম্ভ মানস অশ্বমেধের বর্ণনায়। এই বিশ্বকে অশ্বরূপে কল্পনা করিয়া বিশ্বের বিভিন্ন অংশ অশ্বের বিভিন্ন অঙ্গরূপে কল্পিত হইয়াছে। দ্রব্যযজ্ঞ অশ্বমেধ ধ্যানযজ্ঞে পরিণত হইয়াছে। প্রাণকে "বৃহস্পতি" ও ব্রহ্মণস্পতি বলা হইয়াছে। বাকই বৃহতী ছন্দ। প্রাণ বাক্যের পতি, এইজন্য বৃহস্পতি। বাক্যই ব্রহ্ম (বেদমন্ত্র)। প্রাণ ইহার পতি, এইজন্য ব্রহ্মণস্পতি। প্রসিদ্ধ "পবমান" মন্ত্র—"অসতো মা সদ্গময়। তমসো মা জ্যোতির্গময়। মৃত্যোর্মামৃতং গময়।" অসৎ হইতে আমাকে সতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাকে জ্যোতিতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইয়া যাও।"—এই উপনিষদে আছে।

আত্মা ও সৃষ্টি

"এই জগৎ প্রথমে পুরুষরূপী আত্মা-রূপে ছিল। আত্মা আর কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বলিলেন "আমি আছি"। একাকী বলিয়া তিনি ভীত হইয়াছিলেন। পরে ভাবিলেন, যখন আমা হইতে ভিন্ন কেহ নাই, তখন কেন ভীত হইব? ভয় চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি সুখী হইলেন না। তখন স্বদেহকে দ্বিধা বিভক্ত করিয়া তিনি পতি ও পত্নী হইলেন। এই মিথুন হইতে মানবজাতির এবং পরে অন্যান্য জীবের উৎপত্তি হয়। আত্মা তাঁহার সৃষ্টিরূপে পরিণত হইলেন।

এই সকল (দৃশ্যমান জগৎ) পূর্ব্বে অব্যক্ত ছিল, পরে নামরূপে অভিব্যক্ত হয়। ক্ষুরাধানে যেমন ক্ষুর, অগ্নিকুলায়ে যেমন অগ্নি, তেমনি আত্মাও দেহে নখের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছেন। এই অন্তরতর আত্মা পুত্র হইতে প্রিয়তর, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়তর, অন্য সমুদয় অপেক্ষা প্রিয়তর। (প্রেয়ঃ পুত্রাৎ, প্রেয়ো বিত্তাৎ, প্রেয়ঃ অন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ অন্তরতরং যদয়ন্ আত্মা)। নিশ্বাস প্রশ্বাসাদির কার্য্য করে বলিয়া ইহার নাম প্রাণ, বাক্য উচ্চারণ করে বলিয়া ইহার নাম বাক্, দর্শন করে বলিয়া ইহার নাম চক্ষু, শ্রবণ করে বলিয়া ইহার নাম শ্রোত্র, মনন করে বলিয়া ইহার নাম মন। এই জগৎ পূর্ব্বে ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান ছিল। তিনিই সমস্ত হইয়াছেন। দেব, ঋষি ও মানবগণের মধ্যে যাঁহারা ইহা জানিয়াছিলেন, তাঁহারাও এই সমস্ত হইয়াছিলেন। ঋষি বামদেব বলিয়াছিলেন "আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম।"

বর্ণভেদের সৃষ্টি

অগ্রে এই জগৎ ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান ছিল। তিনি একাকী ছিলেন বলিয়া কোন কার্য্য করিতে পারেন নাই। সেইজন্য তিনি ক্ষত্রিয়জাতি সৃষ্টি করিলেন। ক্ষত্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, সেইজন্য রাজসূয় যজ্ঞে ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়ের নীচে উপবেশন করেন। ব্রাহ্মণই ক্ষত্রিয়জাতিতে এই যশ স্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ-জাতিই ক্ষত্রিয়জাতির উৎপত্তি-স্থল। রাজসূয় যজ্ঞের শেষে ক্ষত্রিয় স্বীয় কারণভূত ব্রাহ্মণকেই আশ্রয় করেন। ক্ষত্রিয় সৃষ্টি করিয়াও ব্রহ্ম সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইলেন না। সেইজন্য বৈশ্যজাতি সৃষ্টি করিলেন। ইহাতেও তিনি সম্যক ব্যক্ত হইলেন না। তখন তিনি (সর্ব্বজাতির) পোষণকারী শূদ্রজাতির সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবীই পূষা (পোষণকারী)। ইহাতেও সম্পূর্ণ ব্যক্ত হইলেন না বলিয়া তিনি শ্রেয়োরূপী ধর্ম্মকে সৃষ্টি করিলেন। ধর্ম্ম অপেক্ষা বলশালী কেহই নাই। এইরূপে তিনি মনুষ্যগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ হইলেন। ক্ষত্রিয়-রূপ ধরিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্যরূপ ধরিয়া বৈশ্য এবং শূদ্র-রূপ ধরিয়া শূদ্র হইলেন।

বালাকি অজাতশত্রু সংবাদ

গর্ব্বোদ্ধত বালাকি রাজা অজাতশত্রুর নিকট গিয়া কহিলেন, "আমি আপনাকে ব্রহ্মোপদেশ দিব।" রাজা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন, কিন্তু

তাহার উপদেশে সন্তুষ্ট হইলেন না। তখন বালাকি তূষ্ণীম্ ভাব অবলম্বন করিলেন। পরে কহিলেন "আমি শিষ্যভাবে আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি।" অজাতশত্রু কহিলেন "ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের শিষ্য হইবেন, ইহা প্রতিলোম অর্থাৎ বিপরীত রীতি হইলেও আমি আপনাকে উপদেশ দিব।" তখন দুইজনে এক নিদ্রিত ব্যক্তির নিকট গমন করিলেন। রাজা তাহাকে ডাকিলেন, কিন্তু সে উত্তর দিল না। পরে তাহার অঙ্গ হাত দিয়া সঞ্চালন করিলে সে উঠিয়া বসিল। রাজা কহিলেন "যখন এই ব্যক্তি নিদ্রিত ছিল, তখন বিজ্ঞানময় পুরুষ স্বীয় বিজ্ঞানদ্বারা প্রাণসমূহের বিজ্ঞানকে গ্রহণ করিয়া হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে আকাশ, সেই আকাশে শয়ন করিয়া ছিল। যখন পুরুষ সমুদয় বিজ্ঞান গ্রহণ করে, তখন সে নিদ্রিত হয়। তখন ঘ্রাণেন্দ্রিয়, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন পুরুষ-কর্তৃক গৃহীত হয়। যখন এই পুরুষ স্বপ্নে বিচরণ করে, তখন এই সকল তাহার পরমলোক। তখন সে যেন মহারাজা হয়, মহাব্রাহ্মণ হয় এবং যেন ঊর্দ্ধে ও অধোভাগে গমন করে, ইন্দ্রিয়গণকে নিজের আয়ত্ত করিয়া শরীরের মধ্যে যথেচ্ছ বিচরণ করে। যখন সুষুপ্ত হয় এবং কোনও বিষয় জানিতে পারে না, তখন হিতা নামক যে ৭২০০০ নাড়ি হৃদপিণ্ড হইতে নির্গত হইয়া হৃদয়বেষ্টনে পুরীতৎ অভিমুখে প্রসারিত, তাহাদিগের দ্বারা পুরীতৎএ গমন করিয়া তথায় শয়ন করে। ঊর্ণনাভি যেমন শরীরস্থ সূত্রদ্বারা ঊর্দ্ধে গমন করে, অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ যেমন চতুর্দ্দিকে নির্গত হয়, সেইরূপ আত্মা হইতে সমুদয় প্রাণ, সমুদয় লোক, সমুদয় দেবতা নির্গত হয়।" "সত্যস্য সত্যং", ইহাই এই আত্মার উপনিষৎ (গুহ্যতত্ত্ব)। প্রাণ সত্য, আত্মা প্রাণদিগের সত্য।

ব্রহ্মের দুই রূপ

ব্রহ্মের দুই রূপ—মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত, মর্ত্ত্য ও অমৃত, স্থিত ও যৎ, সৎ ও ত্যৎ। বায়ু ও অন্তরীক্ষই অমূর্ত্ত; ইহারাই অমৃত ও যৎ (গমনশীল), এবং ত্যৎ (অব্যক্ত)। বায়ু ও অন্তরীক্ষ হইতে যাহা ভিন্ন, তাহাই মূর্ত্ত, তাহাই মর্ত্ত্য, স্থিত ও সৎ (ব্যক্ত)।

মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্য সংবাদ

সন্ন্যাসগ্রহণের প্রাক্কালে যাজ্ঞবল্ক্য পত্নী মৈত্রেয়ীকে কহিলেন, "আমি চলিয়া যাইতেছি, আমার যাহা আছে কাত্যায়নী ও তোমার মধ্যে ভাগ করিয়া দিতেছি"। মৈত্রেয়ী কহিলেন "সমগ্র পৃথিবী যদি বিত্তপূর্ণ

হয়, তাহার দ্বারা আমি কি অমর হইতে পারিব"? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন "তা-ও কি হয়? বিত্তদ্বারা অমৃতত্ব-লাভের আশা নাই। উপকরণবান ব্যক্তির জীবন যে রূপ হয়, তোমার জীবনও সেইরূপ হইবে।" মৈত্রেয়ী কহিলেন "যেনাহং নামৃতা স্যাম্, কিমহম্ তেন কুর্য্যাম্"? যাহার দ্বারা আমি অমর হইতে পারিব না, তাহা লইয়া আমি কি করিব? কিসে অমৃত হইতে পারি, আমাকে বলুন। যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, পতিকে পত্নী কামনা করে বলিয়া পতি পত্নীর প্রিয় হয় না। আত্মাকে কামনা করে বলিয়া পতি প্রিয় হয়। জায়াকে পতি কামনা করে বলিয়া জায়া পতির প্রিয় হয় না, আত্মাকে কামনা করে বলিয়াই হয়। পুত্র ও বিত্তের বেলাতেও সেইরূপ। অন্য যত বস্তু আছে, তাহাদের প্রতিও প্রীতিবশতঃ তাহারা প্রিয় হয় না, আত্মার প্রতি প্রীতির জন্যই হয়। আত্মাকেই দর্শন, শ্রবণ ও নিদিধ্যাসন করিতে হইবে।

বাদ্যমান দুন্দুভি, শঙ্খ ও বীণা শব্দকে দুন্দভি, শঙ্খ ও বীণা শব্দরূপে বুঝিতে পারা যায় না, যদি না দুন্দুভি-বাদক, শঙ্খবাদক ও বীণা-বাদকবে তাহাদের সঙ্গে গ্রহণ করা হয়। তেমনি এই আত্মাকে প্রত্যেক বস্তুর সহিত গ্রহণ না করিলে জগৎকে জানা যায় না। এই উপমাগুলির ব্যাখ্যা শঙ্করাচার্য্য এই ভাবে করিয়াছেন:- "সামান্য" যে বহু আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য এতগুলি উপমা দেওয়া হইয়াছে। দুন্দুভি-শব্দ, শঙ্খশব্দ ও বীণা-শব্দের প্রত্যেকের মধ্যে বহুবিধ ভেদ আছে। বহুবিধ শঙ্খ-শব্দের মধ্যে যাহা সাধারণ, তাহা শঙ্খ-শব্দ-সামান্য। বহুবিধ বীণা-শব্দের মধ্যে যাহা সাধারণ, তাহা বীণা-শব্দ-সামান্য। বহুবিধ দুন্দুভি-শব্দের মধ্যে যাহা সাধারণ, তাহা দুন্দুভি-শব্দ-সামান্য। ইহা বাদেও বহুপ্রকার শব্দ-সামান্য আছে। সকল প্রকার শব্দ-সামান্যের মধ্যে যাহা সাধারণ, তাহা শব্দ-সামান্য। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়েরই একটি সামান্য আছে। যেমন রূপ-সামান্য, রস-সামান্য, গন্ধ-সামান্য, শব্দ-সামান্য ও স্পর্শ-সামান্য। বিভিন্ন-স্বভাব, চেতন ও অচেতন সকল সামান্য যেমন এক মহাসামান্যের অন্তর্গত, সেইরূপ যাবতীয় বস্তুই যে এক প্রজ্ঞানঘন আত্মার অন্তর্গত, তাহাই বুঝাইবার জন্য এতগুলি দৃষ্টান্তের অবতারণা।

উপমাগুলির পর যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন, আর্দ্র কাষ্ঠ প্রদীপ্ত হইলে তাহা হইতে যেমন ধূম ও স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ মহান্ স্বতঃসিদ্ধ ব্রহ্মের নিশ্বাস রূপে চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ প্রভৃতি বিদ্যা বহির্গত হয়। সমুদ্র যেমন

সমস্ত জলের একমাত্র আশ্রয়-স্থান, ত্বক্ সকল স্পর্শের আশ্রয়-স্থান, জিহ্বা যাবতীয় রসের আশ্রয়-স্থান, নাসিকা যাবতীয় গন্ধের আশ্রয়-স্থান, চক্ষু সকল রূপের আশ্রয়-স্থান, কর্ণ সকল শব্দের আশ্রয়-স্থান, মন সর্ব্ব সঙ্কল্পের আশ্রয়-স্থান, হৃদয় সকল বিদ্যার আশ্রয়-স্থান, হস্ত সকল কর্ম্মের আশ্রয়-স্থান, উপস্থ যাবতীয় আনন্দের আশ্রয়-স্থান, পায়ু যাবতীয় বিসর্গের আশ্রয়-স্থান, পদ সমগ্র পথের আশ্রয়-স্থান, বাক্ সর্ব্ব বেদের আশ্রয়-স্থান, আত্মা সেইরূপ সকলের আশ্রয়-স্থান। ইহার ব্যাখ্যায় শঙ্কর বলিয়াছেন :— সকল জল যেমন সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, তেমনি স্পর্শ-বিশেষসকল স্পর্শ-সামান্যে, রস-বিশেষসকল রস-সামান্যে, গন্ধ-বিশেষসকল ঘ্রাণ-বিষয়-সামান্যে, রূপসকল দর্শন-বিষয়-সামান্যে, শব্দসকল শ্রবণ-বিষয়-সামান্যে প্রবিষ্ট হয়। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-বিষয়-সামান্য মনোবিষয়-সামান্য সংকল্পে, এবং মনোবিষয়-সামান্য বুদ্ধিবিষয়-সামান্য বিজ্ঞানমাত্রে প্রবিষ্ট হয়। এই রূপে পঞ্চেন্দ্রিয়বিষয়-সামান্য বিজ্ঞানমাত্র হইয়া প্রজ্ঞানঘন ব্রহ্মে বিলীন হয়। সেইরূপ কর্ম্মেন্দ্রিয়-বিষয়-সকল বচন-গ্রহণ-গমন-বিসর্গ-আনন্দের বিশেষ ক্রিয়াত্মক বিষয়গুলি সেই জাতীয় ক্রিয়া-সামান্যে প্রবিষ্ট হয়। সেই সামান্যসকল প্রাণমাত্র, প্রাণ প্রজ্ঞানমাত্র, প্রজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই নয়। প্রাণ ব্রহ্ম (কৌষীতকি)। প্রজ্ঞান ব্রহ্ম।

যাজ্ঞবল্ক্য আরও বলিলেন "সৈন্ধবখণ্ড যেমন জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জলে বিলীন হয়, তাহাকে আর পৃথক করা যায় না, তেমনি এই মহাভূত অনন্ত অপার বিজ্ঞানঘন। এই মহান আত্মা এই সমস্ত ভূত হইতে (জীবাত্মারূপে) উত্থিত হইয়া ইহাতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর তাহার সংজ্ঞা থাকে না।" মৈত্রেয়ী কহিলেন 'এই কথা বলিয়া আপনি আমাকে মোহগ্রস্ত করিলেন। এখান হইতে গিয়া সজ্ঞা থাকিবে না"? যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন "মোহজনক কিছু আমি বলি নাই। এই আত্মা অবিনাশী এবং অনুচ্ছিত্তি-ধর্ম্মা (উচ্ছেদ বিহীন)। যে স্থলে মনে হয় যেন দ্বিতীয় বস্তু রহিয়াছে, সেইস্থলে একজন অপরকে দর্শন করে, আঘ্রাণ করে, স্পর্শ করে ইত্যাদি। কিন্তু যখন সকলেই আত্মা হইয়া গেল, তখন কে কাহাকে দর্শন করে, আঘ্রাণ করে ইত্যাদি। বিজ্ঞাতাকে কি প্রকারে জানিবে ?"

যাজ্ঞবল্ক্যের এই শেষ কথার অর্থ কি ? চার্ব্বাক দর্শনে ইহা জীবাত্মার নশ্বরত্বের প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। কিন্তু জীবাত্মা পঞ্চভূতের সংঘাত ব্যতীত কিছু নহে, এবং মৃত্যুর পরে তাহার অস্তিত্ব থাকে না, ইহা বলা যাজ্ঞ-

বক্যের উদ্দেশ্য নহে। যখন মোক্ষে জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়, তখন মোক্ষপ্রাপ্ত জীবাত্মার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, ইহা বলাই যাজ্ঞবল্ক্যের উদ্দেশ্য। যতদিন মোক্ষ না হয়, ততদিন সূক্ষ্ম শরীর সহ জীবাত্মা জন্ম-জন্মান্তর ভোগ করে।

মধুবিদ্যা

যজুর্বেদের শাট্যায়ন শাখায় এই আখ্যায়িকা আছে। ইন্দ্র দধীচি ঋষিকে মধুবিদ্যা ও প্রবর্গ বিদ্যা শিক্ষা দিয়া বলিয়াছিলেন "তুমি যদি কাহাকেও এই বিদ্যা প্রদান কর, আমি তোমার শিরশ্ছেদ করিব।" মধুবিদ্যালাভের জন্য উৎসুক অশ্বিদ্বয় দধীচির সহিত পরামর্শ করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিয়া সযত্নে রক্ষা করিলেন, এবং তৎপরিবর্ত্তে দধীচির স্কন্ধে অশ্বশির স্থাপন করিলেন। অশ্বশিরদ্বারা দধীচি অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা শিক্ষা দিলেন। জানিতে পারিয়া ইন্দ্র দধীচির মস্তক ছেদন করিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বশির দধীচি অশ্বিদ্বয়ের নিকট পুনঃ প্রাপ্ত হইলেন। যজুর্বেদে দধীচির নাম দধ্যঙ্। এই বিদ্যা এইরূপ :

পৃথিবীতে, জলে, অগ্নিতে, বায়ুতে, আদিত্যে, দিক্‌সকলে, চন্দ্রে, বিদ্যুতে, মেঘগর্জনে, আকাশে, যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, এবং এই দেহে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, ইহারা অভিন্ন। ধর্ম্মে ও সত্যে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, তাহাও দেহে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, তাহার সহিত অভিন্ন। এই দেহে যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ, তাহা ও জীবাত্মারূপী তেজোময় অমৃতময় পুরুষ এক। ইহাই অমৃত, ইহাই ব্রহ্ম, এবং ইহাই সকল বস্তু। এই আত্মা সকল ভূতের অধিপতি এবং সকল ভূতের রাজা। রথনাভিতে এবং রথনেমিতে "অর"সকল (spokes) যেমন নিহিত থাকে, এই আত্মাতে তেমনি সকল ভূত, সকল লোক এবং পৃথিবী, জল প্রভৃতি নিহিত আছে।

কক্ষীবান্ ঋষি দধ্যঙ্-এর অশ্বশির দ্বারা এই মধুবিদ্যাদানের কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন :

পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ।
পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরুষঃ আবিশৎ॥

তিনি দ্বিপদ পুর (শরীর) ও চতুষ্পদ পুর নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তিনি প্রথমে (পুরঃ) পক্ষী হইয়া পুরুষরূপে পুরঃ (দেহসকলে) প্রবেশ করিয়াছেন।

স বা অয়ং পুরুষঃ সর্বাসু পূর্ষু পুরিশয়ো, নৈনেন কিং চন অসংবৃতম্ ॥
এই পুরুষ দেহে পুরিশয় (দেহপুরে শয়ান)। এমন কিছুই নাই, যাহা ইহা কর্তৃক অনুপ্রবিষ্ট নহে।

গর্গ ঋষি ইহা অবগত হইয়া বলিয়াছিলেন—রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। তদস্য রূপং প্রতি চক্ষণায় ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। যুক্তা হি অস্য হরয়ঃ শতা দশ, ইত্যয়ং বৈ হরয়ো,হয়ং বৈ দশ সহস্রাণি বহূনি চ অনন্তানি। তদেতৎ ব্রহ্ম অপূর্ব্বং, অনপরম্, অনন্তরম্, অবাহ্যম্। অয়মাত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূঃ। ইনি প্রত্যেক বস্তুর অনুরূপ হইয়াছেন, ইঁহার রূপ প্রকাশিত করিবার জন্য। ইন্দ্র মায়াদ্বারা বহুরূপে প্রকাশিত হন। শত ও দশ অশ্ব ইহাতে সংযোজিত হইয়াছে। (অর=ইন্দ্রিয়) ইহাই (আত্মাই) অশ্ব (ইন্দ্রিয়)। ইহাই দশ, সহস্র, বহু ও অনন্ত। ইনিই ব্রহ্ম, কারণ-রহিত, কার্য্য-রহিত, অন্তর-রহিত, বাহ্যরহিত। এই আত্মাই ব্রহ্ম ও সর্ব্বানুভূঃ (সর্ব্ব বিষয়ের অনুভব কর্ত্তা)।

জনক যজ্ঞ

বিদেহরাজ জনকের যজ্ঞে বহু ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়াছিলেন। জনক বলিলেন "আপনাদের মধ্যে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বিদ্বান তাঁহাকে এক সহস্র গো দান করিব"। গোরুগুলি অদূরে বাঁধা ছিল। যাজ্ঞবল্ক্য আপনার শিষ্যকে গোরুগুলি লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন; ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কলরব উঠিল। যাজ্ঞবল্ক্যকে নানা জনে নানা প্রশ্ন করিলেন। অপরোক্ষ সর্ব্বান্তর আত্মা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসিত হইয়া যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, তোমার আত্মাই সকলের অন্তরাত্মা। যিনি প্রাণ, অপান, ব্যান ও উদান দ্বারা তাহাদের কার্য্য সম্পন্ন করেন, তিনিই তোমার আত্মা, সর্ব্বান্তর। দৃষ্টির দ্রষ্টাকে, শ্রুতির শ্রোতাকে, মননের মন্তাকে, বিজ্ঞানের বিজ্ঞাতাকে দেখিতে, শুনিতে, মনন করিতে, জানিতে পারিবে না। তোমার আত্মাই সর্ব্বান্তর।

কহোলের প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, যিনি ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহ, জরা ও মৃত্যুকে অতিক্রম করেন, তিনি অপরোক্ষ ব্রহ্ম। এই তাঁহাকে অবগত হইয়া ব্রাহ্মণগণ পুত্রৈষণা বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেন।

ইহার পরে প্রশ্ন করিলেন বাচক্নু ঋষির কন্যা প্রতিভাশালিনী গার্গী। তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন জল বায়ুতে, বায়ু অন্তরীক্ষে, অন্তরীক্ষ

লোকসকল গন্ধর্ব্বলোকে, গন্ধর্ব্বলোক আদিত্যলোকে, আদিত্যলোক চন্দ্রলোকে, চন্দ্রলোক নক্ষত্রলোকে, নক্ষত্রলোক দেবলোকে, দেবলোক ইন্দ্রলোকে, ইন্দ্রলোক প্রজাপতিলোকে, প্রজাপতি লোকসকল ব্রহ্মলোক-সকলে ওতঃপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান। গার্গী যখন প্রশ্ন করিলেন, "ব্রহ্মলোকসকল কাহাতে ওতঃপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান"? তখন যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন "গার্গি, অতি প্রশ্ন করিও না।" গার্গী বিরত হইলেন।

উদ্দালক আরুণি প্রশ্ন করিলেন "যাহাদ্বারা ইহলোক, পরলোক এবং সর্ব্বলোক গ্রথিত হইয়া আছে, যাহাকে জানিলে লোকে ব্রহ্মবিৎ, লোকবিৎ, দেববিৎ, বেদবিৎ ও ভূতবিৎ হয়, তুমি কি তাহাকে জান? যদি না জান, তবে রাজার গোসকল লইয়া যাইতে পারিবে না।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "আমি তাহাকে জানি। বায়ুদ্বারা ইহলোক, পরলোক ও সর্ব্বলোক গ্রথিত হইয়া আছে। যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক, পৃথিবী যাঁহার শরীর, পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি পৃথিবীকে নিয়মিত করিতেছেন, অথচ পৃথিবী যাহাকে জানে না, তিনি তোমার আত্মা। তিনিই অন্তর্য্যামী ও অমৃত। যিনি জলে, অগ্নিতে, অন্তরীক্ষে, বায়ুতে, দ্যু-লোকে, আদিত্যে, দিক্‌সমূহে, চন্দ্রতারকে, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে অবস্থিত, অথচ এই সকল হইতে পৃথক, এই সকল যাঁহার শরীর এবং ইহাদিগের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি ইহাদের নিয়মিত করিতেছেন, অথচ ইহারা যাহাকে জানে না, তিনি তোমার আত্মা, তিনিই অন্তর্য্যামী ও অমৃত। যিনি সর্ব্বভূতে অবস্থিত, অথচ সর্ব্বভূত হইতে পৃথক, সর্ব্বভূত যাহাকে জানে না, কিন্তু সর্ব্বভূত যাঁহার শরীর এবং যিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে থাকিয়া তাহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা, তোমার অন্তর্য্যামী ও অমৃত। যিনি প্রাণে, বাকে, চক্ষুতে, শ্রোত্রে, মনে, ত্বকে, এবং বিজ্ঞানে, এবং জীববীজে অবস্থিত, কিন্তু ইহাদিগের হইতে পৃথক, ইহারা যাঁহাকে জানে না, কিন্তু ইহারা যাঁহার শরীর, এবং ইহাদের অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি ইহাদিগকে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্য্যামী ও অমৃত। তিনি অদৃষ্ট, অশ্রুত, কিন্তু তিনি দ্রষ্টা এবং শ্রোতা। তাঁহাকে মনন করা যায় না, কিন্তু তিনি সকলের মনন-কর্ত্তা, তিনি অবিজ্ঞাত কিন্তু বিজ্ঞাতা। তিনি ভিন্ন কোন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মননকর্ত্তা এবং বিজ্ঞাতা নাই। তিনি তোমার আত্মা, তিনি অন্তর্য্যামী ও অমৃত, তিনি ভিন্ন আর সমুদয়ই আর্ত্ত।"

ইহার পরে গার্গী আবার প্রশ্ন করিলেন "যাহা পৃথিবীর অধোতে এবং

দ্যৌঃ ও পৃথিবী উভয়ের মধ্যবর্ত্তী, যাহা অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ বলিয়া লোকে বলে, তাহা কোন্ বস্তুতে ওতঃপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান ?"

যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন "সেই বস্তু আকাশ।" "আকাশ কোন্ বস্তুতে ওতঃপ্রোত ভাবে বর্ত্তমান ?" যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন "তিনি সেই অক্ষর। তিনি স্থূল নহেন, অণু নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিত নহেন, স্নেহবস্তু নহেন, ছায়া নহেন, তমঃও নহেন, বায়ু নহেন, আকাশ নহেন। তিনি অসঙ্গ, অরস, অ-চক্ষু, অশ্রোত্র, বাক্‌বিহীন, মনোবিহীন, তেজরহিত, প্রাণরহিত, মুখ-রহিত, অপরিমেয়, অন্তর-রহিত এবং বাহ্যরহিত"। "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি, সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি,নিমেষা, মুহূর্ত্তা, অহোরাত্রানি, অর্দ্ধমাসা, ঋতবঃ, সংবৎসরাঃ ইতি বিধৃতাঃ তিষ্ঠন্তি। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্য পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যঃ অন্যা যাং যাং চ দিশম্ অনু।" "এই অক্ষরের প্রশাসনে সূর্য্যচন্দ্র, দ্যাবা-পৃথিবী, নিমেষ, মুহূর্ত্ত, অহোরাত্রি, অর্দ্ধমাস, ঋতুসকল, সংবৎসরসকল বিধৃত হইয়া আছে। ইহার প্রশাসনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য নদীসকল শ্বেতপর্ব্বত হইতে উদ্‌ভূত হইয়া যে যাহার দিকে প্রবাহিত হইতেছে।" এই অক্ষরকে দেখা যায় না, শোনা যায় না, মনন করা যায় না, জানা যায় না, কিন্তু তিনি দেখেন, শোনেন, মনন করেন এবং জানেন। তিনি ভিন্ন অন্য কোনও দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, জ্ঞাতা নাই। অক্ষরকে জানিয়া যে ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সে ব্রাহ্মণ। এই অক্ষরেই আকাশ ওতঃপ্রোত।

শাকল্য জিজ্ঞাসা করিলেন "দেবতা কতজন ?" যাজ্ঞ - বিশ্বদেব সম্বন্ধী নিবিদে যত দেবতার উল্লেখ আছে (৩০৩ ও ৩০০৩), ততজন। শাকল্য—তা বটে, কিন্তু ঠিক কত জন ? যাজ্ঞ—৩৩ জন। শাকল্য—তা বটে। কিন্তু ঠিক কতজন ? যাজ্ঞ—ছয় জন। শাকল্য—তা বটে, কিন্তু ঠিক কত জন ? যাজ্ঞ—দুই জন। শাকল্য—তা বটে, কিন্তু ঠিক কত জন ? যাজ্ঞ—দেড় জন। শাকল্য—তা বটে, কিন্তু ঠিক কত জন ? যাজ্ঞ—এক জন। শাকল্য—এই ৩০৩ এবং ৩০০৩ দেবতা কে ? যাজ্ঞ—তাহারা ৩৩ জন দেবতার মহিমা। ৮ বসু, ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি। অগ্নি, বায়ু, অন্তরীক্ষ, পৃথিবী, আদিত্য, দ্যৌঃ, চন্দ্রমা, ও নক্ষত্রগণ, ইহারা অষ্টবসু। দশ ইন্দ্রিয় ও আত্মাই ১১ রুদ্র। শরীর হইতে উৎক্রমণের সময় ইহারা সকলকে রোদন করায় বলিয়া ইহারা রুদ্র। সংবৎসরের ১২ মাসই আদিত্য। স্তনয়িত্নু (অশনি), ইন্দ্র এবং যজ্ঞই প্রজাপতি। পশুসমূহই যজ্ঞ। অগ্নি, বায়ু, অন্তরীক্ষ,

আদিত্য, পৃথিবী ও দ্যৌঃ ছয় দেবতা। এই তিন লোক তিন দেবতা। অন্ন ও প্রাণ দুই দেবতা। বায়ুই দেড়জন দেবতা। এক দেবতা প্রাণ, তিনি ব্রহ্ম, তিনি ত্যৎ। (৩।৯)

একদিন যাজ্ঞবল্ক্য জনককে কহিলেন "প্রাণীদিগের মধ্যে যিনি বিজ্ঞানময়, তিনিই আত্মা। শরীর লাভ করিয়া তিনি পাপের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। মৃত্যুকালে তিনি পাপসকল ত্যাগ করেন। তাঁহার দুই স্থান, ইহলোক ও ও পরলোক। ইহাদের সন্ধি স্বপ্নস্থান তৃতীয় স্থান। স্বপ্নস্থানে অবস্থান করিয়া পুরুষ উভয়লোক দর্শন করেন। তিনি যখন সুপ্ত হন, তখন সর্ব্বভূতযুক্ত এই লোকের উপাদান সকল গ্রহণ করিয়া, এই সকল বিনাশ করিয়া, নূতন জগৎ নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় জ্যোতিদ্বারা স্বপ্ন দর্শন করেন। সেখানে রথ নাই, বাহন নাই, পথ নাই। আত্মা রথ, তাহার বাহন এবং পথের সৃষ্টি করেন। সেখানে আনন্দ, মোদ ও প্রমোদ নাই, আত্মা আনন্দ, মোদ ও প্রমোদ সৃষ্টি করেন। বেশান্ত (ক্ষুদ্র জলাশয়), পুষ্করিণী, নদী নাই। আত্মা তাহাদের সৃষ্টি করেন। প্রাণদ্বারা শরীর রক্ষা করিয়া, সেই অমৃত-স্বরূপ বাহিরে গমন করেন এবং যথেচ্ছ বিচরণ করেন। উর্দ্ধে এবং অধঃতে বহুরূপ সৃষ্টি করেন। কখনও আমোদ করেন, আহার করেন, কখনও বা ভয়ের কারণ দেখেন। প্রসাদগুণ অবস্থায় আরাম লাভ করিয়া যথাগত পথে সেই পুরুষ স্বপ্ন দেখিবার জন্য নিদ্রাস্থানে ফিরিয়া আসেন। তথায় যাহা দেখেন, তাহাতে আসক্ত হন না। তিনি অসঙ্গ। তাহার পরে তিনি জাগরিত স্থানে ফিরিয়া আসেন। স্বপ্নাবস্থায় ইনি মনে করেন "আমি যেন দেবতা, আমি যেন রাজা। আমিই এই সকল।" ইহাই তাহার পরম লোক।—কামনারহিত, পাপরহিত, অভয় রূপ। প্রিয়াকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া লোকে যেমন বাহ্য ও আন্তর কিছুই জানে না, তেমনি প্রাজ্ঞ আত্মাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত পুরুষ কিছুই জানিতে পারে না। ইহা তাঁহার আপ্তকাম, আত্মকাম, অকাম, শোকাতীত রূপ। এই অবস্থায় পিতা অপিতা হন, মাতা অমাতা হন, লোক অলোক হয়, দেব অদেব হয়, বেদ অবেদ হয়, স্তেন (চোর) অস্তেন হয়। পুণ্য ও পাপ ইহার অনুসরণ করে না। ইনি শোক হইতে মুক্ত হন। এই অবস্থায় তিনি দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, শ্রবণ, স্পর্শন, বচন, মনন করিয়াও করেন না। নিত্যবর্ত্তমান আত্মাই এই সকল ক্রিয়ার কর্ত্তা। কিন্তু তাহা হইতে ভিন্ন কিছু নাই, যাহা তিনি দর্শন, শ্রবণ, আঘ্রাণ, স্পর্শ ও আস্বাদন করিতে বা বলিতে পারেন। এই জন্য তিনি এ সকল করিয়াও করেন না, এই জন্য তিনি জানিয়াও জানেন

না। যেখানে অন্য কিছু আছে বলিয়া মনে হয়, সেখানেই এই সকল ক্রিয়ার সম্ভব। কিন্তু তিনি সলিলের ন্যায় ভেদরহিত। ইহাই ব্রহ্মলোক, পরমা গতি, পরমা সম্পৎ, পরমলোক, পরম আনন্দ। অন্য সকল এই আনন্দের অংশমাত্র ভোগ করে।

সৌভাগ্যবান্, সমৃদ্ধ, অন্য সকলের অধিপতি, সর্ব্ব মানবীয় ভোগের অধিকারী ব্যক্তির যে আনন্দ, তাহা মানবের পরমানন্দ। তাহার শতগুণ আনন্দ জিতলোক পিতৃগণের একটি আনন্দ; ইহার শতগুণ আনন্দ গন্ধর্ব্ব-লোকের একটি আনন্দ। তাহার শতগুণ আনন্দ কর্ম্মদেবগণের এক আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ আজান দেবগণের আনন্দ। (যিনি জন্ম হইতেই দেবতা, তিনিই আজানদেব)। যিনি নিষ্পাপ অকামাহত শ্রোত্রীয়. তাহারও ইহা একটি আনন্দ। ইহার শতগুণ আনন্দ প্রজাপতিলোকের এক আনন্দ। যিনি নিষ্পাপ অকামহত শ্রোত্রীয়, তাহারও ইহা একটি আনন্দ। প্রজাপতি-লোকের আনন্দের শতগুণ আনন্দ ব্রহ্মলোকের এক আনন্দ। যিনি নিষ্পাপ অকামহত শ্রোত্রিয়, ইহা তাহারও এক আনন্দ। ইহাই ব্রহ্মলোক।

জরা বা ব্যাধিতে জীর্ণ বা ক্ষীণ হইয়া এই পুরুষ সমুদয় অঙ্গ হইতে বিমুক্ত হইয়া নূতন প্রাণলাভের জন্য যোনিস্থানে গমন করে। এই প্রকার জ্ঞানীর জন্য সর্ব্বভূত প্রতীক্ষা করিয়া থাকে। শরীর হইতে আত্মা যখন উৎক্রান্ত হইতে উদ্যত হন, তখন সকল প্রাণ তাহার চতুর্দিকে সমাগত হয়। উৎক্রমণ করিলে সকল প্রাণ তাহার অনুগমন করে। তখন তিনি বিজ্ঞানময় হন। বিদ্যা, কর্ম্ম ও পূর্ব্বানুভূত বিষয়ের জ্ঞানও তাহার অনুগমন করে। জলৌকা যেমন একটি তৃণের অগ্রভাগে যাইয়া তৃণান্তর আশ্রয় করিয়া আপনাকে তাহার নিকট লইয়া যায়, তেমনি এই আত্মা এই দেহ ছাড়িয়া অবিদ্যা দূর করিয়া আর একটি আশ্রয় (দেহ) অবলম্বন করিয়া আপনাকে তাহার নিকট লইয়া যান। স্বর্ণকার একখণ্ড স্বর্ণদ্বারা যেমন নবতর কল্যাণতর অন্য একটি বস্তু নির্ম্মাণ করে, তেমনি আত্মা এই দেহ ত্যাগ করিয়া নবতর কল্যাণতর রূপ প্রস্তুত করেন। "যথাকারী, যথাচারী তথা ভবতি। সাধুকারী সাধুঃ ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন। "স যথা কামো, তৎক্রতুঃ (সেইপ্রকার অধ্যবসায়যুক্ত) ভবতি। যৎ-ক্রতুঃ ভবতি, তৎ কর্ম্ম কুরুতে। যৎকর্ম্ম কুরুতে, তৎ অভিসম্পদ্যতে" (তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয়)। পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ মন যে বিষয়ে আসক্ত, আত্মা সেই বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া নিজ কর্ম্মসহ সেই দিকে যায়। এই লোকে পুরুষ

যে কর্ম্ম করে, সে (স্বর্গাদি লোকে) তাহার ফললাভ করিয়া এই কর্ম্মলোকে পুনরায় আগমন করে। যিনি অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না। তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন। সকল কামনা যখন দূরীভূত হয়, তখন মর্ত্ত্য অমৃত হয়, এবং এই দেহেই আত্মা ব্রহ্মলাভ করেন। যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, তাহারা অন্ধকারে প্রবেশ করে। আর যাহারা (কেবল) বিদ্যায় রত, তাহারা যেন গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করে। "অনন্দা নামক লোকসমূহ গাঢ় অন্ধকারে আবৃত। অবিদ্বান্ ও অবুধগণ তাহাতে গমন করে।" যিনি এইভাবে আত্মাকে জানেন, তিনি কিসের কামনায় এই শরীরে থাকিয়া সন্তাপ ভোগ করিবেন? এই পৃথিবীতে থাকিয়াই যদি আমরা আত্মাকে জানিতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের "মহতী বিনষ্টিঃ" (মহাবিনাশ)। যাঁহার পশ্চাতে দিনসকলের সহিত সংবৎসর আবর্ত্তিত হইতেছে (অর্থাৎ যিনি কালাতীত), সেই জ্যোতির জ্যোতি, আয়ুস্বরূপ, অমৃতস্বরূপ দেবকে দেবগণ উপাসনা করেন। যাঁহারা প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মনকে জানেন, তাঁহারা সেই পুরাতন আদি কারণ ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানিয়াছেন,

> "মনসৈব দ্রষ্টব্যং নেহ নানাস্তি কিঞ্চন,
> মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি, য ইহ নানেব পশ্যতি।"

মনে তাহাকে দর্শন করিতে হইবে। তাহাতে নানা নাই। যে নানা দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়। এই অপ্রমেয় ধ্রুব আত্মাকে একধা দর্শন করিতে হইবে। তিনি বিরজ, আকাশ হইতে শ্রেষ্ঠ, অজ, মহান্ ও ধ্রুব। ধীর ব্রাহ্মণ তাহাকে জানিয়া প্রজ্ঞাসাধন করিবেন। বহু বাক্যের সাধন করিবে না। বহু শব্দ কেবল বাক্ইন্দ্রিয়ের গ্লানিকর। যিনি হৃদয়াকাশে অবস্থিত বিজ্ঞানময় অজ আত্মা, তিনি সকলের শাসনকর্ত্তা, সকলের অধিপতি।

তিনি সাধু কর্ম্মদ্বারা শ্রেষ্ঠ হন না, অসাধু কর্ম্মদ্বারা হীনতর হন না। তিনি সর্ব্বেশ্বর, ভূতদিগের অধিপতি ও তাহাদের পালক, লোকসকল যাহাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না পড়ে, এইজন্য তাহাদের মধ্যে সেতুস্বরূপ ধারণকর্ত্তা। যজ্ঞ, দান, তপস্যা ও অনশন ব্রত দ্বারা ব্রাহ্মণগণ তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন। ইহাকে জানিয়াই লোক মুনি হয়। এই ব্রহ্মরূপ (লোক) কামনা করিয়া সন্ন্যাসিগণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। প্রাচীনকালের বিদ্বান্গণ এই জন্য সন্তান কামনা করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন "আমরা ব্রহ্মলোক

লাভ করিয়াছি। সন্তান দিয়া আমরা কি করিব?" পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা ত্যাগ করিয়া তাহারা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই আত্মা "নেতি নেতি"। ইনি অশীর্য্য, অসঙ্গ। ইনি ব্যথাপ্রাপ্ত হন না, ও হিংসিত হন না।" "কেন পাপ করিয়াছি, ও কেন কল্যাণ করিয়াছি", এই চিন্তা এই প্রকার জ্ঞানীর নাই! কৃত ও অকৃতকর্ম্ম ইহাকে সন্তপ্ত করে না। কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণের এই মহিমা বর্দ্ধিত হয় না, খর্ব্বও হয় না। ইনি শান্ত, উপরত, তিতিক্ষু ও সমাহিত হইয়া, নিজ আত্মাতে আত্মাকে দর্শন করেন, সকল বস্তু আত্মরূপে দর্শন করেন। ইহাই ব্রহ্মলোক।

পূর্ণ হইতে পূর্ণের উদ্ভব

পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥

অদঃ (ঐ অদৃশ্যব্রহ্ম) পূর্ণ। ইদং (এই দৃশ্যজগৎ) পূর্ণ। পূর্ণ হইতে পূর্ণ নির্গত হয়। পূর্ণ হইতে পূর্ণ গ্রহণ করিলে পূর্ণই অবশিষ্ট থাকে।

দ, দ, দ

দেবগণ, মনুষ্যগণ ও অসুরগণ—প্রজাপতির তিন সন্তান—প্রজাপতির সমীপে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া বাস করিয়াছিল। দেবগণ কহিলেন "আমাদিগকে উপদেশ দিন"। প্রজাপতি কহিলেন "দ"। তারপরে কহিলেন "কি বুঝিলে?" দেবগণ কহিলেন "আমরা বুঝিয়াছি দাম্যত—দান্ত হও"। প্রজাপতি ওঁ (ঠিক বুঝিয়াছ)। মনুষ্যগণকেও কহিলেন "দ", এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বুঝিলে?" মনুষ্যগণ কহিল "আমরা বুঝিয়াছি—'দত্ত', দান কর। প্রজাপতি - ওঁ (ঠিক বুঝিয়াছ)। অসুরগণ উপদেশ চাহিলে প্রজাপতি কহিলেন "দ"। জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বুঝিলে?" অসুরগণ কহিল "বুঝিয়াছি 'দয়ধ্বম্'—দয়া কর।" প্রজাপতি কহিলেন "ঠিক"। মেঘগর্জ্জনে এই তিন দৈববাক্য প্রতিধ্বনিত হয়—দ, দ, দ—দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম্।

ছান্দোগ্য উপনিষৎ

বৈশম্পায়ন শিষ্য তাণ্ড্য সামবেদের "তাণ্ড্যশাখার" প্রবর্ত্তক। তাণ্ড্যশাখার অন্তর্গত একখানা ব্রাহ্মণের নাম ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ। এই ব্রাহ্মণের শেষ আট অধ্যায়ের নাম ছান্দোগ্য উপনিষৎ। যাঁহারা ছন্দ (বেদ) গান করেন, তাহাদিগকে ছান্দোগ বলে। সকল উপনিষদের মধ্যে ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যকই

প্রাচীনতম। ভারতীয় ব্রহ্মবাদের প্রাচীনতম রূপ এই দুই উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়।

ছান্দোগ্যে নানা আখ্যায়িকা দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝাইবার চেষ্টা আছে। এই উপনিষদের মধ্যে, সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে অদ্বৈতবাদ বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। ঐ অধ্যায়গুলির মর্ম্ম নিম্নে বিবৃত হইল।

দ্বাদশবর্ষ গুরুগৃহে সমগ্র বেদ অধ্যয়ন করিয়া শ্বেতকেতু যখন পিতৃগৃহে ফিরিয়া আসিলেন, তখন পিতা আরুণি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি পাণ্ডিত্যাভিমানী ও অবিনীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছ। কিন্তু যাহাদ্বারা অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তিত হয় এবং অজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হয়, তাহার কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে কি ?" শ্বেতকেতু বলিলেন "তাহা কি ?" তখন আরুণি কহিলেন, "একটি মৃৎপিণ্ড জানিলে সকল মৃত্তিকানির্ম্মিত বস্তু জানা যায় ; একটি সুবর্ণপিণ্ড জানিলে সকল সুবর্ণময় বস্তু জানা যায়, লৌহনির্ম্মিত একটি নখনিকৃন্তন (নরুন) জানিলে সকল লৌহময় বস্তু জানা যায়। যাবতীয় মৃন্ময়, সুবর্ণময় ও লৌহময় বস্তু মৃত্তিকা, সুবর্ণ ও লৌহের বিকার। মৃত্তিকা, সুবর্ণ ও লৌহই সত্য, তাহাদের দ্বারা যাহা নির্ম্মিত হয়, তাহারা বিকার। বিকার বাক্যের অবলম্বন (বাচারম্ভণ)—নামমাত্র। এই উপদেশ শ্রবণ করিলে অশ্রুত শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয় চিন্তিত হয় এবং অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয়।" শ্বেতকেতু বলিলেন, "আমার উপাধ্যায় নিশ্চয় ইহা জানিতেন না। আপনিই আমাকে এই সম্বন্ধে বলুন।" আরুণি বলিতে লাগিলেন :

কেহ কেহ বলেন এই জগৎ অগ্রে এক, অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপে বর্ত্তমান ছিল। কেহ কেহ বলেন এই জগৎ অগ্রে এক অদ্বিতীয় অসৎরূপে বর্ত্তমান ছিল। কিন্তু অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে ? এই জগৎ অগ্রে এক সৎস্বরূপেই বর্ত্তমান ছিল। সেই সৎ (ঐক্ষত) চিন্তা করিলেন, "আমি বহু হইব, আমি জন্মগ্রহণ করিব।" এই সংকল্প করিয়া তিনি তেজ সৃষ্টি করিলেন। তেজ জলের সৃষ্টি করিল। পরে জল অন্ন সৃষ্টি করিল।

সৎস্বরূপ সংকল্প করিলেন "আমি জীবাত্মারূপে এই তিন দেবতার (তেজ, জল ও অন্ন) মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ব্যক্ত করি।" অনন্তর তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি নাম ও রূপ ব্যক্ত করিলেন। অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্র ও বিদ্যুতের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজের রূপ। তাহাদের শুক্ল রূপ জলের রূপ এবং কৃষ্ণ রূপ অন্নের রূপ। সুতরাং অগ্নি, আদিত্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ

হইতে তাহাদের আদিত্যত্ব, চন্দ্রত্ব ও বিদ্যুত্ব চলিয়া গেল। থাকিল বিকার। তাহা "বাচারম্ভণ", কেবল নাম মাত্র। উক্ত তিনটি রূপই সত্য। লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণরূপের জ্ঞান হইতে মহা শ্রোত্রিয়গণ বুঝিয়াছিলেন যে লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণই সত্য, আর সকল বিকার। লোহিতাদি জানিলেই আর সকল জানা যায়। লোহিত, শুক্ল ও কৃষ্ণকে তাঁহারা তেজ, জল ও অন্নের রূপ এবং যাহা অবিজ্ঞাত বলিয়া মনে হইত, তাহাও এই তিন দেবতার সংযোগ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।

সৎস্বরূপ প্রথমে তেজ, অপ ও অন্নকে ত্রিবৃৎ করিয়াছিলেন—অর্থাৎ প্রত্যেকের মধ্যে অন্য দুইটি সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন। মথিত দধির সূক্ষ্মতম অংশ যেমন নবনীতে পরিণত হয়, তেমনি ভুক্ত অন্নের সূক্ষ্মতম অংশ ঊর্দ্ধে উত্থিত হইয়া মনে পরিণত হয়। তদ্রূপ মনের সূক্ষ্মতম অংশ প্রাণে এবং তেজস্কর বস্তুর সূক্ষ্মতম অংশ বাকে পরিণত হয়।

ইহার পরে পিতার কথামত শ্বেতকেতু পনের দিন কেবল জলপান করিয়া রহিলেন। ফলে 'ঋক, যজুঃ ও সাম মন্ত্রসকল তাহার স্মৃতি হইতে চলিয়া গেল। যখন আবার অন্ন ভোজন করিলেন, তখন তাঁহার স্মৃতি উদ্‌বোধিত হইল। পিতা কহিলেন "পুরুষ ষোড়শকলাযুক্ত। অনশনের ফলে তাঁহার পঞ্চদশ কলা অন্তর্হিত হইয়াছিল। এক কলা মাত্র অবশিষ্ট ছিল। তাহাই অন্নদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া আবার প্রজ্বলিত হইয়াছে। মন অন্নময়, প্রাণ জলময় এবং বাক্‌ তেজোময়।" "পুরুষ যখন নিদ্রিত হয়, তখন সৎস্বরূপের সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় রূপ প্রাপ্ত হয়। সূত্রদ্বারা আবদ্ধ পক্ষী যেমন চতুর্দ্দিকে উড়িয়াও বন্ধনস্থান ছাড়িয়া যাইতে পারে না, মনও তেমনি প্রাণকে ছাড়িয়া যাইতে পারে না। দেহের মূল অন্ন। অন্নের কারণ জল, জলের কারণ তেজ, তেজের কারণ "সৎ"। সৎ-স্বরূপই ভূতদিগের মূল। অন্ন, জল ও তেজ এই তিন দেবতা পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া ত্রিবৃৎ হয়। মুমূর্ষু পুরুষের বাক্‌ মনের সহিত, মন প্রাণের সহিত, প্রাণ তেজের সহিত এবং তেজ পরম দেবতার সহিত মিলিত হয়। এই যে সূক্ষ্মতম বস্তু, ইহাই সমুদয় জগতের আত্মা। তিনিই সত্য। হে শ্বেতকেতু, তুমিই তিনি। (তৎত্বম্‌অসি)।

বহু মধুকর কর্ত্তৃক সংগৃহীত নানা বৃক্ষের রস একত্রিত হইলে, যেমন প্রত্যেক বৃক্ষের রসের এই বিবেক থাকে না, যে আমি অমুক বৃক্ষের রস", তেমনি যাবতীয় প্রাণী সুষুপ্তি সময়ে সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারে না, যে তাহারা সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছে। এই সূক্ষ্মতম সৎবস্তুই জগতের আত্মা, তুমিই তিনি।

"সমুদ্র হইতে উৎপন্ন নদীগণ যেমন সমুদ্রে পতিত হইয়া জানিতে পারে না, "আমি অমুক নদী" তেমনি সমুদয় জীব সৎস্বরূপ হইতে আসিয়া জানিতে পারে না, যে তাহারা সৎস্বরূপ হইতে আসিয়াছে।

"দেহ জীবকর্তৃক পরিত্যক্ত হইলে মৃত হয়, কিন্তু জীব মৃত হয় না, এই সূক্ষ্মতম বস্তুই আত্মা। তুমিই তিনি।"

ইহার পরে একটি ন্যগ্রোধ ফল শ্বেতকেতু পিতার আদেশে ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে সূক্ষ্ম বীজসকল দেখিতে পাইলেন। সেই বীজের একটি ভাঙ্গিয়া তাহার মধ্যে কিছুই দেখিতে পাইলেন না। পিতা বলিলেন "বীজের সূক্ষ্মতম অংশ তুমি দেখিতে পাইতেছ না। সেই সূক্ষ্মতম অংশেই মহা ন্যগ্রোধবৃক্ষ রহিয়াছে। এই অণিমা (সূক্ষ্ম) ই সমুদয় জগতের আত্মা। তৎ ত্বম্ অসি।"

ইহার পরে লবণাক্ত জল শ্বেতকেতুকে আস্বাদন করিতে বলিয়া আরুণি কহিলেন, "এই জলে যেমন লবণ আছে, কিন্তু সে লবণ দৃষ্টিগোচর হয় না, তেমনি আত্মাও বিশ্বের সর্ব্বস্থানে আছেন। কিন্তু তাঁহাকে দেখা যায় না। তুমিই সেই আত্মা।"

ভূমা-তত্ত্ব

নারদ সনৎকুমারের নিকট গিয়া বলিলেন "আমাকে শিক্ষা দিন।" সনৎকুমার বলিলেন "তুমি কি কি জান, আগে বল।" নারদ চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ. গণিত, নীতিশাস্ত্র প্রভৃতি বহুবিধ বিদ্যার নাম করিয়া বলিলেন, "এই সকল সত্ত্বেও আমি মন্ত্রবিৎমাত্র, আত্মবিৎ নহি।" সনৎকুমার কহিলেন "তুমি যে সকল বিদ্যার নাম করিলে, তাহারা সকলেই নামমাত্র। যিনি নামকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, নামের গতি যত দূর, তত দূর তিনি যথেচ্ছ গমন করিতে সক্ষম। নাম অপেক্ষা বাক্ শ্রেষ্ঠ, বাক্‌দ্বারাই যাবতীয় বিদ্যা বিজ্ঞাপিত হয়। বাক্ না থাকিলে ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সত্য, অসত্য, সাধু, অসাধু, প্রীতিকর, অপ্রীতিকর কিছুই বিজ্ঞাপিত হইত না। যিনি বাক্‌কে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করেন, বাকের যত দূর গতি, তত দূর তিনি যথেচ্ছ যাইতে পারেন। বাক্ অপেক্ষা মন শ্রেষ্ঠ। মন বাক্ ও নামকে ধারণ করে। মনদ্বারা কোন বিষয় স্থির করিয়া লইয়া পরে তাহা মানুষ সম্পন্ন করে। যিনি মনকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি মনের যত দূর গতি, তত দূর যাইতে পারেন। মন অপেক্ষা সংকল্প শ্রেষ্ঠ, সংকল্প অপেক্ষা চিত্ত শ্রেষ্ঠ, চিত্ত অপেক্ষা ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা বিজ্ঞান শ্রেষ্ঠ। বিজ্ঞান

অপেক্ষা বল শ্রেষ্ঠ, বল অপেক্ষা অন্ন শ্রেষ্ঠ, অন্ন অপেক্ষা জল শ্রেষ্ঠ, জল অপেক্ষা তেজ শ্রেষ্ঠ, তেজ অপেক্ষা আকাশ শ্রেষ্ঠ, আকাশ অপেক্ষা স্মৃতি শ্রেষ্ঠ, স্মৃতি অপেক্ষা আশা শ্রেষ্ঠ, আশা অপেক্ষা প্রাণ শ্রেষ্ঠ।

"ধ্যায়তীব পৃথিবী, ধ্যায়তীবান্তরীক্ষং, ধ্যায়ন্তি ইব পর্ব্বতাঃ"—পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ও পর্ব্বতেরা যেন ধ্যান করিতেছে। ধ্যানকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করিলে, ধ্যানের গতি যত দূর তত দূর যাওয়া যায়। বিজ্ঞানদ্বারা সর্ব্ববিদ্যার অধিকারী হওয়া যায়। বলশালী হইলেই বিজ্ঞান লাভ করা যায়। অন্ন ভক্ষণ না করিলে বল হয় না। জল (সুবৃষ্টি) না হইলে অন্ন উৎপন্ন হয় না, স্মৃতি না থাকিলে কিছুই জানা সম্ভবপর হয় না। আশাদ্বারা উদ্দীপিত হইয়াই স্মৃতিমান পুরুষ অধ্যয়ন ও কর্ম্ম প্রভৃতি করে। রথনাভিতে অরের ন্যায় এই সমুদয়ই প্রাণে প্রতিষ্ঠিত।

"বিজ্ঞান মনন না করিলে হয় না। শ্রদ্ধা ব্যতিরেকে মনন হয় না। নিষ্ঠা (গুরুতে) না থাকিলে শ্রদ্ধা হয় না। কর্ম্ম না করিলে নিষ্ঠাবান হওয়া যায় না। কর্ম্ম সুখসাপেক্ষ—সুখ লাভ না করিলে কেহ কর্ম্ম করে না।

"ভূমাই (মহান্) সুখস্বরূপ—যাহা ভূমা, তাহাই সুখ। যাহা অল্প, তাহাতে সুখ নাই।"

"যো বৈ ভূমা, তৎসুখং। নাল্পে সুখমস্তি।" "যত্র নান্যৎ পশ্যতি, নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি, স ভূমা। যত্র অন্যৎ পশ্যতি, অন্যৎ শৃণোতি, অন্যৎ বিজানাতি, তৎ অল্পং।" যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায় না, অন্য কিছু শোনা যায় না, অন্য কিছু জানা যায় না, তাহাই ভূমা, আর যাহাতে অন্য কিছু দেখা যায়, অন্য কিছু শোনা যায়, অন্য কিছু জানা যায়, তাহা অল্প।

"ভূমা স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, অথবা স্ব-মহিমায় প্রতিষ্ঠিত নহেন (তিনি নিরালম্ব)। তিনি অধোভাগে, ঊর্দ্ধভাগে, পশ্চাতে, পুরোভাগে, দক্ষিণে, বামে; তিনিই এই সব। আমিই এই সব।" ভূমাবিৎ সকল জগৎ ব্রহ্মময় দেখেন।

দহর-বিদ্যা

দেহরূপ ব্রহ্মপুরে দহর (ক্ষুদ্র) পুণ্ডরীক (পদ্মাকার) গৃহের মধ্যে এক দহর আকাশ আছে। ইহার মধ্যে যাহা আছে, তাহার অন্বেষণ করিতে হইবে। এই বহিঃস্থ আকাশ যে পরিমাণ, হৃদয়াভ্যন্তরস্থ আকাশও সেই পরিমাণ। দ্যৌঃ, পৃথিবী, অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য, চন্দ্র, বিদ্যুৎ, নক্ষত্রগণ এবং এই দেহবান্ আত্মার ইহলোকে যাহা আছে এবং যাহা নাই, সকলই ইহাতে

নিহিত। দেহের জরা হইলে এই অন্তরস্থ আকাশ জীর্ণ হয় না, দেহ নষ্ট হইলে ইহা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না। ইহাই সত্যস্বরূপ ব্রহ্মপুর। ইনিই আত্মা,—বিমৃত্যু, বিশোক, বিজিঘৎস (ভোজনেচ্ছারহিত), সত্যকাম, সত্যসংকল্প। ইহাতেই সকল কামনা নিহিত রহিয়াছে। যিনি ইহলোকে এই আত্মাকে এবং সত্যকামনাসমূহকে জানিয়া চলিয়া যান, সর্ব্বলোকে তাঁহার স্বাধীন আচরণ হয়। তিনি যে কাম্য বস্তু কামনা করেন, সংকল্পমাত্রই তাহা তাঁহার নিকট উপস্থিত হয়। মানুষের যাবতীয় সত্যকামনা হৃদয়াকাশে বর্ত্তমান, কিন্তু অসত্য আবরণ দ্বারা আবৃত। সমুদয় প্রাণী অহরহ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াও সত্য বস্তু লাভ করিতে পারে না, কারণ তাহারা অসত্য দ্বারাআচ্ছাদিত।

এই আত্মা হৃদয়ে অবস্থিত। যিনি ইহা জানেন, তিনি অহরহঃ (সুষুপ্তি-কালে) হৃদয়াকাশে ব্রহ্মলাভ করেন। এই সম্প্রসাদ (প্রসাদগুণযুক্ত সুষুপ্ত আত্মা) শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরমজ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া স্বীয় রূপে প্রকাশিত। "এষ সম্প্রসাদঃ অস্মাৎ শরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পাদ্য স্বেন রূপেণ অভিনিষ্পদ্যতে।" ইনিই আত্মা, ইনিই অমৃত ও অভয়, ইনিই ব্রহ্ম।

ইহার পরে আছে ব্রহ্মলোকের বর্ণনা। এই আত্মা সেতুস্বরূপ। লোক-সমূহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, সেইজন্য ইনি তাহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। (সেতুঃ বিধৃতিঃ এষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায়)। অহোরাত্র এই সেতু পার হইতে পারে না। জরা, মৃত্যু, শোক, সুকৃতি, দুষ্কৃতি ইহা পার হইতে পারে না। ইহা পাপবিহীন। ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা এই ব্রহ্মলোক লাভ করা যায়। হৃদয়ের যে সকল নাড়ী, তাহারা পিঙ্গল, শুক্ল, নীল, পীত ও লোহিত বর্ণের সূক্ষ্ম রস দ্বারা পূর্ণ। সূর্য্যরশ্মিসমূহ এই সকল নাড়ীতে প্রবেশ করে, এবং আবার নাড়ীসমূহ হইতে বিস্তৃত হইয়া সূর্য্যে প্রবেশ করে। যখন পুরুষ দেহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হয়, তখন এই সকল রশ্মিদ্বারা উর্দ্ধে গমন করিতে পারে। একটি নাড়ী মূর্দ্ধা পর্য্যন্ত বিস্তৃত। যিনি এই নাড়ীদ্বারা উর্দ্ধদিকে গমন করেন, তিনি অমৃতত্ব লাভ করেন। অন্যান্য নাড়ী বিভিন্ন দিকে যাইবার পথ। আদিত্যই ব্রহ্মলোকের দ্বার। যাহারা বিদ্বান, তাহারা আদিত্যে প্রবেশ করেন। অন্যে পারে না।

প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদ

দেব ও অসুরগণ শুনিতে পাইল যে প্রজাপতি বলিয়াছেন, যে অপহত-পাপ, বিজর, বিমৃত্যু, বিশোক, বিজিঘৎস, অপিপাস, সত্যসংকল্প, সত্যকাম আত্মাকে

যিনি জানিতে পারেন, তিনি সমুদয় লাভ করেন ও তাঁহার সমুদয় কামনা পূর্ণ হয়। শুনিয়া ইন্দ্র ও বিরোচন (অসুর) উভয়েই প্রজাপতির সমীপে গিয়া আত্মাকে জানিবার ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন। তখন প্রজাপতি কহিলেন, "চক্ষুতে এই যে পুরুষ দৃষ্ট হন, ইনিই অমৃত ও অভয় আত্মা। ইনিই ব্রহ্ম।" ইন্দ্র ও বিরোচনের প্রশ্নের উত্তরে প্রজাপতি আরও বলিলেন, "জলে ও দর্পণে যে পুরুষ দৃষ্ট হন, তিনিও আত্মা।" প্রজাপতির কথার অর্থ এই, যে যিনি চক্ষুর মধ্যে থাকিয়া দর্শন করেন, তিনিই আত্মা। কিন্তু ইন্দ্র ও বিরোচন বুঝিলেন অন্যরূপ। তাঁহারা জলপূর্ণ পাত্রের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, "আমরা লোম ও নখ পর্য্যন্ত আত্মার প্রতিরূপ দর্শন করিলাম।" সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া তাঁহারা আবার জলের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "জলের মধ্যে আমাদের মতই সুন্দর অলংকার ও ভূষণে ভূষিত পরিহিত দুই জনকে দেখিতে পাইতেছি।" প্রজাপতি বলিলেন "উনিই আত্মা—উনিই ব্রহ্ম।" ইন্দ্র ও বিরোচন তখন প্রতিগমন করিলেন। বিরোচন অসুরদিগের নিকট গিয়া প্রজাপতি-উক্ত উপদেশ শিক্ষা দিলেন এবং কহিলেন, "দেহেরই পূজা ও পরিচর্য্যা করিলে ইহলোক ও পরলোক উভয়ই লাভ করা যায়।" ইন্দ্র কিন্তু প্রজাপতির নিকট ফিরিয়া আসিয়া কহিলেন, "জলমধ্যে যে শরীর দৃষ্ট হয়, তাহা এই শরীরের যেরূপ অবস্থা হয়, সেইরূপই হয়। এই শরীর অন্ধ হইলে অন্ধ হয়, বিনষ্ট হইলে বিনষ্ট হয়। তাহাই যদি আত্মা হয়, তাহা হইলে এ বিদ্যায় কোন মঙ্গল আমি দেখিতে পাই না।" প্রজাপতি ইন্দ্রকে ৩২ বৎসর তপস্যা করিতে বলিলেন। ৩২ বৎসরান্তে প্রজাপতি কহিলেন, "যিনি স্বপ্নাবস্থায় মহীয়ান হইয়া বিচরণ করেন তিনিই আত্মা, তিনিই ব্রহ্ম।" ফিরিবার সময় ইন্দ্রের মনে সংশয় উপস্থিত হওয়ায়, তিনি প্রজাপতির নিকট পুনরায় গিয়া বলিলেন, "এ শিক্ষায় আমি মঙ্গল দেখিতে পাইতেছি না, কেননা স্বপ্নপুরুষকে যেন কেহ বিনাশ করিতেছে, তিনি দুঃখ অনুভব করিতেছেন, রোদন করিতেছেন, ইহা স্বপ্নকালে মনে হয়।" প্রজাপতির আদেশে ইন্দ্র আরও ৩২ বৎসর তপস্যা করিয়া ফিরিয়া আসিলে প্রজাপতি কহিলেন, "নিদ্রিত অবস্থায় যে প্রসুপ্ত জীব একীভূত হয়, প্রসন্নতা লাভ করে এবং স্বপ্ন দেখে না, ইনিই আত্মা।" ইন্দ্র প্রতিগমন-কালে চিন্তা করিলেন, "সুষুপ্তিকালে না থাকে আত্মজ্ঞান, না থাকে ভূতদিগের জ্ঞান, সে আত্মা তো বিনাশের সমান। এ শিক্ষায় মঙ্গল কোথায়?" প্রজাপতির নিকট ফিরিয়া গিয়া তিনি তাঁহার সংশয়ের কথা বলিলেন, এবং পুনরায় পাঁচ বৎসর তপস্যা করিলেন। তখন

প্রজাপতি কহিলেন, "এই মর্ত্ত্য শরীরই অশরীর অমৃত আত্মার অধিষ্ঠান। শরীরী আত্মার প্রিয়-অপ্রিয় সংযোগ থাকে; কিন্তু অশরীরী আত্মাকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না। প্রসাদগুণসম্পন্ন আত্মা শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতিঃসম্পন্ন হইয়া বিরাজ করে। তখন ইহা উত্তম পুরুষ। তখন তিনি আনন্দ উপভোগ করিয়া বিচরণ করেন, দেহকে ভুলিয়া যান।"

"দেহের মধ্যে থাকিয়া যিনি দেখেন, শোনেন, আঘ্রাণ করেন ও মনন করেন, তিনিই আত্মা। আকাশ নামরূপের প্রকাশক। যিনি এই নামরূপের অভ্যন্তরে বর্ত্তমান, তিনি ব্রহ্ম, তিনিই আত্মা।" "আমি যেন শ্যাম হইতে (হৃদয়স্থিত ব্রহ্ম হইতে) শবলে (বিচিত্ররূপে) গমন করি, শবল হইতে শ্যামে গমন করি। অশ্ব যেমন লোম কম্পিত করে, তেমনি যেন পাপকে কম্পিত করিয়া বিদূরিত করি, রাহুর গ্রাস হইতে চন্দ্রের মত আমি যেন দেহ হইতে মুক্তিলাভ করি এবং কৃতাত্মা হইয়া ব্রহ্মলোক লাভ করি।"

ঈশোপনিষৎ (শুক্ল যজুর্বেদ-সংহিতা)

এই পরিবর্ত্তনশীল জগতীতে যাহা কিছু আছে, সকলই জগৎ (গমনশীল, ক্ষণস্থায়ী)। তাহাদের মধ্যে সকল বস্তুই ঈশ্বরকর্ত্তৃক অধ্যাসিত মনে করিবে। সুতরাং ত্যাগদ্বারা (আসক্তিত্যাগদ্বারা) ভোগ করিবে। (অথবা পরের জন্য ত্যাগে যে আনন্দ, তাহাই উপভোগ করিবে)। কাহারও ধনে লোভ করিও না।

এই পৃথিবীতে (বিহিত) কর্ম্ম করিতে করিতে শতবর্ষ বাঁচিতে ইচ্ছা করিবে। এইরূপ করিলে তোমাকে কর্ম্মে লিপ্ত হইতে হইবে না। ইহা ভিন্ন অন্য পথ নাই। যাহারা আত্মঘাতী (আত্মজ্ঞানহীন), তাহারা অন্ধ তমসাচ্ছন্ন অসূর্য্যালোকসকলে গমন করে।

আত্মা এক এবং অনেজৎ (অচল), কিন্তু মন হইতেও বেগবান। (অর্থাৎ কূটস্থ আত্মা অচল, কিন্তু বিশ্বাত্মারূপে তিনিই বেগবান্)। তিনি দেবতাদিগের (ইন্দ্রিয়দিগের) অগ্রে অগ্রে গমন করেন। তাহারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হয় না। ধাবমান্ তিনি অন্য সকলকে (মন-বাক-ইন্দ্রিয় প্রভৃতিকে) অতিক্রম করিয়া যান। সেই পরমাত্মাতে মাতরিশ্বা (বায়ু) অপঃ (জল, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি) ধারণ করেন। এই ব্রহ্ম চলেন (বিশ্বাত্মারূপে), এবং চলেন না (কূটস্থ রূপে)। তিনি দূরে, তিনি নিকটে, তিনি জগতের অভ্যন্তরে (অনুস্যূত), তিনি জগতের বাহিরেও (অতিক্রান্ত Transcendent)।

যিনি সর্ব্বভূত আত্মার মধ্যে, এবং আত্মাকে সর্ব্বভূতের মধ্যে দর্শন করেন, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না। যখন জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট সকল ভূতই আত্মাস্বরূপ হয়, তখন মোহ ও শোকের সম্ভাবনা কোথায় ?

স পর্য্যগাৎ শুক্রমকায়মব্রণম্
অস্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিদ্ধং ॥
কবির্মনীষী পরিভূঃ স্বয়ম্ভূঃ
যাথাতথ্যতোঽর্থান্ ব্যদধাৎ শাশ্বতীভ্যঃ সমাভ্যঃ

তিনি পরি (চতুর্দিকে) গত, অর্থাৎ সর্ব্বব্যাপী, শুক্র (জ্যোতির্ম্ময়), কায়হীন, ব্রণহীন, স্নায়ুহীন, শুদ্ধ, অপাপবিদ্ধ, তিনি কবি, মনীষী (মনের নিয়ন্তা), পরিভূ (সকলের উপরি অবস্থিত), স্বয়ম্ভূ। তিনি প্রাণীদিগের ভোগের নিমিত্ত সর্বকালে যথোপযুক্ত (কর্ম্মানুসারে) বস্তুসকলের বিধান করিয়াছেন।

যাহারা অবিদ্যার উপাসনা করে, অর্থাৎ কেবল শাস্ত্রে বিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্ম্ম করে, তাহারা অন্ধতমঃর মধ্যে প্রবেশ করে। অর্থাৎ কেবল কর্ম্ম দ্বারা অবিদ্যার নাশ ও মুক্তি হয় না। আবার (কর্ত্তব্য কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া) কেবল যাহারা বিদ্যায় রত অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের আলোচনা করে, তাহারা তাহা অপেক্ষা গভীরতর অন্ধকারে প্রবেশ করে। জ্ঞান ও কর্ম্মের ফল পৃথক। যিনি জ্ঞান ও কর্ম্ম উভয়কে একত্র অনুষ্ঠেয় বলিয়া জানেন, তিনি কর্ম্মদ্বারা মর জীবন হইতে মুক্ত হইয়া জ্ঞানদ্বারা অমৃতত্ব লাভ করেন।

যাহারা অসম্ভূতির (সম্ভূতি=যাহার উৎপত্তি আছে। উৎপত্তিহীন অজা প্রকৃতি=অসম্ভূতি) উপাসনা করে, তাহারা অন্ধতমঃতে প্রবেশ করে। যাহারা সম্ভূতির (উৎপত্তিশীল দেবতার) উপাসনা করে, তাহারা গাঢ়তর অন্ধকারে প্রবেশ করে। উৎপত্তিশীল দেবতার উপাসনার ফল, অজা প্রকৃতির উপাসনার ফল হইতে ভিন্ন।

হিরণ্ময়েণ পাত্রেণ সত্যস্যাপিহিতং মুখং।
তৎ ত্বং পূষণ অপাবৃণু, সত্য ধর্ম্মায় দৃষ্টয়ে।

সূর্য্যমণ্ডলের জ্যোতিঃদ্বারা (অথবা স্বর্ণময় পাত্রের ন্যায় ভোগ্যবস্তুদ্বারা) (সূর্য্যমণ্ডলের অধিষ্ঠাতা) সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মের মুখ আচ্ছাদিত। (অথবা ভোগ্য বস্তু সকলের চিন্তা ব্রহ্মকে দেখিতে দেয় না।) হে পূষণ (জগৎ-পোষণকর্ত্তা ব্রহ্ম) তুমি সেই আবরক পাত্র অপসারিত কর, সত্যধর্ম্ম ও আমার দৃষ্টির জন্য। হে পূষণ, হে "এক ঋষি" (শ্রেষ্ঠ-দ্রষ্টা), হে সূর্য্য, হে প্রজাপতির পুত্র, হে যম (সংহার কর্ত্তা), তোমার রশ্মিসকল অপসারিত কর, তেজ সংবরণ

কর ; তোমার যে কল্যাণতম রূপ তাহা আমি দর্শন করিব। আদিত্য-মণ্ডল-মধ্যবর্ত্তী যে পুরুষ, তিনিই আমি।

কেনোপনিষৎ (সামবেদীয়)

"কেন" শব্দের দ্বারা এই উপনিষদের আরম্ভ, তাই ইহার নাম কেনোপনিষৎ। ইহার নামান্তর তলব-কারোপনিষৎ। আমাদের মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়গণ হৃষীকেশ কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া স্ব-স্ব কর্ম্ম করে। "কাঁহাকর্ত্তৃক চালিত হইয়া মন বিষয়ে পতিত হয়? প্রধান প্রাণ কাঁহা-কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া স্বকর্ম্মাভিমুখে গমন করে? কাহার প্রেরণায় লোক বাক্য বলে? কোন্ দেবতা চক্ষু ও শ্রোত্রকে স্বকার্য্যে নিযুক্ত করেন? যিনি শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন, বাক্যের বাক্য, প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, তিনি এই সকলে আত্মভাব বর্জন করিয়া এই লোক হইতে গিয়া অমৃত হন।"

সেখানে চক্ষু ও বাক্ যায় না (ব্রহ্ম বাক্য ও মনের অতীত)। আমরা তাঁহাকে জানিনা, কিরূপে তাঁহার সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হয়, তাহাও জানিনা। তিনি বিদিত বস্তু হইতে ভিন্ন, অবিদিত বস্তু হইতেও ভিন্ন, পূর্ব্বাচার্য্যদিগের নিকট ইহা শুনিয়াছি। যিনি বাক্যদ্বারা প্রকাশিত হন না, বাক্য যাঁহাকর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম, তাঁহাকে জান। দেশকাল-পরিচ্ছিন্ন বস্তু—লোকে যাহার উপাসনা করে—তিনি তাহা নহেন। লোকে মনদ্বারা যাঁহাকে মনন করিতে পারে না, কিন্তু যিনি মনকে জানেন, তিনিই ব্রহ্ম। লোকে চক্ষু-দ্বারা যাঁহাকে দেখিতে পায় না, যাঁহার শক্তিতে লোকে দর্শন করে, তিনিই ব্রহ্ম। লোকে যাঁহাকে শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণ করে না, যিনি শ্রোত্রকে শ্রবণ করেন, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁহাকে প্রাণ (ঘ্রাণেন্দ্রিয়) দ্বারা গ্রহণ করা যায় না, যাঁহাদ্বারা ঘ্রাণেন্দ্রিয় বিষয়াভিমুখে নীত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। যাঁহাকে লোকে উপাসনা করে, তিনি ব্রহ্ম নহেন। যদি তুমি মনে কর ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছ, তাহা হইলে বুঝিবে তুমি ব্রহ্ম-সম্বন্ধে যাহা জানিয়াছ, তাহা দভ্র অর্থাৎ অতি অল্প। দেবতাদিগের মধ্যে ব্রহ্মের যে রূপ, তাহাও অল্প। অতএব ব্রহ্ম তোমার বিচার্য্য বিষয়। গুরুর মুখে ইহা শুনিয়া এবং ব্রহ্ম বিষয়ে বিচার করিয়া ও ব্রহ্মকে অনুভব করিয়া শিষ্য ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, "আমার মনে হয় এখন আমি ব্রহ্মকে জানিয়াছি।" গুরু বলিলেন—

যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতম্ অবিজানতাম্॥

যিনি মনে করেন ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই, তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন। যিনি মনে করেন তিনি ব্রহ্মকে জানিয়াছেন, তিনি জানেন না। যাঁহারা উত্তম-জ্ঞানী, তাঁহাদের নিকট ব্রহ্ম অবিজ্ঞাত (তাঁহারা মনে করেন, ব্রহ্মকে জানিতে পারেন নাই)। কিন্তু অসম্যকদর্শীদিগের নিকট তিনি বিজ্ঞাত (তাহারা মনে করে ব্রহ্মকে উত্তমরূপে জানিয়াছে)।

ব্রহ্ম যদি "প্রতি-বোধ-বিদিত" হন, অর্থাৎ প্রত্যেক বোধের ব্যাপারে তাহার কর্তা বলিয়া বিদিত হন (সর্বপ্রত্যয়দর্শীরূপে), তাহা হইলেই তিনি বিদিত হন। এই জ্ঞানে অমৃতত্ব-লাভ হয়। আত্মার স্বরূপজ্ঞানে শক্তি-লাভ হয় এবং এই জ্ঞানে অমরত্ব-লাভ হয়। ইহ জন্মেই ব্রহ্মকে জানিলে সত্য অর্থাৎ জন্ম-সাফল্য-লাভ হয়; না জানিলে, "মহতী বিনষ্টিঃ" অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মজরামৃত্যু ভোগ হয়। সমুদয় ভূতে পরমাত্মার উপলব্ধি করিয়া জ্ঞানী ইহলোক হইতে অপসৃত হইয়া অমর হন।

ব্রহ্মই অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া দেবতাদিগকে বিজয় দান করিলেন। কিন্তু দেবগণ মনে করিলেন এই বিজয়মহিমা তাহাদেরই। ইহা জানিতে পারিয়া ব্রহ্ম দেবতাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইলেন। কিন্তু দেবতারা তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। তাঁহার স্বরূপ জানিবার জন্য তাঁহারা অগ্নিকে পাঠাইলেন। ব্রহ্ম অগ্নিকে কহিলেন, "তুমি কে?" অগ্নি কহিলেন, "আমি অগ্নি, জাতবেদা, পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলই আমি দগ্ধ করিতে পারি"। একটি তৃণ অগ্নির সম্মুখে ধরিয়া ব্রহ্ম বলিলেন "দগ্ধ কর দেখি এই তৃণ খণ্ড।" সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও অগ্নি সে তৃণ দগ্ধ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পরে গেলেন বায়ু। ব্রহ্ম কহিলেন "তুমি কে?" বায়ু কহিলেন "আমি বায়ু—মাতরিশ্বা। আমি সকল বস্তুই গ্রহণ করিতে পারি।" "তবে গ্রহণকর দেখি এই তৃণখণ্ডকে", ব্রহ্ম কহিলেন। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও বায়ু উহা গ্রহণ করিতে না পারিয়া ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পরে গেলেন ইন্দ্র। কিন্তু ব্রহ্ম অকস্মাৎ তিরোহিত হইলেন। ইন্দ্র দেখিলেন আকাশে স্ত্রীরূপিণী অতি সৌন্দর্য্যশালিনী হৈমবতী উমা আবির্ভূতা। ইন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন "এই পূজনীয়স্বরূপ (যক্ষ) কে?" তিনি বলিলেন "ইনি ব্রহ্ম। তিনি তোমাদিগকে যে বিজয় দান করিয়াছেন, তাহাতেই তোমরা মহিমান্বিত হইয়াছ।" এই হৈমবতী উমা ব্রহ্ম-বিদ্যা।

ইহা ব্রহ্ম-সম্বন্ধে একটি উপমা বিদ্যুতের স্ফুরণের মতো, চক্ষুর নিমেষ-

পাতের মতো তাঁহার আবির্ভাব। মন যেন ব্রহ্মের নিকট যায়, সাধক যেন মনের দ্বারা তাঁহাকে বারবার স্মরণ করেন। তিনি সম্ভজনীয় নামে প্রখ্যাত, সম্ভজনীয় রূপে উপাস্য।

তপস্যা (শরীর, ইন্দ্রিয় ও মনের সমাধান), দম (চিত্তস্থৈর্য্য) এবং কর্ম্ম ব্রহ্ম-বিদ্যার প্রতিষ্ঠা (উপায়)। বেদাধ্যয়ন ইহার সর্ব্বাঙ্গ (সহায়) এবং সত্য ইহার আশ্রয়।

কঠোপনিষৎ (কৃষ্ণ যজুর্বেদী)

যজুর্বেদের একশাখার নাম কঠ। এই উপনিষৎখানি কঠশাখার মন্ত্রভাগের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। এই উপনিষৎকে "কাঠকোপনিষৎ"ও বলে।

বাজশ্রবাঃ-নামক ঋষির পৌত্র ঔদ্দালকি-নামক ঋষি স্বর্গলাভকামনায় বিশ্বজিৎ যজ্ঞে সর্ব্বস্ব দান করিয়াছিলেন। যজ্ঞের দক্ষিণা-দানের সময় তাঁহার বালক পুত্র নচিকেতা দেখিলেন দক্ষিণারূপে দত্ত গাভীগুলি রুগ্ন ও বৃদ্ধ। এরূপ গাভী দান করিলে অনন্দা-নামক লোকে গমন করিতে হয়। পিতার নিকট গিয়া বালক বলিল "আমাকে কাহাকে দান করিবেন ?" পিতা কথা কহিলেন না। দ্বিতীয় বারের পরে তৃতীয় বার নচিকেতা এই প্রশ্ন করিলে রুষ্ট হইয়া পিতা বলিলেন "তোমাকে দিব যমকে।" পুত্র পিতাকে সত্য হইতে বিচ্যুত হইতে দিলেন না। নচিকেতাকে যমালয়ে পাঠাইতে হইল। যম গৃহে ছিলেন না। তিন রাত্রি নচিকেতা অনাহারে থাকিলেন। যম গৃহে ফিরিয়া কহিলেন, "আমার গৃহে অতিথি তুমি তিন রাত্রি অনাহারে আছ। আমি তোমাকে তিনটি বর দিব। প্রার্থনা কর।" নচিকেতা কহিলেন, "আমার জন্য উৎকণ্ঠিত পিতা উৎকণ্ঠা-মুক্ত এবং বিগত-রোষ হইয়া আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ; গৃহে যখন ফিরিব, তখন যেন তিনি আমাকে সাদর সম্ভাষণ করেন।" যম কহিলেন "তাহাই হইবে।" ইহা প্রথম বর। দ্বিতীয় বরে নচিকেতা স্বর্গপ্রাপক অগ্নি-সম্বন্ধে সকল কথা জানিতে চাহিলেন। সমস্ত বলিয়া যম কহিলেন, "এই স্বর্গ-সাধন অগ্নি নচিকেতার নামে প্রসিদ্ধ হইবে।"

তখন নচিকেতা বলিলেন—

> যেয়ম্ প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে,
> অস্তি ইত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
> এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্ট স্ত্বয়াহং,
> বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ ॥

মৃত মনুষ্য-সম্বন্ধে এই যে বিচিকিৎসা (সংশয়) আছে, কেহ বলে (মৃত্যুর পরেও) থাকে, কেহ বলে থাকে না। এই বিষয়-সম্বন্ধে তোমার উপদেশ চাই। ইহাই তৃতীয় বর।

যম বলিলেন—

> দেবৈর ত্রাপি বিচিকিৎসিতং পুরা,
> নহি সুবিজ্ঞেয়ম্ অণুরেব ধর্ম্মঃ।
> অন্যং বরং নচিকেতো বৃণীষ্ব
> মা মোপরোৎসীঃ অতি মা সৃজৈনম্।

এ বিষয়ে পূর্ব্বে দেবতাদেরও সংশয় হইয়াছিল। ইহা সুবিজ্ঞেয় নহে, সূক্ষ্ম। তুমি অন্য বর প্রার্থনা কর, আমাকে উপরোধ করিও না। এই বরের ইচ্ছা ত্যাগ কর।

নচিকেতা কহিলেন "এই সংশয়িত বিষয়ে তোমার মতো বক্তা কোথায় পাইব? ইহার তুল্য কোনও অন্য বর নাই। এই বরই আমি চাই।"

যম কহিলেন "শত বর্ষ আয়ু চাও, পুত্র-পৌত্র চাও, হস্তী অশ্বাদি পশু, বিস্তৃত রাজ্য, যাহা চাও, তাহাই দিব। যে কাম্য বস্তু পৃথিবীতে দুর্লভ, তাহা প্রার্থনা কর, কিন্তু মরণ-সম্বন্ধে কিছুই জিজ্ঞাসা করিও না।" নচিকেতা কহিলেন "হে অন্তক, তুমি যে সকল ভোগের কথা বলিলে, তাহারা ক্ষণস্থায়ী। সমগ্র জীবনও অল্পক্ষণস্থায়ী। তোমার অশ্বাদি ও নৃত্যগীত তোমারই থাকুক, আমি তাহা চাই না। "ন বিত্তেন তর্পণীয়াঃ মনুষ্যাঃ" (মনুষ্য বিত্তদ্বারা তৃপ্ত হইতে পারে না)। আমি পূর্ব্বের বরই চাই। ক্বধঃস্থ (কুৎসিৎ অধঃস্থ পৃথিবীর অধিবাসী) কোন মরণশীল মানব অজর-অমরদিগের সমীপে গিয়া আত্মার উৎকৃষ্টতর প্রয়োজন ও প্রাপ্তব্য আছে, ইহা জানিয়াও, বর্ণ-রতি-প্রমোদের (রূপ ও প্রণয়-জাত সুখের) অস্থায়িত্ব চিন্তা করিয়াও অতি দীর্ঘ জীবনে আনন্দ উপভোগ করিবে? নচিকেতা অন্য বর চাহে না।"

ইহার পরে যম নচিকেতাকে পরলোক ও ব্রহ্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সে উপদেশ এইরূপ:

শ্রেয় ও প্রেয় ভিন্ন; তাহারা উভয়েই মানুষের নিকট উপস্থিত হয়। জ্ঞানী সম্যক বিবেচনা করিয়া শ্রেয়কে, অল্পবুদ্ধি প্রেয়কে গ্রহণ করে।

বিদ্যা ও অবিদ্যা অত্যন্ত বিপরীত। তাহাদের ফলও বিষূচী বা ভিন্ন। অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান কিন্তু আপনাদিগকে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলিয়া মন্যমান

লোকে অন্ধকর্তৃক নীয়মান অন্ধের মতো অত্যন্ত কুটিল
চালিত হইয়া পরিভ্রমণ করে।"

অনবধান বিত্তমোহে মূঢ় অবিবেকী লোকের
(পারলৌকিক বিষয়) প্রকাশিত হয় না। এই লোকই
নাই, ইহা মনে করিয়া এই সকল লোক পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধী

তং দুর্দর্শং গূঢ়মনুপ্রবিষ্টং গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্
অধ্যাত্ম-যোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরো হর্ষশোকং

সেই দুর্দর্শ গূঢ়বিষয়মধ্যে প্রবিষ্ট, গুহায় (হৃদয়ে)
গহ্বরেষ্ঠ (দুর্গম ইন্দ্রিয়াতীত দেশে স্থিত) পুরাতন দেবতা
হইতে উৎপন্ন জ্ঞানদ্বারা জানিয়া ধীর (জ্ঞানী) হর্ষ ও শোক

"সকল বেদ যে পূজনীয় পুরুষকে কীর্তন করেন, স
উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, যাঁহাকে পাইবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচর্য্য অব
অক্ষর, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম। ইঁহাকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে
শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। ইঁহাকে জানিয়া সাধক ব্রহ্মলোকে মহীয়ান

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমা

এই বিপশ্চিৎ (জ্ঞানবান) আত্মা জন্মেন না, মরেনও না
ইনি উৎপন্ন হন নাই, অন্য কোনও পদার্থেও ক
নাই। ইনি অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ। শরীরের না
হয় না।

এই আত্মা প্রবচন (বেদাধ্যাপন) দ্বারা লভ্য নহেন।
শক্তি) ও বহু শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাও লভ্য নহেন। যাঁহাকে
তাহার নিকট তিনি স্বীয় তনু (স্বরূপ) প্রকাশ করেন।
এবং অসমাহিত ব্যক্তি জ্ঞানদ্বারাও ইঁহাকে প্রাপ্ত হয় না।

হৃদয়াকাশ এই জগতে পরার্দ্ধ (ব্রহ্মের অর্দ্ধ বা
পরার্দ্ধে গুহা-প্রবিষ্ট স্বকর্ম্ম-ফলভোক্তা জীব ও পরম পুরুষকে
(সূর্য্যতাপ ও ছায়া) বলেন (ব্রহ্ম অবশ্য কর্ম্মফল ভোগ ক

আত্মাকে রথী, শরীরকে রথ, বুদ্ধিকে সারথি, মনকে
বলিয়া জানিবে। ইন্দ্রিয়গণ হয় (অশ্ব), ইন্দ্রিয়
"গোচর" অর্থাৎ পথ, এবং ইন্দ্রিয় ও মন-যুক্ত আত্মাকে
বলেন।

যাহার মন অসমাহিত, যে অবিবেকী, তাহার ইন্দ্রিয়গণ দুষ্ট অশ্বের মতো অবশ্য। কিন্তু যিনি সমাহিতচিত্ত ও বিবেকী ও সর্ব্বদা শুচি, তাঁহার ইন্দ্রিয়গণ উত্তম অশ্বের মতো বশে থাকে। অবিবেকী অসমাহিত-মন ও সর্ব্বদা অশুচি জন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত না হইয়া সংসারগতি প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সমাহিত-চিত্ত বিবেকী ও সদা শুচি জন ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হইয়া আর জন্মগ্রহণ করেন না। বিজ্ঞান যাহার সারথি, মন যাহার প্রগ্রহ (বল্‌গা) তিনি সংসারের পারে বিষ্ণুর পরমপদ প্রাপ্ত হন।

ইন্দ্রিয়বিষয়গণ (ইন্দ্রিয়দিগকে আকর্ষণ করে বলিয়া) ইন্দ্রিয়দিগের হইতে শ্রেষ্ঠ। মন (বিষয়দিগকে গ্রহণ ও বর্জন করিতে পারে বলিয়া) বিষয়দিগের হইতে শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি (মনকে সংযত করে বলিয়া) মন হইতে শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ মহান্ আত্মা (মহৎ তত্ত্ব=হিরণ্য গর্ভরূপী সমষ্টি বুদ্ধি)। মহতের পর অব্যক্ত (ব্রহ্মের শক্তি প্রকৃতি), অব্যক্ত হইতে শ্রেষ্ঠ পুরুষ (পরমাত্মা)। পুরুষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। তিনিই শেষ, তিনিই পরম গতি।

উত্তিষ্ঠত, জাগ্রত, প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি ॥

ওঠ (আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হও), জাগরিত হও (মোহ নিদ্রা হইতে)। উৎকৃষ্ট আচার্য্য (বর) গণের নিকট গিয়া পরমাত্মাকে জান। ক্ষুরের শাণিত ধারের ন্যায় দুরতিক্রম্য সেই পথকে পণ্ডিতগণ দুর্গম বলেন।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং।
তথাঽরসং নিত্যমগন্ধবৎ চ যৎ ॥
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং।
নিচায্য তন্মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে ॥

যিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অব্যয়, অরস, নিত্য, গন্ধহীন, অনাদি, অনন্ত, মহৎ তত্ত্বের পর ও ধ্রুব, তাঁহাকে জানিয়া সাধক মৃত্যুমুখ হইতে প্রমুক্ত হন।

স্বয়ম্ভু পরমেশ্বর 'খ' (ইন্দ্রিয়) দিগকে পরাঞ্চি (বহির্মুখী) করিয়াছেন। সেইজন্য মানুষও বহির্বিষয় (পরাঙ্) দেখে, অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না। কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি অমৃতত্ব লাভের ইচ্ছায় আবৃতচক্ষু হইয়া (অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া) প্রত্যগাত্মাকে (দেহস্থিত ব্রহ্মরূপ আত্মাকে) দেখিয়াছেন।

যাহা দ্বারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও মৈথুন জানা যায়, তাহাকে জানিলে জানিবার কি অবশিষ্ট থাকে? ইনিই সেই আত্মা।

যাহাদ্বারা স্বপ্ন ও জাগরণের মধ্যে যে বস্তু আছে, তাহা দেখিতে পাওয়া যায়, সেই মহান্ বিভু আত্মাকে জানিয়া জ্ঞানী শোকাতীত হন।

গর্ভিণী যেমন গর্ভকে উত্তমরূপে রক্ষা করেন, সেইরূপ দুই অরণি কাষ্ঠের মধ্যে গুপ্ত অগ্নিই ব্রহ্ম। যাঁহা হইতে সূর্য্য উদিত হয়, যাঁহাতে অস্ত যায়, তাঁহাতে সকল দেবতা স্থিত, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না। তিনিই ব্রহ্ম।

যাহা এখানে (ইহ), তাহাই সেখানে (অমুত্র)। যে ইহাকে নানারূপে দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। মনদ্বারাই ইঁহাকে পাওয়া যায়। ইহার নানাত্ব নাই। যে নানা দেখে, সে পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়।

অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ পুরুষ দেহের মধ্যে অবস্থিত, তিনি ভূত ও ভবিষ্যতের নিয়ন্তা। তিনি ধূমশূন্য জ্যোতির ন্যায় প্রকাশিত। দুর্গম গিরিশিখরে যে বৃষ্টি হয়, তাহা যেমন সমস্ত পর্ব্বতে বিসৃত হয়, সেইরূপ যে ধর্ম্মদিগকে (সত্বাদি গুণকে) আত্মা হইতে পৃথক দেখে, সে তাহাদের অনুবর্ত্তন করে, অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করে।

নির্ম্মল জলের সহিত নির্ম্মল জল মিলিত হইলে, জল যেমন একরূপই থাকে, তেমনি যে মুনি একত্বের বিষয় জানেন, তাঁহার আত্মাও একরূপ থাকে।

অজ ও নিত্যপ্রকাশস্বরূপ আত্মার একাদশ দ্বারযুক্ত এক নগর আছে। এই নগরস্বামীকে ধ্যান করিয়া সাধক বীতশোক ও মুক্ত হন।

ব্রহ্ম শুচিসৎ (আকাশবাসী) হংস (সূর্য্য), অন্তরীক্ষবাসী বসু (বায়ু), বেদিসৎ (যজ্ঞবেদিবাসী) হোতা (অগ্নি), দুরোনসৎ (কলসবাসী) অতিথি (সোমরস), নৃসৎ (নরের মধ্যবাসী), বরসৎ (দেবগণের মধ্যবাসী), ঋতসৎ (যজ্ঞের মধ্যবাসী), ব্যোমসৎ (আকাশবাসী), অব্জা (জলমধ্যে জলজপ্রাণী), গোজা (পৃথিবীতে ব্রীহি যবাদি), ঋতজা (যজ্ঞাঙ্গ), অদ্রিজা (পর্ব্বত হইতে উদ্ভূত নদী)। তিনি ঋত, তিনি বৃহৎ। তিনি যখন দেহ হইতে বহির্গত হন, তখন দেহে কিছু অবশিষ্ট থাকে না।

এত ভাবে ব্রহ্মের কথা বলিয়া যম মৃত্যুর পরের কথা বলিতেছেন। কেহ মৃত্যুর পরে পুনরায় শরীর-ধারণের জন্য যোনির মধ্যে প্রবেশ করে। কেহবা স্থাবর দেহ (বৃক্ষরূপ) প্রাপ্ত হয়। যাহার যেরূপ কর্ম্ম ও যেরূপ জ্ঞান, তাহার সেইরূপ গতি হয়।

ইহার পরে আবার ব্রহ্মের কথা।

যিনি সুপ্ত জনগণের মধ্যে জাগরিত থাকিয়া কাম্যবস্তুসকল নির্ম্মাণ করেন, তিনিই শুক্র (শুদ্ধ), তিনিই ব্রহ্ম, তিনিই অমৃত।

অগ্নির্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।
বায়ুর্যথৈকো ভুবনং প্রবিষ্টো
রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব।
একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা
রূপং রূপং প্রতিরূপো বহিশ্চ।

অগ্নি ও বায়ু যেমন ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তুর রূপভেদে সেই সেই রূপ প্রাপ্ত হয়, তেমনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ভুবনে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তুভেদে তাহাদের রূপ ধারণ করিয়াছেন, এবং তাহাদের বাহিরেও আছেন।

সর্ব্বলোকের চক্ষুঃস্বরূপ সূর্য্য যেমন চক্ষু-গ্রাহ্য বাহ্য অশুচি বস্তুর সহিত লিপ্ত হন না, তেমনি সর্ব্বভূতান্তরাত্মা বাহ্য লোকদুঃখের সহিত লিপ্ত হন না।

যিনি স্বকীয় এক রূপ বহুধা বিভক্ত করেন, সেই সর্ব্বনিয়ন্তা, সর্ব্ব-ভূতান্তরাত্মাকে যাহারা আপনার মধ্যে দর্শন করেন, তাহাদেরই শাশ্বত সুখ, অন্যের জন্য সে সুখ নহে।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্
তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাঃ
তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাং॥

অনিত্য বস্তুদিগের মধ্যে নিত্য, চেতন বস্তুদিগের মধ্যে চেতন, যিনি একাকী বহুর কাম্যবস্তু সকলের বিধান করেন, যে জ্ঞানিগণ তাঁহাকে আপনার মধ্যে দর্শন করেন, তাহাদেরই শাশ্বত শান্তি, অপরের নহে।

যোগিগণ "তদেতৎ" (এই সেই) রূপে যাঁহাকে জানিয়া অনির্দ্দেশ্য পরম সুখ বলিয়া মনে করেন, তিনি স্বয়ং দীপ্ত পান, অথবা অন্যের আলোকে দীপ্তি পান, তাহা আমি কিরূপে জানিব?

ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্র-তারকং,
নেমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়মগ্নিঃ।
তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং,
তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি।

সেখানে সূর্য্য, চন্দ্র ও তারকা কিরণ দেয় না, অগ্নির তো কথাই নাই। দীপ্তিমান তাঁহার দীপ্তিতেই সকল বস্তু প্রকাশিত হয়।

এই সংসার সনাতন। ইহা উর্দ্ধমূল এবং নিম্নশাখ অশ্বত্থবৃক্ষের মতো। উর্দ্ধে যে মূল, তাহা ব্রহ্ম, তিনিই শুক্র (জ্যোতির্ম্ময়), তিনিই অমৃত। তাঁহাতেই সকল লোক স্থিত, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।

যাহা কিছু চঞ্চল বস্তু, সকলই প্রাণরূপে ব্রহ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রাণেই কম্পিত হইতেছে। সেই ব্রহ্ম উদ্যত বজ্রের মতো মহৎ ভয়। তাঁহার ভয়ে অগ্নি ও সূর্য্য তাপ দেয়, ইন্দ্র ও বায়ু ধাবিত হয় (স্ব স্ব কার্য্য সম্পাদন করে)। শরীর-ত্যাগের পূর্ব্বে যে ইহা বুঝিতে সক্ষম না হয়, সে পুনরায় সৃষ্ট জীবের আবাস লোকসকলে জন্মগ্রহণ করে।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ, মনসো সত্ত্বমুত্তমম্। সত্ত্বাদধি মহান্ আত্মা, মহতোঽব্যক্ত-মুত্তমম্ ॥ অব্যক্তাৎ পরঃ পুরুষঃ, ব্যাপকোঽলিঙ্গ এবচ। যং জ্ঞাত্বা মুচ্যতে জন্তুরমৃতত্বং চ গচ্ছতি ॥ ইন্দ্রিয়দিগের হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি হইতে মহান্ আত্মা (মহৎ তত্ত্ব—হিরণ্যগর্ভ) শ্রেষ্ঠ; মহৎ হইতে (ব্রহ্মশক্তি) অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ; অব্যক্ত হইতে সর্ব্বব্যাপী (অশরীর) পুরুষ শ্রেষ্ঠ। ইহাকে জানিয়া জীব মুক্ত হয় ও অমৃতত্ব লাভ করে।

যখন পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে, বুদ্ধি স্বকার্য্য করে না, তাহাকে পরমাগতি বলে। সেই স্থির ইন্দ্রিয়-ধারণাকে যোগ বলে। যোগী তখন অপ্রমত্ত হন। যোগ হইতে প্রভব (মঙ্গল) ও অপ্যয় (অমঙ্গল) উভয়ই হয়।

ব্রহ্মের তত্ত্বভাব হইতেছে তাঁহার নিরুপাধিক চিন্মাত্র ভাব। তাঁহার উপাধিযুক্ত ও নিরুপাধিক ভাব উভয়ই উপলব্ধি করিতে হইবে। "তিনি আছেন" এই চিন্তাদ্বারা সোপাধিকরূপে তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে পারিলে, নিরুপাধিরূপ পরে প্রকাশিত হয়। যখন হৃদয়স্থিত সর্ব্বকামনা বিনষ্ট হয় এবং হৃদয়ের গ্রন্থি-সকল ছিন্ন হয়, তখন এইখানেই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় এবং মরণশীল জীব অমর হয়।

হৃদয়ের একশত এক নাড়ীর মধ্যে এক (সুষুম্না নাম্নী) নাড়ী মস্তক ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছে। এই নাড়ীদ্বারা অন্তকালে উর্দ্ধে উঠিয়া অমরত্ব লাভ করে। অন্যান্য নাড়ী সংসারগতি-প্রাপ্তির পথ।

প্রশ্নোপনিষৎ (অথর্ব্ববেদীয়)

ছয় জন ব্রহ্মনিষ্ঠ তপস্বী পিপ্পলাদ ঋষির নিকট গমন করিয়া তাঁহাকে ছয়টি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। সেই প্রশ্নগুলি ও তাহাদের উত্তর এই উপনিষদে বর্ণিত হইয়াছে।

প্রথম প্রশ্ন :—কত্যের পুত্র কবন্ধী জিজ্ঞাসা করিলেন “প্রাণিগণ কোথা হইতে জন্মে ?” পিপ্‌পলাদ কহিলেন, “প্রজাপতি প্রজাকাম (প্রাণীর সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক) হইয়া তপস্যা করিলেন (সংকল্প করিলেন), এবং “রয়ি” (অন্ন —ভোগ্যবস্তু) এবং ‘প্রাণ’ (চৈতন্য—ভোক্তা) এই মিথুন উৎপাদন করিলেন। আদিত্যই প্রাণ, চন্দ্রমাই রয়ি। মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত সমস্ত বস্তুই রয়ি। আদিত্যই বৈশ্বানর বিশ্বরূপ প্রাণ ও অগ্নিরূপে উদিত হন। তিনি উদিত হইয়া যখন পূর্ব্বদিকে প্রবেশ করেন; তখন তিনি পূর্ব্বদিকস্থ সকল প্রাণ নিজ রশ্মিতে গ্রহণ করেন। যখন দক্ষিণ, পশ্চিম, উত্তর, ঊর্দ্ধ, অধঃ এবং অবান্তর দিক-সকল প্রকাশ করেন, তখন সমুদয় প্রাণ স্বীয় রশ্মিতে গ্রহণ করেন। বিশ্বরূপ, রশ্মিমান্, জ্ঞানের কারণ, পরমাশ্রয়, অদ্বিতীয় জ্যোতি, তাপ-দাতা, সহস্র-রশ্মি, প্রাণিভেদে শতধা বর্ত্তমান্, প্রাণি-সমূহের প্রাণ এই সূর্য্য। প্রজাপতিই সংবৎসর (সংবৎসরের রূপ ধারণ করেন)। তাহার দুইটি অয়ন (মার্গ), দক্ষিণ ও উত্তর। যাহারা ইষ্টাপূর্ত্ত (যাগযজ্ঞ ও বাপীকূপাদি খনন) কর্ত্তব্য বলিয়া অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা চন্দ্রলোকে গমন করেন, এবং তথা হইতে পুনরাবর্ত্তন করেন। এই জন্য সন্তানার্থী ঋষিগণ দক্ষিণে গমন করেন। ইহাই পিতৃযান – রয়ি বা অন্নময় পথ। (প্রজাপতি সূর্য্য ও চন্দ্ররূপ ধারণ করিয়া ভোগ ও ভোগ্য সৃষ্টি করেন। তিনি কালরূপ ধারণ করিয়া দক্ষিণায়ণ ও উত্তরায়ণ পথে কর্ম্মমার্গী ও জ্ঞান-মার্গীর পথ নির্দেশ করেন)। অন্যেরা ব্রহ্মচর্য্য, শ্রদ্ধা ও জ্ঞানদ্বারা আত্মাকে অন্বেষণ করিয়া উত্তর মার্গদ্বারা সূর্য্যালোক লাভ করেন। সূর্য্যলোকই সকল প্রাণের আশ্রয়। ইহা অমৃত ও অভয়, পরম শ্রেয়। এখান হইতে কেহ ফিরিয়া আসে না। ইহাদ্বারা সংসার গতি নিরুদ্ধ হয়।

মাসই প্রজাপতি। কৃষ্ণপক্ষ রয়ি। শুক্লপক্ষ প্রাণ। এই জন্য ঋষিগণ শুক্লপক্ষে যাগ করেন। অন্যেরা অপর পক্ষে করেন।

অহোরাত্রই প্রজাপতি। অহঃ প্রাণ। রাত্রি রয়ি। অন্নই প্রজাপতি। তাহা হইতে রেতঃ উৎপন্ন হয়, রেতঃ হইতে সকল প্রাণী। যাহাদের তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য্য আছে, যাহাদের মধ্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত, ব্রহ্মলোক তাহাদের। যাহাদের মধ্যে জিহ্ম (কুটিলতা), অনৃত ও মায়া নাই, শুদ্ধ ব্রহ্মলোক তাহাদেরই।

দ্বিতীয় প্রশ্ন :—ভৃগু পুত্র বৈদর্ভি জিজ্ঞাসা করিলেন “কত দেব (শক্তি) প্রাণীশরীর ধারণ করে, তাহাদের মধ্যে কোন্ কোন্ শক্তি শরীরকে প্রকাশ করে, ইহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা কে ? পিপ্‌পলাদ কহিলেন, “আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, বাক্, মন, চক্ষু, শ্রোত্র, ইহারাই ঐ সকল দেবতা।

(যাহারা শরীর ধারণ করে)। একদিন ইহারা স্ব-স্ব মাহাত্ম্য প্রকাশ করিয়া কহিলেন, আমরা প্রত্যেকে এই "বান"কে (বীণা, শরীর) ব্যাপিয়া ধারণ করিয়া আছি। বরিষ্ঠ (শ্রেষ্ঠ) প্রাণ তখন বলিলেন "মোহগ্রস্ত হইও না। আমিই আমাকে পঞ্চধা বিভক্ত করিয়া শরীরকে রক্ষা করিতেছি।" তাহারা একথা বিশ্বাস করিল না। তখন বরিষ্ঠ প্রাণ ঊর্দ্ধ দিকে যেন ধাবিত হইল। তখন অন্য সকলে উৎক্রান্তের মতো হইল। তিনি প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্য সকলে প্রতিষ্ঠিত হইল। মক্ষিকাগণের রাজাকে যেমন মক্ষিকাগণ অনুগমন করে, সেইরূপ। তখন বাক্, মন, চক্ষু ও শ্রোত্র প্রাণের স্তব করিল। প্রাণ অগ্নিরূপে তাপ দেন, ইনি সূর্য্য, ইনি পর্জন্য, ইনি মঘবান্ (ইন্দ্র), ইনি বায়ু, ইনি পৃথিবী, ইনি রয়ি (চন্দ্রমা), ইনি সৎ ও অসৎ। ইনি অমৃত। হে প্রাণ, তুমিই প্রজাপতি, গর্ভে সঞ্চরণ কর, তুমিই সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ কর। ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে সমস্ত প্রাণী তোমার বলি (উপহার) আহরণ করে। তুমি উৎক্রান্ত হইও না। মাতা যেমন পুত্রদিগকে রক্ষা করেন, তেমনি হে প্রাণ, তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, আমাদিগকে শ্রী ও প্রজ্ঞা দান কর।

তৃতীয় প্রশ্ন :—কৌসল্য জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্, এই প্রাণ কোথা হইতে কিরূপে আসে? কিরূপেই বা আপনাকে বিভক্ত করিয়া থাকে? কোন্ বৃত্তিবিষয়ের দ্বারা শরীর হইতে উৎক্রমণ করে? কিরূপে বাহ্যবস্তু (ভূত ও দেবতাদিগকে) এবং আধ্যাত্মিক বস্তু (জীবাত্মাকে) ধারণ করে?"

পিপ্পলাদ কহিলেন, "তুমি অতি প্রশ্ন (কঠিন প্রশ্ন) করিতেছ। কিন্তু তুমি ব্রহ্মিষ্ঠ, তাই বলিতেছি।"

প্রাণ আত্মা হইতে জন্মে। মনের সংকল্পবশতঃ ইহা শরীরে আসে। সম্রাট যেমন ভিন্ন ভিন্ন গ্রামে কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করেন, তেমনি প্রাণ অন্যান্য প্রাণদিগকে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে সন্নিবেশিত করেন। মলদ্বারে ও জননেন্দ্রিয়ে "অপান"কে, শরীরের মধ্যদেশে "সমান"কে সন্নিবেশিত করিয়া প্রাণ নিজে চক্ষু, কর্ণ, মুখ ও নাসিকাতে অবস্থান করেন। জঠরাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত অন্নকে "সমান" সম ভাগে শরীরের বিভিন্ন অংশে বহন করে। ভুক্ত অন্ন হইতে সাতটি শিখা বহির্গত হয় (২ চক্ষু, ২ নাসারন্ধ্র, ২ কর্ণ ও মুখ)।

আত্মা থাকেন হৃদয়ে। এখানে একশত এক নাড়ী, এবং এক একটি নাড়ীতে একশত শাখা নাড়ী আছে। প্রতি শাখা নাড়ীর ৭২০০০ ক্ষুদ্রতর নাড়ী আছে। তাহাদের মধ্যে "ব্যান" বিচরণ করে। "উদান" একটি

নাড়ী (ঊর্দ্ধগামী সুষুম্না), দ্বারা জীবকে পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা পুণ্যলোকে, পাপকর্ম্ম দ্বারা পাপলোকে এবং উভয়বিধ কর্ম্ম দ্বারা মনুষ্যলোকে লইয়া যায়।

আদিত্যই বাহ্য প্রাণ। ইনি চক্ষুস্থিত প্রাণকে সাহায্য করেন (আলোক দ্বারা)। পৃথিবী-অভিমানিনী দেবতা অপানকে ধারণ করিয়া আছেন (অধোদিকে আকর্ষণ করিয়া)। মধ্যবর্ত্তী আকাশ সমানকে সাহায্য করেন। বায়ুই ব্যান। তেজ (অগ্নি) উদান। এই জন্য দেহের তেজ উপশান্ত হইলে (আয়ু ক্ষীণ হইলে) জীব মনোমধ্যে প্রবিষ্ট ইন্দ্রিয়গণ সহ দেহান্তর প্রাপ্ত হয়। মরণকালে চিত্ত যেরূপ থাকে, তদ্রূপ চিত্তের সহিত জীব প্রাণবায়ুতে অবস্থান করে। প্রাণ উদান-বৃত্তির সহিত যুক্ত হইয়া জীবাত্মাকে যথোচিত লোকে লইয়া যায়।

চতুর্থ প্রশ্ন :—গার্গ্য জিজ্ঞাসা করিলেন "জীবদেহে কাহারা নিদ্রিত হয়, কাহারা জাগিয়া থাকে, কোন্ দেব স্বপ্ন দেখেন, কে সুখ অনুভব করেন, কাহার মধ্যে সকল প্রতিষ্ঠিত থাকে" ?

পিপ্পলাদ কহিলেন "অস্তগামী সূর্য্যের কিরণসকল যেমন সূর্য্যের মধ্যে একীভূত হয়, এবং তাহার উদয়ের সময় চতুর্দিকে বিস্তৃত হয়, তেমনি বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে একীভূত হয়। সেইজন্য তখন পুরুষ শ্রবণাদি কিছুই করেন না। লোকে বলে তিনি নিদ্রিত। তখন দেহপুরীর মধ্যে প্রাণাগ্নিসমূহ (পঞ্চ প্রাণবায়ু) জাগরিত থাকে। (দেহের মধ্যে নিত্য অনুষ্ঠিত যজ্ঞে) অপান গার্হপত্য অগ্নি, ব্যান অন্বাহার্য্য পচন (দক্ষিণাগ্নি), প্রাণ আহবনীয় অগ্নি (গার্হপত্য অগ্নি হইতে আহবনীয় অগ্নি প্রণীত হয়। সুষুপ্তি-কালে প্রাণ অপান হইতে প্রণীত হয়)। সমান উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসকে শরীর-রক্ষার্থ সমভাবে বহন করে, সেই জন্য সমান। যজ্ঞের ফল উদান—যাহা (সুষুপ্তি-কালে) যজমানকে (মনকে) প্রত্যহ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি করায়।

"স্বপ্নে এই দেবতা (মন) মহিমা (বিষয়-বৈচিত্র্য) অনুভব করেন। পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তু দেখেন, পূর্ব্বশ্রুত বিষয় শোনেন, নানা দেশ ও দিকে অনুভূত বস্তু পুনঃ পুনঃ অনুভব করেন। দৃষ্ট, অদৃষ্ট, শ্রুত ও অশ্রুত, অনুভূত ও অননুভূত, সৎ ও অসৎ—এই সকল নিজে সর্ব্বরূপ হইয়া দর্শন করেন। যখন তিনি তেজে অভিভূত হন (সুষুপ্তি-কালে), তখন এই দেবতা স্বপ্ন দেখেন না।

"এই যে দ্রষ্টা, স্প্রষ্টা, শ্রোতা, ঘ্রাতা, রসয়িতা, মন্তা, বোদ্ধা, কর্ত্তা ও বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ, ইনি অক্ষর পরমাত্মাতে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। যাহাতে বিজ্ঞানাত্মা,

প্রাণসমূহ ও ভূতগণ দেবগণের সহিত প্রতিষ্ঠিত, সেই অক্ষর পুরুষকে যিনি জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সমুদয়ের মধ্যে প্রবেশ করেন।"

পঞ্চম প্রশ্ন :—সত্যকাম জিজ্ঞাসা করিলেন "যে ব্যক্তি মৃত্যুপর্য্যন্ত ওঁকারের ধ্যান করে, সে তাহাদ্বারা কোন্ লোক জয় করে ?"

পিপ্পলাদ কহিলেন, "ওঁকার পর ও অপর ব্রহ্ম। ইহার ধ্যানদ্বারা বিদ্বান ব্যক্তি পর ও অপর ব্রহ্মের একটি প্রাপ্ত হন। যদি তিনি ওঁকারের এক মাত্রা অর্থাৎ 'অ'কারের ধ্যান করেন, তাহা হইলে তাহাদ্বারা সংবোধিত হইয়া শীঘ্রই পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। সেখানে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য্য ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া তিনি মহিমা অনুভব করেন। যদি তিনি দ্বিতীয় মাত্রা ('উ'কারের) অভিধ্যান করেন, তাহা হইলে তিনি অন্তরীক্ষে সোমলোকে যান, এবং সেখানে মহিমা অনুভব করিয়া মনুষ্যলোকে ফিরিয়া আসেন। যিনি ত্রিমাত্রাযুক্ত (অ+উ+ম্) অক্ষরদ্বারা পরমপুরুষের ধ্যান করেন, তিনি তেজোময় সূর্য্যে উপনীত হন এবং পাপ হইতে মুক্ত হন। সামমন্ত্রগণ তাঁহাকে ব্রহ্মলোকে (হিরণ্যগর্ভের সত্যলোকে) লইয়া যায়। সেই জীবঘন (সর্ব্ব-জীবের আধার) হিরণ্যগর্ভ হইতে তিনি পরাৎপর পুরিশয় (সর্ব্বশরীরানু-প্রবিষ্ট) পুরুষকে দর্শন করেন।"

ষষ্ঠ প্রশ্ন :—সুকেশা জিজ্ঞাসা করিলেন "ষোড়শকল পুরুষ কে ?" পিপ্পলাদ কহিলেন "ষোড়শকল পুরুষ এই শরীরের মধ্যেই আছেন। (অবিদ্যাবশতঃ শুদ্ধ ব্রহ্ম ষোড়শকলাযুক্ত বলিয়া প্রতীয়মান হন। হৃদয়পুণ্ডরীকমধ্যে ব্রহ্মকে ধ্যান করিতে হয়। অবিদ্যা দূর হইলে তাঁহাকে দর্শন করা যায়)। সেই পুরুষ চিন্তা করিয়াছিলেন 'কে উৎক্রান্ত হইলে আমি উৎক্রান্ত হইব, কে প্রতিষ্ঠিত হইলে আমি প্রতিষ্ঠিত হইব ?' তিনি প্রাণ সৃষ্টি করিলেন। প্রাণ হইতে শ্রদ্ধা, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ইন্দ্রিয়, মন ও অন্ন উৎপন্ন হইল। তাহার পরে অন্ন সৃষ্টি করিলেন। অন্ন হইতে বীর্য্য, তপস্যা, মন্ত্র, কর্ম্ম এবং লোকসমূহ, এবং লোকসমূহ হইতে নাম উৎপন্ন হইল। যেমন সমুদ্রাভিমুখে প্রবহমান নদীসকল সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া অস্ত যায়, তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়, তেমনি জীবরূপ দ্রষ্টার পুরুষায়ন (পুরুষাভিমুখে গতি-বিশিষ্ট) ষোড়শ অংশ সেই পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া অস্ত যায়। তাহাদের নাম ও রূপ বিনষ্ট হয়, তখন কেবল পুরুষমাত্রই (ব্রহ্ম) বলা হয়। তখন জীব কলা বা অংশরহিত এবং অমর হয়। রথনাভিতে অরদিগের মত, যাহাতে কলা (অংশ) সকল প্রতিষ্ঠিত, সেই জ্ঞাতব্য পুরুষকে জান, যাহাতে মৃত্যু

তোমাদিগকে ব্যথা দিতে না পারে। এই ব্রহ্মাকে আমি এই পর্য্যন্ত জানি। ইহা হইতে শ্রেষ্ঠ কিছু নাই।"

ঐতরেয় উপনিষৎ (ঋগ্বেদীয়)

এই জগৎ অগ্রে এক আত্মামাত্র ছিল, (কোনও ভেদ তাহাতে ছিল না) নিমেষ-ক্রিয়াবৎ (প্রাণবান্) আর কিছুই ছিল না। আত্মা ভাবিলেন লোকসকল সৃষ্টি করিব কি? পরে এই সকল লোক সৃষ্টি করিলেন—অম্ভ, মরীচি, মর, আপ। অম্ভ দ্যুলোকের অপর পারে (অম্ভ=যাহা জলকে ধারণ করে)। দ্যৌঃ (স্বর্গ), অম্ভলোকের আশ্রয়। অন্তরীক্ষই (স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের মধ্যস্থিত দেশ) মরীচি। মর হইতেছে পৃথিবী।

যাহা পৃথিবীর নিম্নে, তাহাই আপ। লোকসকল সৃষ্টি করিয়া আত্মা ভাবিলেন "লোক সকল তো সৃষ্টি করিলাম, এখন লোকপালদিগকে সৃষ্টি করিব কি?" তখন তিনি জল হইতে পুরুষের উপাদান তুলিয়া পিণ্ডীকৃত করিলেন। সেই পিণ্ড-সম্বন্ধে তিনি তপস্যা (চিন্তা) করিলেন। তখন সেই পিণ্ড হইতে মুখ বাহির হইল, মুখ হইতে বাক্ ইন্দ্রিয় এবং বাক্ হইতে অগ্নি বাহির হইলেন, পরে নাসারন্ধ্রদ্বয় এবং তাহা হইতে প্রাণ এবং প্রাণ হইতে বায়ু বাহির হইল। পরে পিণ্ডে দুইটি চক্ষু, এবং তাহা হইতে দর্শনেন্দ্রিয় এবং তাহা হইতে আদিত্য বহির্গত হইলেন। পরে দুই কর্ণ এবং কর্ণ হইতে শ্রবণেন্দ্রিয় এবং তাহা হইতে দিক্‌সকল আবির্ভূত হইল। পরে ত্বক্, ত্বক্ হইতে লোম এবং লোম হইতে ওষধি ও বনস্পতিগণ নির্গত হইল। হৃদয় উদ্ভূত হইল, হৃদয় হইতে মন এবং মন হইতে চন্দ্রমা বাহির হইলেন। পরে নাভি, নাভি হইতে অপান এবং তাহা হইতে মৃত্যু আবির্ভূত হইল। ইহার পরে শিশ্ন (জননেন্দ্রিয়), শিশ্ন হইতে রেতঃ এবং রেতঃ হইতে জল নির্গত হইল। আত্মার সংকল্প হইতে এই সকল উৎপন্ন হইল।

এই সকল সৃষ্ট হইয়া দুঃখ ও ভয়সংকুল সংসারার্ণবে পতিত হইল। আত্মা তাহাদিগের সহিত ক্ষুধা ও তৃষ্ণা সংযোজিত করিয়া দিলেন। তখন দেবতাগণ কহিলেন, যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া আমরা অন্নভোজন করিতে পারি, এইরূপ আশ্রয় আমাদিগকে দান করুন। তখন আত্মা একটি গবাকৃতি পিণ্ড আনয়ন করিলেন। তাহারা বলিলেন "ইহা আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নহে।" তখন একটী অশ্বাকৃতি পিণ্ড আনীত হইলে, তাহারা বলিলেন,

"ইহাও যথেষ্ট নহে।" একটি মনুষ্যাকৃতি পিণ্ড আনীত হইলে তাহারা বলিলেন "ইহা উত্তম"। তখন স্রষ্টা তাহাদিগকে আপন আপন স্থানে প্রবেশ করিতে বলিলেন। তখন অগ্নি মুখে, সূর্য্য চক্ষুতে, দিক্‌সকল কর্ণে, ওষধি ও বনস্পতিগণ লোম হইয়া ত্বকে, চন্দ্রমা মন হইয়া হৃদয়ে, মৃত্যু অপান হইয়া নাভিতে এবং জল রেতঃ হইয়া শিশ্নে প্রবেশ করিল। ইহার পর ক্ষুধাতৃষ্ণা কহিল "আমাদিগকে স্থান দিন।" স্রষ্টা কহিলেন "এই দেবতাদিগের মধ্যে তোমাদের ব্যবস্থা করিব, তোমাদিগকে ইহাদের ভাগী করিব।" এইজন্য যে কোন দেবতাকে হবিঃ অর্পিত হয়, ক্ষুধাতৃষ্ণা তাহার ভাগী হয়।

তখন আত্মা জলকে লক্ষ্য করিয়া চিন্তা করিলেন এবং তাহা হইতে এক মূর্ত্তি উৎপন্ন হইল। তাহাই অন্ন। সৃষ্ট হইয়া (সম্মুখে অন্ন ভোক্তা পুরুষ দেখিয়া) অন্ন পলাইতে চেষ্টা করিল। তখন প্রথমজাত পুরুষ বাক্ ইন্দ্রিয়দ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। পারিলে "অন্ন" শব্দ উচ্চারণ করিয়া লোকে তৃপ্ত হইত। ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে চেষ্টা করিয়াও পুরুষ পারিলেন না। পারিলে অন্নের ঘ্রাণ লইয়াই লোকে তৃপ্ত হইত। পরে চক্ষু, কর্ণ ও ত্বক দ্বারাও পুরুষ অন্নকে গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইলেন। সমর্থ হইলে অন্ন দর্শন করিয়া, তাহার কথা শ্রবণ করিয়া এবং তাহাকে স্পর্শ করিয়া লোকে তৃপ্ত হইত। মনদ্বারাও পুরুষ অন্নকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না, পারিলে লোকে অন্নের ধ্যান করিয়া তৃপ্ত হইত। শিশ্নদ্বারা অন্ন গ্রহণ করিতে পুরুষ পারিলেন না। পারিলে শিশ্নদ্বারা অন্ন ত্যাগ করিয়া লোকে তৃপ্ত হইত। পরিশেষে অপান বায়ুদ্বারা অন্নকে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়া অন্ন ভোজন করিলেন। অপান বায়ুই অন্নের গ্রাহক, এই বায়ুই অন্নজীবন।

স্রষ্টা তখন ভাবিলেন "এই ইন্দ্রিয়ান্বিত দেহ আমা ব্যতীত কিরূপে থাকিবে? কোন্ পথে আমি ইহার মধ্যে প্রবেশ করিব? যদি বাক্ কথা বলিল, প্রাণ নিশ্বাস-প্রশ্বাস কার্য্য করিল, চক্ষু দর্শন ও কর্ণ শ্রবণ করিল, ত্বক স্পর্শ করিল, মন চিন্তা করিল, অপান বায়ু মল-মূত্রাদি নিম্ন দিকে লইয়া গেল, শিশ্ন শুক্র ত্যাগ করিল, তাহা হইলে আমি কে?" তখন তিনি সীমা (সিঁথি) ভেদ করিয়া সেই পথে ভিতরে প্রবেশ করিলেন। ইহাই "বিদৃতি"-নামক দ্বার, আনন্দের স্থান। দেহের মধ্যে আত্মার তিনটি বাসস্থান (চক্ষু, হৃদয় ও মন) এবং ইহার তিনটি স্বপ্নাবস্থা (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি)।

শরীরে প্রবেশ করিয়া, "এখানে কোনও বস্তু অন্য আত্মাকে প্রকাশ করিতে চাহে কি না অর্থাৎ ইহাদের স্বতন্ত্র সত্তা আছে কি না" ইহা বিচার করিলেন

এবং আপনাকেই ততম (সর্ব্বব্যাপী) ব্রহ্মরূপে দর্শন করিলেন। এইজন্য পরমাত্মার নাম ইদন্দ্র। ব্রহ্মবিদ্‌গণ পরোক্ষভাবে তাহাকে ইন্দ্র বলেন।

জীব আদিতে পুরুষের শরীরে বীজরূপে থাকে। সেই বীজ স্ত্রীতে সংক্রমিত হইয়া পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। জন্মের পূর্ব্বে মাঙ্গলিক ক্রিয়াদিদ্বারা পিতা পুত্রকে পোষণ করেন। পুত্র যখন জন্মে তখন জীবের দ্বিতীয় জন্ম হয়। পুণ্যকর্ম্ম-সম্পাদনের জন্যই এই জন্ম। পিতা কৃতকৃত্য হইয়া পরলোক গমন করিয়া পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন। বামদেব ঋষি বলিয়াছেন, "গর্ভে থাকিয়া আমি দেবদিগের (মনোবৃত্তিদিগের) সমুদয় জন্মবৃত্তান্ত জানিয়াছিলাম। শত লৌহময়ী পুরী (দুর্ভেদ্য শরীর) আমাকে রক্ষা করিতেছিল। কিন্তু আমি নিম্নদেশ দিয়া শ্যেনপক্ষীর ন্যায় বলপূর্ব্বক নির্গত হইয়া আসিলাম।"

যাঁহাকে আত্মা বলিয়া আমরা উপাসনা করি তিনি কে? চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ই কি তিনি?

এই হৃদয়ই মন। সংজ্ঞান (চেতনভাব), আজ্ঞান (কর্তৃভাব), বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, জূতি, (তৎপরতা), স্মৃতি, সংকল্প, ক্রতু (অধ্যবসায়), অসু (প্রাণন্), কাম, (বিষয়তৃষ্ণা) ও বশ (অভিলাষ), এ সকল প্রজ্ঞানের নাম।

এই অপর ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ), এই ইন্দ্র, এই প্রজাপতি, এই সকল দেবতা, পঞ্চ মহাভূত, এই সমুদয় এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উভচর প্রাণীর ন্যায় প্রাণী, উদ্‌ভিদ, অশ্ব, গো, মানুষ প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণী—সকলই প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত, লোকসকল প্রজ্ঞানেত্র (প্রজ্ঞাকর্তৃক চালিত), প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম।

কৌষীতকি উপনিষৎ (ঋগ্‌বেদীয়)

চারি অধ্যায়ে বিভক্ত এই উপনিষদের প্রথম অধ্যায়ে গার্গ্য চিত্রকর্তৃক ব্রহ্মলোকের বর্ণনা আছে। অরুণ পুত্র শ্বেতকেতু তাঁহার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করিতে পিতৃকর্তৃক প্রেরিত হইয়াছিলেন। চিত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এই লোকে এমন কোন্ গুপ্ত স্থান আছে, যেখানে, এবং কোন্ পন্থা আছে, যাহা দ্বারা তুমি আমাকে সেই লোকে স্থাপন করিতে পার?" শ্বেত-কেতু তাহা জানিতেন না, গৃহে ফিরিয়া পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। পিতাও জানিতেন না, তখন শ্বেতকেতু ফিরিয়া আসিয়া চিত্রের নিকট তাঁহার প্রশ্নের উত্তর জানিতে চাহিলেন। চিত্র কহিলেন "মৃত্যুর পরে সকলে চন্দ্রলোকে যায় চন্দ্র স্বর্গলোকের দ্বার। যে সেখানে থাকিতে অস্বীকার করে, চন্দ্র তাহাকে

উর্দ্ধতর লোকে প্রেরণ করেন। যে অস্বীকার করে না, তাহাকে চন্দ্র বৃষ্টির আকারে এই লোকে বর্ষণ করেন। সে নিজ কর্ম্ম ও জ্ঞান অনুসারে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, ব্যাঘ্র, সিংহ, সর্প বা মনুষ্যের দেহে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। চন্দ্র, যাহাকে উর্দ্ধলোকে প্রেরণ করেন, তিনি দেবযানপথে প্রথমে অগ্নিলোকে, পরে বায়ুলোকে, পরে আদিত্যলোকে, পরে বরুণলোকে, পরে ইন্দ্রলোকে পরে প্রজাপতিলোকে, তাহার পরে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন। ব্রহ্মলোকে "আর" নামক হ্রদ, "বিজরা" নামক নদী, "ইলা" নামক বৃক্ষ (ইলা = পৃথিবী), "সালজ্য" (সাল বৃক্ষের সমান ধনুর্গুণতুল্য উপতীর বিশিষ্ট জলাশয়যুক্ত নগর) নামক নগর এবং "অপরাজিত" নামক মন্দির আছে। ইন্দ্র ও প্রজাপতি সেই নগরের দ্বার-রক্ষক। তথায় "বিভু" নামক সভাগৃহে (বিভু = সর্ব্বব্যাপী), "বিচক্ষণা" নাম্নী (জ্ঞানময়ী) আসন্দী (সভামধ্যবেদী), অমিতৌজা নামক পর্য্যঙ্ক, এবং "মানসী" নাম্নী (আনন্দদায়িনী) ব্রহ্মের প্রিয়া (প্রকৃতি), এবং "চাক্ষুষী" নামে তাঁহার প্রতিরূপ (জীবাত্মা ?) —(যাঁহারা পুষ্পের মতো প্রাণী সকলকে বয়ন করিতেছেন,) অম্বা (জননী) শ্রুতি এবং অম্বায়বী (অতুল বুদ্ধিবৃত্তি-বিশিষ্ট) অপ্সরাগণ এবং অম্বয়া (উপাসনা-রূপিণী ব্রহ্মজ্ঞানদায়িনী নদীসমূহ) আছে। জ্ঞানী ব্রহ্মলোকের নিকটে আসিলে, ব্রহ্ম অপ্সরাদিগকে বলেন "শীঘ্র যাও, এবং সম্মানের সহিত তাহার অভ্যর্থনা কর। সে বিরজা নদী উত্তীর্ণ হইয়াছে, আর জরাগ্রস্ত হইবে না। চূর্ণ (কুঙ্কুম), বস্ত্র, ফল, আঞ্জন এবং মালা লইয়া পাঁচশত অপ্সরা তাঁহার নিকট গিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মালংকারে অলংকৃত করেন। ব্রহ্মবিৎ তখন ব্রহ্মাভিমুখে অগ্রসর হন এবং মনদ্বারা "আর" হ্রদ পার হন। (অব্রহ্মবিদ্‌গণ এই হ্রদে মগ্ন হন।) তিনি "যেষ্টিহা" নামক মুহূর্ত্তগণের নিকটে আসিলে তাহারা সরিয়া যায়। তিনি মনদ্বারা বিরজা নদী পার হন, এবং তথায় পাপ ও পুণ্য বিসর্জ্জন করেন। (জ্ঞাতিগণ পুণ্য, শত্রুগণ পাপ গ্রহণ করে)। ইলা বৃক্ষের নিকট ব্রহ্মগন্ধ তাঁহাতে প্রবেশ করে। সালজ্য নগরের নিকট ব্রহ্মরস তাহাতে প্রবেশ করে। অপরাজিত মন্দিরের নিকট ব্রহ্মতেজ তাহাতে প্রবিষ্ট হয়। ইন্দ্র ও প্রজাপতি দ্বার ছাড়িয়া সরিয়া যান। বিভু নামক সভাগৃহে আবার ব্রহ্মতেজ তাহাতে প্রবেশ করে। তিনি "বিচক্ষণা" নামক সভাবেদীর সমীপে উপস্থিত হন। সেই বেদী প্রজ্ঞা। তিনি অমিতৌজা পর্য্যঙ্কের নিকটে গমন করেন। ইহা প্রাণ। ভূত ও ভবিষ্যৎ ইহার সম্মুখের পাদদ্বয়। শ্রী ও পৃথিবী পশ্চাতের পাদদ্বয়। পর্য্যঙ্কের উপর ব্রহ্ম আসীন। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করেন, "তুমি কে ?" ব্রহ্মবিৎ বলেন "আমি ঋতু (কাল),

ঋতু-সম্ভূত, অনন্তকারণসম্ভূত জ্যোতিঃ। আমি সংবৎসরের তেজ, অতীতের, প্রকৃত কারণের, চতুর্বিধ চেতনাচেতন বস্তুর, এবং পঞ্চমহাভূতাত্মক সকলের আত্মা। তুমিও আত্মা, তুমিও যে, আমিও সে।" ব্রহ্ম বলেন "আমি কে?" তিনি বলেন "তুমি সত্য"। "সত্য কি?" দেবতা ও প্রাণদিগের হইতে যাহা ভিন্ন, তাহাই "সৎ", যাহা দেবতা ও প্রাণ তাহা "ত্যম্"। সত্যশব্দ দ্বারা এই সকলই বুঝায়। তুমি এই সকল।' ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করেন "আমার পুংনাম, স্ত্রীনাম, নপুংসক নামগুলি তুমি কিরূপে পাইলে?" উত্তর—প্রাণদ্বারা, বাক্যদ্বারা, মনদ্বারা। প্রশ্ন—গন্ধ, রূপ, শব্দ, রস, কিরূপে পাও? উত্তর—প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র ও জিহ্বা দ্বারা। "কর্ম্ম কিরূপে কর?"—হস্তদ্বারা। "সুখ দুঃখ কিরূপে অনুভব কর?"—শরীরদ্বারা। "আনন্দ রতি, সন্তান, কিরূপে লাভ কর?—উপস্থদ্বারা। "গমনাগমন কিরূপে কর?"—পদদ্বারা। "চিন্তা, জ্ঞান ও ইচ্ছা কিরূপে সম্পাদন কর?"—প্রজ্ঞাদ্বারা। ব্রহ্ম কহেন, "আমার এই অপময় লোক তোমার।"

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে প্রাণই ব্রহ্ম। মন ইহার দূত, বাক্ পরিবেষ্টী, চক্ষু রক্ষক, শ্রোত্র দ্বাররক্ষক। ইন্দ্রিয়গণ প্রাণরূপ ব্রহ্মের নিকট অযাচিত ভাবে বলি (উপঢৌকন) আনয়ন করে।

কিছুই যাচ্ঞা করিবে না। যিনি যাচ্ঞা করেন না, তাঁহার নিকট সকল প্রাণী অযাচিত ভাবে বলি আনয়ন করে।

ইহার পরে আছে প্রার্থিত বস্তু পাইবার জন্য যজ্ঞবিধির বর্ণনা এবং তাহার পরে আন্তর অগ্নিহোত্রের বর্ণনা। তাহার পরে কৌষীতকি-প্রবর্ত্তিত ত্রিবিধ উপাসনা বর্ণিত হইয়াছে।

প্রবাস হইতে ফিরিয়া কিরূপে পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে হয়, ইহার পরে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। তাহার পরে "দৈব পরিমর" (প্রাণরূপী ব্রহ্মে অগ্নি, বাক্ আদি দেবগণের তিরোভাব) বর্ণিত হইয়াছে। অধ্যায় শেষে বাক্ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণের কলহ ও পরে তাহাদের কর্ত্তৃক প্রাণের উৎকর্ষ-স্বীকার বর্ণিত হইয়াছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে ইন্দ্র ও প্রতর্দন সংবাদ। ইন্দ্র কহিলেন "আমাকে জান, ইহাই মনুষ্যের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা কল্যাণকর। যে আমাকে জানে, তাহার পুণ্যকর্ম্মের ফল মাতৃবধ, পিতৃবধ প্রভৃতি গুরুতর পাপদ্বারাও বিনষ্ট হয় না। আমি প্রাণ, আমি প্রজ্ঞাত্মা, আমাকে আয়ু ও অমৃতরূপে উপাসনা কর। আয়ুই প্রাণ, প্রাণেই আয়ু, প্রাণেই অমৃতত্ব। প্রজ্ঞাদ্বারা লোক সত্যসংকল্প

লাভ করে। প্রাণকে উক্‌থ (ওঁকার) রূপে উপাসনা করিবে। যিনি প্রাণ, তিনিই প্রজ্ঞা; যিনি প্রজ্ঞা, তিনিই প্রাণ। ইঁহারা এই শরীরে বাস করেন এবং একত্র বাহির হন।"

প্রতর্দ্দন কহিলেন "কাহারও কাহারও মতে জ্ঞানকালে ইন্দ্রিয়গণ একত্ব প্রাপ্ত হয়, না হইলে এক সঙ্গে বাক্য উচ্চারণ করিতে, দেখিতে, শুনিতে ও চিন্তা করিতে পারিত না, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের কার্য্যের সময় অন্যান্য ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্ত্তী হয়।" ইন্দ্র বলিলেন "ইহা সত্য, কিন্তু ইহাদিগের মধ্যে প্রাণই শ্রেষ্ঠ। প্রাণই প্রজ্ঞাত্মা, প্রাণই শরীরকে ধারণ ও উত্থাপন করে। যখন পুরুষ নিদ্রিত হয়, কোন স্বপ্ন দেখে না, তখন সে প্রাণে একীভূত হয়। তখন বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন প্রাণ-উপাধিযুক্ত আত্মাতে গমন করে। যখন পুরুষ জাগরিত হয়, তখন জ্বলন্ত অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গের মত, আত্মা হইতে প্রাণসকল আপন আপন আয়তনের (জিহ্বাদি) দিকে গমন করে। প্রাণদিগের হইতে ইন্দ্রিয়গণ, এবং ইন্দ্রিয়গণ হইতে লোকসকল (ইন্দ্রিয়দিগের বিষয়) নির্গত হয়। যখন পুরুষ পীড়িত ও মরণোন্মুখ হয়, তখন সে শুনিতে, দেখিতে, কথা বলিতে ও চিন্তা করিতে পারে না। তখন নামের সহিত বাক্, চক্ষুর সহিত রূপ, শ্রোত্রের সহিত শব্দ এবং চিন্তার সহিত মন পুরুষে গমন করে। আবার যখন জাগরিত হয়, তখন পুরুষ হইতে প্রাণগণ, প্রাণ হইতে ইন্দ্রিয়গণ এবং ইন্দ্রিয়শক্তি হইতে লোকসকল (ইন্দ্রিয়বিষয়) নির্গত হয়। যখন পুরুষ শরীর হইতে বহির্গত হয়, তখন এই সকলের সহিত বহির্গত হয়। বাক্ সকল নাম সহ, ঘ্রাণ সকল গন্ধ সহ, চক্ষু সকল রূপ সহ, শ্রোত্র সকল শব্দ সহ, মন সকল চিন্তা সহ, প্রাণে বিলীন হয়। যাহা প্রাণ তাহাই প্রজ্ঞা। বাক্ প্রজ্ঞার এক অঙ্গ দোহন করিয়াছে অর্থাৎ এক অংশ ধারণ করিয়াছে। নাম তাহার বহির্দিকে স্থাপিত ভূতমাত্রা। ঘ্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, জিহ্বা, অন্নরস, শরীর, উপস্থ, পাদ এবং বুদ্ধি ইহার অন্যান্য ভাব। গন্ধ, রূপ, শব্দ, রস, কর্ম, সুখ-দুঃখ, আনন্দ, রতি ও প্রজাতি, গতি এবং জ্ঞান, জ্ঞাতব্য ও ইচ্ছা প্রজ্ঞার বহিঃস্থ ভূতমাত্রা। জীব প্রজ্ঞাদ্বারা বাক্‌যন্ত্র, চক্ষু, শ্রোত্র, জিহ্বা, হস্ত, শরীর, উপস্থ, গতি ও বুদ্ধি অধিকার করিয়া নাম, রূপ, শব্দ, রস, কর্ম্ম, সুখ-দুঃখ, আনন্দ, রতি ও প্রজাতি, গতি, এবং জ্ঞান ও জ্ঞেয় প্রাপ্ত হয়। বিষয়-জগতের উপাদান-দশ ভূত মাত্রা (বাক্, গন্ধ, রূপ, শব্দ, রস, কর্ম্ম, সুখ-দুঃখ, আনন্দরতি, প্রজাতি ও গতি) প্রজ্ঞায় অধিষ্ঠিত। বিষয়ী জগতের উপাদান দশ প্রজ্ঞামাত্রা (ভূতমাত্রার

জ্ঞান) ভূতে অধিষ্ঠিত। ভূতমাত্রা না থাকিলে প্রজ্ঞামাত্রা থাকিত না। প্রজ্ঞামাত্রা না থাকিলে ভূতমাত্রা থাকিত না। রথনেমি অরে স্থাপিত, অর-সকল রথনাভিতে স্থাপিত, সেইরূপ ভূতমাত্রাগণ প্রজ্ঞামাত্রায় স্থাপিত এবং প্রজ্ঞামাত্রাগণ প্রাণে স্থাপিত। প্রাণ আনন্দময়, অজর, অমর, প্রজ্ঞাত্মা। ইনি সাধু কর্ম্মদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন না, অসাধু কর্ম্মদ্বারা ন্যূনতা প্রাপ্ত হন না। যাহাকে ইনি ইহলোক হইতে উন্নীত করিতে চান, তাঁহাদ্বারা ইনি সাধু কর্ম্ম করান। যাহাকে অধোলোকে লইতে চান, তাহাদ্বারা অসাধু কর্ম্ম করান। (পূর্ব্বজন্ম কৃত কর্ম্ম অনুসারে)। ইনি লোকাধিপতি, সর্ব্বেশ। "তিনি আমার আত্মা" —তাঁহাকে এইরূপ জানিবে।

চতুর্থাধ্যায়ে বালাকি অজাতশত্রু সংবাদ। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যেরূপ আছে প্রায় সেইভাবে লিখিত হইয়াছে। পরে আছে:

ক্ষুরাধারে যেমন ক্ষুর এবং অগ্নি—নীড়ে অরণি আদিতে অগ্নি থাকে, তেমনি জ্ঞানস্বরূপ আত্মা "আমি ইহা" এই অভিমানের আধার শরীরে প্রতি নখ ও লোম পর্য্যন্ত অনুপ্রবিষ্ট হইয়া আছেন। পুরুষেরা এই আত্মার অনুগমন করেন। এই আত্মা এই সকল পুরুষের সহিত বিষয়ভোগ করেন, এবং এই সকল পুরুষ ভোগের জন্য এই আত্মার উপর নির্ভর করেন। ইন্দ্র যত দিন এই আত্মাকে জানিতে পারেন নাই, তত দিন অসুরগণ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। যখন জানিতে পারিলেন, তখন অসুরদিগকে জয় করিয়া দেবগণের মধ্যে আধিপত্য লাভ করিলেন।

তৈত্তিরীয় উপনিষৎ (কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদ)

কথিত আছে, ঋষি বৈশম্পায়ন কোনও কারণে শিষ্য যাজ্ঞবল্ক্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার নিকট যাজ্ঞবল্ক্য যে যজুর্বেদ শিক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য অধীত বিদ্যা যোগবলে অঙ্গার রূপে ভূমিতে বমন করেন। যজুর্বেদ ইহার ফলে কৃষ্ণাঙ্গারত্ব প্রাপ্ত হয়। তখন বৈশম্পায়ন তপস্যাদ্বারা বিষ্ণুকে প্রসন্ন করিলে বিষ্ণু তিত্তির পক্ষীর রূপ ধারণ করিয়া মন্ত্ররূপে তাহা বৈশম্পায়নকে প্রদান করেন এবং এই বেদ কৃষ্ণ যজুর্বেদ আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এদিকে যাজ্ঞবল্ক্য যোগবলে সূর্য্য-মণ্ডলে গমন করিয়া মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্যের নিকট হইতে শুদ্ধ যজুর্বেদ লাভ করেন। এই বেদ মাধ্যন্দিনীয় শুক্ল যজুর্বেদ নামে প্রচারিত হয়। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত।

বরুণ ঋষির পুত্র (বারুণি) ভৃগু ব্রহ্মের জ্ঞান কিরূপে লাভ করিয়াছিলেন, তৈত্তিরীয়োপনিষদে তাহা বর্ণিত হইয়াছে। ভৃগু বলিলেন "পিতঃ, আমাকে ব্রহ্ম-সম্বন্ধে উপদেশ করুন।" পিতা বলিলেন "অন্ন, প্রাণ, চক্ষু, শ্রোত্র, মন ও বাক্য, এই সকল ব্রহ্মের উপলব্ধির দ্বার। যাহা হইতে প্রাণিগণ জন্মলাভ করে, জন্মিয়া যাঁহা দ্বারা বাঁচিয়া থাকে, এবং যাঁহাতে প্রতি-গমন ও প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম।" পিতৃবাক্যের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য ভৃগু তপস্যা করিলেন, এবং তপস্যার ফলে তাঁহার ধারণা হইল অন্নই ব্রহ্ম। অন্ন জড়ের প্রতীক। তিনি স্বকীয় তপস্যার ফল পিতার নিকট ব্যক্ত করিলে, পিতা বলিলেন "আরও তপস্যা কর। তপস্যাই ব্রহ্মজ্ঞানের সাধন।" ভৃগু আবার তপস্যা করিলেন। এবার জড়ের মধ্যে শক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাইয়া তাঁহার মনে হইল প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাণ "শক্তির" বাচক। পিতার নিকট তপস্যার ফল ব্যক্ত করিলে, পিতা তাহাকে আরও তপস্যা করিতে বলিলেন। ভৃগু পুনরায় তপস্যা করিয়া বুঝিলেন মন ব্রহ্ম। তাঁহার এ মীমাংসাও পিতার মনঃপূত হইল না, এবং তিনি পুনরায় তপস্যা করিতে আদিষ্ট হইলেন। তপস্যান্তে ভৃগু বুঝিলেন বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। কিন্তু তাঁহার এ মীমাংসাও পিতার অনুমোদন লাভ করিতে পারিল না। পিতার আদেশে পুনরায় তপস্যা করিয়া ভৃগু জানিলেন আনন্দ হইতেই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, আনন্দদ্বারাই বাঁচিয়া থাকে, এবং পরিণামে আনন্দেই প্রবেশ করে। এ মীমাংসা পিতা অনুমোদন করিলেন। আনন্দই ব্রহ্ম। সৃষ্টির মূলে আনন্দ, স্থিতিতে আনন্দ এবং প্রলয়ে আনন্দ, ইহাই বরুণ কথিত ব্রহ্মবিদ্যা--ভার্গবী বারুণী বিদ্যা। এই যে আত্মা মনুষ্যে আর ঐ যে আত্মা আদিত্যে, উভয়ে একই।

আনন্দ-সম্বন্ধে ঐ উপনিষদে আছে: একজন বেদজ্ঞ, ক্ষিপ্রকর্ম্মা, দ্রঢ়িষ্ঠ, বলিষ্ঠ, যুবক যদি বিত্তপূর্ণ সমগ্র জগতের অধীশ্বর হয়, তাহা হইলে তাহার আনন্দ এক পূর্ণমাত্রা মানবীয় আনন্দ। এই মানবীয় আনন্দের শতগুণ মনুষ্য-গন্ধর্বের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। মনুষ্য-গন্ধর্বের শতগুণ আনন্দ এক পূর্ণ মাত্রা দেব-গন্ধর্বের আনন্দ। দেবগন্ধর্বের আনন্দের শতগুণ চিরলোকবাসী পিতৃদিগের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। এই পরিমাণ আনন্দের শতগুণ আজানজ দেবতাদিগের আনন্দ। কর্ম্ম-দেবতাদের আনন্দ এই আনন্দের শতগুণ। কর্ম্ম-দেবতাদিগের আনন্দের শতগুণ দেবতাদিগের (অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র ও প্রজাপতি—এই তেত্রিশ দেবতা) আনন্দ। অপর দেবতাদিগের আনন্দের শতগুণ দেবরাজ ইন্দ্রের এক পূর্ণ-

মাত্রা আনন্দ। দেবগুরু বৃহস্পতির আনন্দ ইন্দ্রের আনন্দের শতগুণ। বৃহস্পতির আনন্দের শতগুণ প্রজাপতির এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। প্রজাপতির আনন্দের শতগুণ ব্রহ্মের এক পূর্ণমাত্রা আনন্দ। কামনামুক্ত শ্রোত্রিয় পুরুষের আনন্দও এই পরিমাণ।

"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে, অপ্রাপ্য মনসা সহ। আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্, ন বিভেতি কুতশ্চন॥ মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন, তিনি কিছু হইতে ভীত হন না।"

ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ব্রহ্ম সত্য-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ। হৃদয়াকাশে বুদ্ধিরূপ গুহাতে স্থিত বলিয়া যিনি ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্ম সহ সমুদয় কাম্যবস্তু উপভোগ করেন। সেই আত্মা হইতে আকাশ সম্ভূত, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে অগ্নি, অগ্নি হইতে আপ, আপ হইতে পৃথিবী, পৃথিবী হইতে ওষধি, ওষধি হইতে অন্ন, অন্ন হইতে রেতঃ, রেতঃ হইতে পুরুষ উদ্ভূত। এই মনুষ্য অন্নরসের বিকার। এই অন্নরসময় কোষ হইতে ভিন্ন একটি অন্তর আত্মা আছে, সেটি প্রাণময়। সেই প্রাণময় কোষদ্বারা অন্নময় কোষ পূর্ণ। অন্নময় কোষের যিনি আত্মা, তিনিই প্রাণময় কোষেরও আত্মা। প্রাণময় আত্মা হইতে ভিন্ন মনোময় আত্মা; তাহাদ্বারা প্রাণময় কোষ পূর্ণ। মনোময় আত্মা হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানময় আত্মা। তাহাদ্বারা মনোময় আত্মা পূর্ণ। বিজ্ঞানময় আত্মা হইতে ভিন্ন আনন্দময় আত্মা।

সৃষ্টি সম্বন্ধে ঐ উপনিষদে আছে: তিনি (পরমাত্মা) ইচ্ছা করিলেন "আমি বহু হইব, আমি উৎপন্ন হইব।" তিনি তপস্যা করিলেন অর্থাৎ কি সৃষ্টি করিবেন, সে বিষয়ে মনে মনে আলোচনা করিলেন। তাহার পরে এই সকল সৃষ্টি করিলেন। সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন। অনুপ্রবিষ্ট হইয়া "সৎ" (মূর্ত্ত) ও ত্যৎ (অমূর্ত্ত), নিরুক্ত (বচনীয়) ও অনিরুক্ত (অনির্বচনীয়), নিলয়ন (আশ্রিত) ও অনিলয়ন (অনাশ্রিত), বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন), সত্য ও অনৃত, যাহা কিছু আছে, সে সকলই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইলেন। সেইজন্যই তাঁহাকে সত্য বলে। ইদম্ (এই নামরূপে প্রকাশিত জগৎ) অগ্রে অসৎ (অবিকৃত, অপ্রকাশিত) ছিল। সেই অপ্রকাশিত ব্রহ্ম হইতে প্রকাশিত জগৎ উৎপন্ন হইল। তিনি আপনাকে জগৎরূপে স্বাকৃত করিলেন, সেইজন্য তাঁহাকে সুকৃত অর্থাৎ স্বয়ংকর্তা বলে। তিনি রসস্বরূপ। রসস্বরূপ ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া জীব সুখী হয়। যদি হৃদয়াকাশে এই আনন্দস্বরূপ না থাকিতেন, তাহা হইলে প্রাণ ও অপান

চেষ্টা কে করিত? ইনিই জীবকে আনন্দদান করেন। যিনি এই অদৃশ্য, অশরীরী, অনিরুক্ত ও অনিলয়ন ব্রহ্মে অভয় প্রতিষ্ঠা লাভ করেন, তিনি অভয় প্রাপ্ত হন। যিনি ব্রহ্মের সহিত আত্মার অল্পমাত্রও ভেদ দর্শন করেন, ব্রহ্ম তাহার পক্ষে ভয়স্বরূপ হন।

এই উপনিষদে ঋষি বলিয়াছেন:

"ওঁ" বেদবাক্যের মধ্যে প্রধান (ছন্দসাং ঋষভঃ) ও বিশ্বরূপ। ওঁ ব্রহ্ম। "ওঁ" এই সকল।

ঋতং, সত্যং, তপঃ, দমঃ, শমঃ, অগ্নিঃ, অগ্নিহোত্র ও অতিথি-সেবা, লোকের সহিত সৎ-ব্যবহার, সন্তানোৎপাদন, এই সকল কর্ত্তব্য। এই সকলের সঙ্গে স্বাধ্যায় ও প্রবচন (বেদপাঠ ও অধ্যাপন) করিতেই হইবে।

বেদাধ্যাপনান্তে গুরু শিষ্যকে বলিতেছেন: "সত্যং বদ, ধর্ম্মং চর"—সত্য বলিবে ও ধর্ম্ম আচরণ করিবে। বেদাধ্যয়নে ঔদাস্য করিবে না। আচার্য্যকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিবে। "প্রজাতন্তুং ন ব্যবচ্ছেৎসীঃ"—সন্তানসূত্র কর্ত্তন করিবে না, অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রমে সন্তান উৎপাদন করিবে। সত্য, ধর্ম্ম ও কুশল হইতে বিচলিত হইবে না, দেব ও পিতৃকার্য্যে অবহেলা করিবে না। "মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব, অতিথিদেবো ভব।" মাতা, পিতা, আচার্য্য ও অতিথিকে দেবতার ন্যায় সেবা করিবে। অনিন্দনীয় কর্ম্ম করিবে, আমাদের যে সকল কর্ম্ম সৎ, তাহাই করিবে। অন্য (বিপরীত) কর্ম্ম করিবে না। "শ্রদ্ধয়া দেয়ম্"—শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে, অশ্রদ্ধার সহিত নয়। "শ্রিয়া দেয়ম্, ভিয়া দেয়ম্, হ্রিয়া দেয়ম্, সংবিদা দেয়ম্।"—বুদ্ধির সহিত, বিনয়ের সহিত, ধর্ম্মভয়ের সহিত, মিত্রভাবের সহিত দান করিবে। কোন কর্ম্মবিষয়ে সংশয় হইলে, বিচারক্ষম, অক্রূরমতি, ধর্ম্মকাম ব্যক্তি যেরূপ আচরণ করেন, সেইরূপ করিবে।

মুণ্ডকোপনিষৎ

"বিশ্বস্য কর্ত্তা, ভুবনস্য গোপ্তা" ব্রহ্মা সকল দেবতাদিগের প্রথমে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। সর্ব্ববিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্মবিদ্যা তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠপুত্র অথর্ব্বাকে বলিয়াছিলেন। অথর্ব্বা সেই ব্রহ্মবিদ্যা অঙ্গিঃনামক ঋষিকে, অঙ্গিঃ ভরদ্বাজগোত্রীয় সত্যবাহকে, সত্যবাহ অঙ্গিরাকে বলিয়াছিলেন। এই অঙ্গিরার নিকট গিয়া মহাগৃহস্থ শৌনক জিজ্ঞাসা করিলেন "ভগবন, যাহা জানিলে সকলই জানা হয়, সেই বস্তু কি?" উত্তরে অঙ্গিরা বলিলেন "ব্রহ্মবিৎ যাঁহারা,

তাঁহারা পরা ও অপরা নামে দুই বিদ্যার কথা বলেন। ঋগ্বেদ, যজুর্ব্বেদ, সামবেদ, অথর্ব্ববেদ, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ—ইহারা অপরা বিদ্যা। যে বিদ্যাদ্বারা "অক্ষর"কে জানা যায়, তাহা পরাবিদ্যা। যিনি অদৃশ্য, অগ্রাহ্য, অগোত্র (মূলহীন), অবর্ণ (বর্ণহীন), চক্ষুহীন, কর্ণহীন, তিনি হস্তপদহীন, নিত্য, বিভু, সর্ব্বগত, সু-সূক্ষ্ম, অব্যয়, ভূতযোনি (সর্ব্বভূতের উৎপত্তিস্থান)। পণ্ডিতেরা তাহাকে দর্শন করিয়া থাকেন। উর্ণনাভ যেমন স্বীয় দেহ হইতে তন্তু বাহির করে, এবং পুনরায় সেই তন্তু আপনার মধ্যে গ্রহণ করে, পৃথিবী হইতে যেমন ওষধি নির্গত হয়, জীবিত পুরুষের দেহ হইতে যেমন কেশলোম বাহির হয়, তেমনি অক্ষর পুরুষ হইতে বিশ্ব বহির্গত হয়। তপস্যা অথবা জ্ঞান (সৃষ্টির বিধিজ্ঞান) দ্বারা ব্রহ্ম প্রবৃদ্ধ হইলেন। তাঁহা হইতে অন্ন অর্থাৎ জগৎ-উৎপত্তির বীজ উৎপন্ন হইল। অন্ন হইতে প্রাণ, মন, সত্য (আকাশাদি পঞ্চভূত), ভূঃ, ভুবঃ প্রভৃতি লোকসমূহ এবং কর্ম্মের অবিনাশী ফল উৎপন্ন হইল। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, যাঁহার তপস্যা জ্ঞানময়, তাঁহা হইতে এই ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ), নামরূপ ও অন্ন জাত হইয়াছে।

"কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, বিশ্বরুচি, এই সপ্তজিহ্ব অগ্নিশিখায় যে আহুতি দান করে, তাহাকে তাহার আহুতিসকল সূর্য্যরশ্মির ভিতর দিয়া যেখানে দেবতাদিগের একমাত্র রাজা বাস করেন, সেই স্থানে লইয়া যায়। আহুতিসকল তাহাকে বলে 'এসো, এসো, এই তোমাদের পুণ্যকর্ম্মলব্ধ পবিত্র ব্রহ্মলোক।' কিন্তু এই সকল যজ্ঞরূপ প্লব (ভেলা) অদৃঢ়। যে সকল মূর্খ ইহাদিগকে শ্রেয়ঃ মনে করে, তাহারা পুনরায় জরা মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। অবিদ্যার মধ্যে বর্ত্তমান, অথচ আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া মনে করে যে সকল লোক, তাহারা জরা প্রভৃতি অনর্থকর্ত্তৃক পীড্যমান হইয়া অন্ধকর্ত্তৃক নীয়মান অন্ধের মতো পরিভ্রমণ করে। কর্ম্মফলে আসক্তিবশতঃ এই সকল লোক আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিলেও, ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না বলিয়া কর্ম্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে দুঃখার্ত্ত হইয়া তাহারা স্বর্গ হইতে পতিত হয়।

"সুদীপ্ত অগ্নি হইতে যেমন সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেই রূপ অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাহাতেই বিলীন হয়।

"সেই দিব্য পুরুষ অমূর্ত্ত, বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী, অজ, অপ্রাণ, অমনঃ, শুভ্র, পর অক্ষর (হিরণ্যগর্ভ) হইতে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্ম আবিঃ (প্রকাশমান) ও সন্নিহিত (অন্তরস্থ)। গুহাচর (হৃদয়বাসী) তাঁহার নাম। যাহা এজৎ

(চলনশীল), যাহা প্রাণৎ (প্রাণাপান বিশিষ্ট), এবং যাহা মিষৎ (নিমেষ ক্রিয়াযুক্ত), সকলই তাঁহাতে আশ্রিত। যাহা অর্চ্চিমৎ (দীপ্তিশালী), যিনি অণু হইতেও অণু, যাহাতে লোকসমূহ ও তাহাদের অধিবাসিগণ অবস্থিত, তিনি অক্ষর ব্রহ্ম। তিনি প্রাণ, তিনি বাক্য, তিনি মন। তিনি সত্য, তিনি অমৃত। উপনিষৎ-বিহিত মহাস্ত্র ধনু গ্রহণ করিয়া উপাসনা দ্বারা নিশিত শর সন্ধান কর। তদ্‌ভাবগত চিত্তদ্বারা ধনু আকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ কর। প্রণব ধনু, আত্মা শর, ব্রহ্ম লক্ষ্য। তিনি অমৃতের সেতু। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, ভূলোকে যাঁহার মহিমা বিরাজিত. সেই আত্মা জ্ঞানদীপ্ত ব্রহ্মপুরে হৃদয়াকাশে প্রতিষ্ঠিত। তিনি মনোময়, প্রাণ ও শরীরের নেতা। যিনি আনন্দ ও অমৃতরূপে বিরাজ করিতেছেন, পণ্ডিতগণ তাঁহাকে বিশেষ জ্ঞানদ্বারা দর্শন করেন।

পর ও অবর (কারণ ও কার্য্যরূপী) ব্রহ্মকে যখন দর্শন করা যায়, তখন হৃদয়-গ্রন্থি (অবিদ্যাজনিত বিষয়বাসনা) ভিন্ন হয়, সর্ব্ব-সংশয় ছিন্ন হয়, সর্ব্ব কর্ম্ম ক্ষয়-প্রাপ্ত হয়। তিনি শুভ্র, জ্যোতিষ্মৎ বস্তুর জ্যোতিঃ। সেখানে সূর্য্য কিরণ দেয় না (সূর্য্য তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না), চন্দ্রতারকাও তথায় দীপ্তি পায় না। বিদ্যুৎও সেখানে চমকায় না। অগ্নি তো দূরের কথা। সেই দীপ্তিমানের প্রকাশেই সকল বস্তু প্রকাশিত হয়। বরিষ্ঠ ব্রহ্মই এই সমস্ত জগৎ।

> ন তত্র সূর্য্যোভাতি, ন চন্দ্রতারকম্।
> নেমা বিদ্যুতো ভান্তি, কুতোঽয়মগ্নিঃ ?
> তমেব ভান্তমনুভাতি সর্ব্বং।
> তস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি॥
> ব্রহ্মৈ বেদমমৃতং, পুরস্তাদ্ ব্রহ্ম, পশ্চাৎ ব্রহ্ম, দক্ষিণত শ্চোত্তরেণ।
> অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥

দুইটি সুপক্ষযুক্ত পরস্পর সংযুক্ত সখ্যভাবযুক্ত পক্ষী একই বৃক্ষ আশ্রয় করিয়া আছে। তাহাদের একটি মিষ্ট ফল আস্বাদ করে, আর একটি না খাইয়া কেবল দর্শন করে। জীব একই বৃক্ষে নিমগ্ন হইয়া, (দেহকে আত্মা মনে করিয়া) শক্তিহীনতাবশতঃ মুহ্যমান হইয়া শোকার্ত্ত হয়; কিন্তু যখন সাধক কর্ত্তৃক সেবিত, দেহাদি হইতে ভিন্ন অন্যকে (ঈশ্বরকে) এবং তাঁহার মহিমা দর্শন করে, তখন বীতশোক হয়। যখন সাধক দৃষ্টিশক্তি প্রাপ্ত হইয়া সুবর্ণ-বর্ণ (জ্যোতির্ময়) কর্ত্তা ব্রহ্মের (হিরণ্যগর্ভের) যোনি

(উৎপত্তি-স্থান) ঈশ পুরুষকে দর্শন করেন, তখন জ্ঞান-লাভ করিয়া পুন্যপাপ (উভয় বিধ কর্ম্ম) পরিত্যাগ করিয়া, নিরঞ্জন (নির্ম্মল) হইয়া পরম সাম্য প্রাপ্ত হন। যিনি যাবতীয় ভূতের আত্মারূপে বিরাজমান, তিনিই প্রাণ। ইহা জ্ঞাত হইয়া সেই বিদ্বান্ অতিবাদী হন না (ব্রহ্মকে অতিক্রম করিয়া কিছু বলেন না)। তিনি আত্মক্রীড় ও আত্মরতি (পরমাত্মাতে প্রীত এবং তাহাতেই ক্রীড়াশীল) হইয়া ক্রিয়াবান (সৎকার্য্যশীল) হন। তিনি ব্রহ্মবিদ্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। যে জ্যোতির্ম্ময় শুভ্র আত্মা শরীরের মধ্যে বর্ত্তমান এবং নিষ্কল চিত্ত যতিগণ যাহাকে দর্শন করেন, তিনি সত্য, তপস্যা, সম্যক জ্ঞান এবং নিত্য ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা লভ্য। সত্যেরই জয় হয়, অনৃতের জয় হয় না। সত্যদ্বারা দেবযান পন্থা বিস্তীর্ণ। সেই পথদিয়া আপ্তকাম ঋষিগণ সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের পরম ধামে গমন করেন। তিনি বৃহৎ (ব্রহ্ম), তিনি দিব্য, তিনি অচিন্ত্য-রূপ, তিনি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর, তিনি দূর হইতে সুদূরে, আবার নিকটে এখানেও আছেন। যাহারা দেখিতে পায়, তাহাদের (অর্থাৎ জ্ঞানবানপদার্থদিগের) বুদ্ধিরূপ গুহাতে তিনি নিহিত আছেন। চক্ষুদ্বারা অথবা বাক্যদ্বারা তাঁহাকে গ্রহণ করা যায় না। অন্য দেবতাদিগের (ইন্দ্রিয়দিগের) দ্বারাও তিনি গ্রাহ্য নহেন। তপস্যা ও কর্ম্মদ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না। জ্ঞানের প্রসাদ (শুদ্ধি) দ্বারা বিশুদ্ধান্তঃ-করণ হইয়া ধ্যানযোগে সেই নিষ্কল ব্রহ্মকে দর্শন করা যায়। যেখানে প্রাণবায়ু প্রান-অপানাদি পঞ্চ প্রকারে প্রবিষ্ট, সেই দেহের মধ্যে এই অণু আত্মাকে জানিতে হইবে। প্রাণীদিগের সমগ্র চিত্ত প্রাণদ্বারা (ইন্দ্রিয়দিগের দ্বারা) ব্যাপ্ত। চিত্ত বিশুদ্ধ হইলেই আত্মা প্রকাশিত হন।

যে কাম্যবস্তুর চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে কামনা করে, সে সেই কামনাসহ তাহাদের উপভোগের উপযোগী লোকে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু যাহার কামনার পরিতৃপ্তি হইয়াছে, তাহার কামনা ইহলোকেই বিলীন হয়।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যঃ,
ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে, তেন লভ্যঃ,
তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাম্।

বেদাধ্যাপন, মেধা বা শাস্ত্রজ্ঞানদ্বারা এই আত্মাকে লাভ করা যায় না। যাহাকে আত্মা বরণ করেন, তাঁহারই ইনি লভ্য। তাঁহার নিকটই আত্মা স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ করেন।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ,
ন চ প্রমাদাৎ তপসো বাপ্যলিঙ্গাৎ।
এতৈরুপায়ৈঃ যততে যস্তু বিদ্বান্,
তস্যৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম।

(আত্মনিষ্ঠাজনিত) বীর্য্যহীন এই আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। ঔদাস্য এবং সন্ন্যাসরহিত (অলিঙ্গ) তপস্যা (জ্ঞান) দ্বারাও তাহাকে লাভ করা যায় না। যে বিদ্বান্ এই সকল উপায়ে (বীর্য্য, অপ্রমাদ, সন্ন্যাসযুক্ত জ্ঞান), তাহাকে পাইবার জন্য চেষ্টা করেন, তাহার আত্মা ব্রহ্মধামে প্রবেশ করে।

সম্প্রাপ্যৈনমৃষয়ো জ্ঞানতৃপ্তাঃ,
কৃতাত্মানঃ বীতরাগাঃ প্রশান্তাঃ,
তে সর্ব্বগং সর্ব্বতোপ্রাপ্য ধীরাঃ,
যুক্তাত্মানঃ সর্ব্বমেবাবিবিশন্তি।

ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া ঋষিগণ জ্ঞানতৃপ্ত, কৃতাত্মা, বীতরাগ ও প্রশান্ত হন। সমাহিত-চিত্ত তাঁহারা সর্ব্বগ ব্রহ্মকে সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হইয়া সম্যকরূপে তাঁহাতে প্রবেশ করেন।

বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ
সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে
পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে।

বেদান্ত বিজ্ঞানের অর্থ (বিষয়) যাঁহারা নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছেন, সন্ন্যাস-যোগদ্বারা যাঁহারা শুদ্ধ-সত্ত্ব হইয়াছেন এবং পরম অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাদৃশ যতিগণ পরান্তকালে (সংসারাবসানে) মুক্তি প্রাপ্ত হন।

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়।
তথা বিদ্বান্ নামরূপাৎ বিমুক্তঃ
পরাৎপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যং।

প্রবহমান নদীসমূহ যেমন নাম ও রূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে বিলীন হয়, সেইরূপ ব্রহ্মবিৎ নাম-রূপ-মুক্ত হইয়া দিব্য পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হন।

স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি।

যিনি সেই পরব্রহ্মকে জানেন, তিনি সেই ব্রহ্মই হন। তিনি শোক ও পাপ উত্তীর্ণ হন এবং হৃদয়গ্রন্থি হইতে মুক্ত হইয়া অমৃত হন।

মাণ্ডুক্যোপনিষৎ (অথর্ব্ব-বেদীয়)

১২টি শ্লোকে এই উপনিষদে ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

(১) এই সমস্তই "ওঁ" এই অক্ষর। ভূত, ভবৎ (বর্ত্তমান) ও ভবিষ্যৎ, সকলই (যাবতীয় প্রপঞ্চ) ওঁকার। যাহা ত্রিকালাতীত, (প্রকৃতি-আদি) তাহাও ওঁকার।

(২) এই সকলই ব্রহ্ম। এই আত্মাও ব্রহ্ম। এই আত্মা চতুষ্পাদ অর্থাৎ চারি অংশযুক্ত। (এই আত্মা কে ? শঙ্কর বলেন জীবাত্মা। রামানুজ বলেন জীবাত্মার অন্তর্যামী পরমাত্মা)।

(৩) ব্রহ্মের প্রথম পাদ জাগরিত স্থান, বহিঃপ্রজ্ঞ, সপ্তাঙ্গ, একোনবিংশতি-মুখ, স্থূলভুগ্, বৈশ্বানর। এই জীবোপেত জগৎই প্রথম পাদ। জাগ্রৎ অবস্থাতে যাহা যাহা উপলব্ধ হয়, সকলই ব্রহ্ম। এই অবস্থায় ব্রহ্ম বহিঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ বাহ্য যাবতীয় বিষয়, তাঁহার জ্ঞানের বিষয়। স্বর্গ তাঁহার মস্তক, সূর্য চক্ষু, বায়ু প্রাণ, অন্নজল উদর, আকাশ মধ্যদেশ, পৃথিবী দুই পাদ। এই তাঁহার সপ্ত অঙ্গ। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অহংকার ও চিত্ত—ইহারা তাঁহার উনিশ মুখ। এইগুলি তাঁহার উপলব্ধিদ্বার। শব্দাদি স্থূল বিষয় তিনি ভোগ করেন। বিশ্ব ও নর উভয়ই তিনি। তিনি বিশ্বরূপ পুরুষ—(বৈশ্বানর)।

(৪) তাঁহার দ্বিতীয় পাদ স্বপ্নে অধিষ্ঠিত। এই অবস্থায় তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ অর্থাৎ বহিরিন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ, মনোমাত্র-গ্রাহ্য বিষয় তিনি উপলব্ধি করেন। উপরিউক্ত উনবিংশ মুখ মনে বিলীন অবস্থায় বর্ত্তমান থাকে। তখন তিনি প্রবিবিক্ত অর্থাৎ সূক্ষ্ম বিষয় ভোগ করেন। তেজ অর্থাৎ বিষয়শূন্য বাসনাময়ী প্রজ্ঞাই তখন তাহার বিষয়, তিনি তখন বিষয়ীমাত্র—(তৈজস পুরুষ)।

(৫) তাঁহার তৃতীয় পাদ—সুষুপ্তির অবস্থা। তখন কোনও কামনা নাই, কোনও স্বপ্নদর্শন হয় না। জাগরিত ও স্বপ্নাবস্থায় পৃথক পৃথক অনুভূত প্রপঞ্চ বিশ্ব তখন তাঁহাতে একীভূত থাকে। বিবিধ জ্ঞান ঘনীভূত হইয়া অপৃথক ভাবে তখন তাঁহাতে বর্ত্তমান থাকে। তখন তিনি আনন্দময় (প্রচুর আনন্দের আধার) ও চেতোমুখ অর্থাৎ চেতঃ (বোধ-ই) তখন তাহার একমাত্র অনুভব-দ্বার। তখন তিনি প্রাজ্ঞ অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান, সকলই জানেন। ইনি সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, অন্তর্যামী, সকল বস্তুর উৎপত্তিস্থল, সকল প্রাণীর প্রভব (উৎপত্তি) ও অপ্যয়ের (প্রলয়ের) কারণ।

(৬) চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থায় তিনি অন্তঃপ্রজ্ঞ নহেন, বহিঃপ্রজ্ঞ নহেন, উভয়প্রজ্ঞও নহেন, প্রজ্ঞানঘন নহেন, প্রজ্ঞ নহেন, অপ্রজ্ঞ নহেন। তখন তিনি অদৃষ্ট, অব্যবহার্য্য, অগ্রাহ্য (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন), অলক্ষণ (দ্বৈতসম্বন্ধহীন বলিয়া বর্ণনাতীত), অব্যপদেশ্য (অনির্বচনীয়), একাত্মপ্রত্যয়সার (একই আত্মা বিদ্যমান, এই প্রত্যয় বা বোধের বিষয়), প্রপঞ্চোপশম (রূপরসাদি পঞ্চবিধ বিষয় তাঁহাতে উপশান্ত অর্থাৎ তাহাদের জ্ঞানহীন), শান্ত (রাগদ্বেষাদি রহিত), শিব (মঙ্গল) ও অদ্বৈত। এই আত্মাকেই জানিতে হইবে। এই আত্মা অধ্যক্ষর (ওঁ এই অক্ষর দ্বারা বর্ণিতব্য)। ওঁকারের তিন মাত্রা—অ, উ, ম। আত্মার যে তিন পাদ, তাহারা ওঁকারের তিন মাত্রা। জাগরিতস্থান বৈশ্বানর ওঁকারের প্রথম মাত্রা 'অ'কার। 'অ'কার সকল বাক্যের মধ্যে ব্যাপ্ত ও সকল বর্ণের আদি, সেইরূপ বৈশ্বানরকর্তৃক সকল জগৎ ব্যাপ্ত ও তাহা ব্রহ্মের চারি পাদের আদি। স্বপ্নের অধিষ্ঠাতা তৈজস দ্বিতীয় মাত্রা উকার। "উ"কার যেমন "অ"কার হইতে উৎকৃষ্ট এবং 'অ' ও 'ম' কারের মধ্যে অবস্থিত, তেমনি তৈজস বৈশ্বানর ও প্রাজ্ঞের মধ্যস্থ। সুষুপ্তির অধিষ্ঠাতা প্রাজ্ঞ তৃতীয় মাত্রা "ম"কার। সুষুপ্তিকালে বৈশ্বানর ও তৈজস প্রাজ্ঞের মধ্যে প্রবেশ করেন এবং জাগ্রত অবস্থায় তাহা হইতে বহির্গত হন। এই প্রবেশ ও নির্গমন দ্বারা প্রাজ্ঞ যেন বৈশ্বানর ও তৈজসের পরিমাপ করেন। সেইরূপ ওঁকার উচ্চারিত হইবামাত্র 'অ'কার ও 'উ'কার 'ম'র মধ্যে প্রবেশ করে, আবার উচ্চারণের আরম্ভে তাহারা বাহির হয়। এই সাদৃশ্য প্রাজ্ঞ ও 'ম' কারের মধ্যে বর্ত্তমান। বৈশ্বানর ও তৈজস যেমন প্রাজ্ঞে একীভূত হন, সেইরূপ ওঁকার উচ্চারণান্তে 'অ'কার ও 'উ'কার 'ম'কারে একীভূত হয় (অপীতি)।

অমাত্র (মাত্রাশূন্য) চতুর্থ, অব্যবহার্য্য, প্রপঞ্চোপশম, শিব, অদ্বৈত—এইরূপ ওঁকারই আত্মা।

ঔপনিসদ্ ব্রহ্ম

ভৃগু যখন পিতার নিকট গিয়া ব্রহ্ম সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তখন পিতা বরুণ বলিয়াছিলেন "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যং প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি, তদ্ ব্রহ্ম"। যাহাহইতে ভূত সকল উৎপন্ন হয়, যাহাদ্বারা জীব জন্মিয়া বাঁচিয়া থাকে এবং অন্তিমে যাহাতে প্রবেশ করে, তাহাই ব্রহ্ম। কিন্তু ইহা ব্রহ্মের তটস্থ লক্ষণ, ব্রহ্মের

স্বরূপ কি? বরুণ তপস্যাদ্বারা তাহা জানিবার জন্য পুত্রকে আদেশ করিয়াছিলেন। ভৃগু তপস্যা করিয়া প্রথমে বুঝিলেন অন্নই ব্রহ্ম। পরে বুঝিলেন, প্রাণ ব্রহ্ম; তাহার পরে মন ব্রহ্ম; তাহার পরে, বিজ্ঞান ব্রহ্ম অবশেষে বুঝিলেন আনন্দই ব্রহ্ম। ইহাই ভার্গবী বারুণী বিদ্যা।

ভৃগু যে যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা তপস্যালব্ধ। তপস্যা শব্দের অর্থ এখানে কৃচ্ছ্রসাধন (Penance) নহে, বাহ্যান্তঃকরণ-সমাধান, মনের ও ইন্দ্রিয়দিগের সমস্ত শক্তির কেন্দ্রীকরণ। প্রথম বারের মনঃসমাধানের ফলে তিনি যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছিলেন, তাহা বিশুদ্ধ জড়বাদ। জড় (matter) ই সর্ব্ববস্তুর মূল। জড় হইতেই সকল প্রাণী উৎপন্ন হয়। জড় হইতে উৎপন্ন অন্ন খাইয়া প্রাণিগণ বাঁচিয়া থাকে এবং অন্তিমে জড়েই পরিণত হয়। দ্বিতীয় বারে ভৃগু জড় হইতে শক্তিতে উপনীত হইলেন। প্রাণই শক্তি— সার্বিকশক্তি। এই শক্তি সূক্ষ্ম, সর্ব্ববস্তুর অন্তর্বর্তী ও সর্ব্বব্যাপী। শক্তির প্রত্যয় আমাদিগের দৃষ্টি পৃথিবীর বাহিরে অনন্ত বিশ্বের দিকে প্রসারিত করিয়া দেয়। জড়ের স্থূলত্ব, এবং বিভিন্ন বস্তুর পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব ইহা দ্বারা বিদূরিত হয়—এক সনাতন বিশ্বব্যাপী শক্তির প্রকাশরূপে সকল বস্তু পরিগণিত হয়। প্রাণই এই শক্তি। বিশ্বের কেন্দ্র স্থলে অবস্থিত এক উৎস হইতে প্রাণের স্রোত চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত। পৃথিবীর প্রাণিগণ সেই প্রাণ হইতে উদ্‌ভূত এবং সেই কেন্দ্রীয় উৎস হইতে সেই প্রাণ-স্রোত তাহাদিগের মধ্যে প্রবাহিত বলিয়া তাহারা বাঁচিয়া থাকে, এবং অন্তিমে তাহাদের প্রাণ সেই কেন্দ্রীয় উৎসে ফিরিয়া যায়। সেই অসীম প্রাণই ব্রহ্ম। ইহাই ভৃগুর দ্বিতীয় মীমাংসা, কিন্তু শেষ মীমাংসা নহে। ইহার পরে তিনি প্রাপ্ত হইলেন "মনই ব্রহ্ম।" মনহইতে সকল ভূত উৎপন্ন হয়, মনদ্বারাই জীবিত থাকে এবং মনেই অন্তিমে প্রবেশ করে। মন ও আত্মা এক নহে। হিন্দুদর্শনে মন একটি ইন্দ্রিয় বলিয়া পরিগণিত—অন্তরিন্দ্রিয়। এই ইন্দ্রিয়ে সমস্ত সংবেদন (Sensation) উপস্থিত হইয়া জ্ঞানাকারে সজ্জিত হয়। জড় বিশ্বের বিশ্লেষণের ফলে ভৃগু জড়কে শক্তির প্রকাশ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। বুঝিয়াছিলেন যাহা জড়রূপে প্রতীত হয়, তাহা শক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। শক্তির বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বুঝিলেন শক্তি সংবেদনমাত্র, শক্তির যে প্রত্যয় আমাদের মনে আছে, তাহা সংবেদনদিগের সংযোগের প্রত্যয় ভিন্ন অন্য কিছু নহে, এবং যাহাকে মন বলা হয়, তাহাও সংবেদনদিগের সমবায়মাত্র। বিশ্ব যদি শক্তি হইতে

উদ্‌ভূত হয়, এবং শক্তি যদি সংবেদন হয়, তাহা হইলে সমগ্র বিশ্ব বিভিন্নজাতীয় সংবেদনের সমবায়, এবং এই সমবেত সংবেদনরাজিই মন। সুতরাং মন হইতেই ভূতগণ উৎপন্ন হয়, মনদ্বারা বাঁচিয়া থাকে এবং মনেই অন্তিমে লীন হয়।

পুনরায় তপস্যা করিয়া ভৃগু পাইলেন "বিজ্ঞানই ব্রহ্ম।" ভৃগু প্রথমে বুঝিয়াছিলেন জীব-সমন্বিত এই বিশ্ব মন যাহার অন্তর্ভুক্ত) জড় ভিন্ন কিছু নহে। পরমাণুর সমবায়ে যাবতীয় জড় বস্তু গঠিত, পরমাণু অচেতন জড়পদার্থ। তাহার পরে ভৃগু বুঝিয়াছিলেন, যাহাকে অচেতন জড় বলা হয়, তাহা শক্তি—অচেতন শক্তি। কিন্তু শক্তির বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বুঝিলেন শক্তি সংবেদন ব্যতীত কিছু নহে, এই বিশ্ব সংবেদনের সমবায় এবং মন স্বরূপে আত্মিকপদার্থ (Spiritual)। সুতরাং তথাকথিত জড় মূলে পরস্পর সংবদ্ধ আত্মিক পদার্থসমূহের সংঘাত (organised system)। সংবেদন দ্বিবিধ—বাহ্য সমুৎপাদ এবং মানসিক সমুৎপাদ। কিন্তু উভয়ই এক আত্মিক পদার্থের অন্তর্ভুক্ত। বিশ্ব এই দ্বিবিধ সমুৎপাদের (phenomena) সমবায়ে গঠিত, এবং এই দ্বিবিধ আত্মিক উপাদানের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহার উপর ইহার স্থিতি নির্ভরশীল। কিন্তু এই দ্বিবিধ সমুৎপাদ যে আত্মিক পদার্থের বিকার এবং যাহার মধ্যে উভয়বিধ সমুৎপাদের সম্বন্ধ বর্ত্তমান, সেই আত্মিক পদার্থের স্বরূপ কি? সে পদার্থ বিজ্ঞান—প্রজ্ঞা (Reason)। বাহ্য জগৎ এই প্রজ্ঞাকর্তৃক পরিচালিত—তাহার সর্ব্বত্র প্রজ্ঞার শাসন বর্ত্তমান। অন্তর্জগৎ ও প্রজ্ঞার নিয়মদ্বারা শাসিত। সুতরাং ভৃগু বুঝিলেন বিজ্ঞান বা প্রজ্ঞা হইতেই সকল ভূত উৎপন্ন হয়, প্রজ্ঞাদ্বারা বাঁচিয়া থাকে, এই প্রজ্ঞাতেই বিলীন হয়। এই জগৎ প্রজ্ঞা হইতে স্বতন্ত্র নহে; ইহা যে কেবল প্রজ্ঞার নিয়মানুসারে চালিত হয়, তাহা নহে। ইহা প্রজ্ঞাই; প্রজ্ঞাই ইহার উপাদান। যে প্রজ্ঞাকে আমাদের রক্তমাংসের শরীরের মধ্যে আবদ্ধ মনে হয়, দিব্য দৃষ্টিতে তাহাই বিশ্বের চালকরূপে পরিদৃষ্ট হয়। তাহা দেশ ও কালের অতীত, তাহা আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক অনুভূতি এবং প্রত্যেক চিকীর্ষায় অনুস্যূত। স্থূল জগৎ ঊর্ণনাভের জালের ন্যায় প্রজ্ঞা-তন্তুদ্বারা নির্ম্মিত। কিন্তু বরুণের নিকট এ মীমাংসাও বাহ্য বলিয়া প্রতীত হইল। শেষবারের ব্যাখ্যায় ভৃগু সত্যে উত্তীর্ণ হইলেন। "আনন্দ ব্রহ্ম", এই সত্য তাহার নিকট প্রতিভাত হইল। কিন্তু এই মীমাংসা যুক্তিদ্বারা লভ্য নহে। ভৃগু যে আনন্দের কথা বলিয়াছেন, তাহা আমাদের অনুভূত সুখ নহে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে যে ভূমার কথা আছে, সেই ভূমাই আনন্দ। যাহা ভূমা, তাহাই সুখ। অল্পে সুখ নাই। ভূমাই সুখ। "যো-বৈ ভূমা তৎ অমৃতং" ভূমাই সব; তিনি ঊর্দ্ধে, অধঃতে, দক্ষিণে, উত্তরে। ভূমা পূর্ণ, অনবদ্য, সীমাহীন, নিস্তরঙ্গ। তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দ। যুক্তি-বলে ভৃগু "বিজ্ঞান ব্রহ্ম" পর্য্যন্ত উঠিয়া ছিলেন। তাহাই যুক্তির শেষ সীমা। তাহার পরে তিনি যে তত্ত্বের কথা বলিয়াছেন, তাহা তাঁহার অনুভব-সিদ্ধ।* ধ্যান-বলেই তিনি সেই আনন্দ-তত্ত্বের সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন। "যতো বাচঃ নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ, আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন।" মনের সহিত বাক্য যাহাকে না পাইয়া ফিরিয়া আসে, সেই ব্রহ্মের আনন্দ যিনি জানেন, তিনি কখনও ভয় প্রাপ্ত হন না। এই ব্রহ্ম আত্মা—অপহতপাপ্মা, বিজর, বিমৃত্যু (ছান্দোগ্য)। প্রজাপতি ইন্দ্রকে বলিয়াছিলেন "শরীর অশরীর আত্মার অধিষ্ঠান। অশরীর আত্মাকে প্রিয় ও অপ্রিয় স্পর্শ করিতে পারে না। দর্শন, আঘ্রাণ, স্পর্শন, মনন প্রভৃতি অশরীর আত্মাই করেন।" বৃহদারণ্যকে যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিতেছেন যাঁহার নিম্নে সংবৎসর দিন-সকলের সহিত আবর্ত্তন করিতেছে (সংবৎসরঃ অহোভিঃ পরিবর্ত্ততে) সেই জ্যোতির জ্যোতি আয়ুস্বরূপ অমৃতস্বরূপকে দেবগণ উপাসনা করেন। যাহাতে পঞ্চজন (চক্ষুরাদি পঞ্চ ইন্দ্রিয়) ও আকাশ প্রতিষ্ঠিত, তাহাকেই আমি আত্মা বলিয়া জানি। তিনি প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন।"

জীব-শরীরে অধিষ্ঠিত এই আত্মা সর্ব্বশরীরে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি তিন অবস্থাতেই বর্ত্তমান। এই আত্মাই সর্ব্ব শরীরে জ্ঞাতা—সার্বিক বিষয়ী (Subject)। আবার ইনিই সার্বিক বিষয়; জ্ঞেয় সকল বিষয়ই এই আত্মা। এই সার্বিক আত্মাই দর্শন, শ্রবণ, মনন করিয়াও করেন না। তাহা হইতে ভিন্ন দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য কিছুই নাই; এই জন্য তিনি দর্শন, শ্রবণ ও মনন করেন না।†

মানব-শরীরে অধিষ্ঠিত অনন্ত আত্মার মধ্যে নাই, এমন কিছুই বিশ্বে নাই। প্রকৃতির যাবতীয় ব্যাপার এবং অনুভূত সমস্ত বিষয় ইহার অন্তর্গত। জীবাত্মা ইহার অঙ্গীভূত হইলেও ইহা তাহার অতীত। জ্ঞানে যাহা কিছু প্রকাশিত

---

* অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের Intellectual Ideal—Lecture I. দ্রষ্টব্য।

† বৃ, আঃ—৪।৩

হয়, তারা এই অসীম পরমাত্মারই প্রকাশ। আমাদের সংবিদ ও তাহার সমস্ত অবস্থা, তাঁহার অনন্ত জ্ঞানভাণ্ডার হইতে আমাদের মধ্যে আগত হয় (ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ)। দেশ ও কালে উদ্‌ভূত যাবতীয় সংবেদনের স্রোতের নিম্নদেশে অপরিণামী তিনি বর্ত্তমান। তিনি সংবিদে সাক্ষীরূপে বর্ত্তমান, কিন্তু সংবিদের বিষয় কখনও হন না। প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ায় তিনি বর্ত্তমান, কিন্তু কখনও জ্ঞানের মধ্যে থাকেন না। যাবতীয় অনুভবের বিষয়ী কখনও অনুভবের বিষয় হইতে পারেন না। যদি তিনি অনুভবের বিষয় হইতেন, তাহা হইলে অনুভব করিত কে?

মাণ্ডুক্য উপনিষদে আত্মার চারিটি অবস্থার কথা আছে - জাগরিত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। স্বপ্নাবস্থায় আত্মা সূক্ষ্মবিষয় ভোগ করেন, জাগ্রৎকালে অনুভূত বিষয়দ্বারা নূতন রূপজগতের সৃষ্টি করেন। সুষুপ্তি অবস্থায় স্বপ্ন থাকে না, কোনও কামনাও থাকে না, তখন জীব ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়। তখন জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থার ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান একীভূত ও ঘনীভূত হইয়া তাহাতে বর্ত্তমান থাকে। তখন তিনি আনন্দময়, আনন্দভুক্ প্রাজ্ঞ। তখন বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ থাকে না। ইহার উপর তুরীয় (চতুর্থ) অবস্থা। সেই অবস্থায় বাহ্য ও আন্তর কোনও বিষয়ের জ্ঞান হয় না। তাহা প্রজ্ঞানঘন অবস্থা নহে, আবার দ্বৈতভাবযুক্ত জ্ঞানের অবস্থাও নহে, অপ্রজ্ঞ (অজ্ঞান) অবস্থাও নহে। তখন আত্মা একাত্মপ্রত্যয়সার—অর্থাৎ একমাত্র আত্ম-প্রত্যয়ই তখন তাহাতে বর্ত্তমান। প্রপঞ্চ তখন উপশান্ত, রাগদ্বেষাদিও শান্ত। তখন আত্মা শিব (মঙ্গল-স্বরূপ) ও অদ্বৈত।

গৌড়পাদ বলেন "আদিতে যাহার অস্তিত্ব নাই, অন্তেও যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা অসৎ।" এই যুক্তিতে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি, তিন অবস্থাকেই অসৎ বলা যায়। স্বপ্নাবস্থাকে অসৎ বলা হয়, কেননা জাগ্রৎ অবস্থার সহিত তাহার সামঞ্জস্য নাই। কিন্তু বিভিন্ন অংশের মধ্যে সামঞ্জস্য-যুক্ত স্বপ্নও বিরল নহে। জাগ্রৎ অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহীন বলিয়া যদি স্বপ্নাবস্থাকে অসৎ বলা যায়, তাহা হইলে স্বপ্নাবস্থার সহিত সামঞ্জস্যহীন জাগ্রৎ অবস্থাকেও অসৎ বলা যাইতে পারে। উভয়ই আত্মার বিভিন্ন অবস্থা। সুষুপ্তি তুরীয় অবস্থার নেতিবাচক অবস্থা। তখন আত্মার দুঃখ থাকে না। কিন্তু আত্মা কেবল দুঃখহীন নহেন, তিনি আনন্দময়। তুরীয় অবস্থা আত্মার স্বরূপ।

বৌদ্ধিক আত্ম-সংবিদে জ্ঞাতা ও জ্ঞানের ভেদ থাকে। জ্ঞানে ও কর্ম্মেও এই ভেদ বর্ত্তমান। যাহাকে চিন্তা অথবা মনন (Thought) বলে, তাহাতে

যেমন মন্তা (Thinker), তেমনি মননের বিষয়ও বর্ত্তমান। এই বিষয় মনন ক্রিয়া হইতে ভিন্ন—তাহার বাহিরে অবস্থিত বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ। কিন্তু যাহা "সৎ" (Reality), তাহা চিন্তা বা মনন হইতে ভিন্ন। তুরীয় অবস্থায় সেই সৎই অধিগত হয়—অব্যবহিত ভাবে অধিগত হয়। তখন মননের মধ্যে যে দ্বৈত আছে, তাহার বিলোপ হয় এবং ব্যক্তি পরম সত্তার সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়। ইহা অনুভবের বিষয়, যুক্তিদ্বারা ইহা প্রমাণ করা যায় না। এই অবস্থাই আনন্দ। ইহা শূন্যে বিলীন হওয়ার অবস্থা নহে, কিন্তু সত্তার পূর্ণতম অবস্থা।

ব্রহ্ম কামনা করিলেন, 'ঈক্ষণ' করিলেন প্রভৃতি বর্ণনা উপনিষদে আছে। যাহার মধ্যে কামনা আছে বলিয়া জানি, যিনি ঈক্ষণ করেন বলিয়া জানি, তাঁহাকে অজ্ঞেয় বলা যায় না। তিনি যখন কামনা করেন ও ঈক্ষণ করেন, তখন তাঁহার ইচ্ছা আছে, তাঁহার মন আছে, এবং তিনি জীবাত্মা হইতে স্বরূপে একান্ত ভিন্ন নহেন, ইহা উপনিষদের মত বলিতে হইবে। তিনিই যে প্রত্যগাত্মারূপে প্রতি জীবের মধ্যে বর্ত্তমান, ইহা বারংবার উক্ত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম অনন্ত, অন্তর্জ্জগতে ও বহির্জ্জগতে তাঁহার বাহিরে কিছুই নাই। আমাদের সর্ব্বকামনা, সর্ব্বেন্দ্রিয় মন, ইচ্ছা ও শক্তি, সমস্তই তাঁহার জ্ঞান, বল ও স্বাভাবিক ক্রিয়ার অন্তর্গত। সেই অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত বল ও অনন্ত ক্রিয়া কিরূপ, তাহা আমরা জানিনা। আমাদের মন তাহার ধারণা করিতে পারে না ইহা সত্য, কিন্তু একান্তভাবে তিনি আমাদের অজ্ঞাত নহেন। তিনি বিশ্বের সার্ব্বিক তত্ত্ব, কিন্তু তিনি চিৎ-স্বরূপ পুরুষ। তাঁহার সার্ব্বিকত্ব ও পুরুষত্ব, তাঁহার অনন্তত্ব ও ব্যক্তিত্বের (Personality) মধ্যে কিরূপে সামঞ্জস্য হয়, তাহা একটি দুরূহ সমস্যা।

ব্রহ্ম ও আত্মা

ইমানুয়েল ক্যাণ্ট্ বহির্জ্জগতের তলদেশে অবস্থিত অজ্ঞাত স্ব-গত বস্তুর (Thing-in itself) এবং অন্তর্জ্জগতেও জ্ঞান, অনুভূতি ও ইচ্ছার তলদেশে অবস্থিত স্বগত বস্তুর কথা বলিয়াছিলেন। এই দুই স্বগত বস্তু যে এক ও অভিন্ন, তাঁহার দর্শনে তাহার ইঙ্গিত থাকিলেও তিনি স্পষ্ট করিয়া তাহা বলেন নাই। ফিক্‌টে ইহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছিলেন এবং এই অভিন্নতার উপর তাঁহার দর্শনের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উপনিষদের ব্রহ্ম বাহ্যজগতের সার্ব্বিক তত্ত্ব, এবং আত্মা অন্তর্জ্জগতের তত্ত্ব, কিন্তু ব্রহ্ম ও আত্মা এক ও অভিন্ন।

যিনি অন্তরে, তিনিই বাহিরে। ছান্দোগ্য উপনিষদে "অন্তর্জ্যোতি" ও "বহির্জ্যোতির" একত্ব বর্ণিত হইয়াছে। দ্যুঃলোক অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, বিশ্বের উপর, সমস্তের উপর অনুত্তম লোকে, উত্তমলোকে যে জ্যোতি দীপ্তি পাইতেছে, সেই জ্যোতি এবং এই পুরুষের অভ্যন্তরে যে জ্যোতি—এই উভয় জ্যোতি একই জ্যোতি। (৩।১৩।৭) "যিনি সর্ব্বকর্ম্মা, সর্ব্বকাম, সর্ব্বগন্ধ, সর্ব্বরস, যিনি সমুদয় পরিব্যাপ্ত করিয়া আছেন, যিনি বাকরহিত, তিনিই আমার আত্মা এবং আমার হৃদয়ের অভ্যন্তরে। তিনিই ব্রহ্ম।" (৩।১৪।৪)

জীবাত্মা ও ব্রহ্মের এই অভিন্নতা সম্বন্ধে ডয়সেন লিখিয়াছেন "সমগ্র মানবজাতির পক্ষে এই জ্ঞানের মূল্য অপরিমেয়। আমাদের দৃষ্টি ভবিষ্যতের গর্ভে প্রবেশ করিতে অসমর্থ। অবিশ্রান্ত অনুসন্ধানতৎপর মানবাত্মার ভাগ্যে কোন্ কোন্ সত্যের উদ্ঘাটন ও আবিষ্কার সঞ্চিত হইয়া আছে, তাহা আমাদের অজ্ঞাত। কিন্তু একটি কথা আমরা দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত বলিতে পারি। তাহা এই, যে ভবিষ্যতের দর্শন যে নূতন ও অনভ্যস্ত পথের পথিক হউক না কেন, এই তত্ত্ব (জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য) চিরকাল অবিচলিত থাকিবে, এবং ইহা হইতে কোনও প্রকার বিচ্যুতি সম্ভবপর নহে। বস্তুর স্বভাবের মধ্যে দার্শনিক যে মহাপ্রহেলিকার সম্মুখীন হন, আমাদের জ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে যতই স্পষ্টতর ভাবে তাহার সমাধান অধিগত হউক না কেন, প্রকৃতির রহস্য যেখানে আমাদের নিকট উন্মুক্ত রহিয়াছে, কেবল সেখানেই অর্থাৎ আমাদের অন্তরতম আত্মার মধ্যেই সেই সমাধানের "চাবি" মিলিতে পারে। মৌলিক চিন্তাশীল উপনিষদের ঋষিগণ যখন আমাদের আত্মাকে—আমাদের অন্তরতম ব্যক্তিগত সত্তাকে—বিশ্বপ্রকৃতি এবং তাহার যাবতীয় সমুৎপাদের অন্তরতম সত্তা ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া বুঝিয়াছিলেন, তখন তাঁহারাই সর্ব্বপ্রথম সেই "চাবির" সন্ধান পাইয়াছিলেন। এই অবিনশ্বর গৌরবময় কীর্ত্তি তাঁহাদেরই।"

বিষয়ী হইতে ভিন্নরূপেই বিষয় আমাদের সাধারণ জ্ঞানে প্রতীত হয়। বাহ্য জগৎ আমাদের দেহস্থ বিষয়ীর বিষয়। বাহ্য জগৎ যে চিন্তার বিষয় হইতে পারে, ইহাই উভয়ের মধ্যে সমতার প্রমাণ। বাহ্য জগৎ প্রজ্ঞার নিয়মে পরিচালিত। দেহের মধ্যে থাকিয়া যিনি বাহ্য জগৎকে জানেন প্রজ্ঞাই তাঁহার স্বরূপ। সুতরাং বাহ্য জগৎ ও জীবাত্মা স্বরূপে যে একজাতীয়, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু এই সজাতীয়ত্ব ও অভিন্নত্ব এক কিনা, তাহা লইয়া বেদান্তের ভাষ্যকারদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। তুরীয় অবস্থায় বিষয়ী

ও বিষয়ের ভেদ বিলুপ্ত হয়। এক সমগ্রের মধ্যে যাবতীয় বিভেদ বিলীন হয়। তখন জীবাত্মা যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহা আমাদের সাধারণ জ্ঞানের অবস্থা নহে। সে অবস্থা কি, তাহার ধারণা আমাদের নাই। তবে তাহা অচেতন অবস্থা নহে।

ভৃগু বাহ্যজগতের বিশ্লেষণ করিয়া আনন্দময় ব্রহ্মের ধারণায় উপনীত হইয়াছিলেন। এই আনন্দময় ব্রহ্ম ও আত্মার তুরীয় অবস্থা অভিন্ন। এই অবস্থায় বিষয়ী ও বিষয় অভিন্ন। কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় আত্ম-সংবিদযুক্ত জীবে বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ বর্ত্তমান। এই অবস্থায় ব্রহ্ম জগৎ হইতে স্বতন্ত্র ঈশ্বররূপে প্রতিভাত হন।

জীব ও ব্রহ্ম—প্রত্যগাত্মা ও পরমাত্মা

উপনিষদে জীব ও প্রত্যক্ আত্মা শব্দ শারীরী আত্মা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দেহের মধ্যে অবস্থিত যিনি দেহ ও ইন্দ্রিয়দিগের প্রতীপ বা বিপরীত ভাবে প্রকাশিত হন, তিনি প্রত্যগাত্মা। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি জড়; তাহাদিগের হইতে বিলক্ষণ দেহমধ্যবর্ত্তী চিৎ বস্তুই প্রত্যগাত্মা। তাঁহাকে অন্তরাত্মা শব্দেও বিশেষিত করা হইয়াছে। এই জীব বা প্রত্যগাত্মা বা অন্তরাত্মা বা শারীর আত্মা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহেন। কেননা ইন্দ্রিয়গণ বহির্ম্মুখ, অন্তরের দিকে তাহাদের দৃষ্টি যায় না। কোনও কোনও জ্ঞানী ব্যক্তি বহির্বিষয় হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া অন্তরের মধ্যে এই প্রত্যগাত্মার দর্শন পাইয়াছেন। (কঠ ২।৪।১) অন্তরাত্মা পুরুষ—অঙ্গুষ্ঠ-পরিমাণ। তিনি লোকের হৃদয়ে সর্ব্বদা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছেন। তিনি শরীর হইতে পৃথক। (কঠ—২।৩।১৬-১৭)। তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলেন সকল ভূত ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হইয়া ব্রহ্মকর্তৃক জীবিত থাকে এবং পরিণামে ব্রহ্মে লীন হয়। কিরূপে ব্রহ্ম হইতে জীবের উদ্ভব হয়, তাহা বুঝাইতে বৃহদারণ্যক বলিয়াছেন, যেমন অগ্নি হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ আত্মা (ব্রহ্ম) হইতে সকল প্রাণ, সকল ভূত নিঃসৃত হইয়াছে (২।১।২০)। মুণ্ডক বলেন (২।১।১) যেমন সুদীপ্ত অগ্নি হইতে তাহার সরূপ সহস্র সহস্র বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ হইতে জীবসকলের আবির্ভাব হয়। সুতরাং জীবাত্মা যে পরমাত্মার অংশ, উপনিষৎ তাহাই বলেন, ইহা বলা যায়।

কিন্তু ব্রহ্ম নিষ্কল, তাঁহার অংশ নাই, এ কথাও উপনিষদে আছে। "তিনি নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত" (শ্বেত-৬।১৯)। উভয় উক্তির মধ্যে অসংগতি

সুস্পষ্ট। কিন্তু জীবাত্মা অংশরূপে প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাহা পরমাত্মাই, তাহা ব্রহ্মই। জীবাত্মায় পরমাত্মার প্রকাশ সীমাবদ্ধ। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলেন "বিজ্ঞানং ব্রহ্ম"—বিজ্ঞানই ব্রহ্ম। বৃহদারণ্যক বলেন, এই বিজ্ঞানময় মহান অজ-আত্মা, যিনি প্রাণে বর্ত্তমান, তিনি জীবের হৃদয়ের অভ্যন্তরে যে আত্মা, তাহাতে অবস্থিত (৪।৪।২২)। এই জন্য কঠ উপনিষদ পরমাত্মাকে "গুহাহিতং গহ্বরেষ্ঠং পুরাণম্" (২।১২) বলিয়াছেন।

ছান্দোগ্য বলেন, তিনিই অধোভাগে, তিনিই উর্দ্ধে, তিনিই পশ্চাতে, তিনি সম্মুখে, তিনি দক্ষিণে, তিনি বামে, তিনিই এসকল। (৭।২৫।২) শ্বেতাশ্বতর বলেন "তাহা হইতে পরতর অন্যতর কিছু নাই।" (৩।৯)

উপনিষদে যে সৃষ্টির কথা আছে, যাহাতে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অন্য বস্তুর—যেমন জীবের ও জড়ের সৃষ্টির কথা আছে, তাহা মন্দবুদ্ধি লোককে বুঝাইবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে শ্রুতি দ্বৈত বা নানাত্বের উপদেশ করেন নাই। "উপদেশাৎ অয়ং বাদঃ জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে। উপায়ঃ সোঽবতারায়, নাস্তিভেদঃ কথঞ্চন" (মাণ্ডুক্যকারিকা)। দ্বৈত নাই, ভেদ নাই।

"অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম"। এই আত্মা (জীবাত্মা) ব্রহ্ম। "তৎ ত্বম অসি"—তুমিই সেই। ব্রহ্মই একমাত্র বস্তু। জড়জগৎ ব্রহ্ম, জীব ব্রহ্ম। দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব নাই, উপনিষদের বহু স্থলে এই অদ্বৈতবাদ ধ্বনিত।

কিন্তু জীব যে ব্রহ্ম হইতে স্বতন্ত্র, ব্রহ্মে ও জীবে যে ভেদ আছে, একথাও বহু স্থলে উক্ত হইয়াছে। "দুই পক্ষী এক বৃক্ষে বাস করে। তাহারা পরস্পর সংযুক্ত ও সখ্যভাবাপন্ন। একজন মিষ্ট ফল ভোগ করেন, আর একজন অনশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন।" (মুণ্ডক ৩।১) এখানে জীবাত্মা ও পরমাত্মার জীবদেহে একত্র অবস্থানের কথা আছে। কঠোপনিষদে (১।৩।১) জীব ও ব্রহ্ম উভয়কে হৃদয়াকাশে প্রবিষ্ট বলা হইয়াছে। শ্বেতাশ্বতরে জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্পষ্ট স্বীকৃত হইয়াছে। "জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বৌ অজৌ ঈশানীশৌ, অজা হি একা ভোক্তৃ-ভোগ্যার্থযুক্তা"। জ্ঞ (ঈশ্বর), অজ্ঞ (জীব) দুইজন আছেন। অজা (প্রকৃতি) ভোক্তার (জীবের) ভোগ্য-বিষয় প্রদায়িনী। "ক্ষরং প্রধানং অমৃতাক্ষরং হরঃ। ক্ষরাত্মানৌ ঈশতে দেব একঃ" (১।৯।১০)। প্রধান (প্রকৃতি) ক্ষর, হর অমৃত ও অক্ষর। এক দেব (হর, ঈশ্বর) ক্ষর ও আত্মাকে নিয়মিত করেন।

প্রশ্নোপনিষৎ বলেন—

বিজ্ঞানাত্মা সহ দেবৈশ্চ সর্ব্বৈঃ
প্রাণা ভূতানি সম্প্রতিষ্ঠন্তি যত্র।

তদক্ষরং বেদয়তে যস্তু সোম্য,
স সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বমেব আবিবেশেতি ।৪।১১

যাহাতে বিজ্ঞানাত্মা (শারীর আত্মা), প্রাণসমূহ ও ভূতসমূহ সকল দেবতার সহিত (ইন্দ্রিয়দিগের সহিত) প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, সেই অক্ষরকে যিনি জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হইয়া সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন।

মুণ্ডকে আছে—

যথা নদ্যঃ স্যন্দমানাঃ সমুদ্রে
অস্তং গচ্ছন্তি নামরূপে বিহায়,
তথা বিদ্বান্ নামরূপে বিহায়
পরাৎপরং পুরুষং উপৈতি দিব্যং ।৩।২।৮

নদীসকল যেমন নামরূপ ত্যাগ করিয়া সমুদ্রে বিলীন হয়, তেমনি বিদ্বান্ ব্যক্তি-ও নামরূপ বর্জ্জন করিয়া পরাৎপর দিব্যপুরুষকে প্রাপ্ত হন।

এই সকল হইতে স্পষ্টই প্রতীতি হয়, যে মুক্তিতে যাহাই হউক না কেন, মুক্তি পর্য্যন্ত জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন। মুক্তিতে জীবাত্মার অস্তিত্বের লোপ হয় কিনা, সে প্রশ্ন স্বতন্ত্র। সে সম্বন্ধেও মতভেদ আছে।

ইন্দ্রিয়দ্বারা আমরা প্রতিক্ষণ বাহ্যজগতের অস্তিত্ব অনুভব করি। বাহ্য জগতের জ্ঞাতারূপে আমাদের নিজের অস্তিত্বও অনুভব করি। ইহা অস্বীকার করা যায় না. বিবর্ত্তবাদী বলেন এই অনুভব মিথ্যা, অর্থাৎ যাহা অনুভব করি বলিয়া মনে হয়, তাহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই। মরীচিকা যেমন আমরা দেখি, কিন্তু তাহার অস্তিত্ব নাই, জলে সূর্য্যের ও চন্দ্রের প্রতিবিম্ব আমরা দেখিতে পাই, কিন্তু সেই প্রতিবিম্বের বাস্তব অস্তিত্ব নাই ; সেইরূপ জগৎ আমাদের ইন্দ্রিয়ের নিকট অস্তিত্ববান বলিয়া প্রতীত হইলেও তাহার অস্তিত্ব নাই। আমাদের মধ্যে জগতের জ্ঞাতারূপে যে সসীম আত্মার বোধ হয়, তাহারও বাস্তব অস্তিত্ব নাই। এই উভয় অনুভূতির মূলে আছে অবিদ্যা, যাহার স্বরূপ অনির্ব্বচনীয়। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। তিনি দেশ ও কালের অতীত, নিষ্ক্রিয়, নিষ্কল। তাহার কোনও পরিবর্ত্তন কখনও হয় না। দেশ ও কালে প্রকাশিত জড়জগৎ মিথ্যা এবং আমাদের মধ্যে সসীমরূপে প্রতীয়মান আত্মাও বাস্তবিক অস্তিত্ব-হীন। কিন্তু পরিণামবাদী ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করেন এবং বাহ্য জগৎ ও জীবাত্মা যে ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত এবং ব্রহ্মের মধ্যেও বর্ত্তমান, তাহা স্বীকার করেন। উভয় মতের সমর্থক প্রমাণই উপনিষদে আছে।

উপনিষদে সৃষ্টি

ঋগ্বেদে নাসদীয় সূক্তে সৃষ্টির পূর্ব্বের অবস্থার সুন্দর বর্ণনা আছে।

না-সদ্ আসীৎ, নো সদ্ আসীৎ তদানীং ;
নাসীদ্ রজো, নো ব্যোম পরো যৎ।
কিম্ আবরীবঃ, কুহ কস্য শর্ম্মন্
অম্ভঃ কিম্ আসীদ্ গহনং গভীরম্॥
ন মৃত্যুরাসীদ্ অমৃতং ন তর্হি
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদ্ অবাতং স্বধয়া তদেকং
তস্মাদ্ধান্যন্ ন পরঃ কিঞ্চ নাস।
তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে
অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমা ইদম্।
কামস্তদগ্রে সমবর্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ
সতো বন্ধুম্ অসতি নিরবিন্দন
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা।

১০।১২০।১-৪

তখন অসৎও ছিল না, সৎও ছিল না। অন্তরীক্ষ ছিল না, ব্যোমও ছিল না, কিসে আবৃত ছিল? কোথায় ছিল, কাহার আশ্রয়ে? ইহা কি গহন গভীর অম্ভের ("আপ") মধ্যে ছিল?

মৃত্যু ছিল না, অমৃতও ছিল না। দিবা-রাত্রির প্রভেদও ছিল না। ছিলেন কেবল তদেকং (সেই এক)। তিনি বিনা বায়ুতে নিশ্বাস-প্রশ্বাস করিতেন। তিনি ভিন্ন অন্য কিছু ছিল না।

প্রথমে তমঃদ্বারা সকলই আচ্ছাদিত ছিল। এ সকলই অপ্রকেত সলিলমাত্র ছিল। অগ্রে কাম উদ্ভূত হইল। ইহাই মনের প্রথম রেতঃ (বীজ)। কবিগণ হৃদয়ের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া মনীষাদ্বারা অসতের মধ্যে সতের বন্ধুকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন (সৎ ও অসতের মধ্যে সংযোগ-সূত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন)।

ব্রহ্ম সৎ ও অসতের অতীত। (সৎ=প্রকাশিত অবস্থা। অসৎ= অপ্রকাশিত অবস্থা।) শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে—

যদা তমস্তন্ন দিবা ন রাত্রিঃ
ন সৎ ন চাসৎ শিব এব কেবলঃ।
তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী।

সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন তমঃমাত্র ছিল, তখন দিবাও নহে, রাত্রিও নহে। সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না, কেবল শিবই ছিলেন। তিনিই অক্ষর, সবিতার বরেণ্য। তাহা হইতেই পুরাণী প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল।

উপনিষদে ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বস্তু। তাহা হইতে ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। জড়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব উপনিষদে স্বীকৃত নহে। আরিষ্টট্‌ল রূপ ও উপাদান (Form and Matter) নামক দুইটি তত্ত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু উপনিষদের ঋষিগণের নিকট এক ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় তত্ত্ব ছিল না। যাহা কিছু আছে, তাহা ব্রহ্ম হইতেই উদ্‌ভূত, অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, অথবা উর্ণনাভের শরীর হইতে যেমন উর্ণা বাহির হয়। "নানা" নাই; যাহা আছে সকলই নিষ্কল ব্রহ্ম। এক অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে নানারূপে প্রতীয়মান জড়-ও-জীব সমন্বিত জগতের উদ্‌ভবের বিভিন্ন বর্ণনা বিভিন্ন উপনিষদে আছে।

বৃহদারণ্যকে আছে: এই জগৎ পূর্ব্বে পুরুষরূপী আত্মারূপে বর্ত্তমান ছিল। তিনি চতুর্দ্দিকে নিরীক্ষণ করিয়া আপনাকে ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি বলিলেন, "আমি আছি"। ইহা হইতেই "অহং" নামের উৎপত্তি হইল। তিনি (একাকী ছিলেন বলিয়া) ভীত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন ভাবিলেন "আমা হইতে ভিন্ন তো কিছুই নাই, তবে কেন ভীত হইব?" তখন ভয় চলিয়া গেল। কিন্তু তিনি আনন্দলাভ করিলেন না, দ্বিতীয় একজনকে পাইবার ইচ্ছা করিলেন, এবং স্বীয় দেহকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন। এইরূপে পতি ও পত্নী হইল। পতি ও পত্নী হইতে মানবের উৎপত্তি হইল। পত্নী তখন গাভী হইলেন, পতি বৃষ হইলেন। তাহাদিগের হইতে গো-জাতির উৎপত্তি হইল। পত্নী অশ্বী হইলেন, পতি অশ্ব হইলেন। তাহাদিগের হইতে অশ্বজাতির উদ্‌ভব হইল। তখন সেই আত্মা চিন্তা করিলেন আমিই এই সৃষ্টি। তিনিই সৃষ্টিরূপে পরিণত হইয়াছেন।

ঐতরেয় উপনিষদ বলেন—"আত্মা বৈ ইদম্ অগ্রে আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি। স ইমান্ লোকান্ অসৃজত। অম্ভঃ, মরীচিঃ, মরম্ আপঃ।" পূর্ব্বে এক আত্মামাত্র ছিল। নিমেষ-ক্রিয়াবৎ আর কিছুই ছিল না। তিনি ভাবিলেন "আমি কি

লোকসকল সৃষ্টি করিব ?” তিনি অম্ভ (যাহা অপ্‌কে ধারণ করে, দ্যুঃলোকের উপর), মরীচি (অন্তরীক্ষ), মর (পৃথিবী) ও অপ (পৃথিবীর নিম্নস্থ জল) সৃষ্টি করিলেন। ইহার পরে তিনি জল হইতে উপাদান গ্রহণ করিয়া এক পুরুষ সৃষ্টি করিলেন। তিনি সেই পুরুষের মধ্যে প্রবেশ করিলেন।

প্রশ্নোউপনিষদে আছে :—

প্রজাকাম প্রজাপতি তপস্যা (সংকল্প করিলেন এবং রয়ি ও প্রাণ এই মিথুনের সৃষ্টি করিলেন। রয়ি আদি ভূত। যাহা মূর্ত্ত, যাহা অমূর্ত্ত সকলই রয়ি। রয়ি বিশ্বের চরম উপাদান। ছান্দোগ্য উপনিষদে এই রয়িকে ‘আপ’ বলা হইয়াছে। “আপ এব ইমা মূর্ত্তাঃ—যেয়ং পৃথিবী, যৎ অন্তরিক্ষং, যৎ দ্যৌঃ, যৎ পর্ব্বতাঃ, যৎ দেবমনুষ্যা, যৎ পশবশ্চ বয়াংসি চ, তৃণবনস্পতয়ঃ, শ্বাপদান্যাকীটপতঙ্গপিপীলকম, আপ এব ইমা মূর্ত্তা” (৭।১০।১)। পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, দ্যৌঃ, পর্ব্বত, দেবমনুষ্যগণ, পশুগণ, পক্ষিগণ, তৃণ-বনস্পতিগণ, শ্বাপদ, কীট-পতঙ্গ পিপীলিকা, এই সকল মূর্ত্ত বস্তুই আপ। ঐ উপনিষদেই আছে :

সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং। তৎ হি একে আহুঃ অসদেব ইদম্ অগ্রে আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্। তস্মাৎ অসতঃ সৎ জায়ত।... কথমসতঃ সৎ জায়েত ? সৎ তু এব সোম্য ইদমগ্রে আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ং। তৎ ঐক্ষত বহু স্যাং, প্রজায়েয় ইতি। (৬।২) এক অদ্বিতীয় ‘সৎ’ বর্ত্তমান ছিলেন। তাঁহার সংকল্প হইতেই বহুর উদ্‌ভব হইয়াছিল।

এক সৎ হইতে জগতের উৎপত্তি ইহাই উপনিষদের মত। ব্রহ্মের ভিতরই জগতের উপাদান বর্ত্তমান ছিল। স্বরূপে জগৎ ও ব্রহ্ম এক।

উপরে যে রয়ির কথা বলা হইয়াছে, যাবতীয় অমূর্ত্ত (যেমন বায়ু ও আকাশ) ও মূর্ত্ত বস্ত সেই রয়ি। আদিত্যই প্রাণ—সর্ব্ব প্রাণের প্রতীক। তিনি “প্রাণঃ প্রজানাম্”। চন্দ্রমা রয়ির প্রতীক। আদিত্য যে প্রাণের প্রতীক, তাহা পরম পুরুষ হইতে উৎপন্ন। মুণ্ডক উপনিষদে (২।১২) হিরণ্যগর্ভ হইতে শ্রেষ্ঠতর অক্ষর পুরুষ হইতে প্রাণের উৎপত্তির কথা আছে। “এই সকল এবং ত্রিদিবে (স্বর্গে) যাহা প্রতিষ্ঠিত, সকলেই প্রাণের বশে আছে” (প্রশ্ন—২।১৩)। প্রাণ ব্রাত্য (অসংস্কৃত অবস্থাতেও শুদ্ধ), একর্ষি ও সৎপতি (প্রশ্ন—২।১১)। অথর্ব্ববেদে এই প্রাণকে “সর্ব্বস্য ঈশ্বর, এবং প্রাণেই সকল প্রতিষ্ঠিত” বলা হইয়াছে। (১১।৪)।

উপনিষদে রয়ি ও প্রাণকে নানা নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কোথায়ও রয়ি ক্ষর এবং প্রাণ অক্ষর, কোথায়ও রয়ি অন্ন, প্রাণ অত্তা (ভোক্তা)।

কোথায়ও বা রয়ি স্বধা, প্রাণ প্রয়তি (ভোক্তা)। ঋগ্বেদে (১০।১২৯।৫) স্বধাকে প্রয়তি অপেক্ষা অবর বলা হইয়াছে। "স্বধা অধস্তাৎ, প্রয়তি পরস্তাৎ"। (স্বধা = অন্ন, ভোগ্য বস্তু। প্রয়তি = ভোক্তা। অধস্তাৎ = অবর, নিকৃষ্ট। পরস্তাৎ = উৎকৃষ্ট।) মুণ্ডক উপনিষদে আছে উর্ণনাভি যেমন নিজের শরীর হইতে তন্তু বাহির করে, এবং পুনরায় গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধিগণ জন্মে, যেমন জীবিত পুরুষের শরীরে কেশ ও লোম বাহির হয়, সেইরূপ অক্ষর পুরুষ হইতে সমস্ত জগতের উৎপত্তি হয়। (১।১।৭)

তপস্যা (সিসৃক্ষা—কিরূপে সৃষ্টি করা যায়, তাহার জ্ঞান) দ্বারা ব্রহ্ম প্রবৃদ্ধ (স্ফীত) হইলেন। তাহা হইতে অন্ন (জগতের বীজ—অব্যাকৃত প্রকৃতি, রয়ি, আপ) উৎপন্ন হইল। অন্ন হইতে প্রাণ, মন, সত্য (পঞ্চভূত), লোক (ভূর্ভুবঃ প্রভৃতি লোক) এবং কর্ম্মের অবিনশ্বর ফল উৎপন্ন হইল। (মুণ্ডক ১।১।৮) এই শ্লোক হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, যে ব্রহ্মই অন্ন, প্রাণ মন প্রভৃতিতে পরিণত হইলেন। "যিনি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ববিৎ, যাহার তপস্যা জ্ঞানময়, তাহা হইতে ব্রহ্ম (হিরণ্যগর্ভ), নামরূপ ও অন্ন জন্মিয়াছে। ১।১।৮ শ্লোকে যে প্রাণের কথা আছে, বিজ্ঞান ভিক্ষুর মতে, তাহাই সাংখ্যের মহৎ তত্ত্ব। ১।১।৯ শ্লোকের ব্রহ্ম শব্দও একই অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে।* (হিরণ্যগর্ভই মহৎতত্ত্ব।) রয়ি ও প্রাণ প্রজাপতির সৃষ্ট। কিন্তু তাহাদের উপাদান প্রজাপতি নিজেই। ব্রহ্মের সগুণাবস্থাই প্রজাপতি। ব্রহ্ম রয়ি ও প্রাণের যেমন নিমিত্ত কারণ তেমনি উপাদান কারণ। ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু নাই। রয়ি ও প্রাণের মধ্যে ব্রহ্ম অনুস্যূত।

স অকাময়ত বহুস্যাং প্রজায়েয় ইতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বং অসৃজত যদিদং কিঞ্চ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেব অনুপ্রাবিশৎ। তদনু প্রবিশ্য সৎচ ত্যৎচ অভবৎ, নিরুক্তং চ অনিরুক্তং চ, নিলয়নঞ্চ, অনিলয়নঞ্চ, বিজ্ঞানং চ অবিজ্ঞানঞ্চ। ** অসৎ বা ইদম্ অগ্রে আসীৎ। ততো বৈ সৎ অজায়ত। তদাত্মানং স্বয়ং অকুরুত। (তৈ-উ ২।৬, ২।৭) আমি বহু হইব, জন্মগ্রহণ করিব, ইহা তিনি কামনা করিলেন। তিনি তপস্যা করিলেন (মনে আলোচনা করিলেন)। তপস্যা করিয়া এই সকল সৃষ্টি করিলেন। ইহাদিগকে সৃষ্টি করিয়া উহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন এবং সৎ ও ত্যৎ (মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত), নিরুক্ত ও অনিরুক্ত (বচনীয় ও অনির্বচনীয়),

* হীরেন্দ্রনাথ দত্তের উপনিষৎ—জড় ও জীবতত্ত্ব ৫২ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

আশ্রিত ও অনাশ্রিত, চেতন ও অচেতন হইলেন। ...এই জগৎ অগ্রে অসৎ (নাম ও রূপদ্বারা অপ্রকাশিত) অবস্থায় ছিল। সেই অসৎ হইতে নামরূপে প্রকাশিত (সৎ) জগৎ উৎপন্ন হইল। তিনি আপনাকে সৃষ্টি করিলেন অর্থাৎ নামরূপে প্রকাশিত করিলেন।

পুরুষ সূক্তে এই অনুপ্রবেশের কথা আছে। "স ভূমিং সর্ব্বতঃ স্পৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলম্" তিনি সমগ্র বিশ্বে ব্যাপ্ত হইয়া দশ অঙ্গুলি ঊর্দ্ধে অধিষ্ঠিত হইলেন। তথাকথিত জড়ের মধ্যে যেমন তিনি অনুপ্রবিষ্ট, তেমনি জীবের মধ্যেও।

"পুরশ্চক্রে দ্বিপদঃ, পুরশ্চক্রে চতুষ্পদঃ, পুরঃ স পক্ষী ভূত্বা পুরঃ পুরুষঃ আবিশৎ"—ঈশ্বর দ্বিপদের (মানুষের) পুর (দেহ) ও চতুষ্পদের পুর নির্মাণ করিয়া প্রথমে পক্ষী হইয়া সেই সকল দেহে আবিষ্ট হইলেন (বৃ-আ ২।৫।১৮)। ব্রহ্ম জগতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও জগদতীত। উপনিষদে ব্রহ্মই একমাত্র তত্ব—তিনি জগতের Efficient এবং Material cause.

দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্মের সগুণ রূপ। ইহার মধ্যে ও ইহার বাহিরে ব্রহ্মের নির্গুণ রূপ। জগৎ পরিবর্ত্তনশীল ও সমুৎপাদিক (Phenomenal)। ইহা নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ইহার মধ্যে প্রত্যেক বস্তু নিত্য রূপান্তরিত হওয়ার ফলে নূতন বস্তুর উদ্ভব ও বিলয় হইতেছে। কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তনের তলদেশে ব্রহ্ম অপরিণামী অবস্থায় বর্ত্তমান—তিনি দেশ ও কাল-দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন, দেশ ও কালের অতীত। যাবতীয় সমুৎপাদ তাঁহারই মধ্যে সমুৎপন্ন ও বিলীন হইতেছে, কিন্তু তিনি উৎপত্তি-ও-লয়হীন। সমুৎপাদিক জগতের মধ্যেই তাঁহার ইচ্ছাময় ও জ্ঞান-বল-ক্রিয়া রূপ বর্ত্তমান। এই রূপে তিনি ঈশ্বর। এই ঈশ্বরেরই অপর রূপ ব্রহ্ম। বেদান্তের একপ্রকার ব্যাখ্যায় ব্রহ্মের জগতে প্রকাশিত রূপকে অধ্যাস বলা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মের এই রূপ না থাকিলেও, ইহা তাহাতে কল্পিত হয় বলা হইয়াছে। ইহাকে অনির্ব্বচনীয় মায়াও বলা হইয়াছে। দৃশ্যমান জগৎ—নানা ভাগে বিভক্ত জগৎ—সত্য নহে, বলা হইয়াছে। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—এখানে 'নানা' নাই, এই জগৎ নাম ও রূপ মাত্র। কিন্তু মৃত্তিকা-নির্মিত নানাবিধ বস্তু ও স্বর্ণ-নির্মিত নানাবিধ অলংকারের মধ্যে যেমন মৃত্তিকা ও স্বর্ণই সত্য, তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন রূপ কেবল "বাচারম্ভণ" (বাক্যমাত্র) ইত্যাকার উক্তি পাওয়া যায়, তেমনি ব্রহ্ম তেজ, অপ ও অন্ন সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন, দ্বিপদ, চতুষ্পদ দেহ সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন, ইত্যাদি জগতের বাস্তব অস্তিত্ব-

সূচক উক্তিও পাওয়া যায়। জগৎ স্বপ্নের মত অলীক, আবার জগৎ মিথ্যা নহে, সত্য, উভয় মতই উপনিষদের বিভিন্ন উক্তিদ্বারা সমর্থন করা যায়।

ব্রহ্ম অসঙ্গ (absolute)। অসঙ্গের সহিত জগতের সম্বন্ধ কিরূপে হইতে পারে, তাহা আমরা জানি না। কিন্তু জগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না। ইন্দ্রিয়-দ্বারপথে যাহা আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করিতেছে, তাহাকে অস্বীকার করা, তাহার অস্তিত্ব নাই বলা, অসম্ভব। কিরূপে জগতের অস্তিত্বের ধারণা উৎপন্ন হয়, তাহার ব্যাখ্যার জন্য মায়াবাদের উদ্ভব। এই মায়া অনির্ব্বচনীয়। ইহার স্বরূপ বর্ণনা করা যায় না। জগতের ধ্বংস হইলেও তদ্দ্বারা ব্রহ্মে কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় না। ব্রহ্ম জগতের বাহিরে অবস্থিত। জগতের স্রষ্টৃত্ব তাঁহার তটস্থ লক্ষণ, স্বরূপ লক্ষণ নহে। তিনি সৃষ্টি করেন না, কিন্তু স্রষ্টারূপে প্রতিভাত হন। জগতেরই যখন পারমার্থিক অস্তিত্ব নাই, তখন তাহার সৃষ্টির কথা অর্থহীন। পারমার্থিক অস্তিত্ব না থাকিলেও জগতের ব্যবহারিক অস্তিত্ব মায়াবাদে অস্বীকৃত নহে। ব্যবহারিক অস্তিত্বও এক প্রকার অস্তিত্ব—যাহার প্রতীতি হয়। এই প্রতীতি হয় অবিদ্যা বা মায়ার জন্য। এই মতে ব্রহ্ম সম্পূর্ণ একরস (homogeneous) ব্যক্তিত্বহীন চিৎমাত্র। তাহার মধ্যে দ্বৈতের লেশমাত্রও নাই। প্রিন্‌সিপাল থিব (Thibaut) লিখিয়াছেন "উপনিষদে এরূপ উক্তি আছে, যাহা হইতে ব্রহ্ম যাবতীয় গুণের অতীত দ্বৈতহীন ও ব্যক্তিত্ববর্জ্জিত চিৎ-রাশি রূপে অনুমিত হন। কিন্তু এই বহুত্ব-সমন্বিত জগতের বোধকে যখন অস্বীকার করা অসম্ভব, তখন ইহার বাস্তব অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া এই বোধকে মায়া বলাই এই সমস্যা-সমাধানের একমাত্র উপায়। মায়ার সহিত ব্রহ্ম সংযুক্ত, কিন্তু মায়া ব্রহ্মের একত্ব ভঙ্গ করিতে অসমর্থ, কেন না ইহার নিজেরই বাস্তব সত্তা নাই।"

ডয়সেনের মতে ব্রহ্মই একমাত্র সৎ, এবং সৃষ্টি বলিয়া কিছু নাই, ইহাই উপনিষদের মত। অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণ বলেন, ডয়সেনের নিজের মত তিনি উপনিষদের মধ্যে খুঁজিয়াছেন, এবং সেই অনুসারে উপনিষদের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ডয়সেনের মতে দেশ ও কালের জগৎ প্রতিভাস, ঈশ্বরের ছায়া, মায়া,—ইহাই উপনিষদের মত। ঈশ্বরকে জানিতে হইলে প্রাতিভাসিক জগৎকে বর্জ্জন করিতে হইবে। তাঁহার মতে প্রত্যেক সত্য ধর্ম্মের সার কথা এই যে জগতের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। প্রাচীন ভারতের দর্শনে, উপনিষদে, শঙ্করাচার্য্যে, প্রাচীন গ্রীসে পারমেনিদিস, প্লেটো এবং আধুনিক কান্টের

ক্যাণ্ট ও সোপেনহরের দর্শনে ডয়সেন আপনার এই মতের সমর্থন খুঁজিয়াছেন, কিন্তু তথ্য (facts) সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেন নাই। তিনি স্বীকার করিয়াছেন উপনিষদের বিভিন্ন মতের মধ্যে সর্ব্বেশ্বরবাদই (pantheism) প্রধান, কিন্তু তাহার মৌলিক মত (Fundamental doctrine) মায়াবাদ বলিয়াছেন। কিন্তু মায়াবাদই উপনিষদের মৌলিক মত, ইহা ডয়সেনের নিজের মত। উভয় মতের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের জন্য ডয়সেন বলেন যে সাধারণ লোকের অনুভবকে অগ্রাহ্য করিয়া তাহাদের বিরাগ উৎপাদন পরিহার করিবার উদ্দেশ্যে সর্ব্বেশ্বরবাদ কল্পিত হইয়াছিল। (It is a concession to popular clamour and the empirical demands of the unregenerate man)। ডয়সেন বলেন যে উপনিষদের মূল কথা এই যে আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু, কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভবের মর্য্যাদারক্ষার জন্য অল্পাধিক পরিমাণে জগতের অস্তিত্বও স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মই যদি একমাত্র সত্য বস্তু হন, তাহা হইলে জগৎ অসত্য। কিন্তু ব্রহ্ম অনন্ত বলিয়া তাহার মধ্যে যে সসীমের স্থান থাকিতে পারে না, ইহা সত্য নহে। অসীম সসীমের বিপরীত নহে। যাহা সনাতন, তাহা কালিকের বিপরীত নহে। দেশ ও কালে অবস্থিত জগৎ এবং অসঙ্গ শাশ্বত জগতের মধ্যে দ্বন্দ্ব মৌলিক (ultimate) এবং অনতিক্রম্য, ইহা সত্য। কিন্তু সসীম যে অসীমের বাহিরে, একথা উপনিষদে কোথায়ও নাই। যেখানেই ব্রহ্মকে একমাত্র সত্য বলা হইয়াছে, সেখানে ইহাও বলা হইয়াছে যে জগতের মূল ব্রহ্মে প্রোথিত। সুতরাং তাহারও কিছু সত্যতা আছে। কোনও বস্তুকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলে, তাহাতে যাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহার সত্যতাও স্বীকার করা হয়। "আত্মাকে জানিলে সকলই জানা হয়", ইহা হইতে আত্মা ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু নাই, ইহা অনুমান করা যায় না। আত্মার মধ্যে সকলই অবস্থিত বলিয়া আত্মাকে জানিলে সকলই জানা হয়। যাহা কিছু নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবিশিষ্ট, যদি আত্মার মধ্যে তাহার স্থান না থাকে, তাহা হইলে আত্মা বস্তুত্বহীন বিকল্পমাত্র হইয়া পড়ে। অসঙ্গের মধ্যে যদি ভেদ না থাকে, তাহা হইলে তাহা অবস্তুমাত্র। যাহা সনাতন তাহার মধ্যে কালিক কিছু নাই, ইহা বলা চলে না। যাহা কালিক (temporal), তাহার মূল সনাতনের মধ্যে। মানুষের সর্ব্বোত্তম ধর্মীয় ও নৈতিক অনুভবদ্বারা ইহাই সমর্থিত হয়। জগৎ মায়ামাত্র, ইহাই যদি উপনিষদের মত হইত, তাহা হইলে জগতের সত্তা যে আপেক্ষিক, জগৎ যে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মের উপর নির্ভরশীল, তাহারা ইহা বলিতেন না। নাম

এবং রূপই যে জগতের বৈচিত্র্যের কারণ, এ কথা উপনিষদে আছে সত্য। কিন্তু তাহাদ্বারা জগৎ যে সম্পূর্ণ অস্তিত্বহীন, তাহা প্রমাণিত হয় না। নাম-রূপের মধ্যে যে সত্তার প্রকাশ, তাহার অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় নাই। নামরূপের আবরণ ভেদ করিয়া সেই সত্তায় পৌঁছিতে হয়। এই প্রসঙ্গে ডা: রাধাকৃষ্ণণ Edward Cerpenter এর Pagan and Christian Creed হইতে নিম্নলিখিত বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। "বৃক্ষের প্রত্যেক পাতার স্বভাবতঃই মনে হইতে পারে, যে সে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু, সূর্য্যালোকে ও বায়ুর মধ্যে সে আপনাকে রক্ষা করিতেছে, এবং যখন শীত আসিবে, তখন শুকাইয়া মরিয়া যাইবে। কিন্তু ইহা তাহার মনে হয় না যে বৃক্ষ হইতে যে রস প্রবাহিত হয়, তাহাদ্বারাই বৃক্ষের জীবন রক্ষিত হয়, এবং সে নিজেই বৃক্ষের খাদ্য সরবরাহ করিতেছে, এবং সমগ্র বৃক্ষের আত্মাই তাহার আত্মা। জগতের জড় ও চেতন প্রত্যেক বস্তুর সহিত সমগ্র বিশ্বের আত্মার সম্বন্ধও এইরূপ।"*

জগতে নানা নাই, এ কথা উপনিষদে নানাভাবে বহুবার উক্ত হইয়াছে। কিন্তু নানাত্বের এই অস্বীকৃতিদ্বারা, জগতের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় নাই, জগতের একত্বই উক্ত হইয়াছে, জগৎ যে এক অনন্ত ব্রহ্মের প্রকাশ, এই কথাই বলা হইয়াছে। জগৎকে যদি খণ্ড খণ্ড সসীম বস্তুর সমষ্টি গণ্য করা হয়, তাহা হইলে সে ধারণা ভুল। সত্য দৃষ্টিতে জগৎ এক অখণ্ড বস্তু, তাহা ব্রহ্মের-অন্তর্ভুক্ত। বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ জাগ্রৎ অবস্থায় থাকে, কিন্তু সুষুপ্তিতে বিলীন হয়, দ্বৈত তখন থাকে না। "সুষুপ্তিস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘনঃ।" জাগ্রৎ অবস্থার নানাত্ব দেশ ও কালে অবস্থিত বস্তুর অবস্থা, কালে ব্যবস্থিত পৌর্ব্বাপর্য্যের অবস্থা, কারণ ও কার্য্যের দৃশ্যমান ভেদযুক্ত অবস্থা। এই অবস্থা পূর্ণ সত্য নহে। পূর্ণ সত্য দেশ, কাল ও কার্য্য কারণত্বের অতীত। উপনিষৎ সত্যের ক্রম-ভেদ স্বীকার করেন। জগতের নানাত্ব নিম্ন স্তরের সত্য। যখন পূর্ণ সত্যের সাক্ষাৎকার হয়, তখন নানাত্ব দৃষ্টিগোচর হয় না। নানাত্বের পারমার্থিক অস্তিত্ব না থাকিলেও ব্যবহারিক অস্তিত্ব আছে।

ওঁকার

ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমেই ওঁকারের উপাসনা বিহিত হইয়াছে। সামবেদের একটি অংশের নাম উদ্গীথ। এই অংশ গান করার নাম উদ্গান, যাঁহারা গান করেন তাঁহারা উদ্গাতা। ওম্ এই অক্ষরকে উদ্গীথরূপে

* Radha Krishnan's Indian Philosophy p. 189-90

উপাসনা করিতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, কেননা "ওম্" প্রথমে উচ্চারণ করিয়া উদগান করা হয় (১।২)। পরে বলা হইয়াছে "ওম্"ই উদ্গীথ। এই মন্ত্রের প্রভাব অপরিসীম। প্রত্যেক বৈদিক মন্ত্রের প্রথমেই ইহা উচ্চারণ করিতে হয়। ওঁকারকে প্রণবও বলে। পাতঞ্জল দর্শনে প্রণবকে ঈশ্বরের বাচক বলা হইয়াছে এবং তাহার জপ ও ভাবনা সমাধি-লাভের জন্য উপদিষ্ট হইয়াছে। গীতায় ওঁকারকে একাক্ষর ব্রহ্ম এবং মৃত্যুকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে পারিলে পরমাগতি লাভ হয় বলা হইয়াছে (৮।১২)। তৈত্তিরীয় উপনিষদে ওঁকারকে "ছন্দসাম্ ঋষভঃ, বিশ্বরূপঃ" (১।৪) বলা হইয়াছে—বেদ-বাক্যের মধ্যে ঋষভ অর্থাৎ প্রধান, এবং সর্ব্ব বাক্যে ব্যাপ্ত বলিয়া বিশ্বরূপ তিনি। "ছন্দোভ্যো অধ্যমৃতাৎ সম্বভূব"—অমৃতত্বের উৎস বেদসমূহ হইতে তিনি উৎপন্ন হইয়াছেন। কিন্তু ঋগ্বেদে এই মন্ত্রের উল্লেখ নাই। ঐ বেদের একটি মন্ত্রে "অক্ষরেণ প্রতিমিম" (১০ মণ্ডল ১৩।৩) পাওয়া যায়। সায়নাচার্য্য এখানে "অক্ষর" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "ওঁকার।"* এইমাত্র। অথর্ব্ববেদের গোপথ ব্রাহ্মণে আছে যে সৃষ্টিকামী ব্রহ্মার তপস্যা হইতে প্রথম ওম্ শব্দের উৎপত্তি হয়, এবং ইহার প্রথম বর্ণ 'ও' হইতে জল এবং শেষবর্ণ "ম" হইতে তেজের সৃষ্টি হয়। এই বর্ণনা অনুসারে ব্রহ্মাকে "ওঁ" মন্ত্রের ঋষি বলা যায়। সামবেদ, ঋগ্‌বেদ ও যজুর্ব্বেদের সন্ধ্যা মন্ত্রে আছে "ওঁকারস্য ব্রহ্ম ঋষিঃ গায়ত্রী-চ্ছন্দোঽগ্নির্দেবতা, সর্ব্বকর্ম্মারম্ভে প্রাণায়ামে বিনিয়োগ।" অথর্ব্ববেদের উক্তিই বোধ হয় ইহার ভিত্তি।

ছান্দোগ্য উপনিষদে ওঁকার সম্বন্ধে আরও বলা হইয়াছে, পৃথিবী ভূত-সমূহের রস, জল পৃথিবীর রস, ওষধিসকল জলের রস, পুরুষ ওষধিদিগের রস, বাক্ পুরুষের রস, ঋগ্বেদ্ বাক্যের রস, সামবেদ ঋগ্‌বেদের রস, উদ্গীথ সামবেদের রস (সারভাগ)। দেবগণ মৃত্যু-ভয়ে ভীত হইয়া প্রথমে ত্রয়ী বিদ্যাতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন (বেদবিহিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন), পরে ওম্ অক্ষরে প্রবেশ করিয়া (ওঁকারের ধ্যান করিয়া) অমৃত ও অভয় হইয়াছিলেন (ছা—১।৪)। অসুরদিগকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে দেবগণ নাসিকাস্থ প্রাণকে, পরে বাগিন্দ্রিয়কে, তাহার পরে চক্ষুকে, পরে শ্রোত্রকে, পরে মনকে, সর্ব্বশেষে মুখ্য প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করিয়াছিলেন (ছা ১।২)। সূর্য্য, প্রাণ, ব্যান, ও অপানকে এবং উদ্গীথ শব্দের

---

* রায় বাহাদুর সুরেশচন্দ্র সিংহের ওঁকার ও গায়ত্রীতত্ত্ব—পৃষ্ঠা ১/০

অক্ষরদিগকে (উৎ, গী ও থ, এই তিন অক্ষরকে) উদ্‌গীথরূপে উপাসনা করিবার বিধি দেওয়া হইয়াছে (ছা-১।৩)। ইহার পরে আদিত্যকে ও মুখ্য প্রাণকে উদ্‌গীথরূপে উপাসনার উপদেশ আছে (ছা-১ম অ, ৫ম)। সকলবেদ যাঁহাকে কীর্ত্তন করে; সকল তপস্যা যাঁহার কথা বলে, যাঁহাকে পাইবার জন্য ব্রহ্মজ্ঞানার্থিগণ ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাঁহাকে কঠোপনিষদ ওম্ বলিয়াছেন (২।১৫)।

ওঁকার কোথায়ও দ্বিমাত্রা, কোথায়ও ত্রিমাত্রা। প্রশ্নোপনিষৎ বলেন ওঁকারের অ, উ, ম এই তিন মাত্রা স্বতন্ত্ররূপে প্রযুক্ত হইলে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না, কিন্তু সম্যক্ প্রযুক্ত হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি বিচলিত হন না। তিনি ঋক্ মন্ত্রদ্বারা এই লোক, যজুর্মন্ত্রদ্বারা অন্তরীক্ষ লোক, এবং সাম মন্ত্রদ্বারা সেই লোক প্রাপ্ত হন, যাহা জ্ঞানিগণ জানেন। সেই ব্রহ্মলোক জ্ঞানী ওঁকারযুক্ত সাধনা বলে লাভ করেন (৫।৬।৭)। ওঁকার পর ও অপর ব্রহ্ম। যিনি এই মন্ত্রের প্রথম মাত্রা অকার মরণকাল পর্য্যন্ত ধ্যান করেন, তিনি সংবোধিত হইয়া শীঘ্র পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন; যিনি দ্বিতীয় মাত্রা উকারের ধ্যান করেন, তিনি অন্তরীক্ষে, যিনি ত্রিমাত্রাযুক্ত ওঁকারদ্বারা পরমপুরুষের ধ্যান করেন, তিনি সূর্য্যলোকে উপনীত হন (৫।৩-৫)।

আত্মাকে ওঁরূপে চিন্তা করিবে (ওম্ ইত্যেবং ধ্যায়থ আত্মানম্—মুণ্ডক ২।২।৬)। মাণ্ডুক্য উপনিষদে আত্মার চারিটি পাদ বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমপাদ জাগ্রৎ অবস্থার অধিষ্ঠাতা, দ্বিতীয়পাদ স্বপ্ন-স্থানের অধিষ্ঠাতা, তৃতীয়পাদ সুষুপ্তি-স্থানের অধিষ্ঠাতা। অকার প্রথম পাদ, উকার দ্বিতীয় পাদ, মকার তৃতীয় পাদ। ব্রহ্মের চতুর্থ পাদ মাত্রাহীন। এই উপনিষদের মতে ওঁ-কারই সব। ভূত, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ, সকলই ওঁকার, যাহা ত্রিকালাতীত, তাহাও ওঁকার।

সকল বৈদিকমন্ত্রের প্রথমে ওঁকারের প্রয়োগ-সম্বন্ধে উপরি উক্ত গোপথ ব্রাহ্মণে আছে,যে ঐন্দ্রনগরের আধিপত্য লইয়া দেব ও অসুরদিগের মধ্যে সংগ্রাম হয়। এই সংগ্রামে প্রথমে অসুরেরা জয়লাভ করে; পরে দেবগণ ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ পুত্র (প্রথম সৃষ্টি) ওঁকারের অধিনায়কত্বে সংগ্রাম করিয়া অসুরদিগকে পরাজিত করেন। তজ্জন্য কৃতজ্ঞতাবশে দেবগণ অঙ্গীকার করেন, যে প্রথমে ওঁকার মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বেদ মন্ত্রসকলের ব্যবহার হইবে।

ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে (২।২৩।২-৩) প্রজাপতি লোকসকলের ধ্যান করিলে তাঁহার অভিধ্যাত জগৎ হইতে ত্রয়ী-বিদ্যা নিঃসৃত হইল। তখন তিনি ত্রয়ী-বিদ্যার ধ্যান করিলেন। ফলে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ এই তিন

অক্ষর নিঃসৃত হইল। পরে এই অক্ষরদিগের ধ্যান করিলে ওঁকার নিঃসৃত হইল। বৃক্ষপত্রের শিরাদ্বারা যেমন সমস্ত পত্র ব্যাপ্ত থাকে, তেমনি ওঁকার দ্বারা সকল ব্যাপ্ত হইয়াছে। ওঁকারই সব।

ওম্ শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে মাক্ষমূলার বলেন বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে এই শব্দের উৎপত্তি-সম্বন্ধে যে সকল ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের কোনটিই সন্তোষজনক নহে। ইহা সর্বনাম "অয়ম্" শব্দের সংক্ষিপ্ত রূপ হইতে পারে। ইহা যে "হ্যাঁ" (yes) অর্থে ব্যবহৃত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। ভোজরাজ বলেন এই শব্দ কাহারও কর্তৃক সৃষ্ট হয় নাই। ইহার ঈশ্বরার্থে ব্যবহারের কোনও ঐতিহাসিক অথবা ধাতুপ্রত্যয়গত কারণ যদি থাকে, তাহা অজ্ঞাত।

রাজেন্দ্রলাল মিত্র ওম্ শব্দের এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন। তাঁহার মতে "ওম্" হিব্রু Amen শব্দের ভারতীয় রূপ। দুই শব্দের উচ্চারণে সামান্য কিছু সাদৃশ্য থাকিলেও তাহাদের অর্থের মধ্যে কোনও সাদৃশ্য নাই। Amen শব্দ ইহুদী ও খৃষ্টীয় গীর্জ্জায় প্রার্থনার পরে উপাসকগণকর্তৃক উচ্চারিত হয়। ইহার অর্থ "তাহাই হউক" (So be it—Oxford Dictionary)। হিব্রু ভাষায় ইহার অর্থ নিশ্চিতি (certainty), ঈশ্বর নহে। সেই প্রাচীন ব্রাহ্মণযুগে এই শব্দ ভারতে আনীত হইবার সম্ভাবনাই বা কি? বরং "অহম্" শব্দ হইতে ওঁ শব্দের উৎপত্তি সম্ভবপর।

ছান্দোগ্যে "ওম্‌কে" অনুজ্ঞাক্ষর বলা হইয়াছে (১।৮)। অনুজ্ঞাক্ষরের অর্থ অনুজ্ঞা বা সম্মতিজ্ঞাপক শব্দ। "ওম্" বলিয়া মতের ঐক্য জ্ঞাপন করা হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে (১।৪) "আত্মা এব ইদং অগ্রে আসীৎ পুরুষবিধঃ। স অনুবীক্ষ্য নান্যৎ আত্মনঃ অপশ্যৎ। সোঽহম্ অস্মি ইতি অগ্রে ব্যাহরৎ, ততঃ অহং নাম অভবৎ।" এই জগৎ পূর্ব্বে পুরুষরূপী আত্মারূপে ছিল। সেই আত্মা আপন হইতে পৃথক কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তিনি প্রথমে "আমি আছি" বলিলেন। ইহা হইতে 'অহং' এই নাম হইল। "অহং অস্মি"—আত্মার এই বাক্যদ্বারা আত্মার অস্তিত্ব খ্যাপিত হইয়াছিল। এই বাক্যদ্বারা আত্মা আপনাকে Posit করিয়াছিলেন, আপনার অস্তিত্ব ঘোষণা করিয়াছিলেন, আপনার অস্তিত্ব যে সত্য, তাহা যে আছে, তাহা খ্যাপন করিয়াছিলেন। তাহার পরে সৃষ্টির আরম্ভ। বোধ হয় "অহম্ অস্মি" এই বাক্যই 'ওম্।'

প্রশ্ন ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ অনুসারে, অকার, উকার, এবং ম্ কারের যোগে "ওম্" শব্দ গঠিত হইয়াছে। কিন্তু গোপথ ব্রাহ্মণে ও এবং ম্ এই দুই মাত্র

মাত্রা স্বীকৃত। পরবর্ত্তী তান্ত্রিক যুগে অ, উ এবং ম্ এর সঙ্গে চন্দ্রবিন্দু (ঁ) যুক্ত হইয়াছে। মাণ্ডুক্যে ওম্ ব্রহ্মের তিন পাদ—জাগরিতস্থান, স্বপ্নস্থান এবং সুষুপ্তিস্থান। পরে ওম্ অ, উ এবং ম্ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের বাচক বলিয়া গৃহীত হইয়াছিল।

কেহ কেহ "অব" ধাতু (রক্ষা করা, পালন করা) হইতে ওম্ শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়াছেন। যিনি রক্ষা করেন, পালন করেন, তিনিই ওম্।

জগৎ যে শব্দ হইতে উৎপন্ন, ইহা একটী অতি প্রাচীন মত। ভর্তৃহরি ব্রহ্মকে "অনাদি-নিধনং শব্দ-তত্ত্বং অক্ষরং" (এই জগৎ শব্দ-তত্ত্ব ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত) এবং অর্থ (বিষয়) রূপে অভিব্যক্ত বলিয়াছেন। (বিবর্ত্ততে অর্থভাবেন জগতো প্রক্রিয়া যথা)। ওঁকারকে শব্দ-তত্ত্ব ব্রহ্মের বাঙ্ময়রূপ বলা যায়।

প্রাণ

উপনিষদে প্রাণ-সম্বন্ধে বিভিন্ন উক্তি আছে। প্রশ্নোপনিষদ বলেন (১।৪) প্রজাপতি তপস্যা করিয়া পরে প্রাণ ও রয়ি সৃষ্টি করিলেন—বহু প্রজার উৎপত্তির জন্য। আদিত্যই প্রাণ। তিনি উদিত হইয়া পূর্ব্বদিকস্থ সকল প্রাণ তাঁহার রশ্মিতে গ্রহণ করেন। পরে অন্যান্য দিকস্থ প্রাণ দিগকেও স্বীয় রশ্মিতে গ্রহণ করেন। পরে আছে—প্রাণ আত্মা হইতে জন্মে, যেমন দেহ হইতে ছায়ার উৎপত্তি হয়। মুণ্ডক উপনিষদেও আছে (২।১।৩) ব্রহ্ম হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। কিন্তু প্রশ্নোপনিষদের অন্যত্র (২।৭) প্রাণকে প্রজাপতি এবং দেবতাদিগের মধ্যে "বহ্নিতম" (শ্রেষ্ঠ) বলা হইয়াছে। আরও আছে "প্রাণ তুমি ইন্দ্র, তেজে রুদ্র, তুমি পরিরক্ষিতা, তুমি আকাশে বিচরণ কর। তুমি সূর্য্য।··· ইহলোকে ও স্বর্গলোকের সকল বস্তুই প্রাণের বশে।" মুখ্য প্রাণ অন্যান্য প্রাণকে শরীরের ভিন্ন ভিন্ন অংশে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। জীব যখন নিদ্রিত থাকে, তখন পঞ্চ প্রাণাগ্নি জাগরিত থাকে।

কৌষীতকি বলেন "প্রাণ ব্রহ্ম"। প্রাণ রূপ ব্রহ্মের নিকট সকল ইন্দ্রিয়-শক্তি বলি আনয়ন করে। "যিনি প্রাণ, তিনিই প্রজ্ঞা, যিনি প্রজ্ঞা তিনিই প্রাণ"। প্রশ্নোপনিষদে যেখানে প্রাণকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে, সেখানে প্রাণ অর্থে সার্বিক প্রাণ, এবং যখন "দেবতাদিগের মধ্যে বহ্নিতম" বলা হইয়াছে, তখন তাহাকে ব্যক্তির প্রাণ অর্থে গ্রহণ করা হইয়াছে।

বৃহদারণ্যকে (৫।১২) আছে "কেহ কেহ বলেন অন্নই ব্রহ্ম, কেহ বলেন প্রাণই ব্রহ্ম। প্রাতৃদ সিদ্ধান্ত করিলেন এই দুই দেবতা একত্ব প্রাপ্ত হইলেই পরমত্ব-লাভ হয়, অর্থাৎ অন্ন ও প্রাণের একত্বই ব্রহ্ম। কিন্তু প্রাতৃদের পিতা বলিলেন "অন্ন ও প্রাণের একত্ব-জ্ঞানে ব্রহ্মত্ব-লাভ হয় না।" ভৃগু ও (তৈত্তিরীয় উপনিষদ) প্রথমে অন্ন ও পরে প্রাণকে ব্রহ্ম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন। পরে ক্রমান্বয়ে মন, বিজ্ঞান ও আনন্দকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিয়াছিলেন। বস্তুতঃ অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ, ইহাদের প্রত্যেকেই ব্রহ্মের এক এক বিভাব, আনন্দই তাঁহার পূর্ণতম রূপ। ব্রহ্ম অনন্ত, তাঁহার প্রাণরূপও অনন্ত। সমগ্র বিশ্বে প্রাণ বিস্তৃত ও জড়ের মধ্যে অনুস্যূত। এই যে আত্মা মনুষ্যে এবং ঐ যে আত্মা আদিত্যে, উভয়ে একই। আত্মা অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় ও আনন্দময়। "প্রাণ প্রজ্ঞাত্মা, আনন্দময়, অজর, অমর। ইনি লোকপাল, লোকাধিপতি, সর্বেশ। ইনি আমার আত্মা" (কৌষীতকি—৩।৮)

"অন্নরসময় আত্মা প্রাণময় আত্মাদ্বারা পূর্ণ। প্রাণময় আত্মা মনোময় আত্মাদ্বারা পূর্ণ, মনোময় আত্মা বিজ্ঞানময় আত্মাদ্বারা পূর্ণ, বিজ্ঞানময় আত্মা আনন্দময় আত্মাদ্বারা পূর্ণ।" (তৈত্তি—২।২—৫)। ইহা হইতে প্রতীত হয়, যে মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ সকলই প্রাণে অধিষ্ঠিত এবং প্রাণ অন্নে অধিষ্ঠিত। প্রাণ মন-বিজ্ঞান-আনন্দময়। এই প্রাণ বিশ্বপ্রাণ বা সার্বিক প্রাণ (বার্গস'র Elan Vital)। দেহস্থ পঞ্চ প্রাণ—প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান ও উদান—ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে গণ্য। প্রাণ ব্রহ্মের চৈতন্যময় শক্তি। যেখানে ব্রহ্মকে অপ্রাণ বলা হইয়াছে, সেখানে ইন্দ্রিয়-মধ্যে গণ্য পঞ্চ প্রাণই তাহার লক্ষ্য। (মুখ্য) প্রাণ চরাচর বিশ্বে পরিব্যাপ্ত।*

* "এ আমার শরীরের শিরায় শিরায়
যে প্রাণ-তরঙ্গমালা রাত্রি দিন ধায়,

সেই প্রাণ ছুটিয়াছে বিশ্ব দিগ্বিজয়ে
সেই প্রাণ অপরূপ ছন্দে তালে তালে

নাচিছে ভুবনে। সেই প্রাণ চুপে চুপে
বসুধার মৃত্তিকার প্রতি রোমকূপে

লক্ষ লক্ষ তৃণে তৃণে সঞ্চারে হরষে,
বিকাশে পল্লবে পুষ্পে বরষে বরষে।

বিশ্বব্যাপী জন্ম-মৃত্যু-সমুদ্র দোলায়
দুলিতেছে অন্তহীন জোয়ার ভাটায়।

কর্ম্ম

বেদে বিশ্বের ধারক নিয়মকে "ঋত" নাম দেওয়া হইয়াছে। ঋতই সত্য। বাহ্য জগৎ যেমন নিয়মের অধীন, নৈতিক জগৎও তেমনি অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন। প্রত্যেক কর্ম্মেরই ফল উৎপন্ন হয়। পুণ্যকর্ম্মের ফল কর্ত্তার মঙ্গলকর, পাপ কর্ম্মের ফল অমঙ্গলকর। পাশ্চাত্য দার্শনিক ফিষ্‌টে জগতে এক নৈতিক ব্যবস্থার (Moral Order) কথা বলিয়াছিলেন এবং এই ব্যবস্থাকেই তিনি ঈশ্বর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "এই নৈতিক ব্যবস্থার অতিরিক্ত কোনও ঈশ্বরের আমাদের প্রয়োজন নাই। জগতে যে নৈতিক ব্যবস্থা আছে, তাহার মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির ও তাহার পরিশ্রমের নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। প্রত্যেক ব্যক্তি তাহার কৃত কর্ম্মের ফল প্রাপ্ত হয়। তাহা ভিন্ন অন্য যাহা তাহার জীবনে সংঘটিত হয়, তাহা এই নৈতিক ব্যবস্থারই ফল। এই নৈতিক ব্যবস্থার নিয়মানুসারে ব্যতীত কাহারও মস্তক হইতে একটি কেশও স্খলিত হয় না, একটি চাতক পক্ষীরও মৃত্যু হয় না।" কর্ম্মবাদ মতে নৈতিক জগতে বিনা কারণে কিছুই উৎপন্ন হয় না। মানুষের প্রত্যেক কর্ম্মের ফল তাহার চরিত্রের উপর উৎপন্ন হয়। তাহার পুণ্য-প্রবণতা অথবা পাপ-প্রবণতা তাহার পূর্ব্ব কৃত কর্ম্মের ফল। জ্ঞান-কৃত কর্ম্ম ক্রমে ক্রমে অভ্যাসে পরিণত হয়। স্বাভাবিক সৎ প্রবৃত্তি এবং অসৎ প্রবৃত্তি পূর্ব্বের জ্ঞানকৃত কর্ম্মেরই ফল। কর্ম্মের ফল অনাতক্রম্য। "পুণ্যো বৈ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি। পাপঃ পাপেন। (বৃ-আ ৩।২।১৩)। পুণ্য কর্ম্মের দ্বারা লোক পুণ্যবান্, পাপ কর্ম্মদ্বারা পাপী হয়। "ক্রতুময়ঃ পুরুষঃ যথাক্রতুঃ অস্মিন্ লোকে পুরুষো ভবতি, তথা ইতঃ প্রেত্য ভবতি (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)—পুরুষ সংকল্পময়। পৃথিবীতে পুরুষের যেমন সংকল্প, পৃথিবী হইতে চলিয়া যাইবার পরেও সেই প্রকার হয়।" সুতরাং ইহ জন্মে সৎ সংকল্প করাই কর্ত্তব্য।

করিতেছি অনুভব সে অনন্ত প্রাণ,
অঙ্গে অঙ্গে আমারে করিছে মহীয়ান্।

সেই যুগ যুগান্তের বিরাট স্পন্দন
আমার নাড়ীতে আজি করিছে নর্ত্তন। নৈবেদ্য।

উপনিষৎ-নিষিক্ত-চিত্ত রবীন্দ্রনাথকে এই কবিতা অথবা "বলাকা" কাব্যের জন্য বার্গসঁর নিকট যাইবার প্রয়োজন হয় নাই। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র যখন জড়ের মধ্যে প্রাণের দেখা পাইয়াছিলেন, তখন উপনিষদের ঋষিদিগকে স্মরণ করিয়াছিলেন।

আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, প্রত্যেক সংকল্প ও প্রত্যেক কর্ম্ম আমাদের চিত্তের উপর "দাগ" রাখিয়া যায়। সেই দাগই সংস্কার। পুণ্যপ্রবণতা ও পাপপ্রবণতা এই সংস্কারের ফল। মৃত্যুতে এই সংস্কারের ধ্বংস হয় না। ইহ জন্মের সংস্কার সহ জীব নূতন দেহ ধারণ করে। এই সংস্কারদ্বারা তাহার নূতন জন্মের চরিত্র নিয়ন্ত্রিত হয়। কিন্তু এই সংস্কার অতিক্রম করা জীবের অসাধ্য নহে। জ্ঞানদ্বারা অবিদ্যার ধ্বংস সাধন করিয়া সঞ্চিত সংস্কারবিরোধী কর্ম্ম করাও জীবের সাধ্যায়ত্ত। স্বার্থপ্রণোদিত কর্ম্ম হইতে বন্ধন হয়। স্বার্থহীন কর্ম্ম, পরের সেবারূপ কর্ম্ম বন্ধনের হেতু হয় না। ইহা ভিন্ন কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবার অন্য পথ নাই। (ঈশ—২)। জীবাত্মা স্বাধীন। এই স্বাধীনতার বলেই কর্ম্মফল অতিক্রম করা তাহার সাধ্যায়ত্ত এবং তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি (পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল) দমন করা সম্ভবপর। যে এই স্বাধীনতার ব্যবহার করে, তাহার জীবন তাহার স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হইতে উদ্ভূত কর্ম্মের সমষ্টি নহে; প্রকৃতির উর্দ্ধে থাকিয়া সে তাহার জ্ঞান অনুসারে তাহার কর্ম্ম নিয়ন্ত্রিত করে। স্বাধীনতার ব্যবহার না করিলে সে সম্পূর্ণ কর্ম্মফলের অধীন থাকে। আত্মার স্বরূপের জ্ঞান ভিন্ন এই স্বাধীনতার বিকাশ হয় না। "তদ্ য ইহ আত্মানম্ অননুবিদ্য ব্রজন্তি, এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু অকামচারো ভবতি। অথ য ইহ আত্মানম্ অনুবিদ্য ব্রজন্তি, এতাংশ্চ সত্যান্ কামান্, তেষাং সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি।" (ছান্দোগ্য—৮।১।৬)।—যে ব্যক্তি ইহলোকে আত্মাকে এবং সত্য কামনাসমূহকে না জানিয়া চলিয়া যায়, সে সর্ব্বলোকে অকামচর (পরাধীন) হয়। যিনি ইহলোকে এই আত্মাকে এবং সত্য কামনাসমূহ জানিয়া চলিয়া যান, সর্ব্বলোকে তাঁহার কামচার (স্বাধীন আচরণ) হয়। ঈশ্বরকে জানা, তাঁহার সহিত একত্ব অনুভব করা ও স্বাধীন হওয়া এক কথা। এই জ্ঞানের অভাবেই মানুষ স্বার্থপর এবং কর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হয়।

আমাদের কর্ম্ম বাহ্যজগতে যে ফল উৎপাদন করে, তাহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ সম্ভবপর নহে। কিন্তু আমাদের মনের উপর উৎপন্ন ফল—অভ্যাস ও তাহা হইতে উদ্ভূত মানসিক প্রবণতা—আমরা নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ। সংযম-দ্বারা অসৎ প্রবৃত্তিদিগকে বলহীন এবং সৎপ্রবৃত্তিদিগকে বলীয়ান্ করা আমাদের সাধ্যায়ত্ত।

কর্ম্মবাদের সহিত ঈশ্বরবাদের সামঞ্জস্য আছে কি? কেহ কেহ মনে করেন, নাই। কর্ম্মের ফল যদি অখণ্ডনীয় হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরও তাহা

হইতে মুক্তি দিতে পারেন না। কিন্তু ঈশ্বর তো খামখেয়ালী পুরুষ নহেন। তাঁহার কার্য্য তাঁহারই সৃষ্ট নিয়মকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত। বেদে বরুণকে "ঋতের" প্রভূ বলা হইয়াছে। যে নিয়মে বিশ্ব পরিচালিত হয়, তাহার মধ্যে ঈশ্বরের ইচ্ছা ও শক্তিই ক্রিয়াশীল। ঋতই তাঁহার স্বরূপের প্রকাশক। মানুষ তাহার স্বাধীন ইচ্ছার ব্যবহার করিয়া কর্ম্মের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, ঈশ্বর তাহাকে মুক্ত করেন না। যদি সে তাহার স্বাধীনতার ব্যবহার না করে, তাহাকে কৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেই হইবে, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের অধীন।

উপনিষদে চারি প্রকার কর্ম্মের উল্লেখ আছে—শুক্ল, কৃষ্ণ, শুক্লকৃষ্ণ এবং অ-শুক্লাকৃষ্ণ। শুক্লকর্ম্ম = পুণ্যকর্ম্ম। কৃষ্ণ কর্ম্ম = পাপকর্ম্ম। শুক্লকৃষ্ণ কর্ম্ম = অংশতঃ পুণ্য, অংশত পাপকর্ম্ম। অশুক্লাকৃষ্ণ = পুণ্যও নহে পাপও নহে (যাহাদের কোনও নৈতিক গুণ নাই)। পাপ পুণ্যের অতীত হওয়াই যখন লক্ষ্য, তখন যাহারা শেষোক্ত প্রকার কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তাহাদের এই প্রকার কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হয় না। ঈদৃশ কর্ম্ম কোনও ফল কামনা করিয়া কৃত হয় না বলিয়া তাহাদের বন্ধন-শক্তি নাই। গ্রীক্ অদৃষ্টবাদ, ষ্টোয়িক প্রজ্ঞাবাদ (Reason), এবং চৈনিক তাও-বাদ কর্ম্মবাদেরই বিভিন্ন রূপ। কর্ম্মবাদ ভারতীয় দর্শনের চরিত্রনীতির একটা প্রধান স্তম্ভ।

সাম্পরায় বা পরলোক তত্ত্ব
(Eschatology)

নচিকেতা যমকে বলিয়াছিলেন, "মানুষের মৃত্যুর পরে কি হয়, সে সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। কেহ বলে মৃত্যুর পরেও অস্তিত্ব থাকে, কেহ বলে থাকে না। সত্য কি, আপনি আমাকে বলুন।" যম বলিয়াছিলেন, "বিত্তমোহে মূঢ় চিন্তাহীন অবিবেকী লোকের নিকট পারলৌকিক বিষয় প্রকাশিত হয় না। এই লোকই কেবল আছে, পরলোক নাই, মনে করিয়া এই প্রকার লোক পুনঃ পুনঃ মৃত্যুর অধীন হয়।" তাহার পরে বলিয়াছিলেন "আপন আপন কৃতকর্ম ও উপার্জিত জ্ঞান অনুসারে কোনও কোনও আত্মা শরীর-গ্রহণের জন্য প্রাণীগর্ভে প্রবেশ করে; আবার কেহ কেহ স্থাবরত্ব প্রাপ্ত হয়। শরীর-পতনের পূর্বে এখানে যদি জীব ব্রহ্মকে জানিতে না পারে, তাহা হইলে পৃথিবী বা অন্য লোকে পুনরায় শরীর ধারণ করে।" "আত্মার জন্ম-মৃত্যু নাই। ইহা অজ, নিত্য, শাশ্বত ও পুরাণ।"

উপনিষদে উদ্‌ভিদেরও আত্মার কথা আছে। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে "জীবাপেতং বাব কিল ইদম্ ম্রিয়তে। ন জীবো ম্রিয়তে" (৬।১১।৩)। জীবকর্তৃক পরিত্যক্ত দেহ মরে, জীব মরে না। এই জীব বা আত্মা সমস্ত প্রাণীদেহেই আছে। কিন্তু উদ্‌ভিদ ও ইতরপ্রাণীদিগের পরলোকে গতি নাই। তাহারা বারংবার জন্মে ও মরে। যাহারা দেবযান ও পিতৃযান এই দুই পথের কোন পথেই গমন করে না, তাহারা নিত্য আবর্তনশীল। (কেবল জন্মে ও মরে) (ছাঃ ৫।১০।৮)।

মৃত্যুর পরে মানুষের গতি সম্বন্ধে বৃহদারণ্যক উপনিষৎ বলেন—"যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি, সাধুকারী সাধুর্ভবতি, পাপকারী পাপো ভবতি। পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্ম্মণা ভবতি, পাপঃ পাপেন। তদেব সক্তঃ সহ কর্মণা এতি। লিঙ্গং মনোযত্র নিষক্তমস্য। প্রাপ্যান্তং কর্ম্মণঃ তস্য যৎকিঞ্চ ইহ করোত্যয়ং। তস্মাৎ লোকাৎ পুনঃ এতি অস্মৈ লোকায় কর্মণে। (৪।৪।৫—৬) যে যে প্রকার আচরণ করে, সে সেই প্রকার হয়। সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয়। পুরুষের লিঙ্গস্বরূপ মন যে বিষয়ে সংসক্ত, আত্মা সেই বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া স্বীয় কর্মসহ সেই দিকে গমন করে। এই লোকে পুরুষ যে কর্ম করে, তাহার ফল লাভ করিয়া (স্বর্গাদিলোকে) সেই লোক হইতে এই কর্মলোকে পুনরায় আগমন করে।

ছান্দোগ্যে আছে :—তদ্ য ইহ রমণীয়চরণা, অভ্যাশো হ যৎ তে রমণীয়াং যোনিং আপদ্যেরন—ব্রাহ্মণ-যোনিং বা, ক্ষত্রিয় যোনিং বা, বৈশ্যযোনিং বা। অথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যৎ তে কপূয়াং যোনিং আপদ্যেরন—শ্ব-যোনিং বা শূকর-যোনিং বা চণ্ডালযোনিং বা" (৫।১০।৭)।

যাহারা শুভ কর্ম করে, তাহারা অচিরে শুভ ব্রাহ্মণ যোনিতে, বা ক্ষত্রিয়-যোনিতে বা বৈশ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যাহারা অশুভ কর্ম করে, তাহারা অচিরে অশুভ কুকুরযোনিতে, শূকরযোনিতে অথবা চণ্ডালযোনিতে জন্মগ্রহণ করে।

এই জন্মান্তরবাদ প্রাচীন গ্রীসের অর্ফিক ধর্মে ছিল। পাইথাগোরাস্ ও প্লেটো ইহাতে বিশ্বাস করিতেন। কেহ কেহ বলেন ঋগ্বেদের মন্ত্রভাগে (সংহিতায়) ইহার উল্লেখ নাই। সুতরাং আর্য্যদিগের মধ্যে সংহিতা-যুগে এই মতের প্রচলন ছিল না। কিন্তু ঋগ্বেদসংহিতায় স্পষ্টভাবে জন্মান্তরের উল্লেখ না থাকিলেও, তাহার ইঙ্গিত আছে। আর সংহিতায় জন্মান্তরের কোনও উল্লেখ না থাকিলেও, তাহাদ্বারা তখন জন্মান্তরবাদ ছিল না, ইহা

প্রমাণিত হয় না। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগে ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। সংহিতার সমগ্রভাগও যে পাওয়া গিয়াছে, তাহাও নহে।

জীবের দেহত্যাগের সময় এবং তাহার পরে কি ঘটে, তাহার বিবিধ বর্ণনা উপনিষদে পাওয়া যায়। ছান্দোগ্য বলেন, মৃত্যুকালে প্রথমে বাক্ মনে লীন হয়, মন প্রাণে, প্রাণ তেজে এবং তেজ পরম দেবতাতে লীন হয় (৬।৮।৬)। কৌষীতকি উপনিষৎ বলেন, জীব যখন শরীর হইতে বহির্গত হয়, তখন বাক্, সকল ইন্দ্রিয় ও মন, প্রাণের সহিত বহির্গত হয়। বাক্ সকল নাম, ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের বিষয়, মন সকল চিন্তা, তাহাকে সমর্পণ করে। এই সকলই প্রাণে বিলীন হয়। ইহারা সকলেই শরীরে একত্র বাস করে, এবং একত্র শরীর হইতে বহির্গত হয়। (৩।৪) যাহা প্রাণ, তাহাই প্রজ্ঞা।

বৃহদারণ্যকে আছে, মৃত্যুকালে সকল ইন্দ্রিয় আত্মায় একীভূত হয়। তখন ইন্দ্রিয়দিগের ক্রিয়া শুদ্ধ হয়। তখন তাহারা হৃদয়ের অগ্রভাগে দীপ্তিযুক্ত হয়। সেই জ্যোতিদ্বারা আত্মা চক্ষু হইতে বা মূর্দ্ধা হইতে বা অপর কোনও অঙ্গ হইতে বহির্গত হয়। তখন মুখ্য ও অন্যান্য প্রাণ তাহার অনুগমন করে (৪।৪।৩)। যেমন তৃণ-জলৌকা কোনও তৃণের অগ্রভাগে উপস্থিত হইয়া তৃণান্তর আশ্রয় করিয়া আপনাকে সেই তৃণের নিকট লইয়া যায়, তেমনি আত্মা এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া অন্য দেহ আশ্রয় করিয়া আপনাকে তাহার দিকে লইয়া যান। স্বর্ণকার যেমন এক খণ্ড স্বর্ণদ্বারা নবতর ও কল্যাণতর অন্য একটি বস্তু নির্মাণ করে, তেমনি এই আত্মা এই দেহ পরিত্যাগ করিয়া অবিদ্যা দূর করিয়া অন্য একটি নবতর ও কল্যাণতর রূপ প্রস্তুত করেন। এই নূতন রূপ পিতৃগণের রূপের ন্যায় কিংবা গন্ধর্ব্বগণের কিংবা দৈব, প্রাজাপত্য, ব্রাহ্ম অথবা অন্য কোনও ভূতের রূপের ন্যায় (৪।৪।৩-৪)।

কিন্তু এই পুনর্জন্ম মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই হয় না। ইহজন্মে অনুষ্ঠিত কর্মের ফলভোগ করিয়া তাহার পরে পুনর্জন্ম হয়। এই ফলভোগ হয় লোকান্তরে। আর সকলেরই যে পুনর্জন্ম হয়, তাহাও নহে। যাঁহারা গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া "ইষ্টাপূর্তে দত্তম্ ইতি উপাসতে" (ছান্দোগ্য ৫।১০।৩) অর্থাৎ যাগযজ্ঞ ও পুষ্করিণী-খনন আদি লোকহিতকর কর্মের এবং দানের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পরে পিতৃযান পথে, এবং যাঁহারা বানপ্রস্থ অবলম্বন করিয়া অরণ্যে "শ্রদ্ধা-তপ ইতি উপাসতে" (ছান্দোগ্য ৫।১০।১), তাঁহারা দেবযান পথে গমন করেন। মৃত্যুর পরে পুরুষ জ্যোতির্ময় শরীরে চিতা হইতে উত্থিত হন এবং পিতৃযান অথবা দেবযান পথে ঊর্দ্ধলোকের দিকে প্রস্থিত হন। যাঁহারা গ্রামে

ইষ্টাপূর্ত ও দানের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা প্রথমে ধূম, পরে রাত্রি, রাত্রি হইতে কৃষ্ণ পক্ষ, কৃষ্ণ পক্ষ হইতে দক্ষিণায়ন ছয় মাস প্রাপ্ত হন। তাহারা সংবৎসরকে প্রাপ্ত হন না। দক্ষিণায়ন হইতে পিতৃলোক, তথা হইতে আকাশ এবং আকাশ হইতে চন্দ্রমা প্রাপ্ত হন। চন্দ্রই সোমরাজা। চন্দ্রলোকে তাহারা দেবতাদিগের অন্ন হন। দেবতাগণ তাহাদিগকে ভক্ষণ করেন” (ছান্দোগ্য ৫।১০।৩—৪)।

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এইরূপ বর্ণনা আছে। “যাহারা যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদ্বারা লোকসকল জয় করেন, তাঁহারা ধূমকে প্রাপ্ত হন। ধূম হইতে রাত্রি, রাত্রি হইতে অপক্ষীয়মান পক্ষ (কৃষ্ণ পক্ষ), পরে যে ছয় মাস চন্দ্র দক্ষিণ দিকে গমন করেন, সেই ষণ্মাস, তাহা হইতে পিতৃলোক এবং পিতৃলোক হইতে চন্দ্রে গমন করেন। চন্দ্রলোকে তাঁহারা অন্ন হন। সেখানে দেবগণ যেমন বৃদ্ধিশীল ও ক্ষয়শীল সোমরাজাকে, তেমনি ইহাদিগকেও ভক্ষণ করেন (৬।২।১৬)। শঙ্করাচার্য্যের মতে, দেবগণ যে তাহাদিগকে বাস্তবিক ভক্ষণ করেন, তাহা নহে। তাহারা দেবতাদিগের উপকরণ অর্থাৎ ভোগ্যবস্তু হন, “স্ত্রী-পশু-ভৃত্যাদিবৎ।”

দেবযান সম্বন্ধে ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে,—“যাঁহারা অরণ্যে শ্রদ্ধার ও তপস্যার অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা প্রথমে অর্চিঃ প্রাপ্ত হন। অর্চি হইতে অহ্ন (দিবা), অহ্ন হইতে আপূর্য্যমান পক্ষ (শুক্ল পক্ষ), পরে উত্তরায়ণ ছয় মাস (যখন সূর্য উত্তর দিকে গমন করেন) প্রাপ্ত হন। ষণ্মাস হইতে সংবৎসর, সংবৎসর হইতে আদিত্য, আদিত্য হইতে চন্দ্রমা, চন্দ্রমা হইতে বিদ্যুৎ প্রাপ্ত হন। এক অমানব পুরুষ ইহাদিগকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান। ইহাই দেবযান—ব্রহ্মপথ। এই পথে যাঁহারা যান, তাঁহাদিগকে মানবাবর্তে ফিরিয়া আসিতে হয় না। (৪।১৫।৫)।

বৃহদারণ্যকেও এই কথা আছে (৬।২।১৫)। সেখানে ছান্দোগ্যের “অমানব পুরুষে”র স্থলে “মানস পুরুষের” কথা আছে। ব্রহ্মলোকে দেবযানী শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়া বহু বৎসর বাস করেন এবং সেখান হইতে ফিরিতে হয় না। একথাও আছে।

কৌষীতকি উপনিষদে আছে :—

যাহারা এই লোক হইতে চলিয়া যায়, তাহারা সকলে চন্দ্রলোকে যায়। শুক্লপক্ষে চন্দ্র তাহাদের প্রাণদ্বারা আপ্যায়িত হন, কিন্তু কৃষ্ণপক্ষে তিনি উহাদের আনন্দ উৎপাদন করেন না। যাহা চন্দ্রমা তাহাই স্বর্গলোকের দ্বার।

চন্দ্রলোকে থাকিতে যে অস্বীকার করে, তাহাকে চন্দ্র উচ্চতরলোকে (ব্রহ্মলোকে) প্রেরণ করেন। যে সেখানে থাকিতে অস্বীকার করে না, তাহাকে বৃষ্টির আকারে এই লোকে বর্ষণ করেন। সে স্বকীয় কর্ম ও জ্ঞান অনুসারে কীট, পতঙ্গ, পক্ষী, ব্যাঘ্র, সিংহ, মৎস্য, সর্প বা মনুষ্য দেহে এই লোকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে। (১।২)

(ঊর্দ্ধলোকে প্রেরিত পুরুষ দেবযান পন্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে অগ্নিলোকে, পরে বায়ুলোকে, তাহার পরে আদিত্যলোকে, পরে বরুণলোকে, পরে ইন্দ্র-লোকে, পরে প্রজাপতিলোকে ও তাহার পরে ব্রহ্মলোকে উপস্থিত হন।

মুণ্ডক ও প্রশ্ন উপনিষদেও দেবযান ও পিতৃযানের কথা আছে। মুণ্ডকে আছে, (ইষ্টাপূর্তানুষ্ঠাতা) ইষ্টাপূর্তকে বরিষ্ঠ মনে করে; তাহারা অন্য শ্রেয়ের কথা জানে না। তাহারা "নাকস্য পৃষ্ঠে" (স্বর্গলোকে) সুকৃতির ফল ভোগ করিয়া ইহলোক অথবা হীনতর লোকে প্রবিষ্ট হয়। আর অরণ্যে যাঁহারা তপ ও শ্রদ্ধার উপাসনা করেন, তাঁহারা রজোহীন হইয়া সূর্য্যদ্বার পথে অব্যয় পুরুষের ধাম প্রাপ্ত হন। (১।২।১০—১১) প্রশ্ন উপনিষদে প্রজাপতিকেই সংবৎসর বলা হইয়াছে। তাহার দুই অয়ন—দক্ষিণ ও উত্তর। "যাহারা ইষ্টাপূর্ত কর্মের উপাসনা করে তাহারা চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয় এবং তাহাদের পুনরাবৃত্তি ঘটে। আর যাঁহারা তপস্যা, শ্রদ্ধা, ব্রহ্মচর্য্য ও বিদ্যাদ্বারা আত্মার অন্বেষণ করেন, তাঁহারা আদিত্যলোক জয় করেন। আদিত্যই সকল প্রাণের আশ্রয়—অমৃত, অভয় ও পরমাগতি। ঐ স্থান হইতে পুনরাবৃত্তি হয় না। ইহাই নিরোধ অর্থাৎ ইহাদ্বারা সংসারে প্রত্যাগমন নিরুদ্ধ হয়। ইহাই শেষ গতি। (১ম প্রশ্ন)

ছান্দোগ্যে যে অমানব পুরুষের কথা আছে (যিনি দেবযানীকে ব্রহ্মলোকে লইয়া যান), তাহার সম্বন্ধে বাদরায়ন ব্রহ্মসূত্রে বলিয়াছেন (৪।৩।৪) যে দেবযান ও পিতৃযান পথের অর্চিঃ, দিবা প্রভৃতি আতিবাহিক পুরুষ (যাহারা জীবকে বহন করিয়া লইয়া যান), মার্গ-চিহ্ন বা ভোগভূমি নহে। তাহারা অর্চিরভিমানিনী দেবতা, দিবসাভিমানিনী দেবতা প্রভৃতি। কিন্তু ডয়সেন বলিয়াছেন ব্রহ্ম "জ্যোতিষাং জ্যোতিঃ"—যাবতীয় আলোকের জ্যোতি। ব্রহ্ম-লোকের পথ দেবযান। এই পথে যাঁহারা যান, তাঁহারা ক্রমশঃ উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর লোক অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মলোকে উপনীত হন। পিতৃযানের পথিকেরা অন্ধকারময় লোকের মধ্য দিয়া গমন করেন।

যাঁহারা দেবযান পথে গমন করেন, তাঁহাদের পুনরাবৃত্তি হয় না। কিন্তু

পিতৃযান-পথিকদিগকে ফিরিয়া আসিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কখন? বৃহৎ আরণ্যক বলেন, "যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব অবগত না হইয়া ইহলোক হইতে চলিয়া যায়, সে আত্মাকে জানে না বলিয়া আত্মা তাহাকে রক্ষা করেন না। সে পৃথিবীতে মহৎ কর্ম্ম করিলেও, সেই কর্ম্ম পরিণামে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।" মুণ্ডকোপনিষদে আছে "যৎ কর্মিণো ন প্রবেদয়ন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্ষীণলোকাশ্চ্যবন্তে (১।২।৯)।" কর্মফলে আসক্তিবশতঃ কর্মিগণ ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারে না বলিয়া তাহাদের কর্মফল ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে তাহারা দুঃখার্ত্ত হইয়া স্বর্গলোক হইতে পতিত হয়। সুকৃতির ফলে স্বর্গলাভ হয়। কিন্তু এই ফল চিরস্থায়ী নহে। নির্দিষ্ট পরিমিত কাল স্বর্গ ভোগ করিয়া ফিরিয়া আসিতে হয়। ছান্দোগ্য উপনিষদে আছে "তস্মিন যাবৎ সম্পাতং উষিত্বা অথ এতম্ এব অধ্বানম্ পুনর্নিবর্ত্তন্তে" (৫।১০।৫), চন্দ্রলোকে যে পর্যন্ত কর্ম-ক্ষয় না হয়, ততদিন বাস করিয়া যে পথে গমন করিয়াছিল সেই পথেই ফিরিতে হয়।

যাহারা ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ম করে, তাহাদেরই স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু ইষ্টাপূর্ত্ত ব্যতিরিক্ত মনুষ্যলোকে শরীর-গ্রহণের উপযোগী অনেক কর্মও মানুষ করে। সেই সকল কর্মের ফলভোগ চন্দ্রলোকে হয় না। তাহাদের ভোগের জন্য পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। স্বর্গফলপ্রদ কর্ম যাহাদের একেবারেই নাই, তাহারা চন্দ্রলোকে যায় না। তাহারা বারবার জন্মগ্রহণ করে ও মরে।

"তে য এবং এতৎ বিদুঃ, যে বা এতৎ কর্ম কুর্বতে, মৃত্বা পুনঃ সম্ভবন্তি। তে সম্ভবন্ত এব অমৃতত্বং অভিসম্ভবন্তি। অথ য এবং ন বিদুঃ, যে বৈতৎ কর্ম ন কুর্বতে, মৃত্বা পুনঃ সম্ভবন্তি, ত এতস্যৈব অন্নং পুনঃ পুনঃ ভবন্তি"—(শতপথ ব্রাহ্মণ ১০।৪।৩।১০)। যাঁহারা এইরূপ জানেন বা এইরূপ কর্ম করেন, তাঁহারা মৃত্যুর পর উত্থিত হন, এবং অমৃতত্ব সংপ্রাপ্ত হন। যাহারা ইহা জানে না, বা এরূপ কর্ম করে না, তাহারা মরিয়া আবার উত্থিত হয়, এবং বারংবার মৃত্যুর অন্ন হয়।

উপনিষদে যে অমৃতত্বলাভের কথা আছে, তাহার অর্থ মৃত্যুর পরে জীবের স্থায়িত্ব নহে। কেন না জীবাত্মা যে অবিনশ্বর, সে সম্বন্ধে উপনিষদের ঋষিদিগের কোনও সন্দেহ ছিল না। "অমৃতত্ব" শব্দ মৃত্যুহীনতা অর্থেই তাঁহারা ব্যবহার করিয়াছেন। জন্ম-মৃত্যু-চক্র হইতে মুক্ত হওয়াই অমৃতত্ব।

মৃত্যুর পরে পাপ ও পুণ্যের শাস্তি অন্য লোকে হয়, ইহাও যেমন উপনিষদে পাওয়া যায়, তেমনি পাপ ও পুণ্য কর্মের ফলে উত্তম বা নিকৃষ্ট যোনিতে জন্ম

হয়, ইহাও পাওয়া যায়। পুনর্জন্মবাদই উপনিষদে প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। কিন্তু পরলোকে পাপ ও পুণ্যের ফল, শাস্তি ও পুরস্কার-লাভ হয়, এ মতও পরিত্যক্ত হয় নাই। ডয়সন বলেন, পরকালে পাপের শাস্তি ভোগ করিয়া যদি আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে তো জীবকে একই কর্মের ফল দুই বার ভোগ করিতে হয়—একবার পরলোকে, আর একবার তাহার পরে পৃথিবীতে। পরলোকে যদি পাপ ও পুণ্যের ফল ভোগ হয়, তবে কিসের জন্য জীব আবার পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে? এ আপত্তি খুব সঙ্গত বলিয়া গণ্য করা যায় না। সকল কর্মের ফলভোগ পরলোকে সম্ভবপর হয় না। ইহজন্মে যাহাদের প্রতি পাপ অনুষ্ঠিত হইয়াছে, অনুষ্ঠিত পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তাহাদের সহিত পুনরায় সংযোগের প্রয়োজন। পৃথিবীতে সেই সংযোগ সংঘটিত হয় এবং পাপকারীকে পৃথিবীতে তাহার কৃত ক্ষতির পূরণ করিতে হয়। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে পুনর্জন্ম-কেবল পাপের জন্য নহে। জীবের মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানলাভ ও ধর্মসাধনের জন্যও তাহার প্রয়োজন। আত্মতত্ত্ব অবগত হইবার পূর্বে যে পৃথিবী হইতে চলিয়া যায়, আত্মতত্ত্ব-লাভের জন্য তাহাকে ফিরিয়া আসিতে হয়। আবার পুরুষের মন যে বিষয়ে আসক্ত, আত্মা সেই বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া নিজ কর্মসহ সেই দিকে গমন করে (বৃঃ আঃ ৪।৪।৬)। কামনাত্যাগের পূর্বে তাহার মৃত্যু হইলে ঐ আকর্ষণে সেই কামনার পরিতৃপ্তির জন্য তাহাকে জন্মগ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু "যে পুরুষ অকাম, নিষ্কাম, আপ্তকাম, আত্মকাম তাহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না। তিনি ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন।"

উপরি উদ্ধৃত বৃহদারণ্যকের (৪।৪।২—৪) শ্লোক অনুসারে মৃত্যুকালে আত্মা তাহার যাবতীয় ইন্দ্রিয় ও শক্তি আপনার মধ্যে সংগ্রহ করে এবং মৃত্যুর পরে তাহার অর্জিত জ্ঞান, কৃতকর্ম ও সঞ্চিত অভিজ্ঞতা তাহার অনুসরণ করে। আত্মা নিজেই তাহার পরবর্তী দেহ গঠন করে। পরবর্তী দেহ কিরূপ হইবে, তাহা নির্ভর করে তাহার পূর্ব জন্মের প্রকৃতি ও কৃতকর্মের উপর। বৃহদারণ্যকের (৪।৪।৫) শ্লোকে আছে "এই আত্মা (যে পুনর্জন্ম গ্রহণ করে) বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, চক্ষুময়, শ্রোত্রময়, পৃথিবীময়, জলময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, কামময়, অকামময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্মময়, অধর্মময় এবং সবময়।…যে ব্যক্তি যে প্রকার কার্য্য করে ও যে প্রকার আকাঙ্ক্ষা করে, সেই ব্যক্তি সেই প্রকার হয়। সাধুকারী সাধু হয়, পাপকারী পাপী হয়।" যে আত্মা জন্মগ্রহণ করে তাহার মধ্যে তাহার পূর্ব জন্মের মানসিক ও নৈতিক

উপাদান সকলই থাকে। পুনর্জন্মের প্রধান কারণ কামনা। যতদিন কামনার বিলোপ না হইবে, ততদিন পুনর্জন্ম হইবে। কর্ম কামনার ফল। "স যথা-কামো ভবতি, তৎ ক্রতুর্ভবতি। যৎ ক্রতুর্ভবতি তৎ কর্ম কুরুতে। যৎ কর্ম কুরুতে তৎ অভিসংপদ্যতে"—যে যে প্রকার কামনাযুক্ত হয়, সে সেই প্রকার ক্রতুযুক্ত (চিকীর্ষাযুক্ত) হয়, যে প্রকার কর্ম্ম করে, সেই প্রকার ফল প্রাপ্ত হয়।"

"কামান্ যঃ কাময়তে মন্যমানঃ,
স কামভির্জায়তে যত্র তত্র।
পর্যাপ্তকামস্য কৃতাত্মনস্তু
ইহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তি কামাঃ॥

মুণ্ডক—৩।২।২

যে ব্যক্তি কাম্য বস্তুসকলের চিন্তা করিয়া তাহাদিগকে পাইতে কামনা করে, সে সেই সকল কামনাভোগের উপযোগী লোকে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু বাসনাবর্জিত যাহার নিকট আত্মস্বরূপ প্রকাশিত, তাহার সমুদয় কামনা এখানেই বিলীন হয়।"

"যাহারা অবিদ্বান্ ও অবুধ, তাহারা মৃত্যুর পরে অন্ধতমসাবৃত অনন্দা (আনন্দবিহীন) নামক লোকসকলে গমন করে। (বৃঃ আঃ ৪।৪।১১)

যিনি "ইহাই আমি" এইভাবে আত্মাকে জানেন অর্থাৎ আত্মস্বরূপের যিনি সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, তিনি কিসের ইচ্ছায়, কি কামনা করিয়া শরীরে সন্তাপ ভোগ করিবেন? (বৃঃ আঃ ৪।৪।১২)

"এই পৃথিবীতে থাকিয়াই যদি আত্মাকে আমরা অবগত হইতে না পারি, তাহা হইলে আমাদের "মহতী বিনষ্টিঃ"। যাঁহারা আত্মাকে জানেন তাঁহারা অমৃত হন, অপর সকলে দুঃখ প্রাপ্ত হয়। (বৃঃ আঃ ৪।৪।১৪)

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে প্রাচীন গ্রীসেও জন্মান্তরবাদ প্রচলিত ছিল। এই সম্বন্ধে ম্যাক্ডনেল বলেন, "পাইথাগোরাস যে ভারতীয় দর্শন ও বিজ্ঞানের নিকট ঋণী ছিলেন, তাহা খুব সম্ভবপর। তাঁহার জন্মান্তরবাদের সহিত গ্রীক দর্শনের কোনও সম্বন্ধ নাই। তাহার পূর্বে উদ্ভূত কোনও মতের দ্বারাও ইহার ব্যাখ্যা করা যায় না। গ্রীকেরা এই মতকে বিদেশে উদ্ভূত বলিয়া মনে করিত। প্রাচীন মিশরবাসিগণ এই মতের সহিত পরিচিত ছিল না। সুতরাং তাহাদের নিকট হইতে তাঁহার এই মত প্রাপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। গোমপার্জ (Gomperz) লিখিয়াছেন "পাইথাগোরাসের মত ও ভারতীয় মতের মধ্যে সাদৃশ্য ইহা হইতে অনেক অধিক। এই সাদৃশ্য যে

কেবল উভয় মতের সামগ্রিক রূপের মধ্যে বর্তমান, তাহা নহে, তাহাদের বিভিন্ন অংশের মধ্যেও ইহা দৃষ্ট হয়। নিরামিষ ভোজন উভয় মতেরই অংশ। জন্মচক্রের সমগ্র বিবরণটি উভয় মতে অভিন্ন। এই সাদৃশ্য যে যদৃচ্ছার ফল, তাহা মনে করা অসম্ভব।" তাঁহার মতে পাইথাগোরাস পারস্য দেশ হইতে এই ভারতীয় মত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু মাক্ষমুলার এ সম্বন্ধে ভিন্ন মত পোষণ করেন। গ্রীক্ দর্শনের উপর ভারতীয় বিদ্যার প্রভাব তিনি স্বীকার করেন না।

বুদ্ধি ও বোধি

শাস্ত্রপাঠ বা মেধাদ্বারা আত্মাকে জানা যায় না। আত্মা যাহাকে বরণ করেন, তিনিই তাহাকে জানিতে পারেন (কঠ ও মুণ্ডক)। মেধাদ্বারা যদি জানা না যায়, তবে কিরূপে তাঁহাকে জানা যাইবে ?

"স্বয়ম্ভূ ইন্দ্রিয়দিগকে বহির্মুখ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। সেইজন্য মানুষ অনাত্ম বিষয়ই কেবল দেখিতে পায়, যিনি অন্তরাত্মা, তাঁহাকে দেখিতে পায় না" (কঠ)। "তাঁহাকে চক্ষু, বাক্য অথবা অন্য-কোনও ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ করা যায় না। তপস্যা ও কর্মদ্বারাও তাঁহাকে লাভ করা যায় না। নির্মল জ্ঞানদ্বারা বিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়া সাধক ধ্যানযোগে তাঁহাকে দর্শন করেন" (মুণ্ডক ৩।১।৮)। এই নির্মল জ্ঞান (জ্ঞান-প্রসাদ) কি ?

শ্বেতাশ্বতর ঋষি তপঃপ্রভাব ও দেবপ্রসাদের ফলে ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন (৬।২১)। যে তপঃ ও দেবপ্রসাদে তিনি ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছিলেন, তাহার স্বরূপ কি ?

বিষয়ীকে বিষয়রূপে জানা যায় না। "যিনি জীববীজে (রেতসি) অবস্থিত, কিন্তু জীববীজ যাঁহাকে জানে না, জীববীজ যাঁহার শরীর, কিন্তু যিনি জীববীজ হইতে পৃথক, যিনি জীববীজের মধ্যে থাকিয়া তাহাকে নিয়মিত করেন, তিনিই তোমার আত্মা, অন্তর্যামী ও অমৃত। তিনি অদৃষ্ট কিন্তু দ্রষ্টা, অশ্রুত কিন্তু শ্রোতা। তাঁহাকে মনন করা যায় না, কিন্তু তিনি সকলের মন্তা। তিনি অবিজ্ঞাত, কিন্তু বিজ্ঞাতা। তাঁহা ভিন্ন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা কেহ নাই (বৃহদারণ্যক ৩।৭।২৩)"। এই অবিজ্ঞাত আত্মাকে জানিবার উপায় কি ?

বুদ্ধি (Intellect) অখণ্ড দ্রব্যকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখে। দেশকাল-ও-কারণ-প্রত্যয়ের সাহায্যব্যতিরেকে বুদ্ধি কিছুই বুঝিতে পারে না। কিন্তু দেশকাল ও কারণের প্রত্যয় সামুৎপাদিক (phenomenal) জগতের বাহিরে

প্রযুক্ত হইতে পারে না। যদি তথায় তাহাদের প্রয়োগ হয়, তাহা হইলে তাহার ফল হয় বিষম প্রসক্তি (antinomy), বা যে সকল বিষয় সত্য বলিয়া গৃহীত তাহাদের মধ্যে বিরোধ। জগতের কারণরূপে যদি ব্রহ্মের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মেও কারণতত্ত্বের প্রয়োগ করিয়া তাহারও কারণের অন্বেষণ করিতে হয়, এবং এই দ্বিতীয় কারণেরও কারণ খুঁজিতে হয়। এইরূপে অনবস্থার উদ্ভব হয়। যদি প্রথম কারণ বলিয়া কিছু স্বীকার করা যায় এবং তাহার কোনও কারণ নাই, তিনি নিজেই নিজের কারণ, ইহা বলা যায়, তাহা হইলে কার্য-কারণের নিয়মের অন্যথা হয়।

বুদ্ধি সকল বিষয় জানিতে পারে না ; বৃহদারণ্যক উপনিষদে গার্গী-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদে ইহা সুন্দরভাবে দেখান হইয়াছে। গার্গী যাজ্ঞবল্ক্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এই সকলই জলে ওতপ্রোত ? জল কিসে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞ : বায়ুতে।

গার্গী : বায়ু কিসে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞবল্ক্য : অন্তরীক্ষলোকসমূহে।

গার্গী : অন্তরীক্ষ কিসে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞ : গন্ধর্বলোকে।

গার্গী : গন্ধর্বলোক কিসে ওতপ্রোত ?

যাজ্ঞ : আদিত্যলোকে।

গার্গী : আদিত্যলোক কিসে ?

যাজ্ঞ : চন্দ্রলোকে।

গার্গী : চন্দ্রলোক কিসে ?

যাজ্ঞ: নক্ষত্রলোকসকলে।

গার্গী : নক্ষত্রলোক কিসে ?

যাজ্ঞ : দেবলোকসকলে।

গার্গী : দেবলোকসকল কিসে ?

যাজ্ঞ : ইন্দ্রলোকসকলে।

গার্গী : ইন্দ্রলোকসকল কিসে ?

যাজ্ঞ : প্রজাপতিলোকসকলে।

গার্গী : প্রজাপতিলোকসকল কিসে ?

যাজ্ঞ : ব্রহ্মলোকসকলে।

গার্গী : ব্রহ্মলোকসকল কিসে ?

তখন যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন, "গার্গি, অতিপ্রশ্ন করিও না।" প্রশ্নের একটি সীমা আছে। ব্রহ্মলোকই প্রশ্নের শেষ সীমা। কেহই এই সীমা অতিক্রম করিতে পারে না। দেশ, কাল এবং কারণত্বের অতীত ব্রহ্ম। ব্রহ্মলোক পর্যন্তই বুদ্ধির প্রসার। কিন্তু ব্রহ্ম তাহার অতীত। "যাহা দ্যুলোকের উর্দ্ধে, পৃথিবীর অধঃতে, যাহা দ্যাবা-পৃথিবীর অন্তরস্থ, যাহা অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ, তাহা আকাশে ওতপ্রোত। যাহাকে ব্রাহ্মণগণ অক্ষর বলেন, তাহাতে আকাশ ওতপ্রোতভাবে বর্তমান। এই অক্ষর স্থূল নহেন, অণু নহেন, ছায়া নহেন, তমঃ নহেন, আকাশ নহেন, তিনি অপরিমেয়, অন্তর ও বাহ্যরহিত (বৃহদারণ্যক ৩।৮।৬-৮)।" এই দেশকালাতীত পুরুষকে দেশ-কালে ক্রিয়াপর বুদ্ধি জানিবে কিরূপে? মনন ও মননের বিষয়ের মধ্যে আমাদের চিন্তা আবদ্ধ। কিন্তু যাঁহার মধ্যে চিন্তা ও তাহার বিষয় একীভূত এবং উভয়ের ভেদ বিদূরিত, বুদ্ধি সেখানে প্রবেশ করিতে অক্ষম। .

ইহা সত্ত্বেও সেই পরম সত্য কেবল 'নেতি নেতি' নহেন। তাঁহাকে জানিবার উপায় আছে। যদি না থাকিত, তাহা হইলে ঋষিগণ তাঁহার কথা বলিতে পারিতেন না। সেই উপায় হইতেছে বোধি। শ্বেতাশ্বতর দেবপ্রসাদে ও তপঃপ্রভাবে সেই বোধি লাভ করিয়াছিলেন। সিদ্ধার্থ গৌতম বোধি লাভ করিয়া 'বুদ্ধ' হইয়াছিলেন। বার্গস Intuition-নামে এই বোধির কথাই বলিয়াছেন। এই বোধি অব্যবহিত জ্ঞান, কার্য্য হইতে কারণের জ্ঞান নহে, প্রমাণের দ্বারা প্রমেয়ের প্রমা-লাভ নহে। ইহা সাক্ষাৎকার, অব্যবহিত স্পষ্ট দৃষ্টি। যাহাকে আমরা দৃষ্টি বলি তাহা নহে—দিব্যদৃষ্টি। যোগশাস্ত্রে সমাধিতে এই দৃষ্টিলাভের উপায় বর্ণিত আছে। এই দিব্যদৃষ্টি-লাভেই ধর্ম-জীবনের আরম্ভ। ধর্মজীবন পাণ্ডিত্যপরিহারপূর্বক শিশুর ন্যায় অকপট সরল জীবন। কহোলকৌষীতকেয় যখন যাজ্ঞবল্ক্যকে সর্বান্তর আত্মার বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তখন যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন "ব্রাহ্মণেরা এই সর্বান্তর আত্মাকে অবগত হইয়া পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা ও লোকৈষণা বর্জন করিয়া ভিক্ষাচর্য্য অবলম্বন করেন। পাণ্ডিত্য বর্জন করিয়া বাল্যভাবে অবস্থান করিতে ইচ্ছা করেন (বৃহদারণ্যক ৩।৫।১)।" "ধীর ব্রাহ্মণ তাঁহাকে অবগত হইয়া প্রজ্ঞা (প্রকৃষ্ট জ্ঞান) সাধন করিবেন। বহু শব্দ (শাস্ত্র) ও বাক্যের সাধন করিবেন না। তাহা বাগিন্দ্রিয়ের শ্রমমাত্র (বৃহদারণ্যক ৪।৪।২১)।"

Two sources of Morality and Religion গ্রন্থে বার্গস এই বোধি (mystic experience) বা গুহ্য অনুভবের পরিচয় দিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

উপনিষদে দেবতা

উপনিষদে যাগযজ্ঞ ও বৈদিক দেবতাদিগের পূজা নিষিদ্ধ হয় নাই, তাহাদের অস্তিত্বও অস্বীকৃত হয় নাই। ঈশোপনিষদে পুষণ (সূর্য্য) ও অগ্নির নিকট প্রার্থনা আছে (১৫।১৮)। সঙ্গে সঙ্গে একথাও আছে, যে সূর্য্যের জ্যোতি-দ্বারা তন্মধ্যস্থ ব্রহ্মের মুখ আচ্ছাদিত রহিয়াছে। অগ্নিকে যাবতীয় কর্ম্মের জ্ঞাতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে এবং পাপ হইতে মুক্তির জন্য তাহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। কেন উপনিষদে দেবতাগণের শক্তি যে ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত, তাহা এক আখ্যায়িকাদ্বারা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। কঠোপনিষদে যম নচিকেতাকে ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত অগ্নির উপাসনার বিধি বলিয়াছেন। উক্ত উপনিষদে সূর্য্য যে ব্রহ্ম হইতে উদিত এবং ব্রহ্মেই অস্ত যায় এবং সমস্ত দেবতা ব্রহ্মে অবস্থিত, একথাও আছে। তৈত্তিরীয় উপনিষদে "দেব-পিতৃ-কার্য্যে অবহেলা করিও না" একথা আছে। কিন্তু মুক্তির জন্য যাগযজ্ঞ ও দেবপূজায় কোনও বিশেষ গুরুত্ব উপনিষদে অর্পিত হয় নাই, দেবপূজা ও যাগযজ্ঞ নিষ্ফল, ইহা না বলিয়া উপনিষদ বলিয়াছেন, তাহাদ্বারা মুক্তি হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান ভিন্ন মুক্তি অসম্ভব। ইষ্টাপূর্ত্তিদ্বারা স্বর্গলাভ হয়; কিন্তু ভোগ শেষ হইলে আবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। যাগযজ্ঞ ও দেবপূজা নিষ্ফল নহে কিন্তু নিকৃষ্ট উপাসনা। সকাম উপাসনা মাত্রই নিকৃষ্ট। ইহাই উপনিষদের মত।

উপনিষদের পাপ ও পুণ্য

বেদ ও উপনিষদে বহুস্থলে পাপের কথা ও তাহা হইতে মুক্তির জন্য প্রার্থনা দেখিতে পাওয়া যায়। "যুয়োধি অস্মৎ জুহুরাণং এনঃ" (ঈশ ১৮)—আমাদের মন হইতে কুটিল পাপ দূর কর। "অথ একয়োর্দ্ধ্বঃ উদানঃ পুণ্যেন পুণ্যং লোকং নয়তি, পাপেন পাপং", (প্রশ্ন-৩।৭)—এক নাড়ীদ্বারা উদান ঊর্দ্ধ-গত হইয়া জীবকে পুণ্যকর্ম্মদ্বারা পুণ্যলোকে, পাপকর্ম্মদ্বারা পাপলোকে লইয়া যান। বর্গঃ অসি। পাপ্মানং মে বৃঙ্ধি (কৌষীতকি—২।৫)—তুমি পাপনাশক, আমার পাপ বিনাশ কর। "উদ্বর্গঃ অসি পাপ্মানং মে উদ্বৃঙ্ধি" (কৌষী—২।৫) তুমি বিশেষরূপে পাপবিনাশক, বিশেষরূপে আমার পাপ বিনাশ কর। "সংবর্গঃঅসি, পাপ্মানং মে সংবৃঙ্ধি" (কৌষী—২।৫) তুমি সম্যক্‌রূপে পাপবিনাশক, সম্যকরূপে আমার পাপ বিনাশকর। অথ হ য এতান্ এবং পঞ্চাগ্নীন্ বেদ, ন স হ তৈরপি আচরন্ পাপ্মনা লিপ্যতে"

(ছান্দোগ্য—৫।১০।১০)—যিনি এই পঞ্চাগ্নিবিদ্যা জানেন, তিনি ইহাদের সহিত আচরণ করিয়াও পাপদ্বারা লিপ্ত হন না। "যথা ইষীকাতুলম্ অগ্নৌ প্রোতং প্রদূয়েত, এবং হ অস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ প্রদূয়ন্তে, য এতদ্ এবং বিদ্বান্ অগ্নিহোত্রং জুহোতি।" (ছান্দোগ্য ৫।২৪।৩)—যেমন ইষীকার তুলা অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে সম্যক্ দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি যিনি ইহাকে এইরূপ জানিয়া অগ্নিহোত্র হোম করেন, তাহার সমুদয় পাপ দগ্ধ হইয়া যায়। "অয়ং আত্মা সেতুঃ বিধৃতিঃ এষাং লোকানাম্ অসম্ভেদায় সর্ব্বে পাপ্মানঃ অতঃ নিবর্ত্তন্তে" (ছান্দোগ্য—৮।৪।১)। এই আত্মা সেতুস্বরূপ। লোকসমূহ যাহাতে বিচ্ছিন্ন হইয়া না যায়, সেইজন্য ইনি ইহা ধারণ করিয়া রহিয়াছেন। সমুদয় পাপ ইহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়।

পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হইলে বাহ্য ও অন্তর কিছুই জানিতে পারেন না। তখন পুণ্য ও পাপ ইহার অনুগমন করে না (বৃ. আ. ৪।৩।২১-২২)।

এইরূপ বহুস্থলে পাপ ও পুণ্যের কথা আছে। বেদের অনুশাসন মানিয়া চলা বেদ অনুসারে ধর্ম্ম ও তাহা অমান্য করা অধর্ম্ম। উপনিষদের মতে ব্রহ্মজ্ঞানই ধর্ম্ম, অজ্ঞান অধর্ম্ম। যে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করে নাই, তাহার কর্ম্ম স্বার্থপ্রণোদিত। সে আপনাকে অন্য সকল হইতে স্বতন্ত্র গণ্য করে এবং তাহার আচরণও স্বকীয় সুখের অনুসরণ করে। এতাদৃশ আচরণই পাপ। কিন্তু যে জগতে সকল বস্তুই ঈশ্বরের মধ্যে অবস্থিত মনে করে, সে কাহারও অনিষ্ট চিন্তা করে না; তাহার আচরণ জীবের মঙ্গল অনুসরণ করে; তাহা পুণ্য।

বেদে যাগযজ্ঞের বিধি এবং যজ্ঞে পশুবলির ব্যবস্থা থাকিলেও "মা হিংস্যাৎ সর্ব্ব ভূতানি" কোন ভূতের হিংসা করিবে না, এ বিধিও ছিল। পরোপকার—পুণ্য। সেইজন্যই "ইষ্টাপূর্ত্ত" ফলে লোকে স্বর্গলাভ করে। উপনিষদে "দ",—দম, দয়া ও দান—পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত। যাহা চিত্ত শুদ্ধিকর, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সহায়ক, তাহাই পুণ্য। যাহাতে চিত্তের অশুদ্ধি হয়—বিষয়-লালসা, পরের অপকার প্রভৃতি—তাহা পাপ। কিন্তু এই পাপ ও পুণ্যের ফল চিরস্থায়ী নহে। ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইলে পাপ ও পুণ্য থাকে না। প্রাচীন পারসিক ধর্ম্মে ও ইহুদী, খৃষ্টান ও মুসলমান ধর্ম্মে অমঙ্গল (Evil) একটি স্বতন্ত্র সনাতন তত্ত্ব বলিয়াই পরিগণিত। ঈশ্বর মঙ্গল স্বরূপ, আহ্রিমান্ বা সয়তান অমঙ্গলস্বরূপ। কিন্তু বেদ ও উপনিষদে অমঙ্গল স্বতন্ত্র তত্ত্ব বলিয়া

স্বীকৃত নহে। বেদের রুদ্র দেবতা ক্রুদ্ধ হইয়া মানুষের ক্ষতি করেন। তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্য স্তুতিও বেদে আছে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে "হে রুদ্র, আমাদের পুত্র, পৌত্র, জীবন, গো বা অশ্ব বিনাশ করিও না। ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদের বলবান ভৃত্যাদিগকে বধ করিও না (৪।২২)।" কিন্তু তাঁহার দক্ষিণমুখের কথাও তাহাতে আছে। "রুদ্র যৎ তে দক্ষিণং মুখং, তেন মাং পাহি নিত্যং।" তোমার দক্ষিণ (আনন্দদায়ক, চিণ্ময়রূপ) মুখদ্বারা সর্ব্বদা আমাকে রক্ষা কর। রুদ্র অমঙ্গল-স্বরূপ (Evil) নহেন। অমঙ্গল মঙ্গলে পরিণত হয়। কিন্তু তাহাকে জয় করিতে চেষ্টার প্রয়োজন। অমঙ্গল একটি স্বতন্ত্র তত্ত্ব নহে।

সক্রেটিস্ বলিতেন জ্ঞানই ধর্ম্ম। শ্রেয় কি যে জানে, সে অন্যায় কর্ম্ম করিতে পারে না। উপনিষদ বলেন, জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না। যে আত্ম-জ্ঞানলাভ করিয়াছে, সে আপনার স্বার্থের অনুসন্ধানে অন্যের ক্ষতি করিতে পারে না। যাহা সত্য তাহাই মঙ্গল, এবং সত্যই জয়লাভ করে। "সত্যমেব জয়তে নানৃতং।" পাপ অভাবাত্মক।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করা সহজ নহে। "অনেকে তাহার উপদেশ শ্রবণ করিতেও পায় না, শ্রবণ করিয়াও অনেকে তাহাকে জানিতে পারে না। তাহার বক্তা দুর্ল্লভ। নিপুণ আচার্য্যকর্তৃক উপদিষ্ট জ্ঞাতা দুর্ল্লভ।" হীন নর কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলে ইহাকে জানা যায় না, নানা লোকে নানা ভাবে তাহাকে ভাবে। শ্রেষ্ঠ আচার্য্যের উপদেশ ভিন্ন তাহাকে জানা যায় না। "(কঠ—১।২।৭-৮)। "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া, দুর্গং পথস্তৎ কবয়ো বদন্তি"—ক্ষুরের শাণিত ধারের মত সেই পথ দুরত্যয়। শ্রেয় ও প্রেয় সম্পূর্ণ পৃথক। যে প্রেয়কে বরণ করে, সে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত হয়। অবিদ্যাবশতঃই লোকে প্রেয়কে কামনা করে। ভ্রান্ত জ্ঞানই অবিদ্যা। অবিদ্যাই পাপের মূল।

ঔপনিষদ ধর্ম্ম

ধর্ম্ম শব্দ ইংরেজি Religion শব্দ অপেক্ষা অধিকতর ব্যাপক। যাহা সমাজকে ধারণ করে, তাহাই ধর্ম্ম। ঈশ্বরে বিশ্বাস ও ভক্তি এবং তাঁহার উপাসনা যেমন ধর্ম্ম, তেমনি সৎ আচরণও ধর্ম্মের অন্তর্গত। আচরণ চরিত্রনীতির (Ethics) আলোচ্য বিষয়।

উপনিষদ একেশ্বরবাদী, অদ্বৈতবাদী, সর্ব্বেশ্বরবাদী, কিন্তু Pantheism নহে। Pantheism এ জগৎই ঈশ্বর, জগতের বাহিরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নাই উপনিষদের ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়। ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু কোথাও নাই, কিন্তু তিনি যেমন জগৎরূপে প্রকাশিত, তেমনি জগতের বাহিরেও বর্ত্তমান তিনি বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট, প্রতি পরমাণুর মধ্যে তিনি বর্ত্তমান, বস্তুতঃ পরমাণুগণের মধ্যে তিনিই আংশিক ভাবে প্রকাশিত, তদ্‌ব্যতিরিক্ত অন্য কোনও উপাদান পরমাণুদিগের মধ্যে নাই। আবার তিনি বিশ্বাতীতও বটেন। তাঁহার অনন্ত সত্তা বিশ্বে সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় নাই। সুতরাং এই বিশ্বের পর্য্যবেক্ষণ-দ্বারা তাঁহার স্বরূপ সম্পূর্ণ অবগত হওয়া যায় না। সসীমের মধ্যে তিনি বর্ত্তমান, কিন্তু তিনি সসীম নহেন। যাহা কিছু আমরা জানি, তিনি তাহা নহেন। আমাদের যাহার সহিত পরিচয় আছে, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষাই আমাদের আছে। কিন্তু যাহার সহিত আমাদের পরিচয় নাই, তাহা প্রকাশ করিবার ভাষাও নাই। সুতরাং তিনি বাক্যাতীত, বাক্যদ্বারা অবর্ণনীয়। মনের দ্বারাও অসীমের ধারণা করা অসম্ভব। তিনি মনের অতীত। কিন্তু যিনি অনিন্দ্রিয়-গ্রাহ্য, বাক্য যাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না, মন যাঁহার ধারণা করিতে পারে না, তিনি যে আছেন, তাহা জানিব কিরূপে? ঈশ্বর ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য না হইলেও প্রাকৃতিক জগতের শৃঙ্খলা এবং সুনীতির ভিত্তির বিষয় চিন্তা করিয়া আমরা তাঁহার অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারি। যে ধর্ম্মে প্রাকৃতিক জগতের ও নৈতিক জগতের কারণরূপে ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত, তাহাকে প্রাকৃতিক ধর্ম্ম (Natural Religion) বলে। যে ধর্ম্মে প্রত্যাদেশ (revelation) ঈশ্বরে বিশ্বাসের ভিত্তি, তাহা অতি-প্রাকৃতিক ধর্ম্ম। উপনিষদের ব্রহ্মবাদ প্রত্যাদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। উপনিষদের ঋষিগণ কোথায়ও ঈশ্বর হইতে প্রাপ্ত উপদেশের কথা বলেন নাই। উপনিষৎ বেদের অংশ, এবং বেদ ঈশ্বর হইতে নিঃশ্বাসের ন্যায় বাহির হইয়াছে, এরূপ উপনিষদে আছে। কিন্তু বেদের মন্ত্র তাঁহারা মানস চক্ষুতে প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদের দাবি বেদান্ত দর্শনে আছে, কেবল শাস্ত্র হইতে ঈশ্বরের জ্ঞানলাভ হয়, এবং তাহা লাভ করিবার অন্য উপায় নাই। এই শাস্ত্রই বেদ, এবং বেদ ঋষিগণের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিল। সকল সত্যই মানুষের চিন্তায় আবির্ভূত হয়, সত্য কেহ সৃষ্টি করে না। বেদের সত্যও তেমনিই আবির্ভূত হইয়াছিল। ঈশ্বর বেদ রচনা করিয়া ঋষিদিগকে দান করেন নাই; তাঁহার বাণী ঋষিগণ কর্ণে শ্রবণ করিয়াছিলেন, এ কথাও তাঁহারা

বলেন নাই। ঈশ্বর মানবরূপে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মের উপদেশ দিয়াছিলেন, এ কথাও উপনিষদে নাই। সুতরাং যে অর্থে খৃষ্টধর্ম্ম ও ইস্‌লামিক ধর্ম্ম প্রত্যাদিষ্ট, উপনিষদের ধর্ম্মকে সেই অর্থে প্রত্যাদিষ্ট (revealed) বলা যায় না। কিন্তু এই ধর্ম্ম প্রাকৃতিক ধর্ম্মও নহে। ইহা ঋষিগণের অনুভবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রত্যক্ষ, মানস প্রত্যক্ষ—অতীন্দ্রিয় বিষয়ের অনুভব। ইহা "বোধি' নামে অভিহিত। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক বার্গস ইহাকে Intuition বলিয়াছেন। Intuition অব্যবহিত জ্ঞান—বাহ্য ইন্দ্রিয় ও মনের মাধ্যমে জ্ঞান নহে, বুদ্ধির বিচারের দ্বারাও এ জ্ঞান লব্ধ নহে। শাস্ত্রপাঠদ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব জানা যায়, কিন্তু তাহাকে লাভ করা যায় না। শ্রবণ ও মনন তাহার জ্ঞান লাভের সহায়ক, কিন্তু নিদিধ্যাসন বিনা তাঁহাকে পাওয়া যায় না। এই নিদিধ্যাসন বা ধ্যানদ্বারাই উপনিষদের ঋষিগণ সত্য লাভ করিয়াছিলেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে "তে ধ্যানযোগানুগতা অপশ্যন্ দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াং" ধ্যানযোগপরায়ণ ঋষিগণ স্বগুণদ্বারা নিগূঢ় দেবাত্মশক্তি দর্শন করিয়াছিলেন। শ্বেতাশ্বতর "তপঃপ্রভাবাৎ, দেবপ্রসাদাৎচ" ব্রহ্মকে জানিয়াছিলেন। দেবপ্রসাদাৎ—কেননা প্রবচন, মেধা বা বহুশ্রুতদ্বারা আত্মাকে লাভ করা যায় না। তিনি যাহাকে বরণ করেন, তিনিই তাহাকে লাভ করিতে পারেন। তাঁহার এই 'বরণ'-লাভের জন্য, তাঁহার প্রসাদ-লাভের জন্য, 'তপস্যার' প্রয়োজন। তপস্যার অর্থ শুদ্ধচিত্তে মনন ও নিদিধ্যাসন। তপস্যা ব্যতীত উচ্চতর সংবিদ্ লাভ করা যায় না। আমাদের সাধারণ সংবিদ উচ্চতর সংবিদে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। সাধারণ সংবিদে জগৎ ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের সমষ্টিরূপে প্রতিভাত হয়, তাহাদের একত্ব দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু সূরিগণ সর্ব্বত্রই বিষ্ণুর পরমপদ দেখিতে পান। তাঁহাদের সংবিদ সাধারণ সংবিদ অপেক্ষা উচ্চতর, তাহা ধর্ম্মীয় সংবিদ।

অসঙ্গ (Absolute) ব্রহ্ম সাধারণ ধর্ম্মীয় সংবিদের (Religious Consciousness) নিকট প্রকাশিত হন না। তিনি বিষয়রূপে বিষয়ীর নিকট প্রতিভাত হন না। যেরূপে তিনি সাধারণ সংবিদের নিকট প্রতিভাত হন, সেরূপে তিনি ঈশ্বর। তিনি বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট—তিনি বিশ্বকে ধারণ করিয়া আছেন। তিনি জীবের মধ্যেও অনু-প্রবিষ্ট, অন্তর্যামী। তিনি সাক্ষী। জীবাত্মা ভোগ করে, তিনি তাহা দর্শন করেন। জীবাত্মার সহিত তিনি সখ্যসূত্রে বদ্ধ। তিনি সর্ব্বভূতের সুহৃদ্। তিনিই প্রত্যগাত্মা। জীব তিনিই। কিরূপে তিনি অনন্ত হইয়াও সসীম জীব হন, তাহা আমাদের

বুদ্ধির অগম্য। তাঁহার ও জীবের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ই বর্তমান। এই বিশ্ব তাঁহার দেহ। তিনি বিশ্বের আত্মা। জীবাত্মাও তাঁহার অন্তর্ভুক্ত। তিনি অফুরন্ত "ধী"র উৎস। যাবতীয় জীব সেই উৎস হইতেই তাহাদের "ধী" প্রাপ্ত হয়। জীব যখন তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করে, তখন জীব ও তাঁহার মধ্যে ভেদরেখা বিলুপ্ত হয়; জীব সেই সমুদ্রে ডুবিয়া যায়, তাঁহার সহিত একীভূত হয়, জীব তখন ব্রহ্মত্ব লাভ করে। এই অনুভূতি যাঁহারা প্রাপ্ত হন, তাঁহারা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়া আসিয়া তাহার বর্ণনা করিতে পারেন না। সকলের অনুভূতি একপ্রকার হয় না। অনেকে সেই চিৎ ও আনন্দ-সমুদ্রে ডুবিয়াও আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেন। বিষয় ও বিষয়ীর ভেদ তাহাদের মধ্যে বিলুপ্ত হয় না।

ব্রহ্ম ভূমা। তিনি সুখস্বরূপ। উচ্চতর সংবিদ লাভ করিয়া যাঁহারা তাঁহাকে লাভ করেন, তাঁহারা অমৃত হন, জন্ম-মৃত্যু-চক্র হইতে মুক্তিলাভ করেন।

ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে পরাভক্তির প্রয়োজন (শ্বেত ৬।২৩)। ভোগের ইচ্ছা বর্জন না করিতে পারিলে চিত্তশুদ্ধি হয় না। সমস্ত কামনা ও সমস্ত কর্ম ব্রহ্মেই সমর্পণ করিতে হয়। সাধক যখন সমগ্র জগৎ ব্রহ্মময় দর্শন করেন, তখন সর্বত্রই তিনি ব্রহ্মের কর্তৃত্ব দেখিতে পান। যাহাকে তিনি ইহলোক হইতে উন্নীত করিতে চান, তাহাকে দিয়া তিনি সাধুকর্ম করান যাহাকে অধোলোকে লইয়া যাইতে চান, তাহাকে দিয়া অসাধু কর্ম করান (কৌষীতকি ৪।৮) পূর্বজন্মের সংস্কার হইতেই সাধু ও অসাধু কর্মের উৎপত্তি হয়। কর্মের ফলোৎপাদক শক্তিতে তাঁহারই শক্তি ক্রিয়াশীল।

ব্রহ্মকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা সকলে করিতে পারে না। কোনও উপাসনাই উপনিষদে নিন্দিত হয় নাই। তবে উপাসনার বিষয়-ভেদে ফল ভিন্ন হয়। যিনি প্রতিষ্ঠারূপে উপাসনা করেন, তিনি প্রতিষ্ঠাবান হন; যিনি তাঁহাকে "মহৎ" (মহত্ত্ব) রূপে উপাসনা করেন, তিনি মহান্ হন। যিনি মননরূপে উপাসনা করেন, তিনি মননসমর্থ হন। যিনি 'নমন'রূপে উপাসনা করেন, তাঁহার নিকট ভোগ্য বিষয় সকল নত হয়। যিনি তাঁহাকে ব্রহ্মরূপে উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মবান হন তৈত্তিরীয় (৩।১০)।

জীব ও ব্রহ্ম যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে কে কাহার উপাসনা করিবে, এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইতে পারে। প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নহে। যখন জীব ও ব্রহ্মের অভিন্নতা বোধ হয়, এই অভিন্নতার বাস্তব উপলব্ধি যখন হয়, তখন সাধক

সাধনার উচ্চতম স্তরে অধিষ্ঠিত। সেখানে উপাসনার প্রশ্ন উঠে না। কিন্তু যত দিন সে অনুভূতি না হয়, তত দিন রসস্বরূপ ব্রহ্মের চিন্তায় সাধকের মন ভক্তি-প্লাবিত হয়, ততদিন উপাসনার প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে কোনও সংশয় থাকে না। উপাসনা তখন "ব্রহ্মাস্মি" এই অনুভূতিলাভের উপায়।

উপনিষদে অবতারবাদের কোনও কথা নাই। প্রত্যেক জীবেই যিনি প্রকাশিত, কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য-সাধনের জন্য তাঁহার নররূপ ধারণের কোনও কথাই উপনিষদে পাওয়া যায় না। মূর্ত্তি গঠন করিয়া উপাসনার কথাও উপনিষদে নাই।

"ধর্ম্মংচর।" উপনিষদে মানব-সেবা ধর্ম্মের একটি প্রধান অঙ্গ। "অন্নং বহু কুর্ব্বীত, তৎ ব্রতং"। বহু অন্ন অর্জ্জন করিবে, তাহা ব্রত। কেন? অন্ন মানুষের জীবন-রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয়। "ন কং চন বসতৌ প্রত্যাচক্ষীত।" (তৈত্তী—৩।১০) বাসের জন্য আগত কাহাকেও ফিরাইয়া দিবে না। তাহা ব্রত। সেই জন্য যে কোনও প্রকারে বহু অন্ন সংগ্রহ করিয়া সাধু গৃহস্থগণ অভ্যাগত ব্যক্তিকে বলেন "আমরা অন্ন প্রস্তুত করিয়াছি।" যিনি শ্রেষ্ঠ উপচারের সহিত এই অন্ন নিবেদন করেন, তাহার নিকট অন্ন শ্রেষ্ঠরূপে উপস্থিত হয়। যিনি মধ্যম উপচারের সহিত অন্ন নিবেদন করেন, অন্ন তাহার নিকট মধ্যমরূপে উপস্থিত হয়। যিনি অবজ্ঞার সহিত অন্ন নিবেদন করেন, তাহার নিকট অন্ন নীচভাবে উপস্থিত হয়। অন্নার্থীকে অন্ন না দিয়া যে স্বয়ং ভোজন করে, অন্ন তাহাকে ভোজন করে।

ব্রহ্মের উপাসনাবিধি সম্বন্ধে মুণ্ডকোপনিষদ বলেন, "উপনিষদ-বিহিত মহামন্ত্র (ব্রহ্মজ্ঞান) ধনু গ্রহণ করিয়া উপাসনাদ্বারা শাণিত শর সন্ধান করিবে। ব্রহ্মভাবনাগত চিত্তদ্বারা সেই ধনু আকর্ষণ করিয়া সেই অক্ষর ব্রহ্মকে বিদ্ধ করিবে।" "প্রণবই ধনু, আত্মা শর, লক্ষ্য ব্রহ্ম। অপ্রমত্ত (একাগ্রচিত্ত) হইয়া সেই লক্ষ্য বিদ্ধ করিবে।" শর যেমন ঠিক লক্ষ্যাভিমুখী হয়, তেমনি ব্রহ্মময় হইবে (মুণ্ডক—২।২।৩৪)। "ওঁ শব্দের ধ্যান করিবে (মু—২।২।৬)।" ছান্দোগ্য উপনিষদের প্রথমেই ওঁকারের উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে। "যখন পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় মনের সহিত স্থির হইয়া থাকে (নিশ্চল হয়), বুদ্ধির কোনও চেষ্টা থাকে না তাহাকেই পরমাগতি বলা হয় "(কঠ—৬।২) (উপাসনাকালে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি সকলই স্থির হইয়া থাকা চাই। তাহাদের ক্রিয়া যখন স্তব্ধ হয়, তখন ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হয়)।

"বক্ষস্থল, গ্রীবা ও মস্তক এই তিন উন্নত অঙ্গবিশিষ্ট শরীর সমভাবে রক্ষা করিয়া ইন্দ্রিয়দিগকে মনদ্বারা হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট করিয়া ব্রহ্মসমুদ্রে ভেলাস্বরূপ প্রণবমাত্রদ্বারা জ্ঞানী সংসার-স্রোত উত্তীর্ণ হন (শ্বেত—২।৮)। "অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা—(অঙ্গমেজয়ত্ব) সংযত করিয়া, প্রাণবায়ুকেও সংযত করিয়া, মন নিঃশক্তি হইলে নাসিকাদ্বারা নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস করিবে (মুখদ্বারা নয়)। জ্ঞানী অপ্রমত্ত হইয়া দুষ্টাশ্বযুক্ত রথের ন্যায় মনকে ধারণ করিবে" (শ্বেত-২।৯)। "ক্ষুদ্র উপল-অগ্নি-বালু-বর্জিত সমতল পবিত্র ভূমিতে শব্দ, জল ও আশ্রয় বিষয়ে মনের অনুকূল, চক্ষু-পীড়ার কারণহীন বায়ুচ্ছাসশূন্য কুটীরের নিকটবর্তী স্থানে উপবিষ্ট হইয়া চিত্তকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিবে" (শ্বেত—২।১০। "নীহার, ধূম, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্র—এই সকল রূপ ব্রহ্ম-প্রকাশের নিমিত্তস্বরূপ প্রথম আবির্ভূত হয়। ক্ষিতি (মৃত্তিকা), অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম সমুত্থিত এবং পঞ্চাত্মক যোগগুণ প্রকাশিত হইলে শরীর যোগাগ্নিময় হয়। তখন রোগ, জরা ও দুঃখ থাকে না" (শ্বেত—২।১১—১২)।

কঠ ও শ্বেতাশ্বতরে বর্ণিত এই যোগ পরে স্বতন্ত্র দর্শনে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

উপনিষদে ব্রহ্ম-উপাসনাই উপদিষ্ট হইয়াছে। তাহাদ্বারাই অমৃতত্বলাভ হয়। কিন্তু যাগযজ্ঞ বৃথা বলিয়া বর্ণিত হয় নাই। যাগযজ্ঞদ্বারা স্বর্গলাভ হয়, কিন্তু ভোগান্তে সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে হয়। যাগযজ্ঞাদি নিকৃষ্ট উপাসনা, সকাম উপাসনা। ব্রহ্মের উপাসনা নিষ্কাম ভাবে করিতে হয়।

মোক্ষ বা মুক্তি

মুণ্ডক বলেন—"প্রবহমান নদীগণ যেমন নাম ও রূপ বর্জন করিয়া সমুদ্রে অস্ত যায়, জ্ঞানী ব্যক্তিও তেমন নামরূপ হইতে বিমুক্ত হইয়া পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্ত হয়" (৩।২।৮)। পরাৎপর পুরুষকে প্রাপ্তিই মুক্তি। তখন নামরূপ থাকে না, অর্থাৎ ব্যক্তি তাহার ব্যক্তিত্বের নিগড় হইতে মুক্ত হয়। অসীম ও সসীমের মধ্যে ভেদরেখা লুপ্ত হয়, সসীম তখন অসীমে মিশিয়া যায়; তখন অসীম হইতে তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না। কিন্তু অসীম হইতে স্বাতন্ত্র্য তো তাহার কখনও ছিল না। পরমাত্মাই তো ব্যক্তির মধ্যে প্রত্যক্ আত্মারূপে বিরাজিত। পরমাত্মার বাহিরে তো কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব

নাই। তবে মুক্তি ও তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার মধ্যে ভেদ কোথায়? পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে বাস্তব ভেদ থাকুক বা না থাকুক, ভেদ যে উপলব্ধ হয়, তাহা সত্য। এই ভেদ অজ্ঞতা-প্রসূত, অবিদ্যা-সঞ্জাত। এই অজ্ঞান যখন দূরীভূত হয়, তখন পরমাত্মা ও জীবাত্মার ভেদ থাকে না। এই ভেদ বাস্তবিক নাই, কিন্তু তাহার ভ্রান্ত উপলব্ধি হয়। সেই ভ্রান্তি-নিরসন, ভ্রান্ত উপলব্ধির অভাবই মুক্তি। মৈত্রেয়ী যাজ্ঞবল্ক্যকে অমৃতত্বের কথা জিজ্ঞাসা করিলে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, এক খণ্ড সৈন্ধব জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহা জলে বিলীন হইয়া যায়; তাহাকে পৃথকভাবে গ্রহণ করা যায় না। তেমনি অনন্ত অপার বিজ্ঞান-ঘন মহান আত্মা সমুদয় ভূত হইতে উত্থিত হইয়া তাহাতেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পর তাহার সংজ্ঞা থাকে না। শুনিয়া মৈত্রেয়ী বলিলেন "মৃত্যুর পরে সংজ্ঞা থাকে না, ইহা বলিয়া আমাকে মোহগ্রস্ত করিলেন।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন "মোহজনক কিছু বলিতেছি না। যেখানে দ্বিতীয় বস্তু আছে বলিয়া মনে হয়, সেখানেই একজন অপরকে দর্শন করে, শ্রবণ করে, অভিবাদন করে, মনন করে, জানে। কিন্তু যখন একজনের নিকট সকলই আত্মা হইয়া যায়, তখন কে কাহাকে দর্শন করিবে, কে কাহাকে আঘ্রাণ করিবে, কে কাহাকে শ্রবণ করিবে, কে কাহাকে অভিবাদন করিবে, কে কাহাকে কিরূপে জানিবে? যাঁহাদ্বারা এই সকল জানা যায়, তাঁহাকে কিরূপে জানিবে? বিজ্ঞাতাকে কিরূপে জানিবে?" যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন "ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি।" "প্রেত্য" শব্দের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে যাইয়া অর্থাৎ "সংসারকে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিয়া"। ইহার অর্থ কেহ কেহ করেন "মৃত্যুর পরে"। এই অর্থ গ্রহণ করিলে প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর পরে পরমাত্মায় মিশিয়া যায় বলিতে হয়। তাহা হইলে প্রত্যেক জীবেরই মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মুক্তি হয়। মুক্তির জন্য চেষ্টা করিবার প্রয়োজন থাকে না; জন্মান্তরও থাকে না। কিন্তু "প্রেত্য" শব্দের অর্থ "সংসারক্ষেত্র সম্পূর্ণ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়া" ধরিলে যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তির অর্থ হয়—"জন্ম-মৃত্যু-চক্র হইতে লোক যখন মুক্তিলাভ করে, তখন তাহার সংজ্ঞা থাকে না।" যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন "এই আত্মা অবিনাশী, অনুচ্ছিত্তিধর্ম্মা।" ইহার উচ্ছেদ নাই। মৃত্যুর পরে জীবাত্মার সংজ্ঞা থাকে না, এই উক্তির সহিত "আত্মা অবিনাশী" এই উক্তির সংগতি নাই। সে যাহা হউক, মুক্তিতে আত্মার সংজ্ঞা থাকে না, ইহাই যাজ্ঞবল্ক্যের মত। সৈন্ধব খণ্ড জলে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহার যেমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকে না, আত্মাও পরমাত্মায় মিশিয়া গেলে তাহার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না।

কিন্তু ইহার বিপরীত মতও উপনিষদে পাওয়া যায়। ইহা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

বেদান্তবিজ্ঞানের বিষয় ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে জানিয়া শুদ্ধসত্ত্ব যোগিগণ পরিমুক্ত হন তাহাদের কর্ম্ম ও বিজ্ঞানময় আত্মা অব্যয় ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয় (মুণ্ডক—৩।২।৬—৭)। যিনি অক্ষরকে জানেন, তিনি সর্ব্বজ্ঞ হন, এবং সকলের মধ্যে প্রবেশ করেন (প্রশ্ন—৪।১১)। এইরূপ বহু উক্তি পাওয়া যায়, যাহাতে জীব ব্রহ্মের সহিত একীভূত হয়, এবং তাহার স্বতন্ত্র সত্তা থাকে না, বলা হইয়াছে। তখন তাহার কোনও ক্রিয়া থাকে না। প্রতীতি, চিন্তা ও সংবিদ্ দ্বৈত-বোধক ; তাহাও জীবাত্মায় তখন থাকে না। বিষয় ও বিষয়ী উভয়ই যেখানে নাই, সেখানে প্রতীতি চিন্তা ও সংবিদ থাকে না। অসঙ্গের মধ্যে বহুত্ব থাকে না। অসঙ্গ অপরিনামী ও সনাতন। তাহার বর্ণনা করা যায় না। সেই অসঙ্গের সহিত জীবাত্মা যখন মিশিয়া যায়, তখন তাহার যে অবস্থা হয়, তাহার বর্ণনা করা অসম্ভব।

কিন্তু উপনিষদে এরকমও বহু শ্লোক আছে, যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইলে জীব ব্রহ্মের সাদৃশ্য লাভ করে বলা হইয়াছে। "যখন জ্ঞানী জ্যোতির্ম্ময় হিরণ্য-গর্ভের উৎপত্তিস্থান পরম পুরুষ কর্ত্তা ঈশ্বরকে দর্শন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মের সহিত সমতালাভ করেন" (মুণ্ড—৩।১।৩)। "এই যে আত্মা মনুষ্যে, আর ঐ যে আত্মা আদিত্যে, উভয়ে এক। যিনি ইহা জানেন, তিনি এই অন্নময় আত্মা, প্রাণময় আত্মা, মনোময় আত্মা, বিজ্ঞানময় আত্মা, আনন্দময় আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া, ইচ্ছানুরূপ অন্নবান ও রূপবান হইয়া, এই সকল লোক উপভোগ করিয়া, গান করিতে থাকেন—"আমি অন্ন…আমি অন্ন-ভোক্তা…আমি মূর্ত্ত ও অমূর্ত্ত জগতের প্রথমজ হিরণ্যগর্ভ ; দেবতাদিগের পূর্ব্বে আমি সর্ব্ব প্রাণীর অমরত্বের নাভি অর্থাৎ কারণ ছিলাম" (তৈত্তী—৩।১০)। কৌষীতকি উপনিষদে মুক্তাত্মার ব্রহ্মলোকে গমনের যে সুন্দর বর্ণনা আছে, তাহাতে মুক্তিতে জীবের যে স্বাতন্ত্র্য নষ্ট হয়, তাহা মনে হয় না। মুক্তাত্মায় ব্রহ্ম গন্ধ, "ব্রহ্মরস", প্রবেশ করে এবং ব্রহ্মধামে প্রবেশ করিয়া তিনি ব্রহ্মের সাক্ষাৎ পান এবং উপাসনা নদীতে দেবতাদের সঙ্গে কিছুকাল বাস করেন। ছান্দোগ্য উপনিষদেও ব্রহ্মলোকের বর্ণনা আছে ; তাহাতে আছে "প্রসাদগুণপ্রাপ্ত শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরম জ্যোতি সম্পন্ন হইয়া বিরাজ করে। তখন ইহা উত্তম পুরুষ। তখন…ক্রীড়া করিয়া ও আনন্দ উপভোগ করিয়া বিচরণ করে।

উপনিষদে ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্য বাচক এবং সাদৃশ্যবাচক উভয়-বিধ উক্তিই পাওয়া যায়। ইহা হইতে পরে বেদান্তের বহুবিধ ভাষ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। শঙ্করাচার্য্যের নির্বিশেষাদ্বৈতবাদ, রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ ও অচিন্ত্যভেদাভেদ বাদ সকলের ভিত্তিই উপনিষদ।

বেদের ঋষিগণ বহির্জগতে ব্রহ্মের প্রকাশ দেখিতে পাইয়াছিলেন; বহির্জগৎ, যাহাকে জড় জগৎ বলা হয়, তাহার মধ্যে চিন্ময় ব্রহ্ম অনুপ্রবিষ্ট, তাহা ব্রহ্মের শরীর, ব্রহ্ম তাহার আত্মা, তাহা ব্রহ্মই, ইহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা অন্তরের মধ্যেও বহির্জগতের আত্মার অবস্থানের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে চিন্ময় আত্মা, তাহা ও সূর্য্যমণ্ডলের মধ্যে যিনি বর্ত্তমান, তাঁহারা এক ও অভিন্ন, ইহা তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন একই চিন্ময় পরমাত্মা বহির্জগতে ও অন্তর্জগতে বর্ত্তমান; তিনি বহির্জগৎ ও অন্তর্জগতে শুধু অনুপ্রবিষ্ট নহেন, তিনিই বহির্জগৎ, তিনিই অন্তর্জগৎ, বহির্জগতের প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ও অন্তর্জগতে প্রতি জীবের প্রতীতি, অনুভূতি ও জ্ঞান সকলই তাঁহার প্রকাশিত অবস্থা। সাধক ধ্যানবলে এই একত্ব অনুভব করেন। এই অনুভূতির প্রকার ভেদ আছে। কেহ কেহ অসীমের মধ্যে ডুবিয়া আপনার সত্তা হারাইয়া ফেলেন। কাহারও কাহারও সেই সত্তা-সাগরে—আনন্দ-সমুদ্রের মধ্যে—জ্ঞাতা-জ্ঞেয়, ভোক্তা-ভোগ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান থাকে। এই বিভিন্ন অনুভূতিই বিভিন্ন প্রকার বর্ণনার কারণ।

সংবিদের বিভিন্ন অবস্থা

সংবিদ্ একটি অনৈসর্গিক বস্তু। মাণ্ডুক্য উপনিষদে চারি প্রকার সংবিদ্ বর্ণিত হইয়াছে—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি ও তুরীয়। জাগ্রৎ অবস্থায় আমরা যাহা দেখি, স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট বস্তুর সহিত তাহার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু জাগ্রৎ অবস্থায় বস্তুসকল দেশ-কালে অবচ্ছিন্ন, এবং কার্য্য-কারণের নিয়মাধীন। কিন্তু স্বপ্ন-দৃষ্ট বস্তুসকল দেশ-কাল ও কার্য্য-কারণের নিয়ম সকল সময় মানে না। স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট ঘটনার সহিত জাগ্রৎ অবস্থার ঘটনাবলীর সম্বন্ধ দৃষ্ট হয় না। স্বপ্নাবস্থায় দৃষ্ট বিভিন্ন ঘটনার মধ্যে সম্বন্ধও সকল সময় থাকে না। সুষুপ্তি অবস্থায় কোনও কামনা থাকে না, কোনও স্বপ্নও দৃষ্ট হয় না, তখন যাবতীয় বিচ্ছিন্ন জ্ঞান ঘনীভূত হইয়া বর্ত্তমান থাকে, আনন্দ অনুভূত হয়। চতুর্থ বা তুরীয় অবস্থায় বাহ্যজ্ঞানও

থাকে না, অন্তর্জ্ঞানও থাকে না, তাহা প্রজ্ঞানঘন অবস্থাও নহে। সে অবস্থা বর্ণনাতীত। তখন কেবলমাত্র এক আত্মারই অনুভব হয় (একাত্ম-প্রত্যয়সার:)।

স্বপ্নাবস্থায় যাহা দেখা যায়, জাগরিত হইয়া তাহা দেখা যায় না। ইহা হইতে অনুমিত হয়, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব নাই, অন্ততঃ জাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট বস্তুর যে প্রকার অস্তিত্ব স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর তাহা নাই। তাহারা আসে কোথা হইতে, কিরূপে ? কঠোপনিষৎ বলেন "য এষ: সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ" (৫।৮) প্রাণিগণ যখন নিদ্রিত থাকে, তখন তিনি (ব্রহ্ম) জাগ্রৎ থাকিয়া কাম্যবস্তুসকল নির্মাণ করেন। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু স্বপ্ন-দ্রষ্টা ভিন্ন অন্য কেহ দেখিতে পায় না। আবার স্বপ্নদ্রষ্টাও জাগরিত হইয়া স্বপ্নে দৃষ্ট বস্তু দেখিতে পায় না। যাজ্ঞবল্ক্য জনককে বলিয়াছিলেন "পুরুষের দুই স্থান—ইহলোক ও পরলোক। সন্ধিস্থান তৃতীয়স্থান। তাহা স্বপ্ন-স্থান। স্বপ্নে আত্মা রথ, রথযোগ (রথের বাহন) এবং পথের সৃষ্টি করেন। মহামৎস্য যেমন নদীর উভয় পারে বিচরণ করে, তেমনি পুরুষ স্বপ্ন এবং জাগরিত উভয় অবস্থাতেই বিচরণ করেন। শ্যেনপক্ষী যেমন আকাশে বিচরণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পক্ষদ্বয় সংকুচিত করিয়া নীড় অভিমুখে ধাবিত হয়, তেমনি পুরুষ সুষুপ্তি স্থানের দিকে ধাবিত হয়।" (বৃঃ আঃ—৪।৩।১৮-১৯)

স্বপ্নাবস্থায় ইন্দ্রিয়গণ মনে বিলীন হয়। তাহাদের কার্য্য থাকে না। কিন্তু মনের কার্য্য থাকে। সুষুপ্তি-অবস্থায় মন প্রাণবায়ুতে বিলীন হয়। তখন প্রাণের কার্য্য থাকে, কিন্তু মনের কার্য্য থাকে না। তখন আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়, এবং তাহাতে আনন্দ অনুভব করে। সুষুপ্তির এই আনন্দ স্মৃতিতে উদিত হইলে নিদ্রা হইতে উঠিয়া মানুষ বলে "সুখে নিদ্রা গিয়াছি।"

মধুমক্ষিকা নানা বৃক্ষের রস আহরণ করিয়া সকল রসকে এক ভাবাপন্ন করে। তখন যেমন বিভিন্ন রসের বিবেক থাকে না, যে "আমি অমুক বৃক্ষের রস", তেমনি প্রাণিগণ সুষুপ্তি-কালে সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া জানিতে পারে না যে তাহারা সৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সুষুপ্তির পূর্ব্বে ব্যাঘ্র, সিংহ, বৃক প্রভৃতি যে যে অবস্থায় ছিল, সে জাগরিত হইয়া সেই অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বদিকস্থ নদীসমূহ পূর্ব্বদিকে, পশ্চিমদিকস্থ নদীসকল পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়। সমুদ্র হইতে উৎপন্ন হইয়া তাহারা সমুদ্রেই গমন করে এবং সমুদ্রই হইয়া যায়। তাহারা জানিতে পারে না "আমি এই

নদী"। তেমনি এই সমুদয় প্রজা সৎস্বরূপ হইতে আসিয়া জানিতে পারে না "আমরা সৎস্বরূপ হইতে আসিয়াছি।" (ছান্দোগ্য—৬।১০।১-৩)।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তির সংবিদ্ জীবের ব্যক্তিগত সংবিদ্। তুরীয় বা চতুর্থ সংবিদ্ পরমাত্মার বা ব্রহ্মের সংবিদ্। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, ও সুষুপ্তির সংবিদ সকলেরই আছে। মানুষ স্বাভাবিক অবস্থায় এই তিন প্রকার সংবিদ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে লাভ করে। কিন্তু তুরীয় সংবিদ্ আয়াসলভ্য। যোগিগণ এই সংবিদ্ যোগদ্বারা লাভ করেন।

মাণ্ডুক্য উপনিষদে জাগরিত সংবিদ্‌কে বৈশ্বানর, স্বপ্ন-সংবিদ্‌কে তৈজস, সুষুপ্ত সংবিদ্‌কে প্রাজ্ঞ বলা হইয়াছে। জাগরিত অবস্থায় সকলেই এক অভিন্ন জগৎ অনুভব করে। সম্ভবতঃ সেইজন্যই ইহার নাম বৈশ্বানর (বিশ্ব+নর)। তখন ইন্দ্রিয়-সহায় আত্মা শব্দাদি স্থূল বিষয় উপভোগ করে, তখন আত্মার জাগরণ। বৃহৎ আরণ্যক (৪।৩।১৬) এই অবস্থাকে "বুদ্ধান্ত" বলিয়াছেন। "স এষ স্বপ্নে রত্বা চরিত্বা, দৃষ্ট্বা এব পুণ্যং পাপং চ, পুনঃ প্রতিন্যায়ং প্রতিযোন্যা দ্রবতি বুদ্ধান্তায় এব"। তিনি স্বপ্নে সুখ ভোগ করিয়া ও বিচরণ করিয়া পুণ্য-পাপ দর্শন করিয়া প্রতিলোম ক্রমে বুদ্ধান্ত অভিমুখে গমন করেন (অন্ত=স্থান)। স্বপ্ন-স্থানকে তৈজস বলা হইয়াছে, তাহার কারণ বোধ হয় স্বয়ং-জ্যোতি আত্মা তখন স্বকীয় তেজদ্বারা উজ্জ্বলিত হন। এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়-কার্য্য স্তম্ভিত থাকিলেও জাগ্রৎকালে দৃষ্ট বিষয়সকলের বাসনা (সংস্কার, স্মৃতি) মনে উদিত হয়। কঠোপনিষদ্ বলেন, পুরুষই স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের সৃষ্টি করেন (অর্থাৎ জাগ্রৎকালে দৃষ্ট বিষয়সকলের সংস্কার নানা প্রকারে সজ্জিত করিয়া উপভোগ করেন)। সুষুপ্তিতে মনের কার্য্যও বিলীন হয়। তখন আত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়। সুষুপ্তি ও তুরীয় অবস্থার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করিতে গৌড়পাদ বলিয়াছেন, "দ্বৈতস্যাগ্রহণং তুল্যং উভয়োঃ প্রাজ্ঞ-তুর্য্যয়োঃ; বীজনিদ্রাযুতঃ প্রাজ্ঞঃ, সা চ তুর্য্যে ন বিদ্যতে।" (মাণ্ডুক্য কারিকা)। উভয় অবস্থাতেই দ্বৈত জ্ঞানের বিলোপ হয়; কিন্তু প্রাজ্ঞ নিদ্রিত, তুরীয় অবস্থায় নিদ্রা থাকে না। অধ্যাপক ডয়সেন বলেন সুষুপ্তি অবস্থা—is the condition of deep sleep in which a man knows himself to be one with the universe and is therefore without objects to contemplate and consequently without individual consciousness. তখন পুরুষ আপনাকে বিশ্বের সহিত অভিন্ন মনে করে অর্থাৎ আপনাকেই বিশ্ব বলিয়া বোধ করে এবং চিন্তা করিবার কোনও বিষয় তাহার

থাকে না। সুতরাং তাহার ব্যক্তিগত সংবিদ্ তখন থাকে না। তুরীয়-অবস্থা সম্বন্ধে ডয়সেন বলেন "The spiritual subsists alone by itself as a substance undifferentiated, set free from all existing things." তখন আত্মা কেবল নিজের মধ্যে অবস্থিত থাকে—ভেদহীন অদ্বৈতরূপে, যাবতীয় বস্তুর সহিত সম্বন্ধহীন রূপে।

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি অবস্থা সকলেরই সময় বিশেষে হয় (তুরীয় অবস্থা সাধনগম্য)। আমাদের সাধারণ সংবিদ বুদ্ধিদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। বুদ্ধি সকল বস্তুই খণ্ড খণ্ড রূপে দেখে। বুদ্ধিকে অতিক্রম করিতে না পারিলে অদ্বৈত জ্ঞানে পৌঁছিবার উপায় নাই। তুরীয় অবস্থা বুদ্ধির অতীত অবস্থা—Supramental, supra-rational অবস্থা। চিৎস্বরূপ যে "এক" হইতে এই "নানা"-সমন্বিত জগতের উদ্ভব হইয়াছে, যে চিৎস্বরূপ আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধির নিকট নানা খণ্ডে বিভক্ত রূপে প্রতীত হইতেছেন, তাঁহার স্বরূপাবস্থা আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অজ্ঞাত।

উপনিষদে মনোবিজ্ঞান

উপনিষদে মনস্তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক ভাবে আলোচিত না হইলেও মানসিক ব্যাপার-সকলের কিছু কিছু বর্ণনা আছে।

'মনদ্বারা লোকে দর্শন করে, মনদ্বারা শ্রবণ করে। কামনা, সংকল্প, বিচিকিৎসা, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধৃতি, অধৃতি, হ্রী, ভয়, এসকলই মন। এইজন্য কেহ পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করিলে মনদ্বারা জানা যায়' (বৃ-আঃ, ১।৫।৩)।

কঠোপনিষদে ইন্দ্রিয়, মন, মনের বিষয়, বুদ্ধি ও আত্মার কথা আছে। (৩।১০) রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ যিনি জানেন তিনি আত্মা (কঠ ৪।৩)। স্বপ্ন-বিষয় ও জাগরিত-বিষয় আত্মাই অবগত হন (কঠ ৪।৪)। ইন্দ্রিয়গণ বহির্মুখ, সেইজন্য অন্তরাত্মাকে দেখিতে পায় না (কঠ ৪।১)। সূর্য্য অস্তমিত হইলে তাহার রশ্মিসকল যেমন সূর্য্যে একীভূত, এবং সূর্য্য পুনরায় উদিত হইলে তাহারা পুনরায় চারিদিকে বিকীর্ণ হয়, তেমনি নিদ্রিত অবস্থায় ইন্দ্রিয় ও বিষয়গণ মনে একীভূত হয়, সেইজন্য তখন পুরুষ শ্রবণ, দর্শন, আঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ, অভিবাদন, ত্যাগ, গ্রহণ, আনন্দানুভব, মলত্যাগ, গমন কিছুই করেন না (প্রশ্ন ৪।২)। লোকে বলে তখন তিনি নিদ্রিত।

প্রশ্নোপনিষদে পঞ্চভূতের মাত্রা বা মূল উপাদান এবং ইন্দ্রিয়গণ ও তাহাদের

বিষয়ের কথা আছে (৪।৮)। এই ভূতমাত্রাই পরবর্ত্তীকালে "তন্মাত্রা" নামে অভিহিত হইয়াছিল। তাহাই রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ।

ইন্দ্রিয়দিগের ক্রিয়া-সম্বন্ধে কৌষীতকিতে (৩।২) আছে—কেহ কেহ বলেন যে ইন্দ্রিয়গণ একত্ব প্রাপ্ত হয়; নতুবা কেহ এক সঙ্গে বাক্য-দ্বারা নাম জানাইতে, চক্ষুদ্বারা রূপ দেখিতে, কর্ণদ্বারা শব্দ শুনিতে এবং মনদ্বারা চিন্তা করিতে পারিত না। সুতরাং ইন্দ্রিয়গণ একীভূত হইয়া এই সকল কার্য্য করে। যখন বাক্ বাক্য উচ্চারণ করে, তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া বাক্য উচ্চারণ করে। যখন চক্ষু দেখে, তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া দেখে। যখন কর্ণ শোনে, তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া শোনে। যখন মন চিন্তা করে, তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া চিন্তা করে। যখন প্রাণ প্রাণন কার্য্য করে তখন সকল ইন্দ্রিয় তাহার অনুবর্ত্তী হইয়া প্রাণন কার্য্য করে।"

বিষয় ও বিষয়ীর মধ্যে সম্বন্ধের বর্ণনা করিতে কৌষীতকি বলেন বাক্ প্রজ্ঞার এক অংশ দোহন করিয়াছে (অর্থাৎ তাহার এক রূপ প্রকাশ করে)। নাম উহার বহির্দেশে স্থাপিত ভূতমাত্রা। সেইরূপ ঘ্রাণ, চক্ষু, শোত্র, জিহ্বা, হস্তদ্বয়, শরীর, উপস্থ, পাদদ্বয়, বুদ্ধি, প্রজ্ঞার এক এক রূপ প্রকাশ করিতেছে। ঘ্রাণের ভূতমাত্রা গন্ধ, চক্ষুর ভূতমাত্রা রূপ, শ্রোত্রের ভূতমাত্রা শব্দ। জিহ্বার ভূতমাত্রা রস, হস্তদ্বয়ের ভূতমাত্রা কর্ম্ম, শরীরের ভূতমাত্রা সুখ-দুঃখ; উপস্থের ভূতমাত্রা আনন্দ, রতি ও প্রজাতি (সন্তান-সন্ততি), পাদদ্বয়ের ভূতমাত্রা গতি, বুদ্ধির ভূতমাত্রা জ্ঞাতব্য ও কামনাসকল। জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক যাহা যাহা কৃত হয়, সে সকলই প্রজ্ঞাধিষ্ঠিত বলিয়াই সম্ভবপর হয়। প্রজ্ঞাই বক্তা, আখ্যাতা, দ্রষ্টা, শ্রোতা, রস-জ্ঞাতা, সুখ-দুঃখ-জ্ঞাতা, আনন্দ, রতি, প্রজাতি, বিজ্ঞাতা, গন্তা ও মন্তা। ইন্দ্রিয়ের বিষয় ভূতমাত্রাগণ (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এবং নাম, কর্ম্ম, গমন, রতি ও মন্তব্য বিষয়), এবং এই সকল বিষয়ের সংস্পর্শে প্রজ্ঞা যে যে রূপ ধারণ করে, তাহারাই প্রজ্ঞামাত্রা। ভূতমাত্রাগণ প্রজ্ঞাধিষ্ঠিত, প্রজ্ঞামাত্রাগণ ভূতাধিষ্ঠিত। ভূতমাত্রা না থাকিলে প্রজ্ঞামাত্রা থাকিত না, প্রজ্ঞামাত্রা না থাকিলে ভূতমাত্রা থাকিত না। দুই এর মধ্যে কেবলমাত্র একটিতে কোনও রূপ বা বস্তু সম্ভবপর হয় না। অথচ প্রকৃত বস্তু একমাত্র, নানা নহে। যেমন রথনেমিতে অরসকল স্থাপিত এবং অরসকল রথনাভিতে স্থাপিত, তেমনি ভূতমাত্রাসকল প্রজ্ঞামাত্রা-সকলে এবং প্রজ্ঞামাত্রা-সকল প্রাণে স্থাপিত। প্রাণই আনন্দময়, অজ, অমর,

প্রজ্ঞাত্মা। ইহার অর্থ একই প্রজ্ঞাত্মা বিষয়ী ও বিষয়রূপে প্রকাশিত। বিষয়ী ও বিষয় পরস্পর সম্বন্ধ ও অবিনাভাবী।

ঐতরেয় উপনিষদে (৩।২) হৃদয়, মন সংজ্ঞা, অজ্ঞান (কর্তৃভাব), বিজ্ঞান, প্রজ্ঞান, মেধা, দৃষ্টি, ধৃতি, মতি, মনীষা, জুতি (তৎপরতা), স্মৃতি, সঙ্কল্প (সম্যক অবধারণ), ক্রতু (অধ্যবসায়), অসু (প্রাণনাদি), কাম (বিষয়াকাঙ্ক্ষা), বশ (আত্ম-সংযম)—এ সকলকেই প্রজ্ঞানের বিভিন্ন নাম বলা হইয়াছে। এই বিশ্লেষণের মূল্য যাহাই হউক, উপনিষদের সময়েও যে মনের বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা হইয়াছিল, ইহাদ্বারা তাহা প্রমাণিত হয়।

বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়গণ, প্রাণগণ সকলই আত্মাকর্তৃক চালিত হয়। এই আত্মা "আসীনঃ দূরং ব্রজতি, শয়ানো যাতি সর্ব্বতঃ", মহান ও বিভু (সর্ব্বব্যাপী)। আত্মা হৃদয়ের অভ্যন্তরে বাস করেন (বৃ-আর ৫।৬।১। ছা—৮।৩।৩)। তিনি মনোময় জ্যোতিস্বরূপ। ব্রীহি ও যবের ন্যায় সূক্ষ্ম (বৃ-আর)। "তিনি ব্রীহি অপেক্ষা সূক্ষ্ম, যব অপেক্ষা, সর্ষপ অপেক্ষা, শ্যামাক অপেক্ষা, এমন কি শ্যামাক তণ্ডুল অপেক্ষাও সূক্ষ্ম। ইনিই আমার আত্মা, এই হৃদয়ের অভ্যন্তরে। ইনি পৃথিবী অপেক্ষা মহান্, অন্তরীক্ষ অপেক্ষা মহান্, এই সমুদয় লোক অপেক্ষাও মহান্ (ছা—)।" কঠ উপনিষদে আত্মাকে "অঙ্গুষ্ঠমাত্র পুরুষ অন্তরাত্মা" এবং ছান্দোগ্যে "প্রাদেশ মাত্রম্ অভি-বিমানম্" ও বলা হইয়াছে। (প্রাদেশমাত্র = এক "বিঘৎ" পরিমাণ, অথবা দ্যুলোকাদি প্রদেশ যাহার পরিমাণ। অভিবিমান = অতিব্যাপ্ত ও অপরিমেয়)। অশরীরী চিন্ময় আত্মাকে স্থানব্যাপী হৃদয়ে অবস্থিত মনে করা অসংগত বোধ হইতে পারে। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য দার্শনিক দেকার্ত্ত Pineal gland এ আত্মার অবস্থিতি বলিয়াছিলেন। আরিস্টটলের মতে হৃদয় আত্মার অধিষ্ঠান। বস্তুতঃ উপনিষদের ঋষি আত্মাকে স্থূল হইতে স্থূলতর এবং সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর বলিয়াছেন। ইহার অর্থ স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব গুণ তাহাতে আরোপিত হইতে পারে না।

উপনিষদে মন একটি ইন্দ্রিয় এবং অচিৎ। মনের পরে বুদ্ধি, বুদ্ধির পরে মহৎ, মহতের পরে অব্যক্ত, অব্যক্তের পরে পুরুষ। জাগরিত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এবং এই তিনের অতীত তুরীয় অবস্থাপন্ন সংবিদের বর্ণনা বিভিন্ন উপনিষদে আছে। তাহা অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে। বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ যে একই অসঙ্গ (absolute) পুরুষ হইতে অভিব্যক্ত হইয়াছে, সকল

উপনিষদে এই কথা নানা ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "জীবের জ্ঞানময় আত্মা, ইন্দ্রিয়গণ, পঞ্চভূত ও পঞ্চ প্রাণের সহিত অক্ষরে প্রতিষ্ঠিত।" (প্রশ্ন—৪।১১)।

উপনিষদে চরিত্র-নীতি

এক জন পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত * লিখিয়াছেন, উপনিষদের ঋষিগণের চেষ্টা ভাগবত জীবনে প্রবেশ লাভ করিবার জন্য, কিন্তু তাহার উপায় বিশুদ্ধ অনুভূতি, উচ্চ চিন্তা ও অক্লান্ত প্রচেষ্টা নহে, সত্যকে জানিবার জন্য ও সৎপথে চলিবার জন্য অবিরাম প্রযত্নও নহে। মন হইতে সকল অনুভূতি ও চিন্তা বহিষ্কৃত করিয়া শূন্যতা, নিরুৎসাহতা ও নিশ্চেষ্টতার মধ্যে পরমানন্দ-লাভই সেই উপায়। আর এক জন † লিখিয়াছেন, উপনিষদের উদ্দেশ্য জগতের অন্তস্থলে প্রবেশ করিয়া তাহাকে জয় করা নহে, তাহা হইতে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও মুক্ত করা, কঠোরতম বাধার বিরুদ্ধে জীবনকে রক্ষা করিবার জন্য জীবনের শক্তি বৃদ্ধি করা নহে, তাহার খর্ব্বতাসাধন করা, তাহার কাঠিন্যকে কোমল করা, তাহাকে বিশীর্ণ করিয়া গভীর চিন্তায় মগ্ন হওয়া। এই ধারণা ভ্রান্ত। উপনিষদের ঋষিগণ জীবনকে তুচ্ছ বলিয়া মনে করিতেন না এবং তাহা হইতে মুক্ত হইতে চাহিতেন না। তাঁহারা চাহিতেন অনন্ত জীবন—অমৃতত্ব, এবং জীবনকে সংযত করিয়া এই অমৃতত্বলাভ সুগম করিতে। অমৃতত্বলাভের উপায় কর্ম্মত্যাগ নহে, কর্ম্মে অনাসক্ত হওয়া। "কুর্ব্বন্ এব ইহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেৎ শতং সমাঃ এবং ত্বয়ি নান্যথাতোঽস্তি ন কর্ম্ম লিপ্যতে নরে" (ঈশ—২)—এই পৃথিবীতে কর্ম্ম করিতে করিতে শত বৎসর জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করিবে। এই কর্ম্ম অনাসক্ত হইয়া করিলেই কর্ম্ম তোমাতে লিপ্ত হইবে না। অন্য পথ নাই। দেবগণ যখন প্রজাপতির নিকট গিয়া উপদেশ চাহিয়াছিলেন, তখন প্রজাপতি কেবলমাত্র 'দ' অক্ষর তিনবার উচ্চারণ করিয়াছিলেন। তাহার অর্থ দান্ত হও (ইন্দ্রিয়দিগকে দমন কর), দত্ত (দান কর) এবং দয়া কর। প্রজাপতি সংসার ত্যাগ করিবার উপদেশ দান করেন নাই। উপনিষদের ঋষিগণ ঈশ্বরে বিশ্বাস করিতেন, এবং ঈশ্বরদত্ত জীবনের মূল্য বুঝিতেন।

জীবনের উদ্দেশ্য কি, পরমার্থ অথবা পরম-শ্রেয়ঃ কি, তাহার সুস্পষ্ট

---

* Gough (গাফ) † Eucken (অয়কেন)

ধারণাই চরিত্রনীতির ভিত্তি। যে কর্ম্ম এই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সহায়ক, তাহাই সৎ কর্ম্ম; যাহা তাহার পরিপন্থী, তাহা অসৎ কর্ম্ম। ব্রহ্মজ্ঞানই পরমার্থ। কেবল বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞান নহে, ব্রহ্মের অনুভূতি, তাহার সাক্ষাৎকার, সর্ব্বত্র সর্ব্বদা তাহাকে দর্শনই ব্রহ্মজ্ঞান। যাহা হইতে এই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, তাহার অনুষ্ঠান সুনীতি (Morality)। "দ" (দম, দান ও দয়া) এই জন্য সুনীতিসম্মত। তৈত্তিরীয় উপনিষদে গুরু শিষ্যকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা এই,—"সত্যং বদ, ধর্ম্মং চর (সত্য বলিবে, ধর্ম্মাচরণ করিবে), স্বাধ্যায়াৎ মা প্রমদ (বেদাধ্যয়নে ঔদাস্য করিবে না)। প্রজা-তন্তুং মা ব্যবচ্ছেৎসীঃ (সন্তানসূত্র কর্ত্তন করিবে না, অর্থাৎ গৃহস্থ হইয়া সন্তান উৎপাদন করিবে); সত্যাৎ ন প্রমদিতব্যম্ ধর্ম্মাৎ ন প্রমদিতব্যম্ (সত্য ও ধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইবে না)। কুশলাৎ ন প্রমদিতব্যম্, ভূত্যৈ ন প্রমদিতব্যম্, স্বাধ্যায়-প্রবচনাভ্যাম্ ন প্রমদিতব্যম্ (কুশল, অর্থাৎ আত্মরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় কর্ম্ম, ভূতি অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্তিজনক কর্ম্ম, বেদ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা,—এই সকলে অবহেলা করিবে না)। মাতৃদেবো ভব, পিতৃদেবো ভব, আচার্য্যদেবো ভব, অতিথি-দেবো ভব (মাতাকে, পিতাকে, আচার্য্যকে, অতিথিকে দেবতাবৎ পূজা করিবে), দেবপিতৃকার্য্যাভ্যাং ন প্রমদিতব্যং (দেব ও পিতৃ কার্য্যে ঔদাস্য করিবে না)। ···শ্রদ্ধয়া দেয়ম্, অশ্রদ্ধয়া অদেয়ম্, শ্রিয়া দেয়ম্, হ্রিয়া দেয়ম্, ভিয়া দেয়ম্, সংবিদা দেয়ম্ (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক দান করিবে, অশ্রদ্ধায় দান করিবে না, বুদ্ধিপূর্ব্বক দান করিবে, লজ্জার সহিত দান করিবে, ভয়ের সহিত দান করিবে, মৈত্রীভাবের সহিত দান করিবে)"। এ সকলই সুনীতি-সংগত কর্ম্ম। ইহার পরে গুরু বলিতেছেন "যদি কর্ম্ম ও আচার বিষয়ে বিচিকিৎসা (সংশয়) হয়, তাহা হইলে বিচারক্ষম, অক্রূরমতি, ধর্ম্মকাম, স্বাধীনমতি ব্রাহ্মণ যেরূপ আচরণ করেন, সেইরূপ করিবে।" ইহা জীবনকে তুচ্ছ করা নহে, জীবনকে সৌন্দর্য্যে সমৃদ্ধ করিবার উপদেশ। ঐ উপনিষদের অন্যত্র (১।৪) এই প্রার্থনা আছে—"আমি যেন অমৃতত্বের (ব্রহ্মজ্ঞানের) ধারয়িতা হই। আমার শরীর যেন বিচক্ষণ অর্থাৎ যোগ্য হয়; আমার রসনা মধুরভাষিণী হউক, আমি যেন কর্ণদ্বারা বহু শ্রবণ করি। ······আমি যেন লোকে যশস্বী ও ধনবান্ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হই ইত্যাদি।" ইহাও জীবনের প্রতি অশ্রদ্ধার পরিচায়ক নহে।

মানবের মধ্যে যে সম্ভাবনা আছে, তাহার বাস্তবতা-বিধান চরিত্রনীতির আদর্শ। প্রজ্ঞা যদিও প্রকৃতির মধ্যে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান, তথাপি মানুষই কেবল

ইহার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সচেতন। জড়জগতে ও ইতর প্রাণীর মধ্যে প্রজ্ঞা আত্ম-সংবিদ-সমন্বিত নহে। তাই ইতর জীবের পক্ষে ন্যায়ান্যায়, কর্ত্তব্য-অকর্ত্তব্য বলিয়া কিছু নাই। তাঁহারা তাহাদের প্রকৃতিদত্ত প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হয়, এবং তাহাদ্বারাই আত্মরক্ষা করে এবং জীবনের আনন্দ উপভোগ করে। মানুষ তাহার মধ্যে প্রজ্ঞার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেতন। মানুষ জানে যে তাহার মধ্যে প্রকৃতি অপেক্ষা মহত্তর কিছু আছে। এই জ্ঞান আছে বলিয়া মানুষ আপনাকে প্রকৃতির উর্দ্ধে তুলিতে চায়, এবং তাহার জীবন যে অর্থ ও উদ্দেশ্যহীন নহে, তাহা বুঝিতে পারে। এই জন্য সুখকেই জীবনের লক্ষ্য করিয়া যখন আমরা কর্ম্ম করি, তখন আমরা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হইতে বিচ্যুত হই, এবং সে সুখও আমাদের সম্পূর্ণ অধিগত হয় না। পশুগণ তাহাদের সহজাত সংস্কারকর্ত্তৃক চালিত হয়। মানুষের মধ্যে প্রজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও তাহার বুদ্ধি যদি পশুগণ তাহাদের সংস্কারের যে ভাবে ব্যবহার করে সেই ভাবেই ব্যবহৃত হয়, তাহা হইলে তাহার জীবন ও পশুর জীবনের মধ্যে ভেদ থাকে না। অসুরাধিপতি বিরোচন ও ইন্দ্র উভয়েই প্রজাপতির নিকট উপদেশের জন্য গিয়াছিলেন। বিরোচন বুঝিয়া আসিলেন, যে দেহই আত্মা এবং তাহারই উপাসনা কর্ত্তব্য। যে মানুষ কেবল দেহেরই উপাসনা করে, দেহাতীত আত্মার জন্য কিছু করে না, সে বিরোচনের শিষ্য ও আসুরিক-ভাবাপন্ন। এতাদৃশ লোকের জীবনের কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য নাই, সে তাহার সাময়িক প্রবৃত্তির দাস। বিভিন্ন কামনার পরিতৃপ্তির উদ্দেশ্যে যে ইতস্ততঃ ধাবমান, তাহার জীবন বিচ্ছিন্ন ঘটনা-পরম্পরার সমষ্টিমাত্র। তাহার জীবনের ঐক্য-বিধায়ক কোনও উদ্দেশ্য নাই। সমগ্র জীবন যদি এক লক্ষ্যদ্বারা পরিচালিত হয়, তাহা হইলেই জীবনে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্যাণ্টের "অনুল্লঙ্ঘনীয় আদেশ" (Categorical imperative) এই ঐক্যবিধায়ক সূত্র। "এমন ভাবে কর্ম্ম কর, যে তোমার ইচ্ছা যে নীতি (maxim) অনুসরণ করে, তাহা সকলেরই অবলম্বন-যোগ্য হয়, অথবা তোমার নীতি যদি সকলেই অবলম্বন করে, তাহা হইলে বিরোধের উৎপত্তি না হয়।" ইহাই "অনুল্লঙ্ঘনীয় আদেশ।" এই আদেশ প্রত্যেক মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিতে ধ্বনিত হয়। "পরের জন্য চাহিব সুখ, নিজের জন্য চাহিব পূর্ণতা" (perfection)। "মানবাত্মাকে সাধনরূপে (as a means) গণ্য না করিয়া উদ্দেশ্য (end) রূপে গ্রহণ কর, এবং তদনুসারে কর্ম্ম কর," ইহাও অনুল্লঙ্ঘনীয় আদেশের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু কেন এই নীতি অবলম্বন করিব? ক্যাণ্ট বলেন, এই আদেশ আমরা অন্তরের

মধ্যে প্রাপ্ত হই। কিন্তু উপনিষদ্ বলেন তোমার মধ্যে ও অন্যান্য মানুষের মধ্যে একই আত্মা প্রকাশিত। যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন, "পত্নী পতিকে কামনা করে বলিয়া পতি প্রিয় হয় না; পতি জায়াকে কামনা করে বলিয়া জায়া পতির প্রিয় হয় না; পুত্র, বিত্ত, পশু প্রভৃতি লোকে কামনা করে বলিয়া তাহারা লোকের প্রিয় হয় না। পতি, জায়া, পুত্র, বিত্ত, পশু প্রভৃতি সকলের মধ্যেই আত্মা বর্ত্তমান। এই আত্মাকেই লোকে কামনা করে বলিয়া এই সকল প্রিয় হয়। মানব-সমাজ পরমাত্মারই অঙ্গ। সুতরাং "যিনি যাবতীয় ভূত আপনার মধ্যে দেখিতে পান এবং আপনাকে সকল ভূতে দেখিতে পান, তিনি কাহাকেও ঘৃণা করেন না।" (ঈশ ৬) "যখন জ্ঞানীর নিকট সকল ভূতই নিজ আত্মা বলিয়া পরিগণিত হয়, তখন এই একত্বদর্শীর শোক, মোহ কিছু থাকে না।" (ঈশ—৭) সমগ্র বিশ্বে ও যাবতীয় জীবে আত্মার এই একত্বই উপনিষদের চরিত্রনীতির সুদৃঢ় ভিত্তি। যে জীবন প্রজ্ঞাকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত, তাহাতে প্রত্যেক কর্ম্মই প্রজ্ঞাকর্ত্তৃক বিবেচিত হয়, এবং পরমার্থ-সাধনে তাহার যদি কার্য্যকারিতা থাকে মনে হয়, তবেই তাহা কৃত হয়। যিনি আপনার ব্যক্তিগত স্বার্থ সমাজের স্বার্থের অধীনতায় স্থাপন করেন, তিনিই সৎ লোক। আমিত্বের প্রসারদ্বারা সমাজের স্বার্থের সহিত ব্যক্তিগত স্বার্থের একত্ব-বোধ হইতে সমবেদনার উদ্ভব হয়। সমবেদনা ব্যক্তির সহিত সমাজের অভিন্নতার প্রকাশক। সমাজ ভূমারই অংশ; অল্পে সুখ নাই। ভূমাই সুখ-স্বরূপ। ভূমার সুখ-প্রাপ্তি যাহার লক্ষ্য, সে পরের অনিষ্ট করিয়া আপনার সুখ চাহে না।

উপনিষদের ঋষিদিগের মধ্যে অনেকেই গৃহস্থ ছিলেন। বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস বিহিত হইয়াছিল গৃহস্থাশ্রম পালন করিবার পরে। গৃহস্থাশ্রম যথারীতি পালন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট অংশ পরমার্থ-চিন্তায় অতিবাহিত করিবার বিধি ছিল। ইহাদ্বারা ঋষিগণ যে জীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, তাহা প্রমাণিত হয় না।

উপনিষদের ঋষিগণ বিশুদ্ধ অনুভূতি, গভীর চিন্তা ও কঠোর প্রচেষ্টা এবং সত্যকে জানিবার জন্য ও সৎপথে চলিবার জন্য অবিরাম প্রযত্নদ্বারা ভাগবত জীবন লাভের জন্য চেষ্টা করেন নাই, গফের এই উক্তির কোনও ভিত্তি নাই। সত্যকে জানিবার জন্য ও বিশুদ্ধ অনুভূতি-লাভের জন্য প্রচেষ্টা এবং গভীর চিন্তা ও সৎপথে চলিবার জন্য ঐকান্তিক উদ্যম উপনিষদের সর্ব্বত্র পরিস্ফুট। যাহাকে গফ্ মনকে নিশ্চল ও শূন্য করা বলিয়াছেন,

তাহা অন্য সকল বিষয় বর্জন করিয়া ব্রহ্মে প্রগাঢ় মনসংযোগ (নিদিধ্যাসন)। অয়কেনের মন্তব্যও সমর্থনযোগ্য নহে। জগতের স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইবার জন্য ঐকান্তিক চেষ্টা উপনিষদের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। জগতের স্বরূপ অবগত হইয়া প্রকৃতির শক্তির উপর জয়লাভদ্বারাই জীবনের শক্তিবৃদ্ধি করা সম্ভবপর। তাহাদ্বারা জীবনের খর্ব্বতা হয় না। উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির দমনদ্বারা জীবন বিশীর্ণ হইয়া বিনষ্ট হয় না, তাহার অসুন্দর অংশ হইতে মুক্ত হইয়া সুষমা-মণ্ডিত হয়।

ব্রহ্মজ্ঞান ও তৎসঙ্গে ভূমার আনন্দলাভই জীবনের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া উপনিষদে মানুষের কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। সত্যকথন পরম ধর্ম্ম। দম, দান ও দয়া সমস্ত কর্ত্তব্যের শীর্ষস্থানীয়। "ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ; মা গৃধঃ কস্যস্বিৎ ধনম্।" ঈশকর্ত্তৃক দত্ত দ্রব্য ভোগ করিবে, অন্যের ধনে লোভ করিবে না। "তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসা" (বৃঃ আ ৪।৪।২২)। বেদপাঠ, যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদ্বারা ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বেশ্বর ভূতাধিপতিকে জানিতে ইচ্ছা করেন।

উপনিষদের ঋষিগণ জন্মমৃত্যু-চক্র হইতে উদ্ধার পাইবার জন্য ব্যাকুল। জন্মমৃত্যু হইতে মুক্তিকেই তাঁহারা অমৃতত্ব বলিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাই এই মুক্তি সাধিত হয়। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের জন্যে যেরূপ আচরণ প্রয়োজনীয়, তাহাই সৎ কর্ম্ম, তাহার বিরোধী কর্ম্ম অসৎ। "ইষ্টাপূর্ত্ত" (যজ্ঞ ও লোক-হিতকর বাপী, কূপ, তড়াগাদি খনন) সৎ কর্ম্ম, কিন্তু কেবল ইষ্টাপূর্ত্তদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না। ইষ্টাপূর্ত্ত স্বর্গপ্রাপ্তির সাধন, ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধন নহে। কিন্তু তাহারাও মূল্যহীন নহে। তদ্বারা চিত্তের বিশুদ্ধি হয়। ক্রিয়াবান্ শ্রোত্রিয় (বেদজ্ঞ) ব্রহ্মনিষ্ঠ যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ হইয়া একর্ষিনামক অগ্নিতে আহুতি দান করেন, তাহাদিগকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিবে (মুণ্ডক ৩।২।১০)। যে দুষ্ট আচরণ হইতে বিরত হয় নাই, যাহার চিত্তে ইন্দ্রিয়-লালসার নিবৃত্তি হয় নাই, যাহার মন অসমাহিত এবং বিক্ষিপ্ত, সে জ্ঞানদ্বারাও আত্মাকে প্রাপ্ত হয় না। (কঠ ১।২।২৪)। শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি হয়, মন শান্ত হয়, ইন্দ্রিয়-লালসা বিদূরিত হয়, ব্রহ্মজ্ঞান-লাভ সুগম হয়। সুতরাং ইষ্টাপূর্ত্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু অমৃতত্ব-লাভের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তাহার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন।

উপনিষদে যাগ-যজ্ঞ অর্থে "কর্ম্ম" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে এবং লোকের সহিত ব্যবহার বা আচরণকে "চরণ" বলা হইয়াছে। "যাহাদের চরণ রমণীয়, তাহারা রমণীয় যোনি এবং যাহাদের চরণ কপূয় (অশুভ), তাহারা কপূয়

যোনি প্রাপ্ত হয়।" (ছান্দোগ্য)। ইহজন্মে কৃত সৎ ও অসৎ কর্ম্মের ফল পরজন্মে ভোগ করিতে হয়। এই জন্মান্তরবাদকে উপনিষদের চরিত্রনীতির একটি স্তম্ভ বলা যায়। সৎ কর্ম্ম করিব কেন? অসৎ কর্ম্ম হইতে যদি আমার সুখ হয়, তবে তাহা হইতে বিরত হইব কেন? উত্তর—বিরত না হইলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে না। কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানের জন্য সকলে লালায়িত নহে। যাহারা লালায়িত নহে তাহাদের প্রশ্নের উত্তর—পাপ হইতে বিরত না হইলে পরলোকে অশুভ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিতে হইবে। তাহাদের নিকট সুনীতির ইহাই ভিত্তি (sanction.)

Keith তাঁহার Religion and Philosophy of the Upanishads গ্রন্থে বলিয়াছেন, উপনিষদের ত্রুটি এই যে, তাহাদের মতে পরিণামে সুনীতি অর্থহীন হইয়া পড়ে, তাহার কোনও মূল্যই থাকে না।" Dr. R. E. Hume তাঁহার The Thirteen Principal Upanishads গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বেদান্তের মতে "উপাসনা, যাগযজ্ঞ অথবা রমণীয় আচরণ ইহজন্মে ধর্ম্মের জন্য অথবা পরলোকে মুক্তির জন্য প্রয়োজনীয় নহে।" ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত তাঁহার "ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে" লিখিয়াছেন, "উপনিষদে কোনও কর্ম্মের বিধি নাই। চরম সত্য এবং সৎ বস্তু কি তাহাই উপনিষদে ব্যক্ত হইয়াছে।" ডাঃ দাসগুপ্তের উক্তি যে ঠিক নহে, তাহা তৈত্তিরীয় উপনিষৎ হইতে পূর্ব্বে উদ্ধৃত বচনদ্বারাই প্রমাণিত হয়। "সত্যং বদ, ধর্ম্মং চর, মাতৃদেবো ভব" প্রভৃতি উপদেশদ্বারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম আদিষ্ট হইয়াছে। বৃহদারণ্যকেও "দান্ত হও, দান কর, দয়া কর" এই উপদেশদ্বারা কর্ম্মের বিধি দেওয়া হইয়াছে। Keith-এর মন্তব্যের ভিত্তি মায়াবাদ। জগৎ যদি মিথ্যাই হয়, তাহা হইলে সুনীতি ও দুর্নীতি উভয়ই মিথ্যা। কিন্তু যিনি মায়াবাদের প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া খ্যাত, সেই শঙ্করাচার্য্যও বলিয়াছেন "প্রাক্ ব্রহ্মাত্ম-প্রতিবোধাৎ নিয়মেন অনুষ্ঠেয়ানি শ্রৌত-স্মার্ত্তানি কর্ম্মাণি" (শঙ্করভাষ্য-তৈত্তিরীয় উপনিষৎ ১।১১।১)। ব্রহ্মাত্মবোধ জন্মিবার পূর্ব্বে শ্রৌত ও স্মার্ত্ত-কর্ম্ম সকল অনুষ্ঠেয়। ব্রহ্মলাভ হইবার পরে জগৎই ব্রহ্মময় হইয়া যায়। তখন সুনীতি দুর্নীতি কিছুই থাকে না, ইহা সত্য। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে সৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে ব্রহ্মাত্মবোধই যে হইবে না। ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, মায়াবাদই উপনিষদের এক মাত্র ব্যাখ্যা নহে। রামানুজ এবং অন্যান্য ভাষ্যকার জগতের সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। কিন্তু এই জ্ঞান কেবল শাস্ত্রপাঠ

অথবা গুরুপদেশ অথবা মেধাদ্বারা লাভ করা যায় না। চিত্তশুদ্ধি না হইলে এই জ্ঞান-লাভ হয় না। চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে। ব্রহ্ম জিজ্ঞাসার পূর্ব্বে "শমদমাদি সাধন-সম্পদের" প্রয়োজনীয়তা শঙ্কর তাঁহার বেদান্তভায়্যের প্রথমেই স্বীকার করিয়াছেন। সুতরাং উপনিষদে সুনীতির স্থান নাই, এই উক্তি অজ্ঞতা-প্রসূত।

ডাঃ হিউম আরও লিখিয়াছেন, "গ্রীক পণ্ডিতেরা বলিতেন যাহার জ্ঞান আছে, সেই জ্ঞানের জন্যই তিনি ধর্ম্মশীল হন। শিক্ষার ফল ধার্ম্মিক চরিত্র-লাভ। এই মতের সহিত উপনিষদের মতের বিস্তর প্রভেদ। উপনিষদের মতে এক প্রকার তাত্ত্বিক জ্ঞান (Some metaphysical knowledge) লাভ হইলে অতীতের সমস্ত পাপের ধ্বংস হয় এবং যিনি এই জ্ঞান লাভ করেন, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বের মতো গুরুতর অসৎ কর্ম্মে লিপ্ত থাকিতেও বাধা নাই; যদিও এইরূপ কর্ম্ম ভাষণ পাপ এবং যাহারা এই জ্ঞান লাভ করে নাই, তাহাদের উপর ইহার ফল অমঙ্গলকর। এইরূপ কর্ম্মের জন্য তাহাকে শাস্তি ভোগ করিতে হয় না।" এই মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিবার সময় ইহা ডাঃ হিউমের মনে হয় নাই যে, যে তাত্ত্বিক জ্ঞানের কথা তিনি বলিয়াছেন, যাহার লাভ হইলে পূর্ব্বকৃত পাপের ধ্বংস হয়, সে জ্ঞান যিনি লাভ করেন, তাহার পক্ষে অসৎ কর্ম্ম করা সম্ভবপর নহে। সেই জ্ঞান বুদ্ধিদ্বারা লভ্য নহে। তাহা সাক্ষাৎকার—বিশ্বের এবং জীবের অন্তরে অধিষ্ঠিত পরমাত্মার সাক্ষাৎকার। তাহা যখন লাভ করা যায়, তখন হৃদয়াশ্রিত সকল কামনা বিলুপ্ত হয়, তখন মর্ত্ত্য অমর হয়, তখন ইহলোকেই ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। (কঠ ২।৩।১৪)। মানুষের প্রকৃতির সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন না হইলে এই সাক্ষাৎকার সম্ভবপর হয় না। এই অবস্থায় পুরুষ প্রাজ্ঞ আত্মাকর্ত্তৃক আলিঙ্গিত হন। "তখন স্তেন (চোর) অস্তেন (অ-চোর) হয়, ভ্রূণহা অভ্রূণহা হয়। তখন পুণ্য ও পাপ ইহার অনুগমন করে না" (বৃঃ আ ৪।৩।২১।২২)।

ক্যাণ্ট বলিয়াছিলেন যে, যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য, তাহা কেবল অনিচ্ছাপূর্ব্বকই কৃত হইতে পারে। ইহার অর্থ এই যে, যে কর্ম্ম করিয়া সুখলাভ হয়, তাহার কোনও নৈতিক মূল্য নাই। কর্ত্তব্য কর্ম্ম যখন ইচ্ছার গতির বিরোধী হইলেও কৃত হয়, তখনই তাহার নৈতিক মূল্য থাকে। অধিকাংশ লোকের মনেই তাহাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি ও কর্ত্তব্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব বর্ত্তমান। তাহাদিগকে প্রবৃত্তির সহিত সংগ্রাম করিয়াই কর্ত্তব্য সম্পাদন করিতে হয়। কিন্তু এই

দ্বন্দ্বের অতীত হওয়া সাধ্যায়ত্ত। অনেকে এই দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া মনের স্থৈর্য্য ও শান্তি লাভ করিয়াছেন। কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাঁহাদের পক্ষে স্বাভাবিক। তাঁহাদের যাবতীয় কর্ম্ম জীবনের উদ্দেশ্যের সহিত সমঞ্জস ভাবে নির্দ্বন্দ্বে অনুষ্ঠিত হয়। সুনীতির নিয়ম তাঁহাদের উপর স্থাপিত বাহ্য নিয়ম নহে। তাহা তাঁহাদের সত্তার নিয়মে পরিণত। তাহার বিপরীত কর্ম্ম তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব। ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিলে এই অবস্থাই হয়। ব্রহ্মজ্ঞানীর কর্ম্মের ফল অন্যের পক্ষে অমঙ্গলকর হইবার আশঙ্কা নাই। পাপ তাঁহাদের অনুসরণ করে না। কেননা তাঁহাদের কর্ম্ম যদিও তাঁহাদের স্বাধীন ইচ্ছা হইতে উদ্ভূত, তথাপি এই ইচ্ছার স্বাধীনতা তাঁহাদিগকে অধর্ম্মের পথে লইয়া যায় না। সুনীতি তাঁহাদের ইচ্ছার নিয়মে পরিণত হয় বলিয়া তাঁহাদের কর্ম্ম সুনীতিদ্বারা স্বভাবতই চালিত হয় এবং সুনীতি প্রেমের মধ্যে পরিণতি লাভ করে। তাঁহাদের নিকট "উচিত" (ought) শব্দ অর্থহীন, কেননা তাঁহাদের ইচ্ছা সর্ব্বদাই যাহা উচিত তাহার সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত। সুনীতির নিয়ম-সমূহে তাঁহাদের ইচ্ছার স্বরূপই প্রকাশিত। সুতরাং তাঁহাদের ইচ্ছা সুনীতির নিয়মের উর্দ্ধে, সুনীতির নিয়মের স্রষ্টা।

উপনিষদে ব্রাহ্মণেতর জাতির প্রভাব

উপনিষৎ যুগের পূর্ব্বেই ভারতীয় আর্য্য সমাজে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঋগ্বেদীয় পুরুষ সূক্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র বিরাট পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গরূপে বর্ণিত হইয়াছে। বেদের ঋষিদিগের মধ্যে কেহ কেহ অব্রাহ্মণ ছিলেন। উপনিষদে কয়েক জন ব্রহ্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ আছে, এবং তাঁহাদের নিকট ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের জন্য ব্রাহ্মণগণ যে যাইতেন, তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে জার্মাণ পণ্ডিত গার্বে মনে করেন, যে ব্রহ্ম-বিদ্যার উদ্ভব হইয়াছিল ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে। কিন্তু এই মতের পক্ষে যথেষ্ট যুক্তির অভাব আছে। উপনিষৎ যুগে এবং তাহার পূর্ব্বেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির অধিকার সমান ছিল এবং বেদপাঠ এই তিন জাতিভুক্ত সকলেরই—প্রত্যেক আর্য্য সন্তানেরই—অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। সুতরাং ব্রহ্মজ্ঞান প্রথমে ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছিল, এই প্রশ্ন অবান্তর। গার্বে তাহার মতের সমর্থনের জন্য যে কয়েকটি উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাদ্বারা ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে ব্রহ্ম-জ্ঞানের উদ্ভব হয় নাই, ইহা প্রমাণিত হয় না। গার্বে বালাকি-অজাতশত্রু

সংবাদ, শ্বেতকেতু (আরুণি) ও প্রবাহন সংবাদ এবং আরুণি-অশ্বপতি-কৈকেয় সংবাদের উল্লেখ করিয়াছেন। বালাকি নামে বিদ্যাগর্বিত ব্রাহ্মণযুবক রাজা অজাতশত্রুর নিকট গিয়া বলিলেন "আমি আপনাকে ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দিব।" কিন্তু অজাতশত্রু তাঁহার উপদেশ সন্তোষজনক বলিয়া গ্রহণ না করায়, তিনিই তাঁহার নিকট ব্রহ্মজ্ঞান যাচ্ঞা করিলেন। অজাতশত্রু বলিলেন "ক্ষত্রিয় হইয়া আমি ব্রাহ্মণকে শিক্ষা দিব, ইহা প্রতিলোম অর্থাৎ বিপরীত রীতি হইলেও আমি আপনাকে শিক্ষা দিব।" পরে তিনি বালাকিকে ব্রহ্মোপদেশ দিয়াছিলেন। (বৃহদ্‌আরণ্যক ২।১)। এই আখ্যায়িকাদ্বারা এই মাত্র প্রমাণিত হয় যে যদিও ক্ষত্রিয়েরাই সাধারণতঃ ব্রাহ্মণদিগের নিকট শিক্ষালাভ করিতেন, তথাপি একজন ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়ের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রবাহন-শ্বেতকেতু সংবাদে বর্ণিত আছে যে প্রবাহণ আরুণিকে জন্মান্তর বাদ, দেবযান ও পিতৃযান-সম্বন্ধেই উপদেশ দিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন "এই বিদ্যা ইহার পূর্ব্বে কোনও ব্রাহ্মণে অবস্থিতি করে নাই" (ইয়ং বিদ্যা ইতঃ পূর্ব্বং ন কস্মিন্ চন ব্রাহ্মণে উবাস) (বৃহঃ আরঃ ৬।২)। কিন্তু ইহা ব্রহ্ম-বিদ্যা নহে। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে জন্মান্তরবাদ, দেবযান ও পিতৃযানবাদ ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যেই উদ্ভূত হইয়াছিল। আরুণি অশ্বপতির উদাহরণে (ছান্দোগ্য ৫।১১) অশ্বপতি আরুণিকে বৈশ্বানর-সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন, ব্রহ্মবিদ্যা-সম্বন্ধে নহে। উপনিষদে বর্ণিত আখ্যায়িকাগুলিদ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রাচীন কালে ক্ষত্রিয় সন্তান এবং স্ত্রীলোকেও দর্শনালোচনায় যোগদান করিতেন এবং জ্ঞান লাভের জন্য ব্রাহ্মণ-সন্তান ক্ষত্রিয়ের নিকটও গমন করিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণ সকলেই এক আর্য্যজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। ইহাদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ অন্য দুই জাতি অপেক্ষা অধিকতর বিদ্যানুশীলন করিতেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যদিগের মধ্যেও বিদ্যানুরাগী ব্যক্তির অভাব ছিল না, এবং তাহাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞ হইতেন, তাঁহাদের নিকট শিক্ষালাভের জন্য ব্রাহ্মণগণও যাইতেন। ইহাতে ব্রাহ্মণদিগের অগৌরবের কিছু নাই। সত্যকাম জাবাল শূদ্রাণীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা অবগত হইয়াও মহর্ষি গৌতম তাহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সত্যকাম জাবালই পরে ব্রহ্মোপদেশ দিয়াছিলেন। তখন তিনি ব্রাহ্মণ এবং ঋষি হইয়াছিলেন।

উপনিষদে উল্লিখিত ব্রহ্মবিদ্ ঋষিগণের মধ্যে যাজ্ঞবল্ক্যই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। তৈত্তিরীয় উপনিষদে

যিনি ভৃগুকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেশ করিয়াছিলেন, সেই বরুণ যে ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাহা সন্দেহ করিবার কারণ নাই। উপনিষদের অধিকাংশ ঋষিই ব্রাহ্মণ ছিলেন। গার্গী বাচক্নবীকে (বাচক্নু ঋষির কন্যা) যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন "যে অক্ষরকে জানিয়া ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সে ব্রাহ্মণ।" কহোলকে যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছিলেন "ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকে অবগত হইয়া পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা এবং লোকৈষণা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি আচরণ করেন।" এই ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয়ের নিকট প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা উপনিষদে নাই। অজাতশত্রু দাম্ভিক বালাকির ব্রহ্মজ্ঞান যে অসম্পূর্ণ, তাহা দেখাইয়া দিয়াছিলেন। ইহা হইতে ব্রহ্মবিদ্যা ব্রাহ্মণের মধ্যে উদ্ভূত হয় নাই, ইহা কল্পনা করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

তৃতীয় অধ্যায়

মহাকাব্যের যুগ

বৈদিক যুগের পরবর্ত্তী যুগে রামায়ণ ও মহাভারত রচিত হয় বলিয়া এই যুগকে মহাকাব্যের যুগ বলা হয়। রামায়ণ ও মহাভারতে বর্ণিত ঘটনাবলী যদিও ইহার বহু পূর্ব্বেই সংঘটিত হইয়াছিল তথাপি তাহাদের রচনা এই যুগেই হইয়াছিল। এই যুগ খৃষ্ট পূর্ব্ব ৬০০ অব্দ হইতে খৃষ্টীয় ২০০ অব্দ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগে শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ ও অন্যান্য অনেক উপনিষৎ রচিত হইয়াছিল। চার্বাক দর্শন এই যুগেই প্রচারিত হইয়াছিল। বুদ্ধের দর্শন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম এবং জৈন ধর্ম্মও এই যুগেই আবির্ভূত হয়। ষড়দর্শনের বীজও এই যুগে অঙ্কুরিত হইয়াছিল, যদিও তাহাদের পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল পরবর্ত্তী সূত্র যুগে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ঈশ্বরবাদও এই যুগেই প্রচারিত হয়। এতদ্ব্যতীত পাঞ্চরাত্র দর্শন ও শৈব দর্শনও এই যুগেই উদ্ভূত হইয়াছিল। বৌদ্ধ ধর্ম্মের মহাযান সম্প্রদায়ের আবির্ভাবও এই যুগে হয়।

ঐতিহাসিকগণ ভারতের প্রাচীন ইতিহাসকে সাধারণতঃ চারি যুগে বিভক্ত করিয়াছেন—বৈদিক যুগ, মহাকাব্যের যুগ, বৌদ্ধ যুগ ও পৌরাণিক যুগ। দর্শনের দৃষ্টিকোণ হইতে বৈদিক যুগকে তিনভাগে বিভক্ত করা যায়—সংহিতা যুগ, ব্রাহ্মণ যুগ এবং আরণ্যক-উপনিষদ যুগ। কিন্তু বৈদিক যুগের শেষভাগে দার্শনিক চিন্তা যে কেবল উপনিষদের খাতেই প্রবাহিত ছিল, তাহা মনে

করিলে ভুল হইবে। উপনিষদদিগের মধ্যেই অন্যবিধ চিন্তার অস্তিত্বের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রাচীনতম উপনিষদদিগের অন্যতম। তাহাতে প্রজাপতি- ও ইন্দ্রবিরোচন সংবাদে আসুরী উপনিষদের বর্ণনা আছে। এই উপনিষদ্ অনুসারে দেহের পূজা ও পরিচর্য্যাই ইহলোক ও পরলোকে শ্রেয়োলাভের উপায়। কঠোপনিষদে যাহারা কেবল ইহলোকের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে এবং পরলোক মানে না, তাহাদের কথা আছে (২।৬)। বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্রের অন্তর্গত ব্রহ্মজাল সূত্রে ৬২ প্রকার দার্শনিক মতের উল্লেখ আছে। বুদ্ধ নিজে এই সকল মতের উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং বুদ্ধের আবির্ভাবকালে এই সকল মত প্রচলিত ছিল। খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দী বুদ্ধের আবির্ভাব কাল। মাক্ষমূলারের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ৭০০ বৎসর হইতে উপনিষদ যুগের আরম্ভ। কিন্তু এ সম্বন্ধে মতভেদের অবকাশ আছে।

ডাঃ রাধাকৃষণ বলেন, আর্য্যগণ যখন গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসতি স্থাপন করিতেছিলেন, তখনই মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়, এবং এই সময়েই চতুর্ব্বেদের মন্ত্রগুলি শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে সংকলিত হয়। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এই সংকলনকার্য্য সম্পাদন করেন বলিয়া কথিত আছে। এই জন্যই তাঁহার নাম বেদব্যাস। দুর্য্যোধনের পিতা ধৃতরাষ্ট্র ব্যাসের ক্ষেত্রজ পুত্র বলিয়া মহাভারতে লিখিত হইয়াছে। এই ব্যাসই আবার মহাভারতের রচয়িতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সুতরাং কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ ও মহাভারতের রচনার মধ্যে দীর্ঘকালের ব্যবধান অসম্ভব। কিন্তু ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের মতে খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে মহাভারত রচিত হইয়াছিল, তাহার কোনও প্রমাণ নাই।

স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁহার কৃষ্ণচরিত্রে প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন যে আনুমানিক খৃষ্টপূর্ব্ব ১৪৩০ অব্দে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হয়। তাহা হইলে ঐ শতাব্দীতেই—খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীতে—মহাভারত রচিত হইয়াছিল বলিতে হয়। এই মতের সহিত পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদিগের মতের মিল নাই। এই মত সত্য হইলে বৈদিক যুগকে মহাকাব্যের যুগের (খৃঃ পূঃ পঞ্চদশ শতাব্দীর) কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে স্থাপন করিতে হয়। সে যাহা হউক, মহাকাব্যের যুগ যে সূত্রযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই এবং এই যুগে যে উপনিষদ-দর্শন ব্যতীত আরও বহু দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল, তাহাও নিশ্চিত। কিন্তু এই সকল দার্শনিক মত তখন মুখেমুখেই চলিত ছিল, লিপিবদ্ধ হয় নাই। ইহাদের মধ্যে প্রধান মতগুলি পরে সূত্রাকারে রক্ষিত হয়।

সেই অতি প্রাচীন যুগে ভারতবর্ষে দার্শনিক চিন্তার এতাদৃশ প্রবৃদ্ধির কারণ

কি ? আর্য্যদিগের মধ্যে জগৎ-তত্ত্ব আবিষ্কারের জন্য এই ঐকান্তিক ... মৃত্যুর যবনিকা-ভেদ-প্রয়াসী পরলোক-সম্বন্ধে এই কৌতূহলের মূল ... তখন দেশের অবস্থা কি এরূপ ছিল, যে লোকে ইহলোকে সুখলাভে ... হইয়া অন্যত্র সুখের কল্পনায় মগ্ন ছিল ? গৌতম বুদ্ধ মানবজীবনকে ... আগার গণ্য করিয়া দুঃখ হইতে মুক্তির উপায় অনুসন্ধান করিয়াছিলেন, ইহার কি কোনও নৈসর্গিক অথবা সামাজিক কারণ ছিল ? ডাঃ ... লিখিয়াছেন, এই যুগে দেশের রাষ্ট্রনৈতিক সংকটে লোকের মন ... হইয়াছিল। ছোট ছোট রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধ ও বহিরাগত শত্রুর আক্রমণে ... শান্তি বিধ্বস্ত হইয়াছিল। লোকের লোভ ও রাজাদিগের ইন্দ্রিয়... বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছিল। ধনীদিগের সম্বন্ধে একটি বৌদ্ধসূত্রে আছে ... বশে তাহারা যে সকল সম্পত্তি অর্জন করিয়াছে, তাহার কিছুই ... কাহাকেও দেয় না। তাহারা অনবরত অর্থ সঞ্চয়ই করিতেছে। ... রাজ্য সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তাহারও সমুদ্রপারের দেশের প্রতি লোভ। ... রাজা ও অতৃপ্তকাম অন্যান্য সকল লোকই মৃত্যুর কবলে পতিত হয়। ... আত্মীয় বা বন্ধু কেহই তাহাদিগকে রক্ষা করিতে পারে না। ... উত্তরাধিকারিগণ তাহাদের সম্পত্তি প্রাপ্ত হয় ; আর তাহারা প্রাপ্ত হয় ... কর্ম্মের ফল। স্ত্রী,পুত্র, ধন, রাজ্য, সম্পদ কিছুই মৃতের সঙ্গে ... জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি, রাষ্ট্র ও সমাজের ব্যর্থতার বোধ, সংসারে সুখলাভে নৈরাশ্য এবং মানুষের উপর বিশ্বাসের অভাববশতঃ অনেকের দৃষ্টি ... অন্তরস্থ আত্মার উপর নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এবং তাহাদের চিত্ত উদ্বেলিত ... উঠিয়াছিল। এরূপ লোকেরও অভাব ছিল না, যাঁহারা নিষ্পাপ ... অনুসরণে এই নশ্বর অপূর্ণ জীবনকে তুচ্ছ করিয়া দূরবর্ত্তী এমন এক ... লোকপ্রাপ্তির জন্য প্রয়াসে উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন, যাহা অবিনশ্বর, ... একরূপ, যেখানে পাপ নাই, যাহার ক্ষয় নাই। অধিকাংশ লোকই ক্লান্তি ... এবং নৈরাশ্যে জীবনের প্রতি বিমুখ হইয়াছিল। ভবিষ্যতের আশা ... বর্ত্তমানের প্রলোভন হইতে মুক্ত করিয়াছিল। লোকে মুক্তিলাভের ... পন্থার দিকে লোলুপ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। ... সংগ্রামে পরাজয়ের গভীর অনুভূতি হইতে এই যুগের কর্ম্ম প্রেরণা ... হইয়াছিল। জগতের মূলে এক নৈতিক ব্যবস্থা আছে, নৈতিক নিয়মে জগৎ শাসিত, এই বিশ্বাস এবং ন্যায়বান ও দয়ালু ঈশ্বরে বিশ্বাস ... পরস্পরের সহযোগী। কিন্তু যখন সকলেই জীবনকে দুঃখময় বলিয়া ...

অথবা জীবনের মূল্য-সম্বন্ধে সন্দিহান হয়, তখন এই বিশ্বাসে স্থির থাকা সহজ হয় না। এই যুগে বহু শতাব্দীর বিশ্বাস স্বপ্নের মত শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছিল। শাস্ত্রের মর্য্যাদা হ্রাসপ্রাপ্ত এবং ঐতিহ্যের বন্ধন শিথিল হইয়াছিল। বিশ্বাসের বিলুপ্তির ফলে চিন্তায় যে বিপ্লব উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা এবং মানবচিন্তার স্বাধীনতা-ঘোষণার ফলে বহুসংখ্যক দার্শনিক কল্পনা এবং গবেষণার উদ্ভব হইয়াছিল। নৈতিক দুর্বলতা-বোধপীড়িত যুগের লোকে আধ্যাত্মিক যে কোনও অবলম্বন গ্রহণ করিতে ব্যাকুল হয়। এই জন্যই প্রত্যক্ষ জগতের উপর নির্ভরশীল জড়বাদীদিগের পার্শ্বে মনস্তাত্ত্বিক এবং নীতিবাদী বৌদ্ধ দার্শনিকদিগের উদ্ভব হইয়াছিল। জলে নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় আকুল আগ্রহে বেদাবলম্বী লোকের অভাব না থাকিলেও, সংস্কার-পন্থিগণ মৃত্যুর পর কি হইবে, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া পবিত্র জীবন-যাপন এবং পরের মঙ্গলসাধনে ব্যাপৃত ছিলেন।*

ডাঃ রাধাকৃষ্ণের এই বর্ণনা যে অতিরঞ্জিত, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। নূতন যে সকল দর্শনের উদ্ভবের কথা ডাঃ রাধাকৃষ্ণ বলিয়াছেন, তাহাদের বীজ এই যুগের পূর্ব্বেই অঙ্কুরিত হইয়াছিল। জড়বাদ যে উপনিষদ যুগেও ছিল, উপনিষদে তাহার প্রমাণ আছে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম বৈদিক যাগযজ্ঞ-বিরোধী হইলেও উপনিষদ হইতে ভিন্ন কোনও নূতন ধর্ম্ম প্রচার করে নাই, ইহাই অনেক পণ্ডিতের মত। বৌদ্ধ নির্ব্বাণ এবং বেদান্তের মুক্তিকে অনেকে অভিন্ন বলিয়াই গণ্য করেন। দেশ তখন খণ্ড খণ্ড বহুরাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এই সকল রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ-সংঘটনও বিরল ছিল না, ইহা সত্য। কিন্তু সেই প্রাচীন যুগে পৃথিবীর সকল দেশের অবস্থাই এইরূপ ছিল। ভারতের ধনী-শ্রেণী অন্য দেশের ধনী-শ্রেণী হইতে যে অধিকতর স্বার্থপর ও লোভী ছিল, তাহাও মনে করিবার হেতু নাই। দেশে জীবিকা সুলভ ছিল, জমি উর্ব্বর ছিল, সুতরাং জীবনের ব্যর্থতার গ্লানিও বহুলোকের অনুভব করিবার কোনও কারণ ছিল না। জীবনে দুঃখের অনুভূতি চিন্তাশীল লোকদিগের প্রবল ছিল। কিন্তু মহাকাব্যের যুগের পূর্ব্বেও তাহা ছিল। তাহা সত্ত্বেও তাঁহারা আনন্দ হইতেই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে, এবং জগতে আনন্দ আছে বলিয়াই প্রাণিগণ জীবিত আছে, ইহা জানিতেন এবং শত বৎসর জীবিত থাকিবার ইচ্ছা করিতেন।

---

* Radha Krishnan, Indian Philosophy. vol, I. P. p. 273-74.

কিন্তু তাহারা ইহাও জানিতেন যে জাগতিক ভোগসুখ নশ্বর। তাই তাঁহারা অবিনশ্বর ভূমার সুখের জন্য লালায়িত ছিলেন। জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস থাকায় এই ভূমার সুখ ইহজন্মে লব্ধ না হইলেও স্বকীয় চেষ্টার ফলে জন্মান্তরে লব্ধ হইবে, ইহা তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। এই বিশ্বাস মহাকাব্যের যুগেও অধিকাংশ লোকেরই ছিল; সুতরাং জীবনের ব্যর্থতার গ্লানি যে প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল, তাহা মনে করিবার সঙ্গত কারণ নাই। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বহু লোকের প্রাণনাশ হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে ব্যাপক দুঃখের সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা সত্য। কিন্তু তাহার ফলেই যে লোকের বিশ্বাসে আঘাত লাগিয়াছিল এবং বহুবিধ নূতন মতের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহা নহে। এই সকল মতের অনেকগুলি যে উপনিষদ যুগেও প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। দুঃখবাদের প্রধানশাস্ত্র সাংখ্য দর্শনের মূল কঠ ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে দেখিতে পাওয়া যায়। চিন্তার স্বাধীনতা ভারতীয় আর্য্য সমাজে চিরকালই ছিল। মহাকাব্যের যুগে চিন্তা বন্ধনমুক্ত হয়, ইহা বলিবারও সংগত কারণের অভাব।

তবে এই যুগের দার্শনিক চিন্তার সমৃদ্ধির কারণ কি? অতি প্রাচীনকালে ভারতে দার্শনিক চিন্তার আবির্ভাব সম্বন্ধে মাক্ষমূলার যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই; "অতি প্রাচীনকালে ভারতের রাজা, মানী ও পণ্ডিতগণ যে দার্শনিক আলোচনায় মগ্ন ছিলেন, তাহা আমাদিগের নিকট আশ্চর্য্য মনে হয়। তাহার কারণ, যতদিনের সংবাদ আমরা জানি, ততদিন হইতে ইয়োরোপীয়দিগের শক্তি সাংসারিক ব্যাপার এবং বিদ্যার চর্চ্চা এই দুই দিকে প্রযুক্ত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীনকালে সাংসারিক ব্যাপারেই এই শক্তি অধিকতর প্রযুক্ত হইত। কিন্তু যে দেশে কৃষকদিগের অধিক পরিশ্রম ব্যতীতও জীবনধারণের জন্য যে যে বস্তুর প্রয়োজন, তাহা প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইত, যে দেশ তিন দিকে সমুদ্র এবং এক দিকে দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বতমালাকর্তৃক সুরক্ষিত, সহস্র সহস্র বৎসর যাবৎ অসভ্য আদিম অধিবাসীদিগের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ভিন্ন অন্য যুদ্ধে যে দেশ লিপ্ত হয় নাই, সে দেশে ইয়োরোপীয় জীবন হইতে ভিন্ন প্রকারের জীবন অসম্ভব মনে করিবার কারণ নাই। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ যখন দেখিলেন, তাঁহারা এই পৃথিবীতে স্থাপিত হইয়াছেন, কিন্তু কেন ও কিরূপে, তাহার কিছুই অবগত নহেন, তখন তাঁহারা কে, কোথা হইতে তাঁহারা আসিয়াছেন, এবং তাঁহাদিগকে পৃথিবীতে স্থাপিত করিবার উদ্দেশ্য কি, এই সকল প্রশ্ন তাঁহাদের পক্ষে অতিপ্রশ্ন নহে, বিশেষতঃ যখন জীবন-

সংগ্রাম বলিয়া কিছু ছিল না।" * উপনিষদ যুগে বিদ্যার যে বহুল চর্চ্চা ছিল উপনিষদেই তাহার প্রমাণ আছে। নারদ সনৎকুমারের নিকট শিক্ষার্থী হইয়া গমন করিলে, সনৎকুমার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তুমি কি কি শিক্ষা করিয়াছ?" নারদ তখন যে যে বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহা এই—চতুর্ব্বেদ, ইতিহাস, পুরাণ, ব্যাকরণ, গণিত শাস্ত্র, দৈবউৎপাত বিদ্যা, কালতত্ত্ব, বাকোবাক্য (তর্কশাস্ত্র), নীতিশাস্ত্র, দেববিদ্যা, নিরুক্ত (Etymology), ব্রহ্মবিদ্যা (শিক্ষাকল্পাদি—শঙ্কর ও মাক্সমূলার), সর্প ও দেবজন বিদ্যা (সর্প ও সর্প বিষ-সংক্রান্ত বিদ্যা = সর্প বিদ্যা। দেবজন বিদ্যা = গন্ধর্ব্ব বিদ্যা। দেবজন = গন্ধর্ব্ব। গন্ধদ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী ও নৃত্যগীতাদি বিদ্যা), নক্ষত্র বিদ্যা (জ্যোতিষশাস্ত্র)। এত বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব-শিক্ষার জন্য নারদ সনৎকুমারের নিকট গিয়াছিলেন। এই সমস্ত বিদ্যার মধ্যে বাকোবাক্যের (Logic) উল্লেখ লক্ষণীয়। প্রত্যেক আর্য্যসন্তানের পক্ষে গুরুগৃহে দ্বাদশ বৎসর বিদ্যার্জ্জনের জন্য বাস কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত ছিল। রাজগণ যে দার্শনিক আলোচনায় উৎসাহ দান করিতেন, তাহার পরিচয় উপনিষদেই আছে। রাজসভায় বিভিন্ন মতাবলম্বী দার্শনিকদিগের মধ্যে তর্ক-যুদ্ধ হইত, এবং বিজেতাকে রাজা পুরস্কার দান করিতেন। উপনিষদের যুগেই বৈদিক যাগযজ্ঞ নিকৃষ্ট শ্রেণীর উপাসনা বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছিল। সুতরাং মহাকাব্যের যুগে চিন্তার স্বাধীনতা, বৈদিক ধর্ম্মে সংশয় ও দুঃখ-কষ্টের নবোদ্ভূত বাহুল্য এবং জীবনের ব্যর্থতার বোধ হইতে যে নূতন নূতন দার্শনিক মতের উদ্ভব হইয়াছিল, ইহা মনে করা যায় না। জীবন অস্থায়ী, পার্থিব ভোগ্যবস্তু নশ্বর, মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এই বোধ ভারতের চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের মনে সংহিতার যুগ হইতে ছিল। অসৎ হইতে সতে, মৃত্যু হইতে অমৃতে উত্তীর্ণ হইবার প্রার্থনা ঋষিদিগের কণ্ঠ হইতে যজ্ঞকালেই ধ্বনিত হইত (বৃঃ আঃ ১।৩।২৮)। সুতরাং উপনিষদে পরবর্ত্তী যুগে দার্শনিক আলোচনার বিবৃদ্ধি ভারতীয় সমাজে জ্ঞান-বৃদ্ধির সহগামী সংশয়িত মনের পরিচায়ক বলিয়া মনে করা যাইতে পারে।

---

* Six Systems of Indian Philosophy—p, 10.

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ পূর্ব্বে বিবৃত এগারো খানি উপনিষদের পরে রচিত। কিন্তু ইহা যে সাংখ্যকারিকা, পাতঞ্জল সূত্র, বৈশেষিক সূত্র, গৌতম সূত্র ও জৈমিনি সূত্রের পূর্ব্বে রচিত, তাহা মনে করিবার কারণ আছে। এই উপনিষদের প্রথমে কয়েকটি সূত্রে সাংখ্যদর্শনের মূল তত্ত্বগুলি বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে কেহ কেহ ইহাকে সাংখ্যদর্শনের পরবর্ত্তী বলেন। কিন্তু ইহা কপিলের সাংখ্যদর্শনের পরবর্ত্তী হইলেও যে সাংখ্যকারিকার বহু পূর্ব্ববর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। সাংখ্যদার্শনিকগণ এই উপনিষৎকে সাংখ্যদর্শনের শ্রুত্যুক্ত প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করেন। মহর্ষি কপিল বুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী, এবং সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব অষ্টম শতাব্দীতে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। আসুরির আবির্ভাব কাল খৃষ্টপূর্ব্ব ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে। শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ কপিল ও আসুরির পরবর্ত্তী। উক্ত উপনিষদে কপিলের নামের উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু উহার ভাষ্যকার 'কপিল' শব্দ "হিরণ্যগর্ভ" অর্থে এবং উক্ত শব্দের পূর্ব্বস্থিত "ঋষি" শব্দ "সর্ব্বজ্ঞ" অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। এই উপনিষদে সাংখ্যের প্রধান, প্রকৃতি ও সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এইজন্য কপিলের সাংখ্যদর্শন (প্রাচীন) কর্ত্তৃক এই দর্শন প্রভাবিত বলিয়া মনে হয়। কিন্তু বুদ্ধের কোনও প্রভাব ইহার উপরে আছে বলিয়া মনে হয় না।

এই উপনিষদে ব্রহ্মকে "সাংখ্যযোগাধিগম্য" বলা হইয়াছে। ইহার জন্য ইহাকে যোগদর্শনেরও পরবর্ত্তী বলা হয়। পাতঞ্জলির যোগসূত্র খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহে। কিন্তু সূত্রাকারে গ্রথিত হইবার পূর্ব্বে যে উক্ত সূত্রাবলী মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইহা ভগবদ্গীতার পূর্ব্ববর্ত্তী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় এই উপনিষদের কতকগুলি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। এই উপনিষৎ যে বুদ্ধের সমকালে অথবা তাহার কিছু পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহা মনে করিলে ভুল হইবে না বলিয়া মনে হয়।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে ব্রহ্মকে হর, রুদ্র ও শিব নামে অভিহিত করা হইয়াছে, এবং ব্রহ্ম সবিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালের ভক্তি-ধর্ম্মের উদ্ভব এই উপনিষৎ হইতেই হইয়াছিল। শৈব ধর্ম্মের মূল ইহার মধ্যে রহিয়াছে। ইহা ঈশ্বরবাদের (Theism) উপনিষৎ। ইহাতে ব্রহ্মকে

"সর্ব্বব্যাপী ভগবান", বরদ, ধর্ম্মাবহ, পাপনুদ ও ভগেশ (ঐশ্বর্য্যশালী) বলা হইয়াছে।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎ যখন রচিত হইয়াছিল, তখন যে নানাবিধ দার্শনিক মত ভারতে প্রচলিত ছিল, গ্রন্থারম্ভেই তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম শ্লোকেই আছে—কিং কারণং ব্রহ্ম (ব্রহ্মই কি কারণ?); কুতঃ স্ম জাতাঃ? (আমরা কোথা হইতে জন্মিয়াছি?) জীবামঃ কেন? (কাহাদ্বারা বাঁচিয়া আছি?), ক চ সম্প্রতিষ্ঠা? (আমাদের স্থিতি কোথায়?), অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু বর্ত্তামহে, ব্রহ্মবিদো, ব্যবস্থাম্, (হে ব্রহ্মবিদ্‌গণ? কোন্ হেতুতে সুখ-দুখে ব্যবস্থিত হইয়া আমরা বর্ত্তমান থাকি?)। দ্বিতীয় শ্লোকে আছে—কাল, স্বভাব, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতসকল এবং পুরুষ ইহাদের মধ্যে কারণ কোন্‌টি, তাহা চিন্তনীয়। ইহাদের সংযোগ কারণ হইতে পারে না, কেন না সংযোগ আত্মসাপেক্ষ। আবার জীবাত্মা সুখ-দুঃখের অধীন, সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যে অসমর্থ।

শ্বেতাশ্বতর ঋষি কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা আছে এই উপনিষদের শেষ ভাগে। তিনি বলিয়াছেন—

তপঃ-প্রভাবাৎ দেবপ্রসাদাৎ চ,
ব্রহ্ম হ শ্বেতাশ্বতরোঽথ বিদ্বান্।
অত্যাশ্রমিভ্যঃ পরমং পবিত্রং,
প্রোবাচ সম্যক্ ঋষি-সংঘজুষ্টং ॥

স্বীয় তপঃ প্রভাবে এবং দেবপ্রসাদে পরম পবিত্র এবং ঋষিগণকর্তৃক সেবিত প্রসিদ্ধ (হ) ব্রহ্মকে অবগত হইয়া শ্বেতাশ্বতর অত্যন্ত পূজনীয় আশ্রমিগণের নিকট তাঁহাকে সম্যক্ কীর্ত্তন করিয়াছেন।

এই ব্রহ্মবিদ্যা যে অনুভবলব্ধ গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোক হইতে তাহা অনুমিত হয়। ধ্যানযোগ-পরায়ণঋষিগণ যে অদ্বিতীয় দেব কাল ও আত্মা সহ নিখিল কারণসমূহকে নিয়মিত করেন, সেই দেবের স্বগুণ-নিগূঢ়া (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ দ্বারা আচ্ছাদিতা), আত্মশক্তি (ঈশ্বরের শক্তি) দর্শন করিয়াছিলেন। নিরীশ্বর সাংখ্য শ্বেতাশ্বতর উপনিষৎকে প্রমাণ-স্বরূপে উপস্থিত করিয়া থাকেন। কিন্তু এই উপনিষদের প্রথমেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ যে ঈশ্বরেরই গুণ (তাহারা স্বতন্ত্র নহে, ইহা) এবং ঈশ্বরই যে জগতের নিয়ন্তা তাহা বলা হইয়াছে।

সাংখ্যদর্শনে যে সকল পদার্থের উল্লেখ আছে, চতুর্থ শ্লোকে (১ম অধ্যায়)

তাহারা বিবৃত হইয়াছে। সংসার চক্র একনেমি, (প্রকৃতি), ত্রিবৃৎ (সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণান্বিত), ষোড়শান্ত (পঞ্চভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয় এই ষোড়শ বিকার যুক্ত), শতার্দ্ধার (শতের অর্দ্ধ ৫০ "অর" যুক্ত—বিপর্য্যয় বা মিথ্যাজ্ঞান, অশক্তি, তুষ্টি ও সিদ্ধি ইহাদের পঞ্চাশটি ভেদ), বিংশতি প্রত্যর (২০টি প্রত্যর—দশ ইন্দ্রিয় ও তাহাদের বিষয়), ছয় অষ্টক (অষ্ট প্রকৃতি, অষ্ট ধাতু, অষ্ট ঐশ্বর্য্য, অষ্ট ভাব, অষ্ট দেব ও দয়াদি অষ্ট গুণ), বিশ্বরূপ, একপাশ (কামরূপ), ধর্ম্ম, অধর্ম্ম ও জ্ঞানরূপ তিন মার্গভেদযুক্ত, দ্বিনিমিত্ত, এক মোহযুক্ত (ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম নিমিত্ত হইতে অবিদ্যাযুক্ত)। কিন্তু সমগ্র উপনিষৎ খানি ব্রহ্মের কথায় পূর্ণ।

হংস (হন্তি গচ্ছতি ইতি—জীব) আপনাকে ও তাহার প্রেরয়িতাকে পৃথক মনে করিয়া, সর্ব্বাজীব (সর্ব্বজীবাধার) সর্ব্বসংস্থ (প্রলয়ে সকলের আশ্রয়) বৃহৎ ব্রহ্মচক্রে ভ্রমণ করে। পরে ঈশ্বরকর্ত্তৃক জুষ্ট (উপকৃত) হইয়া অমৃতত্ব লাভ করে। এই পরম ব্রহ্ম বেদান্তে উদ্গীত। ভোক্তা, ভোগ্য ও নিয়ন্তা এই ভাবত্রয় তাঁহাতে বর্ত্তমান। তিনিই জগতের প্রতিষ্ঠা, তিনিই অক্ষর। এই জগতে প্রপঞ্চের অতীত ব্রহ্মকে জানিয়া ব্রহ্মবিদ্গণ ব্রহ্মে লীন এবং যোনি হইতে মুক্ত হন। পরস্পর সংযুক্ত ক্ষর ও অক্ষর, ব্যক্ত ও অব্যক্ত সকলই ঈশ্বর ধারণ করিয়া আছেন। অনীশ (শক্তিহীন) জীবাত্মা ভোক্তৃ-ভাববশতঃ অবিদ্যাদি বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ঈশ্বরকে জানিয়া সর্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হয়।

জ্ঞ ও অজ্ঞ উভয়েই অজ (জন্মরহিত)। ঈশ ও অনীশ এই দুই জন আছেন। ভোক্তার ভোগের বিষয়যুক্ত এক অজা প্রকৃতি (পরমেশ্বরের শক্তি) আছেন। অনন্ত আত্মাই বিশ্বরূপ ও অকর্ত্তা (কর্ত্তৃত্বাদি ভাব-রহিত)। জীব যখন জীব, ঈশ্বর ও প্রকৃতি তিনরূপী ব্রহ্মকে জানিতে পারে তখন মুক্ত হয়।

প্রধান (প্রকৃতি) ক্ষর, হর (অবিদ্যা-হরণকারী পরমেশ্বর) অমৃত ও অক্ষর। সেই এক (অদ্বিতীয়) দেব ক্ষর ও আত্মা (জীব) উভয়কে নিয়ন্ত্রিত করেন। তাঁহার অভিধ্যান (চিন্তন) ও তাঁহার সহিত যোগ ও তাঁহার স্বরূপভাব (ব্রহ্মৈকত্ব ভাব) হইতে বিশ্বমায়ার (সর্ব্বমোহের) নিঃশেষে নিবৃত্তি হয়। সেই দেবকে জানিলে সর্ব্ব পাশ ছিন্ন হয়। ক্লেশ (অবিদ্যা অস্মিতা প্রকৃতি) ক্ষীণ হইলে জন্ম-মৃত্যুর নিবৃত্তি হয়। তাঁহার চিন্তা হইতে দেহ-পাতের পরে বিশ্বৈশ্বর্য্য নামে তৃতীয় অবস্থা-লাভ হয়। তখন সাধক কেবল ও আপ্ত-কাম হন।

নিত্য আত্মসংস্থ (সত্তান্তর নিরপেক্ষ) ব্রহ্মকেই জানিতে হইবে। ইহার পরে জ্ঞাতব্য কিছু নাই। ভোক্তা, ভোগ্য ও প্রেরয়িতাকে জানিয়া (ব্রহ্ম বলিয়া জানিয়া) সাধক মুক্ত হন।

বহ্নির যোনিগত (কাষ্ঠগত) মূর্ত্তি যেমন দৃষ্ট হয় না, কিন্তু ইহার সূক্ষ্ম স্বরূপের নাশ হয় না, অরণির ঘর্ষণদ্বারাই তাহা দৃষ্ট হয়, তেমনি আত্মা দেহে প্রণব (ওঁকার) উচ্চারণদ্বারা উপলব্ধ হন।

স্বদেহকে অরণি (কাষ্ঠ) করিয়া, প্রণবকে দ্বিতীয় অরণি করিয়া, উভয়কে ধ্যানরূপ ঘর্ষণদ্বারা নির্মথন করিয়া নিগূঢ় অগ্নির মত দেবকে দর্শন করিবে।

তিলেষু তৈলং দধিনীব সর্পিঃ,
আপঃ স্রোতস্বরণিষু চাগ্নিঃ,
এবমাত্মনি গৃহ্যতেঽসৌ
সত্যেনৈনং তপসা যোঽনুপশ্যতি ॥
সর্ব্বব্যাপিনমাত্মানং ক্ষীরে সর্পিরিবার্পিতং
আত্মবিদ্যাতপোমূলং তৎব্রহ্মোপনিষৎ পরং ॥

তিলে যেমন তৈল, দধিতে ঘৃত, স্রোতে জল, অরণিতে অগ্নি, তেমনি এই আত্মা, যিনি সত্য ও তপস্যাদ্বারা ইঁহাকে অন্বেষণ করেন, তাঁহাদ্বারা আত্মাতে গৃহীত (দৃষ্ট) হন। দুগ্ধে ঘৃতের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও আত্মবিদ্যা এবং তপস্যাদ্বারা লভ্য আত্মাকে—উপনিষদে পরম শ্রেয়রূপে উপদিষ্ট ব্রহ্মকে—যিনি সত্য ও তপস্যাদ্বারা অন্বেষণ করেন, তিনি প্রাপ্ত হন।

বক্ষ, গ্রীবা ও মস্তক সমভাবে স্থাপন করিয়া মনদ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে হৃদয়ে সন্নিবেশিত করিয়া ব্রহ্ম-প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ প্রণবরূপ উড়ুপ (ভেলা) দ্বারা বিদ্বান্ ভয়াবহ সংসারস্রোত উত্তীর্ণ হন।

স্থির ভাবে (অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-চালনা-রহিত) থাকিয়া প্রাণ (মন) নিঃশক্তি হইলে নাসিকাদ্বারা (মুখদ্বারা নহে) নিশ্বাস-প্রশ্বাস করিবে। দুষ্টাশ্বযুক্ত রথের মতো মনকে জ্ঞানী অপ্রমত্ত হইয়া ধারণ করিবেন। শর্করা (ক্ষুদ্র উপল), বহ্নি ও বালুকাবর্জ্জিত, সমতল ও শব্দ, জল ও আশ্রয় (পর্ণকুটির) দ্বারা মনের অনুকূল, চক্ষুর অপীড়ক, গুহা ও বায়ুর উচ্ছ্বাসশূন্য কুটীরের নিকটবর্ত্তী স্থানে চিত্তকে পরমাত্মায় সংযোজিত করিবে।

যোগে নীহার, ধূম, সূর্য্য, বায়ু, অগ্নি, খদ্যোত, বিদ্যুৎ, স্ফটিক ও চন্দ্র,

এই সকলের রূপ ব্রহ্মের অভিব্যক্তির নিমিত্তরূপে প্রথমে আবির্ভূত হয়।

মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ সমুত্থিত হইলে, পঞ্চাত্মক যোগগুণ প্রকাশমান হইলে, যোগাগ্নিময়-শরীর-প্রাপ্ত সাধকের রোগ, জরা ও দুঃখ থাকে না।

লঘুত্ব, আরোগ্য, লোভশূন্যতা, বর্ণের উজ্জ্বলতা, স্বর-মাধুর্য্য, শুভগন্ধ, অল্প মূত্র ও পুরীষ, এই সকল যোগের প্রথম ফল।

এই দেবই প্রাচী আদি দিক এবং অগ্নি আদি অবান্তর দিক। তিনিই হিরণ্যগর্ভরূপে প্রথমে উদ্‌ভূত হইয়াছিলেন। গর্ভের মধ্যে তিনি বর্ত্তমান। তিনি জন্মিয়াছেন এবং জন্মিবেন। তিনি সর্ব্বতোমুখ ও সর্ব্বজনের পশ্চাতে বর্ত্তমান।

"একো হি রুদ্র ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ।" রুদ্রই একমাত্র, যিনি এই সকল লোক নিয়মিত করেন। ব্রহ্মবিদ্-গণ দ্বিতীয় স্বীকার করেন না।

পরবর্ত্তী কয়েক অধ্যায়ের কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং,
আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি,
নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥

এই আদিত্যবর্ণ (প্রকাশস্বরূপ) তমঃপারে অবস্থিত মহান্ পুরুষকে আমি জানি। তাঁহাকে জানিয়াই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়, অমৃতত্ব-প্রাপ্তির অন্য পথ নাই।

যাহা হইতে শ্রেষ্ঠ, অশ্রেষ্ঠ বা অন্যতর, ক্ষুদ্র বা মহৎ কিছু নাই, যে অদ্বিতীয় দেবতা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া আকাশে বর্ত্তমান (বৃক্ষ-ইব স্তব্ধঃ দিবি তিষ্ঠতি), সেই পুরুষদ্বারা এই সকল পূর্ণ।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখং
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি।
সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতং,
সর্ব্বস্য প্রভুমীশানং, সর্ব্বস্য শরণং বৃহৎ।
অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা
পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ,

স বেত্তি বেদ্যং, ন চ তস্যাস্তি বেত্তা,
তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্।
অণোরণীয়ান্, মহতো মহীয়ান্,
আত্মা গুহায়াং নিহিতোঽস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রসাদান্মহিমানমীশং॥
ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমান্ অসি, ত্বং কুমার উতবা কুমারী,
ত্বং জীর্ণো দণ্ডেন বঞ্চসি, ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ॥

তুমি স্ত্রী, তুমি পুরুষ, তুমি কুমার, তুমিই কুমারী, তুমি জরাগ্রস্ত হইয়া দণ্ডহস্তে গমন কর (বঞ্চসি), তুমি বিশ্বতোমুখ হইয়া জন্মগ্রহণ কর।

অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং
বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাং।
অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে,
জহাত্যেনাং ভুক্তভোগাং অজোঽন্যঃ॥

লোহিত, শুক্ল, কৃষ্ণ (তেজ, অপ ও অন্ন বা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপা) বহু প্রজার সৃষ্টিকর্ত্রী সমানাকারা এক অজাকে (প্রকৃতিকে), অন্য এক অজ (আত্মা) সেবা করিয়া ভজনা করে, এবং ভোগ সমাপ্ত হইলে তাহাকে ত্যাগ করে।

ছন্দাংসি যজ্ঞাঃ ক্রতবো ব্রতানি
ভূতং ভব্যং যচ্চ বেদা বদন্তি,
যস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ,
তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ॥
মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, মায়িনং তু মহেশ্বরং।
তস্যাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥

বেদ, যজ্ঞ (ঘৃতসম্পাদ্য যাগ), ক্রতু (সোমরস সম্পাদ্য বৃহৎ যাগ), ব্রত, ভূত ও ভবিষ্যৎ, যাহাদের কথা বেদে বলে, যাহা হইতে মায়ী এই সকল সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাতেই অন্য (জীব) মায়াদ্বারা অবরুদ্ধ হয়। মায়াই প্রকৃতি, মহেশ্বর মায়ী; তাহার অবয়বসকলদ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত।

যদা তমঃ তন্নদিবা ন রাত্রিঃ,
ন সন্ন চাসচ্ছিব এব কেবলঃ।

তদক্ষরং তৎ সবিতুর্বরেণ্যং,
প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা পুরাণী।
নৈনমূর্দ্ধং ন তির্য্যঞ্চ ন মধ্যে পরিজগ্রভৎ।
ন তস্য প্রতিমা অস্তি, যস্য নাম মহৎযশঃ॥

যখন তমঃ (সৃষ্টির পূর্ব্বে) ছিল, তখন দিবাও নয়, রাত্রিও নয়, সৎও নহে, অসৎও নহে, তখন কেবল শিব (মঙ্গল)ই ছিলেন। তিনি অক্ষর, সূর্য্যের সম্ভজনীয়। তাঁহা হইতে পুরাতন প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছে।*

ঊর্দ্ধে, অধঃতে ও মধ্যে ইহাকে কেহ ধরিতে পারে না। যাঁহার নাম "মহৎ যশঃ", তাহার প্রতিমূর্ত্তি (বা উপমা) নাই।

অজাত ইত্যেবং কশ্চিৎ ভীরুঃ প্রতিপদ্যতে।
রুদ্র, যৎ তে দক্ষিণং মুখং, তেন মাং পাহি নিত্যং॥

"তুমি অজাত" বলিয়া (সংসার ভয়ে) ভীত ব্যক্তি তোমার শরণ লয়। হে রুদ্র, তোমার যে দক্ষিণ মুখ (আনন্দজনক চিন্ময় রূপ), তাহাদ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্পিতস্য চ
ভাগো জীবঃ, স বিজ্ঞেয়ঃ, স চানন্ত্যায় কল্পতে।

জীব কেশাগ্রের শততম ভাগের শততম ভাগ হইলেও অনন্তত্ব-প্রাপ্তির উপযুক্ত।

দেহী স্বগুণদ্বারা (প্রাক্তন জন্মসংস্কারদ্বারা) স্থূল, সূক্ষ্ম অনেক রূপকে আবৃত করেন। সেই সকল রূপের ক্রিয়াগুণ এবং শারীর গুণবশতঃ সংযোগকারক আত্মা ক্ষুদ্ররূপে দৃষ্ট হন।

তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং,
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং,
পতিং পতীনাং, পরমং পরস্তাৎ,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥

---

* গায়ত্রী মন্ত্র এই সঙ্গে তুলনীয়। "প্রজ্ঞা চ তস্মাৎ প্রসৃতা" ও "ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ" একই অর্থ বহন করে। "সবিতুঃ বরেণ্য অক্ষর" ও "সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গোদেবস্য" ইহাদের অর্থও প্রায় একই। এই শ্লোকের ভাষ্যে যদাতমঃ = যদা + অতমঃ বলা হইয়াছে। কিন্তু যদা—তমঃ করিলেই সুন্দর অর্থ হয়। পূর্ব্বে ৩১—৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ন তস্য কার্য্যং করণং চ বিদ্যতে,
ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে,
পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে,
স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ।
যস্তূর্ণনাভ ইব তন্তুভিঃ প্রধানজৈঃ
স্বভাবতো দেব একঃ স্বমাবৃণোৎ,
স নো দধাৎ ব্রহ্মাপ্যয়ম্॥
নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং
একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্,
তৎ কারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং
জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাশৈঃ॥
স বিশ্বকৃৎ বিশ্ববিদাত্মযোনিঃ,
কালকারো গুণী সর্ব্ববিদ্ যঃ,
প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞপতির্গুণেশঃ,
সংসার-মোক্ষস্থিতি-বন্ধ হেতুঃ॥
যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং,
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ,
তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-প্রকাশং,
মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে॥
নিষ্কলং নিষ্ক্রিয়ং শান্তং নিরবদ্যং নিরঞ্জনং।
অমৃতস্য পরং সেতুং দগ্ধেন্ধনমিবানলম্॥

যিনি ঈশ্বরদিগের পরম মহেশ্বর, দেবতাদিগের পরম দেবতা, প্রভুদিগের প্রভু, পরম (হিরণ্যগর্ভ) হইতে শ্রেষ্ঠতর, স্তবনীয় ভুবনেশ্বর, তাঁহাকে আমরা জানি। তাঁহার কার্য্য (শরীর) নাই, ইন্দ্রিয়ও নাই। তাঁহার সমান বা শ্রেষ্ঠতর কেহই নাই। তাঁহার বিচিত্রা পরাশক্তি বেদে কীর্ত্তিত আছে। তাহা স্বাভাবিক জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়া।

যে অদ্বিতীয় দেবতা, ঊর্ণনাভের মতো প্রধানজ তন্তুসমূহদ্বারা (স্বকীয় সৃষ্টশক্তি হইতে উদ্ভূত তন্তু) আপনাকে আচ্ছাদিত করিয়াছেন (স্বকীয় সৃষ্টির মধ্যে লুক্কায়িত আছেন), তিনি আমাদিগের ব্রহ্মে প্রবেশ বিধান করুন।

যিনি নিত্যবস্তুদিগের মধ্যে নিত্য, চেতনাবানদিগের মধ্যে চেতনাবান্,

যিনি একাকী বহুর কাম্যবস্তুর বিধান করেন, সাংখ্য ও যোগদ্বারা লভ্য সেই কারণরূপী দেবতাকে জানিয়া সকল বন্ধন হইতে লোকে মুক্ত হয়।

তিনি বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্ববিদ, স্বয়ম্ভু, কালের কর্ত্তা, গুণী, সর্ব্বজ্ঞ, প্রধান (জগদুপাদানভূত মূলশক্তি) ও ক্ষেত্রজ্ঞের (জীবাত্মার) স্বামী, সত্ব, রজঃ ও তমোগুণের নিয়ন্তা, এবং সকলের মোক্ষ, স্থিতি ও বন্ধের কারণ। যিনি প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহাকে সকল বেদ দান করিয়াছিলেন, মুমুক্ষু আমি আত্মজ্ঞানের প্রকাশক সেই দেবতার শরণ লই।

১

জড়বাদ

মাধবাচার্য্য তাঁহার সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহের প্রথমেই চার্বাক দর্শনের বর্ণনা করিয়াছেন, এবং চার্বাককে নাস্তিক-শিরোমণি বলিয়াছেন। এই দর্শন লোকায়ত দর্শন নামেও পরিচিত এবং বৃহস্পতি ইহার প্রবর্ত্তক বলিয়া খ্যাত। মাধবাচার্য্য লিখিয়াছেন, "নীতি ও কামশাস্ত্রানুসারে অর্থ ও কামই পুরুষার্থ, পারলৌকিক অর্থ কিছুই নাই, ইহা যাহাদের বিশ্বাস, তাহারা চার্বাক মতেরই অনুসরণ করে। এইজন্য চার্বাক মতের লোকায়ত নাম অন্বর্থ।" কেহ কেহ বলেন, যাহারা চার্বাক-মতাবলম্বী, তাহারা এই লোকই একমাত্র সত্য, অন্য লোক নাই, মনে করে বলিয়া এই মতকে লোকায়ত মত বলে (অয়ং লোকো, নাস্তি পর ইতি মানী। কঠ ২।৬)। আবার কাহারো কাহারো মতে 'চর্ব' ধাতু হইতে চার্বাক শব্দ উৎপন্ন। চর্ব ধাতুর অর্থ চর্বণ করা, খাওয়া; চার্বাক-পন্থীরা কেবল খায়, ধর্ম ও নীতি বলিয়া কিছু তাহাদের নাই; এই জন্য তাহারা চার্বাক নামে অভিহিত। 'চর্ব' ধাতু হইতে উৎপন্ন চার্বাক শব্দের অর্থ রাক্ষসও হইতে পারে। এই মত রাক্ষসদিগের মত— আসুর মত, এই বিশ্বাসেও ইহাতে চার্বাক বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়া থাকিতে পারে। চার্বাক নামে কোনও লোক ছিল কিনা, তাহা সন্দেহস্থল। কিন্তু মহাভারতে চার্বাকনামা এক ব্যক্তির যুধিষ্ঠিরের সহিত সাক্ষাৎকারের বর্ণনা আছে। বেদবিরোধী মত যে অতি প্রাচীন কালেও ছিল, বেদের মধ্যেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু চার্বাক মত যে সাধারণ লোকের মধ্যে বহুল প্রচারিত ছিল, তাহা মনে করিবার যথেষ্ট প্রমাণ নাই। ইহলোককেই চার্বাকপন্থিগণ একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করিত বলিয়া তাহাদের লোকায়তিক নাম হইয়াছিল, ইহাই অধিকতর সম্ভবপর।

এই মত বৃহস্পতি-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত বলিয়া উপনিষদে আছে। এই জন্য ইহার নামান্তর বার্হস্পত্য দর্শন। এই বৃহস্পতি কে? বৈদিক দেবতাদিগের মধ্যে এক বৃহস্পতির নাম পাওয়া যায়। বৃহস্পতিনামা ঋষি-রচিত দুইটি সূক্তও ঋগ্বেদে আছে (১০।৭১-৭২)। বৃহস্পতি-সহায় ইন্দ্র নাস্তিক লোকদিগকে পরাভূত করিয়াছিলেন, ইহাও ঋগ্বেদে আছে (৮।৯৬।১৫)। বৃহস্পতিরচিত অপেক্ষাকৃত আধুনিক এক স্মৃতিগ্রন্থও বর্ত্তমান আছে। নবগ্রহের এক গ্রহের নামও বৃহস্পতি। দেবতাদিগের পুরোহিতের নামও বৃহস্পতি। দেবতাদিগের যিনি গুরু, তিনিই নাস্তিক মতের প্রচারক, ইহা আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয়। ইহার ব্যাখ্যায় মাক্ষমূলার ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত প্রজাপতি ও ইন্দ্র-বিরোচন সংবাদের উল্লেখ করিয়া বলেন, ইন্দ্র ও অসুররাজ বিরোচন যখন প্রজাপতির নিকট আত্ম-তত্ত্ব শিক্ষার জন্য গিয়াছিলেন, তখন প্রজাপতি প্রথমে বলিয়াছিলেন চক্ষুর মধ্যে যে পুরুষ দেখা যায় ও জলের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া তাহার মধ্যে যে প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, তাহাই আত্মা। বিরোচন ইহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া প্রস্থান করিয়াছিল, এবং প্রজাপতির নিকট পুনরায় না গিয়া দেহকেই আত্মা বলিয়া মনে করিয়াছিল। কিন্তু মৈত্রায়ণ উপনিষদে এই কাহিনী ভিন্নরূপ ধারণ করিয়াছে। তাহাতে আছে ইন্দ্রের নিরাপত্তার উদ্দেশ্যে এবং অসুরদিগের বিনাশের জন্য বৃহস্পতি এক মিথ্যা দর্শনের উদ্ভাবন করেন, এবং অসুরদিগকে তাহা শিক্ষা দেন। এই দর্শনে যাহা পুণ্য, তাহাকে পাপ, এবং যাহা পাপ, তাহাকে পুণ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছিল। অসুর ভিন্ন অন্য সকলকে এই দর্শন পাঠ করিতে নিষেধ করা হইয়াছিল। ইহাই বৃহস্পতির দর্শন এবং চার্বাক দর্শন নামে পৃথিবীতে প্রচারিত। কিন্তু বৃহস্পতি-রচিত কোনও গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। মাধবাচার্য্যের গ্রন্থে বর্ণিত চার্বাকদর্শন যে বৃহস্পতির অনুমোদিত, একথা তাহাতে আছে।

চার্বাক দর্শন যে ভারতের প্রাচীন দর্শনদিগের অন্যতম, বাল্মীকির রামায়ণেও তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ম্যাকডনেলের মতে রামায়ণের রচনা খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দের পূর্ব্বেই হইয়াছিল (History of Sanskrit Literature 309)। রাম বনবাসে প্রস্থিত হইয়া যখন চিত্রকূট পর্ব্বতে অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভরত তাঁহার নিকটে যাইয়া তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরিয়া পরলোকগত পিতার রাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। রাম অস্বীকৃত হন। তখন জাবালি নামে এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে যে উপদেশ দিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ

জড়বাদ (অযোধ্যাকাণ্ড—১০৮)। তিনি বলিয়াছিলেন, "অর্থধর্মপরা যে যে তাং স্তান্ শোচামি নেতরান্। তে হি দুঃখং ইহ প্রাপ্য বিনাশং প্রেত্য লেভিরে"। "যদি ভুক্তমিহান্যেন দেহমন্যস্য গচ্ছতি, দদ্যাৎ প্রবসতাং শ্রাদ্ধং, ন তৎ পথ্যাশনং ভবেৎ"। "দান সংবদনা হ্যেতে গ্রন্থা মেধাবিভিঃ কৃতাঃ। যজস্ব, দেহি, দীক্ষস্ব, তপঃ তপ্যস্ব সন্ত্যজ"। "স নাস্তি পরমিত্যেতৎ, কুরু বুদ্ধিং মহামতে। প্রত্যক্ষং যৎ, তৎ আতিষ্ঠ, পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু"। যাহারা অর্থধর্মপর, আমি তাহাদের জন্য শোক করি, অন্যের জন্য নয়। তাহারা ইহলোকে দুঃখ পাইয়া মৃত্যুতে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। একজনের ভুক্ত অন্ন যদি অন্যের দেহে যাইতে পারে, তাহা হইলে প্রবাসীর শ্রাদ্ধ করিলেও বিদেশে প্রবাসী সে অন্ন পাইতে পারে। যজ্ঞ কর, দান কর, দীক্ষা নাও, তপস্যা কর, সন্ন্যাসগ্রহণ কর, এই সকল যে শাস্ত্রে আছে (বেদাদি), তাহারা ধূর্ত্ত লোকের কৃত। ইহার পরে কিছু নাই, ইহা স্থির জানুন। যাহা প্রত্যক্ষ তাহা আশ্রয় করুন, পরোক্ষ বর্জন করুন। ইহা স্পষ্টতঃ বার্হস্পত্য দর্শনের অনুবাদ।

চার্বাক মত

ক্ষিতিঃ, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারিটি তত্ত্ব। তাহারা দেহাকারে পরিণত হয়। নানাবিধ দ্রব্যের মিশ্রণে যে মদ্য প্রস্তুত হয়, তাহার মাদকশক্তি থাকে। (কিণ্বাদিভ্যঃ মদশক্তিবৎ) সেই রূপ চারিভূতের মিশ্রণে যে দেহ নির্মিত হয়, তাহাতে চৈতন্য শক্তি থাকে। চৈতন্য একটি স্বতন্ত্র দ্রব্য নহে। চতুর্ভূতের মিশ্রণেই তাহার উৎপত্তি হয়। দেহের বিনাশ হইলে চৈতন্যেরও নাশ হয়। "এতেভ্য ভূতেভ্যঃ সমুত্থায় তানি এব অনু বিনশ্যতি। ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি।" (বৃঃ আঃ—উপঃ—৪।৫।১৩)। উপনিষদের এই শ্লোক চার্বাক মতের সমর্থনে সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে উদ্ধৃত হইয়াছে। আত্মা "এই সকল ভূত হইতে উত্থিত হইয়া তাহাতেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। মৃত্যুর পরে সংজ্ঞা থাকে না।"

চৈতন্যবিশিষ্ট দেহই আত্মা। দেহের অতিরিক্ত আত্মার অস্তিত্বের প্রমাণ নাই। প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। অনুমানাদি প্রমাণ চার্বাক দর্শনে স্বীকৃত নহে। দেহ ব্যতিরিক্ত আত্মার প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই।

এই মতে কামিনী-সঙ্গাদিজন্য সুখই পুরুষার্থ। এই সুখ দুঃখ-সংভিন্ন, সুতরাং ইহার পুরুষার্থত্ব নাই, ইহা বলা যায় না। যে দুঃখ পরিহার করিবার উপায় নাই, তাহা যেমন ভোগ করিতে হইবে, তেমনি প্রাপ্ত দুঃখ তুচ্ছ করিয়া

সুখ উপভোগ করিতে হইবে। মৎস্যার্থী কণ্টক ও শল্কযুক্ত মৎস্য গ্রহণ করে, কিন্তু শল্ক ও কণ্টক বর্জন করিয়া সারভাগ ভক্ষণ করে। ধান্যার্থী তৃণলগ্ন ধান্য আহরণ করিয়া তৃণ ত্যাগ করে এবং ধান্য গ্রহণ করে। সুতরাং দুঃখ-ভয়ে সুখ ত্যাগ করা উচিত নহে। ভীরু যদি দৃষ্ট সুখ ত্যাগ করে, তবে সে পশুবৎ মূর্খ।

কেহ কেহ বলেন যদি পারলৌকিক সুখ না থাকে, তবে বহু অর্থব্যয় এবং আয়াস স্বীকার করিয়া বিদ্বান্ ব্যক্তিরা কেন অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ করেন। কিন্তু ইহা কোনও প্রমাণই নহে। বেদ অনৃত, ব্যাঘাত (বিরোধ) ও পুনরুক্তি দোষে দূষিত। বেদের কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড পরস্পরের বিরোধী। এই বেদ অবলম্বন করিয়া ধূর্ত্ত বক বৈদিকেরা আপনাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছে। বেদ ধূর্ত্তদিগের প্রলাপ মাত্র।

অগ্নিহোত্রঃ ত্রয়ো বেদাঃ, ত্রিদণ্ডং, ভস্মগুণ্ঠনং।
বুদ্ধি-পৌরুষ-হীনানাং জীবিতো ইতি বৃহস্পতিঃ॥

বৃহস্পতি বলেন, অগ্নিহোত্র, তিন বেদ, ত্রিদণ্ড (ত্রিগুণ উপবীত) ও ভস্মলেপন বুদ্ধি ও পৌরুষহীনদিগের জীবিকা। কণ্টকাদিজন্য দুঃখই নরক, লোকসিদ্ধ রাজাই ঈশ্বর এবং দেহপাতই মোক্ষ। ইহা ব্যতীত অন্য কোনও নরক, ঈশ্বর অথবা মোক্ষ নাই। দেহ ও আত্মা অভিন্ন বলিয়াই আমরা "আমি কৃশ", "আমি কৃষ্ণবর্ণ" ইত্যাদি বলিয়া থাকি। "আমার দেহ" যখন বলি, তখনও আমি ও দেহ অভিন্ন। রাহুর মস্তক ভিন্ন অন্য অঙ্গ নাই। তবুও আমরা 'রাহুর শির' বলিয়া থাকি। ইহা ঔপচারিক।

প্রতিপক্ষ বলিতে পারেন, প্রত্যক্ষই যদি একমাত্র প্রমাণ হইত, অনুমানাদি প্রমাণ যদি না থাকিত, তাহা হইলে ইহা সত্য হইতে পারিত। কিন্তু অনুমানও তো একটা প্রমাণ। তাহা যদি না হইত, তাহা হইলে ধূম দেখিয়া সেখানে অগ্নি আছে, ইহা লোকে ভাবে কিরূপে? কিন্তু এই অনুমানের দৃঢ় ভিত্তি নাই। যখন ধূম দেখি, তখন ধূমের সঙ্গে পূর্ব্বে দৃষ্ট অগ্নির কথা মনে হয়। কিন্তু ধূম ও অগ্নির এই সম্বন্ধ সমগ্র ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানে দৃষ্ট নহে। ভবিষ্যতের প্রত্যক্ষ হইবার তো কোনও সম্ভাবনাই নাই। অতীতেও সর্ব্বস্থানের সর্ব্বকালের ধূম আমার প্রত্যক্ষ হয় নাই, সুতরাং ধূমের সঙ্গে যে অগ্নি সর্ব্বকালেই থাকে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ নাই। ব্যাপ্তিজ্ঞান সীমিত-সংখ্যক প্রত্যক্ষের উপর প্রতিষ্ঠিত। অভিজ্ঞতার সীমা পর্য্যন্ত ব্যাপ্তির সীমা। সুতরাং তাহা হইতে অনুমান

অসিদ্ধ। প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য কোনও প্রমাণ নাই। যাহা প্রত্যক্ষ হয়, তাহাই সত্য। যাহা প্রত্যক্ষ হয় না, তাহার অস্তিত্ব নাই। অন্যের সাক্ষ্যের কোনও মূল্য নাই। উপমা হইতে অনুমান সম্ভব পর নহে। অনুমান সত্য হইতে পারে, নাও পারে। যখন তাহা সত্য হয়, তখন তাহা দৈবাৎ হয়।

এক অনুমান অন্য আর একটি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত, ইহাও বলা চলে না। কেননা ইহা স্বীকার করিলে দ্বিতীয় অনুমানের জন্য অন্য আর একটি অনুমানের প্রয়োজন হয়, এবং তৃতীয় অনুমানের জন্য আবার আর এক অনুমানের প্রয়োজন হয়। ফলে অনবস্থার উদ্ভব হয়। অন্যের সাক্ষ্য যে প্রমাণ হইতে পারে না, তাহার কারণ এই যে, এই সাক্ষ্য অনুমানের উপর নির্ভরশীল। সাক্ষী যে সত্যবাদী, তাহাও অনুমানসাপেক্ষ। বিশেষতঃ অনুমান যদি অন্যের সাক্ষ্যের উপরই নির্ভর করে, তাহা হইলে কেহই নিজে কিছুই অনুমান করিতে পারে না।

যদি বল ধূম ও অগ্নির মধ্যে সার্বিক সম্বন্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না, ইহা যদি স্বীকারও করা যায়, তাহা হইলেও ধূম-সামান্য এবং অগ্নি-সামান্য যে সহভাবী, তাহা তো সর্বত্রই প্রত্যক্ষ হয়। অগ্নিত্ব ও ধূমত্বের এই নিত্য সহভাব হইতে অগ্নি ও ধূমের সহভাব অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু অগ্নিত্ব ও ধূমত্বের মধ্যে সম্বন্ধজ্ঞানও সীমিত-সংখ্যক অগ্নি ও ধূমের সহভাবের উপরে প্রতিষ্ঠিত। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সার্বিক সহভাবের জ্ঞান প্রত্যক্ষ হইতে প্রাপ্ত হইবার সম্ভাবনা নাই।

প্রত্যক্ষই যখন একমাত্র জ্ঞান, তখন জড়ই একমাত্র সত্য, কারণ জড় বস্তুই কেবল প্রত্যক্ষ হয়। ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ সনাতন। তাহাদের হইতেই বুদ্ধির আবির্ভাব। তাম্বুল, সুপারি এবং চূণের সংযোগে যেমন রক্তবর্ণের উৎপত্তি হয়, তেমনি ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ এই চারি পদার্থের সমবায়ে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়।

যাগযজ্ঞের কোনও ফল নাই। মণি, মন্ত্র ও ঔষধের ব্যবহারে যেমন কখনও কখনও ফল পাওয়া যায়, যাগযজ্ঞাদির ফলও তেমনি আকস্মিক। "অদৃষ্ট" বলিয়া কিছু নাই। জগতে নানা প্রকার সৃষ্টি, সকলই আকস্মিক। ইহার কোনও কারণ নাই। যদি তাহা স্বীকার না কর, তাহা হইলে জগতের এই বৈচিত্র্য স্বভাব হইতে উদ্ভূত বলিতে হইবে, যেমন অগ্নির উষ্ণতা, জলের শৈত্য ও বায়ুর শীতল স্পর্শ। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, স্বর্গ নাই, অপবর্গ নাই,

আত্মা নাই, পারলৌকিকও কিছু নাই। বর্ণাশ্রমে উপদিষ্ট কোন ক্রিয়ারও কোনও ফল নাই। যজ্ঞে নিহত পশু যদি স্বর্গে যায়, তবে যজমান যজ্ঞে নিজের পিতাকে বলি দেয় না কেন? মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করিলে যদি তাহার তৃপ্তি হয় (শ্রাদ্ধে দত্ত দ্রব্য যদি মৃত ব্যক্তি পাইতে পারে), তাহা হইলে ভ্রমণে বাহির হইবার সময় পাথেয়-সংগ্রহের প্রয়োজন কি? (গৃহে অন্ন রন্ধন করিয়া নিবেদন করিলেই তো সেই দূরস্থিত ব্যক্তি পাইতে পারে)। স্বর্গে অবস্থিত পিতা যদি পৃথিবীতে দত্ত দান প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে পৃথিবীতে অবস্থিত পিতাকে প্রাসাদোপরি রাখিয়া নিম্নে দান করিলে, তিনি তাহা পান না কেন? "যাবৎ জীবেৎ, সুখং জীবেৎ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ, ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ?" যতদিন বাঁচিবে, সুখে বাঁচিবার চেষ্টা করিবে, ঋণ করিয়া ঘৃত পান করিবে। ভস্মীভূত দেহ কিরূপে ফিরিয়া আসিবে? দেহ হইতে বাহির হইয়া যদি জীব পরলোকে গমন করে, তবে বন্ধু-স্নেহবশতঃ ফিরিয়া আসে না কেন? ব্রাহ্মণেরা শ্রাদ্ধাদির ব্যবস্থা করিয়া আপনাদের জীবিকার ব্যবস্থা করিয়াছে। "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ, ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ। জর্ব্বরীতুর্ব্বরীত্যাদি পণ্ডিতানাং বচঃ স্মৃতম্।" তিন বেদের কর্ত্তাগণ ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর। "জর্ব্বরী তুর্ব্বরী" প্রভৃতি বিকট বাক্যে বেদ পূর্ণ। বহু প্রাণীর উপকারের জন্য রমণীয় চার্ব্বাক মত আশ্রয়নীয়।

ইহাই চার্ব্বাক দর্শন। ইহার অসংযত ভাষা ও দুর্নীতিমূলক মত পড়িয়া মনে হয়, কেহ বা জড়বাদকে লোকসমাজে ঘৃণিত করিবার জন্য এতাদৃশ ভাষায় উহার প্রচার করিয়াছে। কিন্তু কোনও কোনও বৌদ্ধ গ্রন্থেও ব্রাহ্মণদিগের গ্লানিকর ভাষা প্রযুক্ত হইয়াছে। সুতরাং উপরি উদ্ধৃত শ্লোকগুলি চার্ব্বাকবাদীদিগেরই রচিত মনে করিতে হইবে। সুখই এই মতে জীবনের লক্ষ্য, কিন্তু সুখের মধ্যে কোনও গুণভেদ ইহা স্বীকার করে না। উচ্চতর সুখের জন্য হীনতর সুখ-ত্যাগের কথাও বলে না। কর্ম্মের ভালমন্দ, পাপপুণ্য ইহা স্বীকার করে না। এই নীতিহীন সমাজবিরোধী মত যদি সমাজের সর্ব্বস্তরে বিস্তৃত হইত, তাহা হইলে সমাজধ্বংস অনিবার্য্য হইত। সুতরাং এই মত যে বহুল প্রচারিত হইয়াছিল, তাহা মনে করা যায় না। মেগাস্থিনীসের বিবরণ বহু পরবর্ত্তী হইলেও তাহাতে তৎকালীন সমাজ নীতিহীন বলিয়া বর্ণিত হয় নাই; চৌর্য্য ও দস্যুতা তখন নিতান্তই বিরল ছিল।

কিন্তু চার্ব্বাকবাদী সকলেই যে সুখের গুণভেদ স্বীকার করিত না, তাহা না হইতেও পারে। দুই শ্রেণীর চার্ব্বাকবাদীর উল্লেখ প্রাচীন সাহিত্যে দেখিতে

পাওয়া যায়—ধূর্ত্ত ও সুশিক্ষিত। উভয়ের মধ্যে কি ভেদ ছিল, তাহা জানিতে পারা যায় নাই। "সুশিক্ষিত" বিশেষণ হইতে মনে হয় সুশিক্ষিত চার্ব্বাক-পন্থিগণ উচ্চতর সুখকেই জীবনের লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিল।

ভারতীয় দর্শনে চার্ব্বাক দর্শনের যে একটী মূল্য আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যতই ঘৃণিত হউক, এই মতের সংঘাতে দার্শনিক চিন্তা নূতন সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিল। অন্যান্য সকল দর্শন চার্ব্বাক-মত-খণ্ডনে প্রয়াসী হইয়াছিল এবং যুক্তিহীন বিশ্বাস বর্জ্জন করিয়া যুক্তিদ্বারা স্ব স্ব মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিল।

চার্ব্বাক দর্শনের সুখ-বাদের সহিত গ্রীক দর্শনের সুখ-বাদের কিঞ্চিৎ আলোচনা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। খৃষ্ট পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে জন্মগ্রহণ করিয়া আরিস্টিপ্পাস সাইরেনাইক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সুখকেই জীবনের লক্ষ্য বলিতেন এবং সুখের গুণভেদ স্বীকার করিতেন না। এই সুখ কেবল দৈহিক সুখ, বর্ত্তমানের সুখ, সমগ্র জীবনের সুখ নহে। কোনও কর্ম্ম হইতে যদি সুখের উৎপত্তি হয়, তবে তাহা কর্ত্তব্য, পরিণামের কথা ভাবিবার প্রয়োজন নাই, ইহাই ছিল তাহার মত। কিন্তু সুখের প্রাপ্তি ও তাহার রক্ষার জন্য তিনি বিচার, আত্মসংযম ও বিশেষ বিশেষ কামনা জয় করিবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতেন, এবং তাঁহার মতে সুখের জন্য পারিপার্শ্বিক অবস্থা জয় করিতে হইবে, তাহার দাস হইলে চলিবে না। তাহার জন্য কোন্ সুখ বর্জ্জন করিয়া কোন্‌টি গ্রহণ করিতে হইবে, তাহার বিচার আবশ্যক। তাঁহার আত্ম সংযমের অর্থ ভোগবর্জ্জন নহে, বিচারপূর্ব্বক ভোগ। সকল সুখই একজাতীয়, ভালমন্দ তাহার মধ্যে নাই, ইহা তিনি বলিতেন।

খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে এপিকিউরাসের আবির্ভাব হয়। তাহার শিষ্য নাস্তিক লাটিন কবি লুক্রেসিয়াস্ লিখিয়াছিলেন, "মানব জীবন যখন ধর্ম্মের নিষ্ঠুরতায় দলিত ও লাঞ্ছিত ছিল, এপিকিউরাস তখন ধর্ম্মের নিগড় হইতে মানবকে মুক্ত করিরাছিলেন।" এপিকিউরাস সুখকেই পুরুষার্থ বলিয়া গণ্য করিলেও তাহার দর্শন ছিল, চরিত্রনীতিমূলক। জড়বাদ তাহার দর্শনের তাত্ত্বিক ভিত্তি হইলেও, এবং তাহাতে ঈশ্বর ও পরকালের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হইলেও, তাহার মতে সৎকর্ম্মের ফল সুখ, এবং সেই জন্যই তাহা করণীয়। সমগ্র জীবনব্যাপী স্থায়ী ও শান্ত সুখই এপিকিউরাসের দর্শনের সুখ। দুঃখের সোপান বলিয়া অনেক তথাকথিত সুখ তাঁহার মতে বর্জ্জনীয় এবং সুখের সোপান বলিয়া অনেক দুঃখ গ্রাহ্য। সমগ্র জীবনব্যাপী

সুখ দৈহিক সুখ হইতে পারে না, তাহা আধ্যাত্মিক সুখ। দেহের অনেক সুখ জ্ঞানীর কাম্য হইতে পারে না। অবিচলিত ধৈর্য্য ও শান্তি, স্বকীয় উৎকৃষ্টতর স্বরূপের উপলব্ধি এবং অদৃষ্টের আঘাতের উর্দ্ধে স্থিতিই জ্ঞানীর আধ্যাত্মিক সুখ। এপিকিউরাস বলিয়াছিলেন সুকৃতি ও সুখ পরস্পর সম্বন্ধ এবং সুকৃতি ব্যতীত সুখ, এবং সুখ ব্যতিরেকে সুকৃতি (virtue) অসম্ভব। আত্মসংযম, মিতাচার, সন্তোষ ও প্রকৃতির অনুগত জীবন ভিন্ন সুখ হইতে পারে না। চিত্তের প্রশান্তি ও মনের স্থৈর্য্যই স্থায়ী আনন্দের উৎস। সুখের বাস্তব অনুভূতি ভাবাত্মক সুখ, দুঃখের অভাব হইতে উদ্‌ভূত প্রশান্তির অনুভূতি অভাবাত্মক সুখ। এই অভাবাত্মক সুখই পুরুষার্থ। ভাবাত্মক সুখ আনন্দের বৃদ্ধি না করিয়া তাহা জটিল করিয়া তোলে। প্রকৃতির অনুসরণ করিলেই আনন্দ পাওয়া যায়। অত্যধিক আকাঙ্ক্ষা এবং ভবিষ্যৎ অনিষ্টের ভয় জীবনকে বিষাক্ত করে। মৃত্যু যখন আসে, তখন আমাদের অস্তিত্বের বিলোপ হয়, সুতরাং মৃত্যুকে ভয় করিবার কিছু নাই। দুঃখের প্রধান কারণ ভয়। মৃত্যু ও প্রচলিত ধর্ম্ম-বিশ্বাস ভয়ের কারণ। মৃত্যুর পরে মানুষ দুঃখে পতিত হয়, ইহাই প্রচলিত ধর্ম্মে শিক্ষা দেয়। কিন্তু মৃত্যুর পরে দুঃখভোগ করিবার কেহ থাকে না। সুতরাং ভয়ের কারণ নাই। ঈশ্বরে বিশ্বাস না করিলেও এপিকিউরাস দেবতাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু তাঁহার মতে দেবতাগণ মানুষের সম্বন্ধে কিছুই করেন না। এই সুখবাদ ও চার্ব্বাকবাদ নিতান্ত ভিন্ন।

২

জৈন দর্শন

জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তি

জৈন ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠাতা বর্দ্ধমান মহাবীর বৈশালী নগরে (বর্ত্তমান পাটনার ২৭ মাইল উত্তরে) "জ্ঞাত" নামে এক ক্ষত্রিয় বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল সিদ্ধার্থ এবং মাতার নাম ত্রিশলা। বৈশালী ছিল লিচ্ছবী-বংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের রাজ্য, এবং মহাবীরের মাতা ছিলেন লিচ্ছবীরাজের ভগিনী। মহাবীরের জন্ম হয় বুদ্ধদেবের কিছু পূর্ব্বে। মহাবীরের স্ত্রীর নাম ছিল যশোদা। তাঁহার গর্ভে এক কন্যার জন্ম হয়। মহাবীরের বয়স যখন ত্রিশ বৎসর, তখন তাঁহার পিতামাতার মৃত্যু হয়। তাহার পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নন্দীবর্দ্ধনের অনুমতি লইয়া তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং বারো বৎসর কঠোর তপস্যার পরে

কৈবল্য-সিদ্ধি প্রাপ্ত হন। ৪২ বৎসর ধর্ম্মপ্রচার করিয়া তিনি খৃষ্টপূর্ব্ব ৫২৭ অব্দে পরলোকগমন করেন।

তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া মহাবীর "জিন" হন। যিনি ষড়রিপু জয় করিয়াছেন, তিনিই জিন। জৈন শাস্ত্রে চব্বিশ জন তীর্থঙ্করের নাম আছে। মহাবীর শেষ তীর্থঙ্কর। তীর্থ শব্দের অর্থ "ঘাট"। যাহাদ্বারা নদীগর্ভ হইতে তীরে উত্তীর্ণ হওয়া যায়, তাহাই তীর্থ। জৈন তীর্থঙ্করগণ সংসার-সমুদ্র হইতে উত্থিত হইবার সোপান প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন বলিয়া তাঁহারা তীর্থঙ্কর। মহাবীরের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী তীর্থঙ্করের নাম পার্শ্বনাথ। ৭৭৬ খৃষ্ট-পূর্ব্বাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। তাহার বহু শতাব্দী পূর্ব্বে প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল বলিয়া জৈনগণ বিশ্বাস করেন। কিন্তু জৈন ধর্ম্ম সনাতন, এবং যুগে যুগে তীর্থঙ্করগণ আবির্ভূত হইয়া এই ধর্ম্মের প্রচার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস। বর্ত্তমান যুগের প্রথম তীর্থঙ্করই ঋষভদেব। সকল তীর্থঙ্করই মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মোক্ষপ্রাপ্তির অর্থ আমরা পরে আলোচনা করিব।

শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর সম্প্রদায়

জৈনগণ দুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত—শ্বেতাম্বর ও দিগম্বর। "দিগম্বর" শব্দের অর্থ দিগ্বসন—অর্থাৎ বসনহীন, উলঙ্গ। ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব উভয় সম্প্রদায়েরই এক। অন্য বিষয়ে উভয় সম্প্রদায়ে যে ভেদ তাহা এই : শ্বেতাম্বর জৈনগণের বিশ্বাস যে মহাবীরের ভ্রূণ প্রথম দেবানন্দা নাম্নী নারীর গর্ভে উৎপন্ন হয়, এবং সেই ভ্রূণ ত্রিশলার গর্ভে স্থানান্তরিত হয়। দিগম্বরগণ ইহা বিশ্বাস করেন না। দ্বিতীয়তঃ, যাঁহারা সাধনায় সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কোন খাদ্যই গ্রহণ করেন না বলিয়া দিগম্বরদিগের বিশ্বাস, কিন্তু ইহা শ্বেতাম্বরগণ স্বীকার করেন না। তৃতীয়তঃ, দিগম্বরদিগের মতে যে সন্ন্যাসী কোনও সম্পত্তির অধিকারী এবং যিনি বস্ত্র পরিধান করেন, তিনি এবং কোনও স্ত্রীলোকই মোক্ষলাভ করিতে পারে না, মোক্ষলাভের জন্য স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষরূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয়। শ্বেতাম্বরগণ ইহাও স্বীকার করেন না। শ্বেতাম্বরদিগের ধর্ম্ম-শাস্ত্রের প্রামাণ্য দিগম্বরগণ স্বীকার করেন না। তাহাদের মতে মহাবীরের তিরোধানের পরেই জৈন শাস্ত্র তিরোহিত হয়। ৮৩ খৃষ্টাব্দে দিগম্বর-শাখা মূল-সম্প্রদায় হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। দিগম্বরগণ বলেন, তাঁহারাই সনাতন আচার পালন করিতেছেন। তাঁহারা আরও বলেন, মহাবীরের

তিরোধানের বহু দিন পরে প্রাচীন আচারের কঠোরতা বর্জন করিয়া অর্দ্ধকালক নামে সম্প্রদায় স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে এবং অর্দ্ধকালকগণই পরে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। পরবর্ত্তীকালে ৮৪টি বিভিন্ন সম্প্রদায়ে জৈনগণ বিভক্ত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভেদ নিতান্তই তুচ্ছ বিষয়ে।

সমগ্র ভারতবর্ষে জৈনদিগের সংখ্যা কুড়ি লক্ষও নহে। দিগম্বর জৈন বাংলায় বেশী নাই। দক্ষিণ ভারতে, পূর্ব্ব রাজপুতানা এবং পঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে তাহাদের বাস। ভারত বিভাগের পরে তাহাদের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ আছে। গুজরাট এবং পশ্চিম রাজপুতানাতেই অধিকাংশ শ্বেতাম্বর জৈন বাস করেন। জৈন সন্ন্যাসিগণ ভিক্ষোপজীবী, কৌপীনধারী ও ক্ষৌরিতমস্তক। সম্বল তাহাদের ভিক্ষাপাত্র ও যষ্টিমাত্র। প্রত্যহ তিন ঘণ্টার অধিক কাল নিদ্রা যাওয়া তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। দিনের অবশিষ্ট সময় তাহাদের পাপের জন্য অনুতাপ ও প্রায়শ্চিত্ত, ধ্যান, অধ্যয়ন এবং ভিক্ষায় ব্যয়িত হয়। যাহাতে কোনও প্রাণী-হত্যা না হয়, তাহার দিকে গৃহী ও সন্ন্যাসী প্রত্যেক জৈনকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হয়। কৃষি ও অন্যান্য যে সকল ব্যবসায়ে জীবহত্যার সম্ভাবনা আছে, তাহাদের দ্বার জৈনদিগের নিকটে রুদ্ধ। এই জন্য অধিকাংশ জৈনই বাণিজ্য-ব্যবসায়ী।

জৈন দার্শনিক গ্রন্থের মধ্যে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি উল্লেখযোগ্য :

(১) উমাস্বাতিকৃত তত্ত্বার্থাধিগম সূত্র (তৃতীয় শতাব্দীর পরবর্ত্তী)
(২) সিদ্ধসেন দিবাকরকৃত ন্যায়াবতার (৫ম শতাব্দী)
(৩) হরিভদ্রকৃত ষড়্দর্শন সমুচ্চয় (৯ম শতাব্দী)
(৪) মেরুতুঙ্গ রচিত ষড়্দর্শন বিচার (১৪শ শতাব্দী)
( ) নবতত্ত্ব (অজ্ঞাত) (১৪শ শতাব্দী)
(৬) হেমচন্দ্রের যোগশাস্ত্র (১২শ শতাব্দী)
(৭) দেবসূরিকৃত প্রমাণ-নয়-তত্ত্বালোকালংকার (১২শ শতাব্দী)
(৮) বিদ্যানন্দকৃত জৈন শ্লোক বার্ত্তিক (৮ম শতাব্দী)
(৯) গুণভদ্র রচিত আত্মানুশাসন (৯ম শতাব্দী)
(১০) নেমিচন্দ্র রচিত দ্রব্যসংগ্রহ (১০ম শতাব্দী)
(১১) অমিতচন্দ্র রচিত তত্ত্বার্থসার
(১২) মল্লিসেনকৃত স্যাদ্বাদমঞ্জরী (১৩শ শতাব্দী) (১৩) গোম্মতসার
(১৪) লব্ধীসার (১৫) ক্ষপাসার (১৬) ত্রিলোকসার
(১৭) পুরুষার্থসিদ্ধ্যুপায় (৯ম শতাব্দী) (১৮) তর্কবার্ত্তিক

জৈন শাস্ত্র

জৈন ধর্ম্ম যে অতি প্রাচীন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যজুর্ব্বেদে ঋষভ, অজিতনাথ এবং অরিষ্টনেমি নামে তিন জন তীর্থঙ্করের উল্লেখ আছে। ভাগবত পুরাণ মতে ঋষভদেব হইতেই জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তি হয়। প্রাচীনতম বৌদ্ধগ্রন্থে "নিগন্থ" নামে এই সম্প্রদায়ের এবং তাহার গুরু নাতপুত্র বর্দ্ধমান মহাবীরের উল্লেখ আছে। বুদ্ধের সময়ে যে সকল রাজা ছিলেন, জৈন শাস্ত্রেও মহাবীরের সমসাময়িক বলিয়া তাহাদের উল্লেখ আছে। অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় জৈন শাস্ত্রও প্রথমে কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা হইত। সমগ্র শাস্ত্র কণ্ঠস্থ রাখা দুরূহ। ফলে প্রাচীন শাস্ত্রের কিয়ৎ অংশ নষ্ট হয় এবং মতভেদের উৎপত্তি হয়। খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে পাটলিপুত্র নগরে জৈন ধর্ম্মের প্রকৃত মতগুলি নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এক সভার অধিবেশন হয়। ইহার পরে খৃষ্টীয় ৪৫৪ অব্দে বলভী নগরে আর এক সভায় ধর্ম্মমতগুলি চূড়ান্তরূপে নির্দ্ধারিত হয়। এই সভায় ৮৪খানা গ্রন্থ শাস্ত্র বলিয়া গৃহীত হয়। ইহাদের মধ্যে ৪১খানা সূত্রগ্রন্থ, ১২খানা নির্যুক্তি (ভাষ্য), একখানা মহাভাষ্য, এবং কতকগুলি প্রকীর্ণক (বিচ্ছিন্ন—অশ্রেণীবদ্ধ) গ্রন্থ ছিল। সূত্রগ্রন্থদিগের মধ্যে ছিল ১১ অঙ্গ, ১২ উপাঙ্গ, পাঁচ ছেদ, পাঁচ মূল, এবং আট বিবিধ গ্রন্থ। ভদ্রবাহুর কল্পসূত্র শেষোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সকল গ্রন্থ অর্দ্ধমাগধী ভাষায় লিখিত ছিল। কিন্তু খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে সংস্কৃত ভাষাতেও জৈন গ্রন্থ লিখিত হইতে থাকে। দিগম্বর জৈনদিগের মতে খৃষ্টীয় ৫৭ অব্দে জৈন ধর্ম্মশাস্ত্র লিপিবদ্ধ হয়। এই সময়ে শাস্ত্রে অভিজ্ঞ লোকের অভাব হইয়াছিল, এবং মহাবীরের ও কেবলী সন্তদিগের উপদেশসকলের মধ্যে যাহা যাহা কাহারও কাহারও স্মৃতিতে রক্ষিত ছিল, তাহাই মাত্র শাস্ত্রের অবশিষ্ট ছিল। ইহার উপরই সপ্ততত্ত্ব, নবপদার্থ, ষড়্‌দ্রব্য এবং পঞ্চ অস্তিকায় সম্বন্ধীয় শাস্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এই সমস্ত শাস্ত্রের বহু ভাষ্য ও টীকা পরে রচিত হইয়াছিল।

সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগেও সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় পদ্য ও গদ্যে জৈনদিগের অনেক গ্রন্থ আছে। কাব্য, নাটক, নীতি-কথা, ব্যাকরণ, বিজ্ঞান, দর্শন প্রভৃতি বিভাগে জৈনদিগের দান সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় নগণ্য নহে।

জৈন ধর্ম্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও জৈন ধর্ম্মের মধ্যে কয়েক বিষয়ে যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। উভয় ধর্ম্মেই অহিংসাই পরম ধর্ম্ম। বৌদ্ধ ও জৈন উভয় সম্প্রদায়েই বহু সন্ন্যাসী আছে। উভয়েই নিরীশ্বরবাদী। উভয় ধর্ম্মেই বেদের প্রামাণ্য অস্বীকৃত। বুদ্ধ ও মহাবীরের উপদেশের মধ্যেও আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্ত্তমান। ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম মূলতঃ এক এবং জৈন ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের এক শাখা। গৌতম বুদ্ধ ও মহাবীরের জীবনের ঘটনার মধ্যেও আশ্চর্য্য সাদৃশ্য বর্ত্তমান। উভয়েই রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। উভয়েই বিবাহ করিয়াছিলেন। উভয়ের আত্মীয় ও শিষ্যদিগের নামের মধ্যেও সাদৃশ্য আছে। একই শতাব্দীতে প্রায় এক সময়েই উভয়ের আবির্ভাব হইয়াছিল। বুদ্ধ নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হন ৫৪৩ খৃঃ পূঃ অব্দে, মহাবীর ৫২৬ খৃঃ পূঃ অব্দে। মৌর্য্যবংশীয় রাজগণ তাহাদের সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, ইহা উভয় সম্প্রদায়েরই দাবি। উভয় ধর্ম্মের তীর্থস্থানগুলি পরস্পরের নিকটবর্ত্তী। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিলে মনে হয় এই দুই সম্প্রদায়ের একটি অন্যটির শাখা। এই সমস্ত সাদৃশ্যের উল্লেখ করিয়া বার্থ তাঁহার Religions of India গ্রন্থে বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে জৈন ধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছে বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু কোলব্রুকের মতে জৈন ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতে প্রাচীন। প্রায় প্রত্যেক বস্তুরই আত্মা আছে, এই জীববাদ (animism) জৈন-ধর্ম্মের বিশেষত্ব। বৌদ্ধ ধর্ম্মে এই বিশ্বাস নাই। এই বিশ্বাস কোলব্রুকের মতে ধর্ম্মের অভিব্যক্তির ইতিহাসে প্রথমেই উদ্‌ভূত হয়। জেকোবি, বুলহার এবং অন্যান্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা বার্থের মত গ্রহণ করেন নাই। গৌতম বুদ্ধ ও বর্দ্ধমান মহাবীরের জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে যেমন সাদৃশ্য আছে, তেমনি প্রভেদও আছে, এবং জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে বিভিন্ন উৎস হইতে উদ্‌ভূত, তাহাতে বর্ত্তমানে কেহ সন্দেহ করেন না। জৈন ধর্ম্ম বৌদ্ধ ধর্ম্মের পূর্ব্ববর্ত্তী।

জৈন-দর্শন

জৈন সাহিত্য প্রধানতঃ পালি ভাষায় লিখিত। কিন্তু অন্যান্য সম্প্রদায়ের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য জৈন দার্শনিকগণ সংস্কৃত ভাষাতেও গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।

জৈন দর্শন বহুত্ববাদী ও বস্তুবাদী। বাহ্য জগৎ, যাহা আমরা ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রত্যক্ষ করি, তাহা সত্য। জগতে দ্বিবিধ বস্তুর অস্তিত্ব আছে—প্রাণবান্ ও

প্রাণহীন। প্রত্যেক প্রাণবান্ বস্তুর আত্মা (জীব) আছে। সুতরাং অহিংসা—জীবহিংসা-বর্জ্জন—জৈন মতে পরম ধর্ম্ম। জৈন ধর্ম্মের আর একটি প্রধান কথা পরের মতের প্রতি সম্মান-প্রদর্শন। জৈন অনেকান্তবাদের উপর এই পরমত-সহিষ্ণুতা প্রতিষ্ঠিত।

জৈন মনো-বিজ্ঞান

জৈন মতে সংবিদ (consciousness) প্রত্যেক আত্মার স্বরূপ। জড় হইতে সংবিদের উদ্ভব হইতে পারে না। সংবিদ্ স্ব-প্রকাশ। সূর্য্যালোকের ন্যায় অন্যের সাহায্য ব্যতীত সংবিদ আপনিই প্রকাশিত হয় এবং অন্য বস্তুও ইহার আলোকে প্রকাশিত হয়। অন্য বস্তু যখন সংবিদ্‌কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয় না, তখন কোনও বাধাকর্ত্তৃক সংবিদের আলোক প্রতিহত হওয়াই তাহার হেতু। বাধা যদি না থাকিত, তাহা হইলে প্রত্যেক আত্মাই সর্ব্বজ্ঞ হইতে পারিত। শক্যভাবে সর্ব্বজ্ঞতা প্রত্যেক আত্মায় বর্ত্তমান, কিন্তু এই শক্যতা যে বাস্তবতা প্রাপ্ত হইতে পারে না, তাহার কারণ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের বাধা। আমাদের মন, ইন্দ্রিয় ও দেহ পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল, এবং ইহারাই আত্মার সর্ব্বজ্ঞত্ব-প্রাপ্তির পথে বাধা।

জৈন মতে জ্ঞান মুখ্যতঃ দ্বিবিধ—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ। অপরোক্ষ জ্ঞান অব্যবহিত জ্ঞান, বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয়-সাহায্যে লব্ধ জ্ঞান; পরোক্ষ জ্ঞান অনুমান-লব্ধ-ব্যবহিত জ্ঞান। ইন্দ্রিয়জাত জ্ঞান সম্পূর্ণ অপরোক্ষ নহে, কেননা আত্মা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ভিন্ন এই জ্ঞানলাভে সমর্থ হয় না। ইন্দ্রিয়লব্ধ ব্যাবহারিক জ্ঞানের অতিরিক্ত সম্পূর্ণ অপরোক্ষ (পারমার্থিক) জ্ঞানেরও অস্তিত্ব আছে। কর্ম্মের বাধা দূরীভূত হইলে সেই জ্ঞানলাভ হয়। তখন আত্মা অব্যবহিত-ভাবে বিষয়ের জ্ঞানলাভ করে, ইন্দ্রিয়দিগের ও মনের তখন প্রয়োজন হয় না।

পূর্ণ অপরোক্ষ জ্ঞান ত্রিবিধ—(১) অবধি জ্ঞান, (২) মনঃ-পর্য্যায় এবং (৩) কেবল জ্ঞান। যখন কেহ কর্ম্মের বাধা আংশিকভাবে দূর করিতে সমর্থ হয়, তখন সে দূরস্থ অথবা অতি সূক্ষ্ম অথবা অস্পষ্ট রূপবান বস্তু দর্শন করিবার শক্তিলাভ করে। এই জ্ঞান সীমাবদ্ধ বলিয়া ইহার নাম অবধি জ্ঞান। বর্ত্তমানে এতাদৃশ জ্ঞানকে Clairvoyance বলে। ঘৃণা, ঈর্ষা প্রভৃতি হইতে মুক্ত হইতে পারিলে অন্য মনের (অতীত ও বর্ত্তমান বিষয়ের) জ্ঞানলাভ করা যায়। ইহাই মনঃ-পর্য্যায়। বর্ত্তমানে ইহাকে Telepathy বলে। যখন

জ্ঞানবিরোধী যাবতীয় কর্ম্মের বিনাশ সাধিত হয়, তখন সর্ব্বজ্ঞতাপ্রাপ্তি হয়। ইহাই কেবল জ্ঞান। মুক্ত আত্মাগণই এই জ্ঞানলাভ করেন। এই জ্ঞান দেশকালে অবাধিত এবং সর্ব্বপ্রসারী। ইহা ইন্দ্রিয়-নিরপেক্ষ এবং বর্ণনাতীত, কিন্তু অনুভবগম্য।

উপরি উক্ত কয়েক প্রকার অপরোক্ষ জ্ঞান ব্যতীত আর দুই প্রকার জ্ঞান হইতেছে মতি-জ্ঞান এবং শ্রুতি-জ্ঞান। ইন্দ্রিয় অথবা মনের সাহায্যে যে কোনও জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহাই মতি। বাহ্য বস্তুর ইন্দ্রিয়জ এবং মনোজ জ্ঞান, স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, তর্ক, অভিনিবোধ, অনুমান (deductive reasoning) "মতি"র অন্তর্গত। মতি-জ্ঞান আবির্ভাবের পূর্ব্বে ইন্দ্রিয়ে প্রথমে বস্তুর দর্শন হয়। এই দর্শনই মতি-জ্ঞানে পরিণত হয়। শব্দ, প্রতীক এবং চিহ্ন দ্বারা যে জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা শ্রুতি। মতি-জ্ঞান বস্তুর সহিত পরিচয় হইতে লব্ধ হয়। শ্রুতি-জ্ঞান উৎপন্ন হয় বস্তুর বর্ণনা শুনিয়া।

মতি, শ্রুতি ও অবধি জ্ঞানে ভ্রম সম্ভবপর। কিন্তু মনঃ-পর্য্যায় ও কেবল জ্ঞান অভ্রান্ত। জ্ঞানের সত্যতা নির্ভর করে ব্যবহারে তাহার হিতকারিতার উপর। যে জ্ঞানদ্বারা আমরা যাহা মঙ্গলকর, তাহা প্রাপ্ত হই, এবং যাহা অমঙ্গলকর, তাহা পরিহার করি, তাহাই সত্য। বস্তু প্রকৃতপক্ষে যাহা, তাহাই সত্য জ্ঞানে প্রতিফলিত হয়। এই জন্যই তাহা হিতকারী। মিথ্যা-জ্ঞানে বস্তুর অন্যান্য বস্তুর সহিত সম্বন্ধ সত্যভাবে প্রকাশিত হয় না। যখন শুক্তিতে মুক্তাভ্রম হয়, তখন যে স্থানে ও কালে মুক্তার অস্তিত্ব নাই, সেই স্থানে ও সেই কালে মুক্তার দর্শন হয়। ভ্রান্ত জ্ঞানের লক্ষণ সংশয়, বিপর্য্যয় (বস্তু স্বরূপতঃ যাহা, তাহার বৈপরীত্য) এবং অনধ্যবসায় (অসতর্কতাজনিত ভ্রম)।

অন্যের নিকট শ্রবণ হইতে যে জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, তাহাই শ্রুত জ্ঞান। লিখিত গ্রন্থ পাঠ করিয়া যে জ্ঞান হয় তাহাও শ্রুতজ্ঞান। এই জ্ঞানের পূর্ব্বে মতি জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কথিত ও লিখিত শব্দের জ্ঞান শ্রুত জ্ঞানের জন্য প্রয়োজন।

কেহ কেহ প্রত্যক্ষ জ্ঞানকে সংব্যবহারিক এবং সার্ব্বিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। অবধি, মনঃ-পর্য্যায় এবং কেবল জ্ঞান পারমার্থিক জ্ঞান। ইন্দ্রিয়জ (ইন্দ্রিয় নিবন্ধন) এবং ইন্দ্রিয়নিরপেক্ষ (অতিন্দ্রিয় নিবন্ধন) জ্ঞান সংব্যবহারিক জ্ঞানের অন্তর্গত। সংব্যবহারিক প্রত্যক্ষ আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের জ্ঞান। স্মৃতি এই জ্ঞান হইতে উদ্‌ভূত হয়। জ্ঞানের ইচ্ছা

পরিতৃপ্তি-ক্রিয়াই সংব্যবহারিক প্রত্যক্ষ। কেবলীর জ্ঞান পূর্ণ (সকল), অন্যের জ্ঞান অপূর্ণ (বিকল)। স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, তর্ক (সার্বিক হইতে বিশেষের জ্ঞান), অনুমান (মধ্যবর্ত্তী অবয়বের middle term সাহায্যে জ্ঞান), এবং আগম (প্রাচীনের সাক্ষ্য) ভেদে পরোক্ষ পঞ্চবিধ। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ জ্ঞানের মধ্যে প্রভেদ স্বচ্ছতার প্রভেদ। কেননা জৈনমতে বাহ্য ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া প্রত্যক্ষ প্রতীতির গৌণ সাধন মাত্র।*

জীবের স্বরূপ চেতনা বা সংবিদ। (Con-sciousness)। প্রথম দর্শন (প্রতীতি), পরে জ্ঞান রূপে চেতনা প্রকাশিত হয়। দর্শনে বস্তুর অস্তিত্ব মাত্রের অনুভব হয়, তাহার বিশেষত্বের জ্ঞান হয় না। তাহা সংবেদনের অনুভবমাত্র। তাহার অর্থবোধ হয় না। "জ্ঞানে" বস্তুর বিশেষত্বের অনুভব হয়। দর্শনের পাঁচক্রম—(১) ব্যঞ্জনাবগ্রহ, (২) অর্থাবগ্রহ, (৩) ইহা, (৪) অবায় এবং (৫) ধারণা। বাহ্য উত্তেজনা, (Stimulus) ইন্দ্রিয়ের বহিঃপ্রান্তে পতিত হইয়া ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার উৎপত্তি করে, এবং বিষয়ীর সহিত বিষয়ের সংযোগ বিধান করে। ইহাই ব্যঞ্জনাবগ্রহ। ইহার ফলে চেতনা উদ্বুদ্ধ হয়, সংবেদন অনুভূত হয়, এবং বস্তুর অস্তিত্বমাত্রের অনুভব হয়। ইহাই অর্থাবগ্রহ। তৃতীয় ক্রম "ইহায়" "ইহা কি" এই প্রশ্নের উদয় হয়, এবং বস্তু সম্বন্ধে বিশিষ্ট জ্ঞানলাভের ও অন্যান্য বস্তুর সহিত ইহার সাদৃশ্য ও ভেদ জানিবার চেষ্টার উদ্ভব হয়। তাহার পরে অতীতের অনুভবের সহিত উপস্থিত অনুভবের সাদৃশ্য ও ভেদের তুলনাদ্বারা বস্তুর বিশেষত্বের অনুভব হয়। ইহাই "অবায়"। তাহার পরে "ধারণা"য় সংবেদন বস্তুর গুণরূপে অনুভূত হয়, এবং তাহার প্রত্যয় স্মৃতিতে রক্ষিত হয়।

জ্ঞানের উপরি উক্ত বিশ্লেষণ হইতে স্পষ্টই প্রতীত হয়, যে জৈন দর্শন বস্তুবাদী (Realist)। ইহাতে বস্তু ও তাহার বিজ্ঞান পৃথক বলিয়া স্বীকৃত-বস্তু বিজ্ঞানবাহ্য, বিজ্ঞানের বাহিরে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত। বস্তুর গুণ এবং বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধ অব্যবহিত ভাবে অনুভূত হয়; তাহা চিন্তা অথবা কল্পনা-সৃষ্ট নহে। জ্ঞান-প্রক্রিয়া-কর্ত্তৃক জ্ঞানের বিষয় কোনও প্রকারে রূপান্তরিত হয় না। জীবের সংবিদ কখনও নিষ্ক্রিয় হয় না, তাহা আপনাকে ও বিষয়কে একসঙ্গে প্রকাশিত

*(Vide Dr Radha Krishnan's Indian Philosophy vol. I. P. 296).

করে। আত্মা ও অনাত্মা—বিষয়ী ও বিষয়—উভয়ে একত্র প্রকাশিত হয়। আলোক যেমন আলোকিত বস্তুর সঙ্গে আপনাকে প্রকাশিত করে, তেমনি জ্ঞান আপনাকে এবং তাহার বিষয়কে প্রকাশিত করে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে জ্ঞান কেবল বাহ্য বস্তুকে প্রকাশ করে, আপনাকে প্রকাশিত করে না। জৈন মতে যখনই কোনও বস্তুর জ্ঞান হয়, তখন বিষয়ী বিষয়ের সঙ্গে আপনাকেও জানে। তাহা যদি না হইত, আত্মা যদি জ্ঞেয় বস্তুর সহিত আপনার জ্ঞানলাভ না করিত, তাহা হইলে কেহই তাহাকে এই জ্ঞান দিতে পারিত না। প্রত্যেক জ্ঞান-ক্রিয়ার সহিত "আমি জানিতেছি" এই জ্ঞান যুক্ত থাকে। সংবিদ কিরূপে অচেতন পদার্থকে প্রকাশিত করিতে পারে, এই প্রশ্ন অর্থহীন, কেননা সংবিদের স্বরূপই হইতেছে বস্তুকে প্রকাশ করা।

আত্মসংবিদে জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের মধ্যে সম্বন্ধ, বাহ্য সম্বন্ধ মাত্র নহে, তাহা অতি ঘনিষ্ঠ। জ্ঞানী ও জ্ঞানের মধ্যে সম্বন্ধও ঘনিষ্ঠ, একটি হইতে স্বতন্ত্র ভাবে অন্যটির অস্তিত্ব থাকে না; কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভেদ নির্দ্দেশ করা যায়। আত্মসংবিদে বিষয়ী, বিষয় ও জ্ঞান একই বস্তুর বিভিন্ন বিভাব (aspects)। জ্ঞানবিহীন কোনও জীবের অস্তিত্ব নাই, এবং জ্ঞানও জীব ব্যতীত অন্যত্র সম্ভবপর নহে।

পূর্ণ অবস্থায় আত্মা পূর্ণ জ্ঞান ও পূর্ণ-দর্শন। এই জ্ঞান ও দর্শন সমকালেই উদ্ভূত হয়, কিন্তু বদ্ধ জীবে জ্ঞানের পূর্ব্বে দর্শনের উদ্ভব হয়। পূর্ণ জ্ঞানে সংশয়, বিমোহ এবং বিভ্রমের স্থান নাই। কর্ম্ম-কর্তৃক দর্শন ও জ্ঞান উভয়েরই বাধা হয়। যে সকল কর্ম্মদ্বারা দর্শনের বাধা হয়, তাহারা দর্শনাবরণীয় কর্ম্ম, এবং যে সকল কর্ম্মদ্বারা জ্ঞানের বাধা হয়, তাহারা জ্ঞানাবরণীয় কর্ম্ম। আত্মার মধ্যেই যাবতীয় জ্ঞান বর্ত্তমান, কিন্তু বাধার অস্তিত্ব বশতঃ সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইতে পারে না। বাধা বিদূরিত হইলেই তাহা প্রকাশিত হয়। জ্ঞানের প্রকাশের বাধা হইতেছে চারি রিপু (Passions—কষায়) এবং প্রবল চিত্তাবেগ (Emotions)। ইহাদের অস্তিত্ববশতঃ আত্মার মধ্যে জড় পদার্থ (সূক্ষ্ম কার্ম্মিক জড়) প্রবেশ করিয়া, আত্মার স্বাভাবিক ক্রিয়ায় বাধাদান করে; ইহার ফলে সাংসারিক জীবনের প্রতি মমতাবোধ উৎপন্ন হয়; এবং যাহা বর্ত্তমান কালে স্বার্থসিদ্ধির অনুকূল, তাহাতেই জ্ঞানকে সীমাবদ্ধ করে। যাহাতে আমাদের স্বার্থ নাই, তাহা আমাদের দৃষ্টির বাহিরে পড়িয়া থাকে। আত্মা যখন জড়ের প্রভাব হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনভাবে ক্রিয়া করিতে সক্ষম হয়, তখন সর্ব্বজ্ঞত্ব প্রাপ্ত হয়। জড়কে আত্মার মধ্য হইতে নিষ্কাশিত করিয়া তাহার

শক্তির ধ্বংস করিতে পারিলেই ইহা সম্ভবপর হয়। সকল আত্মাই চেতন এবং বুদ্ধিমান। জড়ের সহিত তাহাদের বিভিন্ন পরিমাণে সংযোগের দ্বারা বিভেদের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়।

প্রত্যক্ষজ্ঞানে বাহ্যবস্তুর স্বরূপই প্রকাশিত হয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শ হইলে আত্মার দর্শনাবরণ ও জ্ঞানাবরণ উন্মোচিত হওয়ার ফলে আত্মার মধ্যস্থিত জ্ঞান প্রকাশিত হয়। আত্মার দৃষ্টিশক্তিই ইন্দ্রিয়-শব্দবাচ্য, বাহ্য দৈহিক ইন্দ্রিয় নহে। আত্মার সহিত দেহের প্রত্যেক অংশ সংযুক্ত। আত্মার যে অংশ চক্ষুর সহিত সংযুক্ত, সেই অংশে দৃষ্টিজ্ঞান উৎপন্ন হয়। যখন কোনও বস্তুর দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করা যায়, তখন সেই বস্তু দৃষ্ট হইবার যোগ্যতা লাভ করে; তখন দ্রষ্টা আত্মার জ্ঞানাবরণ উত্তোলিত হয়, এবং আবৃত জ্ঞান উন্মুক্ত হয়। বাস্তবিক কেহ চক্ষুদ্বারা দর্শন করে না। চাক্ষুষ জ্ঞান সকল ইন্দ্রিয় জ্ঞানই—জ্ঞানাবরণ উন্মোচনের ফলে আত্মার মধ্যে প্রকাশিত হয়। কোনও ইন্দ্রিয়ই অনুভবগম্য নহে, অর্থাৎ দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি প্রভৃতির অনুভব হয় না। সুতরাং আত্মার বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব-কল্পনা অসংগত। মনের অস্তিত্বও অনুভবগম্য নহে বলিয়া জৈনগণ তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। জীবের কর্ম্মদ্বারাই প্রত্যক্ষ জ্ঞানে আত্মার আবরণ উন্মোচিত হয়। বাহিরে বিষয়ের অস্তিত্ব, আলোক ও ইন্দ্রিয়ের পটুতাও ইহার কারণ।

জৈন দার্শনিকদিগের এই মত হইতে অনুমিত হয়, তাঁহারা আত্মার উপর জড়ের ক্রিয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করেন না। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদিগেরও অনেকে ইহা স্বীকার করেন নাই। জৈন মতে দৈহিক পরিবর্ত্তন ও আত্মিক পরিবর্ত্তন সমকালবর্ত্তী, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নাই। দেহের ঘটনাবলী জড়ের নিয়মানুসারে সংঘটিত হয়। জীবের মানসিক অবস্থা তাহার কর্ম্মের ফল। দৈহিক পরিবর্ত্তনদ্বারা তাহা সংঘটিত হয় না। এই মতে জ্ঞান একটি দুর্বোধ্য ব্যাপার। আত্মার আবরণ-উন্মোচন কিরূপে দৈহিক ক্রিয়ার সমকালে উৎপন্ন হয়, তাহা দুর্ব্বোধ্য।

জৈন তত্ত্ববিদ্যা

অনেকান্তবাদ

জৈন মতে "অনন্তধর্ম্মকং বস্তু"—প্রত্যেক বস্তুর অসংখ্য ধর্ম্ম আছে। বস্তুর মধ্যে অনবরত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে, এবং প্রত্যেক বস্তু প্রতিক্ষণে বিভিন্ন রূপ ধারণ করিতেছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্ বলেন এই সকল পরিবর্ত্তন

মিথ্যা, "বাচারম্ভণ"মাত্র। মৃত্তিকা এবং স্বর্ণ হইতে বিবিধ দ্রব্য নির্মিত হয়; তাহারা সকলেই অস্থায়ী ও মিথ্যা। উৎপন্ন বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে মৃত্তিকা এবং স্বর্ণই স্থায়ী ও সত্য। বিভিন্নতা নামরূপ হইতে উদ্ভূত। নাম ও রূপ মিথ্যা। বৌদ্ধ মতে বস্তুর মধ্যে চিরস্থায়ী বা ধ্রুব কিছুই নাই। তাহার গুণই অনুভূত হয়, এবং গুণসকল নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। চিরস্থায়ী "সৎ" অজ্ঞানের বিজৃম্ভনমাত্র। তাহা কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সকল গুণ কোনও স্থায়ী বস্তুতে আবির্ভূত হয় না, তাহারা তাহাদিগের হইতে ভিন্ন কোন বস্তুর গুণ নহে। গুণ হইতে স্বতন্ত্র কোনও কিছুর অস্তিত্বই নাই। আছে কেবল ক্ষণস্থায়ী গুণসকল। গুণসকল নিত্য পরিবর্ত্তিত হইতেছে। নিত্য পরিবর্ত্তিত হইলেও তাহারা সত্য। জৈন মত এই দুই মতের মধ্যবর্ত্তী। এই মতে গুণের কেবল অস্তিত্ব আছে, তাহাদের আধারের অস্তিত্ব নাই, ইহাও যেমন সত্য নহে, তেমনি বস্তু আছে, কিন্তু তাহাদের গুণ নাই, ইহাও সত্য নহে। দুই মতেই আংশিক সত্য আছে, কিন্তু কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নহে। বস্তুতে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে (১) তাহার কতকগুলি ধর্ম্ম অন্তর্হিত হয়, (২) কতকগুলি নূতন ধর্ম্মের আবির্ভাব হয় এবং (৩) কতকগুলি ধর্ম্মের কোনও পরিবর্ত্তন হয় না। বস্তুর ধর্ম্ম প্রতিক্ষণে যে পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা সত্য, কিন্তু সকলগুলি পরিবর্ত্তিত হয় না, কতকগুলির মাত্র পরিবর্ত্তন ঘটে। যখন মৃত্তিকাপিণ্ড হইতে ঘটের উৎপত্তি হয়, তখন মৃত্তিকার পিণ্ডত্বের ধ্বংস হয়, কিন্তু মৃত্তিকা মৃত্তিকাই থাকে। পিণ্ডরূপ ঘটরূপের উৎপাদন করিয়া বিনষ্ট হয়। বস্তুর কতকগুলি ধর্ম্ম অপরিবর্ত্তিত থাকে বলিয়া বস্তু স্থায়ী। যখন স্বর্ণখণ্ড অলংকারের রূপ ধারণ করে, তখন যে সকল ধর্ম্মের আধার স্বর্ণ, তাহাদের পরিবর্ত্তন হয় না। প্রত্যেক বস্তুর এমন কতকগুলি ধর্ম্ম আছে, যাহা শত পরিবর্ত্তনের মধ্যেও অপরিবর্ত্তিত থাকে। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে একটি অপরিবর্ত্তিত অংশ বর্ত্তমান। সুতরাং 'সতে'র স্বরূপ সম্পূর্ণ অপরিবর্ত্তমানও নহে, সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তমানও নয়। প্রতিক্ষণে তাহার কতকগুলি ধর্ম্ম তিরোহিত হইতেছে এবং কতকগুলি নূতন ধর্ম্ম তাহাতে সংযোজিত হইতেছে। যে সকল ধর্ম্মের পরিবর্ত্তন হয় না, তাহারা বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্ম; যাহাদের পরিবর্ত্তন হয়, তাহারা আপতিক (তটস্থ)। চৈতন্য আত্মার স্বরূপগত ধর্ম্ম। তাহার বিনাশ নাই। কিন্তু সুখ, দুঃখ, কামনা, ইচ্ছা প্রভৃতি আপতিক। দ্রব্যের সকল পরিবর্ত্তনই আপতিক গুণদিগের পরিবর্ত্তনের ফল। আপতিক ধর্ম্মের অভিধান "পর্য্যায়"। "গুণ-পর্য্যায়বদ্ দ্রব্যম্"।

যাহার গুণ ও পর্য্যায় আছে, তাহাই দ্রব্য। বৌদ্ধ মত ঐকান্তিক বহুত্ববাদী (absolute pluralism), বেদান্ত ঐকান্তিক অদ্বৈতবাদী (absolute monism), জৈন মত আপেক্ষিক বহুত্ববাদী (Relative Pluralism)। জৈন মতে প্রত্যেক বস্তুই অনেকান্ত (ন+একান্ত); কোনও বস্তু-সম্বন্ধে কিছুই অনপেক্ষ অর্থাৎ ঐকান্তিক ভাবে বলা যায় না। কোনও বস্তু-সম্বন্ধে যাহাই বলা যায়, তাহা ঐকান্তিক সত্য নহে, আপেক্ষিক ভাবে সত্য। তাহার সত্যতা কতকগুলি প্রতিবন্ধের (condition) অপেক্ষা করে। তাহা স্থান, কাল, অবস্থা এবং আরও বহু প্রতিবন্ধকর্তৃক সীমিত।

প্রত্যেক বস্তুর ধর্ম্ম অসংখ্য। যিনি সর্ব্বজ্ঞ, তিনিই কেবল সমস্ত ধর্ম্মের জ্ঞান এক সঙ্গে লাভ করিতে পারেন; বস্তু ও তাহার সকল ধর্ম্ম এক সঙ্গে তাহার জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। কিন্তু যাহাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তাহারা সকল বস্তুরই এক একটি বিভাব এক সময় দেখিতে পান। সুতরাং কোনও বস্তু-সম্বন্ধে তাঁহারা যাহা বলেন, তাহা আংশিক ভাবে সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য নহে। এই প্রসঙ্গে জৈন দার্শনিকগণ এক উদাহরণের উল্লেখ করেন। কয়েকজন অন্ধলোকের মধ্যে হস্তীর স্বরূপ লইয়া তর্ক হইয়াছিল। একজন, যে কেবল তাহার পদস্পর্শ করিয়াছিল, সে কহিল, হস্তী একটা স্তম্ভের ন্যায়। আর একজন তাহার কর্ণ স্পর্শ করিয়াছিল। সে বলিল তাহা "কুলা"র ন্যায়। তৃতীয় ব্যক্তি তাহার দেহ স্পর্শ করিয়াছিল। সে কহিল হস্তী পর্ব্বতের ন্যায়। চতুর্থ ব্যক্তি শুঁড় স্পর্শ করিয়াছিল। সে কহিল হস্তী স্থূল লতার ন্যায়। প্রত্যেক বর্ণনাই আংশিক সত্য, কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নহে। বিভিন্ন দর্শনে জগতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। জগতের বহু বিভাবের মধ্যে এক একটি বিভাব এক এক দার্শনিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। বিশ্বের যাবতীয় বিভাব কাহারো দৃষ্টিতে পড়ে নাই। হস্তীর বিভিন্ন বর্ণনার ন্যায় প্রত্যেক দর্শনই যে সত্য হইতে পারে, তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারেন নাই। জগৎ বিভিন্ন দ্রব্যের সমবায়ে গঠিত। জগতের উপাদান-ভূত দ্রব্যসকলের স্বরূপ-গুণ চিরস্থায়ী; সুতরাং জগৎও চিরস্থায়ী। উপাদানদিগের "পর্য্যায়" সকল অস্থায়ী; সুতরাং জগৎ পরিবর্ত্তনশীলও বটে। বিশ্বের মধ্যে স্থায়ী কিছুই নাই, বিশ্বের যাবতীয় বস্তু প্রতিক্ষণে পরিবর্ত্তিত হইতেছে বৌদ্ধদিগের এই ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ জৈন দার্শনিকদিগের মতে ভ্রান্ত। আবার বৈদান্তিকগণ যে পরিবর্ত্তনের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া, এক অপরিবর্ত্তনীয় নিত্য পদার্থই স্বীকার করেন, ইহাও জৈন মতে ভ্রান্ত। উক্ত দ্বিবিধ মতের প্রত্যেকেই "সতে"র

"এক অন্তে" আবদ্ধ এবং আভাসিক (fallacious)। বিশ্ব ও তাহার উপাদান অপরিবর্ত্তী ও পরিবর্ত্তী—উভয় বর্ণনাই সত্য।

জৈন মতে দ্রব্য সৎ। সতের ধর্ম্ম তিনটি, (১) স্থায়িত্ব, (২) উৎপত্তি, (৩) লয়। দ্রব্যের এক অংশ অপরিণামী, তাই দ্রব্য স্থায়ী। তাহার এক অংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, এবং তাহার স্থলে নূতন অংশের উৎপত্তি হয়। দ্রব্যে সতের তিন ধর্ম্মই বর্ত্তমান, সুতরাং দ্রব্য সৎ।

জৈন দর্শন

স্যাৎ-বাদ

প্রত্যেক বস্তু অনন্তধর্ম্মী এবং কোনও বস্তু-সম্বন্ধে কোনও বর্ণনাই সম্পূর্ণ সত্য হইতে পারে না বলিয়া, জৈন দার্শনিক মতে প্রত্যেক বর্ণনার পূর্ব্বে "স্যাৎ" শব্দ ব্যবহার করা উচিত। "স্যাৎ" শব্দ "অস্" ধাতুর বিধিলিঙএর প্রথমান্ত ক্রিয়া। অস্ ধাতুর অর্থ "হওয়া" (Be), এবং "স্যাৎ" শব্দের অর্থ "হইতে পারে," "হয়তো"। এই শব্দের প্রয়োগদ্বারা অন্যবিধ বর্ণনার সম্ভাব্যতা সূচিত হয়। "হস্তী স্তম্ভের মতো" এই বাক্যটি অনপেক্ষ। কিন্তু যদি বলা যায় "স্যাৎ হস্তী স্তম্ভঃ ইব," তাহা হইলে অর্থ হয়, "হস্তী স্তম্ভের মতো," ইহা এক দিক হইতে সত্য। "ঘটঃ অস্তি" না বলিয়া বলা উচিত "স্যাৎ ঘটঃ অস্তি"। "ঘটঃ অস্তি" বলিলে সর্ব্বকালে সর্ব্বস্থানে ঘট আছে, ইহা বুঝাইতে পারে। কিন্তু "ঘটঃ অস্তি" যখন কেহ বলে, তখন তাহার উদ্দেশ্য, "বর্ত্তমান-কালে যে স্থলে ঘট আছে, সেই স্থলে এক বিশিষ্ট আকার ও বর্ণবিশিষ্ট ঘট আছে" ইহা বলা। "স্যাৎ ঘটঃ অস্তি" বলিলে এই আপেক্ষিকতা ব্যক্ত হয়। এখানে লক্ষ্য করিতে হইবে "স্যাৎ ঘটঃ অস্তি" ইহার অর্থ "ঘট আছে" ইহা সত্য না হইতেও পারে—ইহা নয়। ইহার অর্থ "ঘট আছে," এই বাক্য এক দিক হইতে সত্য, যেখানে ঘট আছে, যে-সম্বন্ধে আছে, সেই স্থান ও সেই সম্বন্ধ সত্য, মিথ্যা নহে।

গ্রীসদেশে আরিষ্টটলের সমকালে পাইরো নামে এক সংশয়বাদীর আবির্ভাব হয়, খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীতে। তাহার মতে কোনও বিষয়েই সত্য-নির্দ্ধারণের ক্ষমতা মানুষের নাই। বস্তুর সহিত বস্তুর সম্বন্ধই আমরা অবগত হইতে পারি। আমাদের জ্ঞানবৃত্তিদ্বারা প্রত্যক্ষ জ্ঞানও এরূপ পরিবর্ত্তিত হয়, যে বস্তুর স্বরূপ কি, তাহা ব্যাখ্যা করা আমাদের পক্ষে অসম্ভব।

পাইরো ও তাঁহার অনুগামিগণ কোনও বিষয়ে মত প্রকাশ করিবার সময় সন্দেহবাচক শব্দের প্রয়োগ করিতেন, যেমন "সম্ভবতঃ," "হয়তো," "এরূপ হইতে পারে," "আমার মনে হয়," "আমি নিশ্চিত জানি না, তবে—" "আমি নিশ্চিত জানি না,—আমি যে নিশ্চিত জানি না, তাহাও নিশ্চিত জানি না, তবে—" ইত্যাদি।" কিন্তু পাইরো ছিলেন সংশয়বাদী, জৈন দর্শন বাস্তববাদী। পাইরোর মতে সমস্ত বাক্যের সত্যতাই অনিশ্চিত। জৈন মতে প্রত্যেক বাক্যই আপেক্ষিকভাবে সত্য, কিন্তু অনপেক্ষভাবে সত্য নহে। জৈন আপেক্ষিকতা ও পাশ্চাত্ত্য আপেক্ষিকতার মধ্যে সাদৃশ্য আছে, সত্য। কিন্তু এই আপেক্ষিকতা বস্তুগত, বিজ্ঞানগত (idealistic) নহে। বিজ্ঞানের সহিত তাহার সম্বন্ধ এইটুকু, যে, মন যে-দৃষ্টিকোণ হইতে কোনও বস্তু দেখে, সেই কোণ হইতে কোনও বাক্য সত্য। কিন্তু সেই দৃষ্টিকোণ হইতে যতটুকু দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা মনের সৃষ্ট নহে, তাহা বস্তুর অন্য বস্তুর সহিত প্রকৃত সম্বন্ধগত। হোয়াইট্‌হেডের আপেক্ষিকতার সহিত জৈন আপেক্ষিকতার সাদৃশ্য আছে। কিন্তু সোফিষ্ট প্রোটাগোরাস্ ও সিলারের মত হইতে ইহা ভিন্ন।

নয়-বাদ—সপ্তভঙ্গী নয়

তর্কশাস্ত্রে সাধারণতঃ দুই প্রকার বাক্যের বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়—ভাব বা ইতিবাচক, এবং অভাববাচক—নঙ্ বা নেতি বাচক। জৈন দর্শনে সাতপ্রকার "নয়" (Judgement) বর্ণিত আছে। কোনও বস্তুর কোনও ধর্ম আছে, ইহা বর্ণনা করিতে বাক্যের যে রূপ ব্যবহৃত হয়, তাহা ভাববাচক। অন্য বস্তুর ধর্ম্ম, যাহা কোনও এক বস্তুর নাই, তাহা তাহার নাই, ইহা বর্ণনা করিতে বাক্যের নঙ্‌বাচক রূপ ব্যবহৃত হয়। জৈন দর্শনে প্রত্যেক ভাববাচক এবং নঙ্‌বাচক বাক্যের সহিত "স্যাৎ" শব্দ ব্যবহৃত হয়। ঘট-সম্বন্ধে ভাববাচক বাক্যের রূপ হইবে "স্যাৎ গৃহে ঘটঃ অস্তি"। ইহার অর্থ নির্দ্দিষ্ট গুণবিশিষ্ট ঘট নির্দ্দিষ্ট কালে নির্দ্দিষ্ট স্থলে গৃহের মধ্যে আছে। "স্যাৎ ঘটঃ ভগ্নঃ অস্তি" —ইহার অর্থ ঘট সকল সময়ে ভগ্ন, ইহা নহে, কিন্তু নির্দ্দিষ্ট কালে, নির্দ্দিষ্ট স্থানে ভগ্ন ঘট আছে। সুতরাং যাবতীয় ভাববাচক বাক্যের সার্ব্বিক রূপ হইবে— "স্যাৎ অস্তি"। নঙ-বাচক বাক্যের রূপ হইবে "স্যাৎ গৃহাৎ বহিঃ ঘটঃ নাস্তি," অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট প্রকারের ঘট নির্দ্দিষ্টকালে গৃহের বাহিরে নাই। "স্যাৎ ঘটঃ কৃষ্ণঃ নাস্তি," অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট কালে নির্দ্দিষ্ট স্থানে এবং অন্যান্য নির্দ্দিষ্ট অবস্থায় ঘট কৃষ্ণবর্ণ নহে। নঙবাচক বাক্যের সার্ব্বিক রূপ—স্যাৎ নাস্তি।

"ঘট কখনও কৃষ্ণবর্ণ, কখনও বা কৃষ্ণবর্ণ নহে," এই ভাব প্রকাশ করিতে হইলে একটি জটিল বাক্যের প্রয়োজন। তাহার রূপ—স্যাৎ ঘটঃ কৃষ্ণঃ অকৃষ্ণশ্চ। ইহার সার্ব্বিক রূপ—স্যাৎ অস্তি চ, নাস্তি চ। বস্তুর সমগ্র স্বরূপ-প্রকাশের জন্য ঈদৃশ বাক্যের প্রয়োজন হয়।

ঘট যখন কাঁচা থাকে, তখন তাহার বর্ণ কৃষ্ণ, যখন পোড়ানো হয়, তখন রক্তবর্ণ হয়। ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ হয়। সর্ব্ব অবস্থায়, সর্ব্বকালে ঘটের কি বর্ণ, তাহা বলা যায় না। জিজ্ঞাসিত হইলে বলিতে হয়, সর্ব্বকালে সর্ব্ব অবস্থায় ঘটের কি বর্ণ হয়, তাহা অবক্তব্য (স্যাৎ অবক্তব্যম্)। এই চতুর্থ রূপ হইতে প্রতীত হয়, যে "জৈন দর্শন বিরোধের নিয়ম (Law of Contradiction) ভঙ্গ করে," এই অভিযোগ ভিত্তিহীন। একই সময়ে পরস্পর-বিরোধী ধর্ম্ম কোনও বস্তুতে আরোপ করা যায় না, ইহা জৈন দর্শন অস্বীকার করে না।

পূর্ব্বোক্ত চারি প্রকার বাক্যের চতুর্থটির সহিত অন্য তিনটির সমবায়ে অন্য তিনটি নয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম ও চতুর্থের সমবায়ে পাওয়া যায়—"স্যাৎ অস্তি চ, অবক্তব্যম্ চ"। ঘট সময়-বিশেষে কৃষ্ণ, কিন্তু স্থান-কাল নির্ব্বিশেষে ঘট কি প্রকার, তাহা বর্ণনা করা যায় না। ইহা বলিতে হইলে, বলিতে হয় "স্যাৎ ঘটঃ কৃষ্ণঃ, স্যাৎ অবক্তব্যম্"।

দ্বিতীয় ও চতুর্থ বাক্যের সংযোগে পাওয়া যায় এই নয়—"স্যাৎ ঘটঃ ন কৃষ্ণঃ অবক্তব্যং চ।" ইহার সার্ব্বিক রূপ—"স্যাৎ নাস্তি চ অবক্তব্যং চ"। তৃতীয় ও চতুর্থ নয়ের সমবায়ে পাওয়া যায় সপ্তম নয়—"স্যাৎ ঘটঃ কৃষ্ণশ্চ ন কৃষ্ণশ্চ অবক্তব্যম্ চ"। ইহার সার্ব্বিক রূপ—"স্যাৎ অস্তি চ, নাস্তি চ, অবক্তব্যঞ্চ"।

(১) স্যাৎ অস্তি, (২) স্যাৎ নাস্তি, (৩) স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ (৪) স্যাৎ অবক্তব্যম্ (৫) স্যাৎ অস্তি চ, অবক্তব্যং চ (৬) স্যাৎ নাস্তি চ, অবক্তব্যং চ, (৭) স্যাৎ অস্তি চ নাস্তি চ অবক্তব্যং চ—এই সাত নয়ের কোনও একটি ব্যবহার করিয়া প্রত্যেক বস্তুর বর্ণনা করিতে হয়। অন্য রূপ নাই। প্রথম নয়ে কোনও বস্তু-সম্বন্ধে বলা হয়, যে সে বস্তু স্বরূপে, স্বদ্রব্যে, স্বক্ষেত্রে, স্বকালে অবস্থিত। দ্বিতীয় নয়ে বলা হয়, যে কোনও বস্তু তাহার স্বরূপ হইতে ভিন্ন রূপে (পররূপে), পরদ্রব্যে, পরক্ষেত্রে, পরকালে "নাস্তি।" প্রত্যেক বাক্যেরই দুই রূপ—অস্তিরূপ ও নাস্তিরূপ। তাহা সদসদাত্মক। বস্তু যাহা তাহাই, যাহা নহে, তাহা নহে। (Law of Identity and of Contradiction)। নঙ্‌-বাচনের এই মতে একটি ভাবরূপ আছে। যাহাই চিন্তার বিষয়

হইতে পারে, এক অর্থে তাহার অস্তিত্ব আছে, অন্য অর্থে নাই। আকাশ-কুসুমের একটি ভাববাচক ভিত্তি আছে। আকাশ ও কুসুম উভয়ই সত্য, যদিও উভয়ের সংযোগ অসত্য। চিন্তার জন্য ভেদের প্রয়োজন। কোনও বস্তু হইতে যাহার ব্যাবৃত্তি নাই, তাহার চিন্তাও অসম্ভব।"

ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন

বৌদ্ধ মতে যাহা ফল (effect)-উৎপাদনে সমর্থ, তাহাই সৎ, ইহা স্বীকার করিলে যখন রজ্জুতে সর্প-ভ্রম হয়, তখন সেই কাল্পনিক সর্পকেও সৎ বলিতে হয়, কেন না তাহাদ্বারা ভয়ের উৎপত্তি হয়। এই মতের উপর প্রতিষ্ঠিত দ্রব্যের ক্ষণিকত্ববাদও ভ্রান্ত। সর্ব্ব বস্তু যদি ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে আত্মাও ক্ষণিক। কিন্তু আত্মা যদি ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে স্মৃতি, প্রত্যভিজ্ঞা, আত্ম-স্মৃতি প্রভৃতিরও ব্যাখ্যা করা যায় না। মুক্তিরও ব্যাখ্যা হয় না। কেননা স্থির আত্মা যদি না থাকে, তাহা হইলে নৈতিক জীবনও অসম্ভব! কেন না নৈতিক জীবন-লাভে যে চেষ্টা করিতে পারে, তাহার জীবন যদি ক্ষণমাত্র-স্থায়ী হয়, তাহা হইলে উন্নত জীবন-লাভের চেষ্টা করিবে কে? নৈতিক নিয়মও (Moral law) তাহা হইলে থাকে না, কেন না কর্ত্তার কর্ম্মের ফল কর্ত্তা ভোগ করিতে পারিবে না (কৃত প্রণাশ), অন্যের কর্ম্মের ফল তাহাকে ভোগ করিতে হয় (অকৃতাভ্যুপগম)। ক্ষণমাত্র স্থায়ী অবস্থাদিগের সংযোগে কোনও শ্রেণীবিশেষের উৎপত্তিও হইতে পারে না। কেননা বিভিন্ন অবস্থাকে একত্র ধারণ করিবার জন্য সূত্র-স্বরূপ কোনও স্থায়ী পদার্থের অস্তিত্ব এই মতে অস্বীকৃত। প্রত্যক্ষ বা অনুমান হইতে এমন কোনও পদার্থের অস্তিত্ব অবগত হওয়া যায় না, যাহাতে কেবল পরিবর্ত্তনই আছে, কোনও স্থায়ী অংশ নাই।

জৈন মতে দ্রব্য দ্বিবিধ—দেশব্যাপী ও অদেশব্যাপী। একমাত্র দ্রব্য অদেশব্যাপী—তাহা কাল। অন্য সকল দ্রব্যই দেশব্যাপী। দ্রব্যদিগকে 'অস্তিকায়' বলে, কেন না প্রত্যেক দেশব্যাপী বস্তু দেশব্যাপী কায়বান বস্তুর ন্যায় বর্ত্তমান (অস্তি)।

অস্তিকায় দ্রব্য সকল জীব ও অজীব এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। জীব ও আত্মা অভিন্ন। মুক্ত ও বদ্ধ ভেদে আত্মা দ্বিবিধ। বদ্ধ আত্মার মধ্যে আবার দুই শ্রেণী—ত্রস (গতিশক্তিমান্) এবং স্থাবর (গতিহীন)। স্থাবর আত্মাদের দেহ মৃত্তিকা, জল, অগ্নি অথবা বায়ু-নির্ম্মিত। উদ্ভিদের মধ্যেও স্থাবর আত্মা বর্ত্তমান। স্থাবর আত্মাদের কেবল স্পর্শেন্দ্রিয় আছে। তাহাদের চৈতন্য

স্পর্শজ্ঞানে সীমাবদ্ধ। ত্রস আত্মাদিগের কাহারও দুই, কাহারও তিন, কাহারও চারি, কাহারও পাঁচ ইন্দ্রিয়। কীটদিগের দুই ইন্দ্রিয়—স্পর্শ এবং রসনা। পিপীলিকার তিন ইন্দ্রিয়—স্পর্শ, রসনা ও ঘ্রাণ। মৌমাছি দিগের চারি ইন্দ্রিয়—স্পর্শ, রসনা, ঘ্রাণ এবং দর্শন। মনুষ্য, পশু ও পক্ষী দিগের পাঁচ ইন্দ্রিয়।

ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, আকাশ এবং পুদ্গল (জড়) এই চারিটি দেশব্যাপী অজীব দ্রব্য।

জীব

আত্মাই জীব। চৈতন্য (সংবিদ) আত্মার স্বরূপ। আত্মা কখনও চৈতন্যবিচ্যুত হয় না—যদিও বিভিন্ন আত্মার চৈতন্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ বিভিন্ন। মুক্ত আত্মাগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তাহারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিয়া সর্ব্বজ্ঞত্ব লাভ করিয়াছেন। সর্ব্ব নিম্নশ্রেণীর জীব উদ্ভিদদেহে অথবা মৃত্তিকা, জল, অগ্নি অথবা বায়ু-নির্ম্মিত দেহে বাস করে। তাহাদের মধ্যে প্রাণ ও চৈতন্যের অস্তিত্ব নাই বলিয়া মনে হইলেও, বস্তুতঃ তাহারা প্রাণ ও চৈতন্যহীন নহে। স্পর্শানুভব তাহাদের আছে। এই চৈতন্য সুপ্ত অবস্থায় বর্ত্তমান। অন্যান্য জীবদিগের দুই, তিন, চারি অথবা পাঁচটি ইন্দ্রিয় আছে। আত্মা আপনার অস্তিত্ব অনুভব করে। এই জ্ঞানদ্বারাই তাহার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। দেহ ও আত্মা এক নহে—আত্মা দেহ-ব্যতিরিক্ত। আত্মা সনাতন, কিন্তু তাহার অবস্থা-পরিবর্ত্তন আছে। আত্মাই জানে, আত্মাই কর্ম্ম করে, সুখদুঃখ ভোগ করে, আপনাকে ও বিষয়কে প্রকাশিত করে।

পূর্ব্ব জন্মে কৃত কর্ম্ম-অনুসারে আত্মা বিভিন্ন প্রকারের দেহ ধারণ করে। আত্মার কোনও মূর্ত্তি নাই। আলোক যেমন মূর্ত্তিহীন হইলেও যাহার উপর পতিত হয়, তাহার রূপ এবং পরিমাণ প্রাপ্ত হয়, আত্মাও তেমনি সমগ্র দেহ আলোকিত ও চৈতন্যবান্ করিয়া দেহের রূপ এবং পরিমাণ প্রাপ্ত হয়। এই অর্থেই আত্মাকে দেশব্যাপী বলা হয়। জীব অসীম ও বিভু নহে, দেহের সর্ব্বাংশব্যাপী হইলেও দেহের বাহিরে বিস্তৃত নহে। দেহের সহিত সংস্পর্শহীন বস্তুর অব্যবহিত জ্ঞানলাভে জীব সাধারণতঃ অসমর্থ।

উদ্ভিদদিগের কাহারও কাহারও মধ্যে একটি মাত্র আত্মা, কাহারও মধ্যে একাধিক আত্মার অধিষ্ঠান। এক আত্মা-কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত উদ্ভিদ স্থূল। পৃথিবীতে জীবের বসতির উপযুক্ত অংশে তাহাদের বাস। কিন্তু একাধিক

আত্মাকর্তৃক অধ্যুষিত সূক্ষ্ম ও অদৃশ্য দেহসমন্বিত উদ্ভিদও আছে। তাহারা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বাস করিতে সক্ষম। সমগ্র বিশ্ব "নিগোদ" নামে এক প্রকার সূক্ষ্ম জীবদ্বারা পূর্ণ। প্রত্যেক নিগোদ অসংখ্য আত্মার সমষ্টি। তাহাদের শ্বাস-প্রশ্বাস এবং খাদ্যগ্রহণ এক সঙ্গে হয়। তাহারা বিষম যন্ত্রণা ভোগ করে। কোনও আত্মা যখন মোক্ষপ্রাপ্ত হয়, তখন নিগোদদিগের মধ্য হইতে এক আত্মা গিয়া তাহার স্থান পূর্ণ করে। কিন্তু এপর্য্যন্ত যত আত্মা মোক্ষলাভ করিয়াছে, তাহাদের স্থান পূর্ণ করিতে একটিমাত্র নিগোদের মধ্যে এক অতি সামান্য অংশস্থিত আত্মাদিগের অধিক প্রয়োজন হয় নাই। নিগোদের মধ্যস্থিত আত্মাদিগের মধ্যে যাহারা উন্নতিলাভে ইচ্ছুক, তাহারাই বাহির হইয়া আসিয়া উন্নতিলাভের পথ অবলম্বন করে।

পাশ্চাত্য দর্শনে মনন (চিন্তা thought) ও ব্যাপ্তি (Extension) পরস্পর-বিরোধী গুণ বলিয়া গণ্য। ব্যাপ্তি জড় দ্রব্যের ব্যবর্ত্তক ধর্ম্ম, এবং সংবিদ আত্মার ব্যবর্ত্তক ধর্ম্ম। একই বস্তুর উভয় ধর্ম্ম থাকা অসম্ভব। কিন্তু জৈন মতে আত্মার উভয় ধর্ম্মই বর্ত্তমান এবং প্রত্যেক আত্মা সমগ্র দেহব্যাপী। আত্মা যে দেশ ব্যাপিয়া থাকিতে পারে, তাহা অন্যান্য ভারতীয় দার্শনিকও স্বীকার করেন। প্লেটো ও আরও কোনও কোনও গ্রীক দার্শনিক এবং আধুনিক দার্শনিক আলেকজান্দার ও অন্যান্য কয়েকজন বস্তুবাদী দার্শনিকও ইহা স্বীকার করেন। আত্মার দেশব্যাপিত্বের অর্থ দেশের বিভিন্ন অংশে তাহার অবস্থিতি, সেই সকল অংশ পূর্ণ করা নহে। জড় বস্তু যখন কোনও স্থানে থাকে, তখন সে স্থানে দ্বিতীয় বস্তুর স্থিতি অসম্ভব। কিন্তু একাধিক আত্মা দেশের কোনও এক অংশে থাকিতে পারে। দুইটি আলোক দ্বারা যেমন একটি স্থান আলোকিত হইতে পারে, সেই রূপ।

চার্ব্বাক মত-খণ্ডন

চার্ব্বাক দর্শনে আত্মার অস্তিত্ব নাই, ইহা প্রমাণ করিতে যে সকল যুক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে, জৈন দর্শনে তাহাদের খণ্ডন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। গুণরত্নের যুক্তি এই রূপ: প্রথমতঃ, আমাদের অনুভবদ্বারা আত্মার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। যখন সুখ বা দুঃখের অনুভব হয়, তখন "আমি সুখ অথবা দুঃখ বোধ করিতেছি" এই বোধ হয়। দ্বিতীয়তঃ, যখন কোনও বস্তুর গুণের প্রত্যক্ষজ্ঞান হয়, তখন আমরা সেই বস্তু দেখিতেছি, বলি। কোনও গোলাপী রং দেখিলে বলি গোলাপ ফুল দেখিতেছি। তেমনি যখন আত্মার ধর্ম্ম সুখ,

দুঃখ, ইচ্ছা, সংশয়, জ্ঞান প্রভৃতির অনুভব হয়, তখন আমরা আত্মাকেই অব্যবহিতভাবে জানি, ইহা বলা যায়। আত্মার অস্তিত্ব অনুমানদ্বারাও প্রমাণিত হয়। দেহ চালিত হয়, ইহা দেখিতে পাই। রথচালনা করিতে সারথির প্রয়োজন। অচেতন দেহ চালিত করিবার জন্যও একজন চালকের প্রয়োজন। এই চালকই আত্মা। ইন্দ্রিয়গণ জ্ঞানের সাধনমাত্র। তাহাদিগকে ব্যবহার করিবার জন্য কর্ত্তার প্রয়োজন। এই ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠিত চালকই আত্মা। দেখিতে পাওয়া যায় যে জড় দ্রব্যদ্বারা কোনও দ্রব্য নির্ম্মাণ করিতে হইলে নির্ম্মাতার প্রয়োজন হয়। জীবদেহের নির্ম্মাণের জন্যও নির্ম্মাতার প্রয়োজন। এই নির্ম্মাতাই আত্মা। চার্ব্বাক মতে জড় দেহ হইতে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়। কিন্তু কোথায়ও অচেতন উপাদান হইতে চৈতন্য উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। চার্ব্বাক মতে প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ। জড় উপাদান হইতে চৈতন্যের উৎপত্তির কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। চৈতন্য যে জড় হইতে উৎপন্ন হয়, ইহার অনুকূলে কোনও অনুমান প্রমাণও পাওয়া যায় না। দেহই যদি চেতনার কারণ হইত, তাহা হইলে যতদিন দেহ বর্ত্তমান থাকে, ততদিন তাহাতে চৈতন্যের অভাব হইত না। কিন্তু নিদ্রা ও মূর্চ্ছাকালে এবং মৃত দেহে চৈতন্য থাকে না, যদিও তখন দেহ বর্ত্তমান থাকে। দেহ যদি চৈতন্যের কারণ হইত তাহা হইলে দেহের উন্নতি বা অনবতির সঙ্গে সঙ্গে চৈতন্যেরও হ্রাস-বৃদ্ধি দেখা যাইত। যদি বল জড়ের সকল অবস্থায়, তাহা হইতে চৈতন্যের উদ্‌ভব হয় না বটে, কিন্তু যখন তাহা বিশিষ্ট প্রকারে সংহত হইয়া জীবন্ত দেহে পরিণত হয়, তখন চৈতন্যের উদ্‌ভব হয়, তাহা হইলে কে জড়কে সংহত করিয়া জীবন্ত পদার্থে পরিণত করে, তাহা বলিতে হইবে। আত্মাই দেহ-সংঘাতের কর্ত্তা। "আমি স্থূল" "আমি কৃশ" প্রভৃতি আমরা বলি, ইহা সত্য। কিন্তু তাহাদ্বারা দেহই যে আত্মা, তাহা প্রমাণিত হয় না। আক্ষরিক অর্থে এই সকল বাক্য বুঝিতে হয় না। দেহের প্রতি মমতা বশতঃই আত্মা দেহকে আপনা হইতে অভিন্ন মনে করে। আত্মার যদি অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে "দেহের মধ্যে আত্মা নাই" যখন বল, তখন তাহার কোনও অর্থই হইত না। কোনও স্থলে কোনও বস্তু নাই, যখন বলি, তখন অন্যত্র তাহার অস্তিত্ব আছে, বলা হয়। "আমার মাতা বন্ধ্যা" অথবা "এই জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য নাই" ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় "আমার আত্মা নাই" বাক্যও অর্থহীন।"

চার্ব্বাক দর্শনে প্রত্যক্ষ ভিন্ন অন্য প্রমাণ স্বীকার করা হয় না। কিন্তু প্রত্যক্ষকেও যদি প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করা না হয়, প্রত্যক্ষ অভ্রান্ত কেন

যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, তাহা হইলে চার্ব্বাক-শিষ্য কি উত্তর দিবেন? তিনি যদি কোনও উত্তর না দিয়া নীরব থাকেন, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, এই মতের পক্ষে কোনও যুক্তি নাই। আর তিনি যদি যুক্তির সাহায্যে নিজের মত প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করেন, তাহা হইলে তিনি "অনুমানের" সাহায্য গ্রহণ করেন। নিজে তিনি যে অনুমান প্রমাণের ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন না, তাহাকে অগ্রাহ্য তিনি করেন কিরূপে? যদি তিনি বলেন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিরোধী কিছু নাই, এবং তাহা ভ্রান্তির পথে লইয়া যায় না, সেই জন্যই প্রত্যক্ষকে প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে এই কারণেই অনুমান ও সাক্ষ্যকেও প্রমাণ বলিতে হয়। চার্ব্বাক শিষ্য যদি বলেন, অনুমান ও সাক্ষ্য সময় সময় ভ্রান্ত হয়, ইহা দেখা যায়; তাহা হইলে বলা যায় প্রত্যক্ষ হইতেও অনেক সময় ভ্রান্তির উদ্‌ভব হয়। সুতরাং জ্ঞানের উৎস প্রত্যক্ষই হউক, অনুমানই হউক অথবা কাহারও সাক্ষ্যই হউক, তাহা হইতে লব্ধ জ্ঞান যদি মিথ্যা প্রমাণিত না হয়, তাহা হইলে তাহাকে প্রমাণ বলিতে হইবে। জ্ঞানের সহিত তাহার ব্যবহার হইতে উদ্‌ভূত ফলের "সংবাদ" (সংগতি) তাহার সত্যতার কষ্টি। চার্ব্বাকপন্থিগণ অতীত কালের প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান ভবিষ্যৎ বিষয়ে প্রয়োগ করেন। কিন্তু ভবিষ্যৎ তো প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। অতীতে যাহা ঘটিয়াছে, ভবিষ্যতেও যে তাহা ঘটিবে তাহার নিশ্চিতি কি? এখানেও তাঁহারা অনুমানের ব্যবহার করেন। আবার যখন তাহারা কাহারও সহিত তর্ক করেন, তখন প্রতিদ্বন্দ্বীর বাক্য হইতে তাহার অভিপ্রেত অর্থের অনুমান করেন। যখন অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, তখন অপ্রত্যক্ষ বিষয়ের অপ্রত্যক্ষতা হইতে তাহার অনস্তিত্ব অনুমান করেন। সুতরাং প্রত্যক্ষই যে এক মাত্র প্রমাণ, তাহা তাহারা বলিতে পারেন না।

অদ্বৈত মত-খণ্ডন

জৈন দর্শন বহুত্ববাদী। তাহাদের মতে একদিকে যেমন অসংখ্য আত্মা, অন্যদিকে অসংখ্য পুদ্‌গলকণা। তাহারা বলেন, যদি একাধিক আত্মার অস্তিত্ব না থাকিত, একই আত্মা যদি সর্ব্ব-জীব সাধারণ হইত, তাহা হইলে এক জীব হইতে অন্য জীবকে পৃথক করিবার কিছু থাকিত না, তাহাদের কর্ম্মফলও বিভিন্ন হইত না। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র, কীট, পক্ষী এবং সর্প, এই সকল ভেদও থাকিত না। যাহারা পাপ-জীবন যাপন করে, এবং যাহারা পুণ্যকর্ম্ম করে তাহাদের মধ্যেও ভেদ থাকিত না।

অজীব

সমগ্র বিশ্ব দুইভাগে বিভক্ত—জীব ও অজীব। জীব ভোক্তা, অজীব ভোগ্য। চৈতন্যযুক্ত জীবের বিপরীত-ধর্ম্মী অজীব। জীব জ্ঞাতা, অজীব জ্ঞেয়—জ্ঞানের বিষয়। যে জানে, সুখ-দুঃখ অনুভব করে, কামনা করে, ইষ্টানিষ্ট কর্ম্ম করে এবং কৃতকর্ম্মের ফলভোগ করে, সে জীব। অজীব ইহার কিছুই করে না। অজীব দ্রব্যও দুইভাগে বিভক্ত—অরূপ ও রূপবান। ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, দেশ ও কাল, পাপ ও পুণ্য অরূপ। রূপবান দ্রব্য পুদ্গল অথবা জড়।

দেশ বা আকাশ

আকাশ দুইভাগে বিভক্ত—লোকাকাশ ও অলোকাকাশ। আকাশের যে অংশ আত্মা ও অন্যান্য দ্রব্যকর্ত্তৃক অধ্যুষিত, তাহা লোকাকাশ। লোকাকাশের বাহিরের শূন্য আকাশ অলোকাকাশ। আকাশ শূন্যমাত্র নহে। ইহা দ্রব্য, ইহার মধ্যে অন্যান্য দ্রব্য অবস্থিত। সর্ব্বব্যাপী আকাশকে "আকাশাস্তিকায়"ও বলে। আত্মা, পুদ্গল, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম সকলেই আকাশের মধ্যে অবস্থিত। আকাশ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য না হইলেও অনুমানগম্য। যে সকল বস্তুর বিস্তার আছে, তাহাদের বিস্তারের জন্য স্থানের প্রয়োজন। এই স্থানই আকাশ। আকাশ না থাকিলে বিস্তারের সম্ভাবনা থাকিত না। আকাশ ও বিস্তার এক নহে, কিন্তু আকাশের মধ্যেই বিস্তার সম্ভবপর।

মুক্ত আত্মার আবাস অলোক। তাহাতেও আকাশ অনুপ্রবিষ্ট (অলোক আকাশ)।

কাল

অগণ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশকর্ত্তৃক কাল গঠিত। এই সকল অংশ মিশ্রিত হয় না। কিন্তু কাল আছে বলিয়াই বস্তুর গুণের বর্ত্তন (স্থায়িত্ব), পরিণাম (পরিবর্ত্তন), ক্রিয়া, পরত্ব ও অপরত্ব (পূর্ব্বাপরত্ব) সম্ভবপর হয়। কাল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, কিন্তু অনুমানগম্য। কালের অস্তিত্ব না থাকিলে বস্তুর উপরি উক্ত ধর্ম্মগুলি থাকিত না। কিন্তু কাল উক্ত ধর্ম্মগুলির কারণ নহে। কাল ব্যতীত কোনও বস্তুর স্থিতি হইতে পারে না। স্থিতি বা বর্ত্তনের অর্থ নানা-ক্ষণ-ব্যাপী অস্তিত্ব। সুতরাং ক্ষণের (কালের সূক্ষ্মতম অংশ) অস্তিত্ব

বর্ত্তনের জন্য আবশ্যক। কালের ধারণা ব্যতীত পরিণামের ধারণাও করা যায় না। কাঁচা ফল পাকে, কাঁচার পরবর্ত্তী অবস্থা পাকা। এই "পরে সংঘটন" বুঝিতে কালের ধারণার প্রয়োজন। কাল ব্যতীত গতিও সম্ভবপর নহে। কোনও বস্তুর এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমনই গতি। গতির ধারণার জন্য "পূর্ব্ব ক্ষণ" ও "পর ক্ষণের" ধারণার প্রয়োজন। "নূতন ও পুরাতন" এবং "পূর্ব্ববর্ত্তী ও পরবর্ত্তী" বুঝিতেও কালের ধারণার প্রয়োজন। অপরিণামী কাল পল, বিপল, ঘণ্টা, প্রহর, দিন, পক্ষ প্রভৃতি নানারূপে প্রকাশিত। কাল দ্রব্য; ক্ষণ, দণ্ড, প্রহর, দিন প্রভৃতি এই দ্রব্যের পর্য্যায় (অস্থায়ী গুণ)। কাল দেশে বিস্তৃত নহে, ইহা "অস্তিকায়"ও নহে, কেন না কালের পর্য্যায় থাকিলেও, কাল স্বরূপতঃ অবিভাজ্য। একই কাল বিশ্বের সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। কাল দ্বিবিধ—পারমার্থিক ও ব্যবহারিক। বর্ত্তন (duration, continuity) পারমার্থিক কালের ধর্ম্ম। পরিণাম ব্যবহারিক কালের ধর্ম্ম। ব্যবহারিক কাল, ক্ষণ, দণ্ড, প্রহর, দিন প্রভৃতি ভাগে বিভক্ত হয়। ইহার আরম্ভ ও শেষ আছে। ইহাকে "সময়"ও বলে। কালের মধ্যে ব্যবহারের জন্য সীমার আরোপ করিয়া সময়ের সৃষ্টি করা হয়।

কালের অস্তিত্ব আছে, কিন্তু কায়ত্ব (পরিমাণ) নাই। ইহা একদিক অভিমুখী, ইহার ব্যাপ্তি নাই।

কোনও কোনও জৈন দার্শনিক কালকে স্বতন্ত্র দ্রব্য বলেন না। তাঁহাদের মতে কাল দ্রব্যের পর্য্যায়।

পুদ্গল

"পুদ্গল" শব্দের অর্থ জড় বস্তু। স্থানব্যাপী বলিয়া জড়কে "পুদ্গলাস্তিকায়"ও বলে। সংহত ও বিশ্লিষ্ট হয় বলিয়া জড়ের নাম পুদ্গল। (পূরয়ন্তি গলন্তি চ)। "ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহার প্রতীতি হয়, তাহা এবং ইন্দ্রিয়, জীবদেহ, জড়ীয় মন, কর্ম্ম প্রভৃতি সকলই মূর্ত্ত, সকলই পুদ্গল। শব্দ, সংযোগ, সূক্ষ্মত্ব, স্থূলত্ব, আকার, বিভাগ, অন্ধকার, প্রতিমূর্ত্তি, জ্যোতি ও তাপ সমস্তই পুদ্গল-নামক দ্রব্যের পরিণাম"। জড় সনাতন দ্রব্য। ইহার আয়তনের হ্রাস-বৃদ্ধি হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে তাহার মধ্যস্থ অণুদিগের অপচয় অথবা উপচয় হয় না। ইহা যে কোনও আকার ধারণ করিতে পারে, ইহাতে বিভিন্ন গুণের আবির্ভাবও হইতে পারে। ইহা তৈপ্রতির (Energy) আধার। এই তৈপ্রতি সক্রিয়—গতি-স্বরূপ। এই গতি

পুদ্গলের। ইহা দ্বিবিধ—পরিস্পন্দ এবং পরিণাম। পুদ্গল জগতের প্রাকৃতিক ভিত্তি। আত্মা এবং আকাশ ভিন্ন আর সকল বস্তুই পুদ্গল হইতে উদ্ভূত হয়। জড়ের ছয় প্রকার রূপ। এই সকল রূপ সমান পরিমাণে সূক্ষ্ম ও দর্শনযোগ্য নহে। রূপ (বর্ণ), রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ পুদ্গলের গুণ। যে সকল দ্রব্য আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহারা স্থূল, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নহে, এরূপ বস্তুও আছে। এই সকল অনিন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুই বিবিধ পরিমাণ বিশিষ্ট কর্ম্মে পরিণত হয়।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বস্তুর উপাদান পরমাণু। পরমাণুর উদভব হয় একাকার পুদ্গলপুঞ্জ হইতে। এই পুদ্গলপুঞ্জ বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট কয়েক প্রকার অণুতে বিভক্ত হয়। অণুগণ সংখ্যায় অসীম ও সনাতন। তাহারা অতি সূক্ষ্ম, এত সূক্ষ্ম যে আকাশের কোনও বিন্দুতে তাহাদের আরম্ভ, কোনও বিন্দুতে শেষ নাই। তাহাদের যেমন আদি নাই, অন্ত নাই, তেমনি মধ্যও নাই; সৃষ্টিও নাই, লয়ও নাই। যাবতীয় মূর্ত্ত বস্তুর ভিত্তি হইলেও অণুগণ অমূর্ত্ত। কেবলীগণ তাহাদিগকে দেখিতে পান, এই অর্থে তাহাদের রূপ আছে। ভারী অণু নিম্নগামী, লঘু অণু উর্দ্ধগামী। আকাশের এক এক বিন্দু এক এক অণুকর্ত্তৃক অধিকৃত। এক স্থূল অণুর স্থানে সূক্ষ্ম অবস্থায় অসংখ্য অণু থাকিতে পারে। প্রত্যেক অণুই বর্ণ, গন্ধ, স্বাদ ও স্পর্শগুণ বিশিষ্ট। কিন্তু এই সকল গুণ চিরস্থায়ী নহে। পরমাণুগণ পরিণামী। তাহাদের গুণের পরিবর্ত্তন হয় এবং তাহাদের মধ্যে নূতন গুণের আবির্ভাব হয়। ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মরুতের পরামাণুগণ যে বিভিন্ন-জাতীয়, তাহা নহে। ন্যায় ও বৈশেষিক মতে যত প্রকারের ভূত আছে, তত প্রকারের পরমাণু। জৈন মতে সকল পরমাণুই একজাতীয়, কিন্তু তাহাদের বিভিন্ন পরিমাণে মিশ্রণের ফলে বিভিন্ন ভূতের উৎপত্তি হয়। বস্তুতঃ পরমাণুদিগের মধ্যে গুণের ভেদ নাই। এ বিষয়ে গ্রীক দার্শনিক লিউকিপ্‌পাস্ ও ডেমক্রিটাসের সহিত জৈন মতের মিল আছে।

অণুদিগের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণ আছে। তাহাদের সংযোগ হইতে জড়ীয় দ্রব্যসকল উৎপন্ন হয়। একটি এটোল ও আর একটি শুষ্ক পরমাণু পরস্পর মিলিত হইয়া একটি জটের সৃষ্টি করে। পরমাণুদিগের মধ্যে যেমন আকর্ষণ আছে, তেমনি বিকর্ষণও আছে। বিভিন্ন প্রকারের পরমাণুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে। একাধিক অণুর সমবায়ে সংঘাত অথবা স্কন্ধ উৎপন্ন হয়। আমাদের দেহ ও প্রাকৃতিক সকল বস্তুই সংঘাত। সংঘাত

অথবা স্কন্ধগণ আবার মিলিত হয়। পুদ্গলগণের দুই রূপ—অনু এবং স্কন্ধ। দ্ব্যণুক স্কন্ধ হইতে অসংখ্য অণুবিশিষ্ট স্কন্ধ আছে। সমগ্র বিশ্ব "মহাস্কন্ধ"। বৌদ্ধ মতে বস্তুর মধ্যগত অণুদিগের মধ্যে ব্যবধান থাকে। কিন্তু জৈন মতে অণুদিগের স্পর্শ-সংযোগ ব্যতীত কোনও বস্তু উৎপন্ন হইতে পারে না। বস্তুর পরিণাম অণুদিগের বিশ্লেষণের ও সংশ্লেষণের ফল। অণুর মধ্যে গতির উদ্ভব হইতে পারে। এই গতির বেগ এত অধিক হইতে পারে, যে এক নিমেষে ইহা বিশ্বের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত অতিক্রম করিতে পারে।

সূক্ষ্ম অদৃশ্য অনুগণ যে স্থূল রূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়, তাহা অণুদিগের সংস্থানের ফল নহে। তাহা মনের সৃষ্টিও নহে, তাহা বহুসংখ্যক অণুর এক সঙ্গে একই গুণগ্রহণের ফল। তাহাদের এই পরিণামই ইন্দ্রিয়ে প্রতিফলিত হইয়া মনের গোচর হয়। অণু-সংঘের নূতন গুণের এই সমতাকে "তির্য্যকসামান্য" বলে। অণুদিগের এই সাদৃশ্য যতদিন বর্ত্তমান থাকে, ততদিন তাহাদের সমবায়জাত বস্তু এক রূপে প্রতীত হয়। বস্তুর কোনও কোনও গুণের তিরোধান এবং তাহাদের স্থানে নূতন গুণের আবির্ভাব সত্ত্বেও সমগ্র বস্তুটি কিছুকাল ন্যূনাধিক একই থাকিয়া যায়। কালগত এই গুণ-সামান্যকে "ঊর্দ্ধসামান্য" বলে।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম

জৈন দর্শনে ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম শব্দ পুণ্য ও পাপ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। উভয়ই অজীব। ধর্ম্ম বিশ্বব্যাপী, কিন্তু রূপ-রস-গন্ধ-শব্দ-স্পর্শহীন। বিশ্বব্যাপী ধর্ম্ম "অস্তিকায়" কিন্তু অমূর্ত্ত। ধর্ম্ম গতির জন্য অপরিহার্য্য। যেমন জল না থাকিলে মৎস্যের সঞ্চলন সম্ভবপর হইত না, তেমনি ধর্ম্ম না থাকিলে গতি অসম্ভব হইত। জল মৎস্যের গতির প্রেরক নহে। মৎস্যের গতিশক্তি তাহার নিজের, কিন্তু সেই গতির প্রকাশের জন্য জলের প্রয়োজন। ধর্ম্মও গতির কারণ নহে। তাহা উদাসীন। আত্মা ও জড়বস্তুকে ধর্ম্ম চালিত করিতে পারে না, কিন্তু ধর্ম্ম না থাকিলে আত্মা ও জড়বস্তুর মধ্যগত গতিশক্তি সক্রিয় হইতে পারিত না। মুক্ত আত্মাদিগের আবাস-স্থান "অলোকে" ধর্ম্ম নাই, সুতরাং সেখানে তাঁহারা সম্পূর্ণ স্থিতি লাভ করেন। অধর্ম্ম ধর্ম্মের বিপরীত এবং স্থিতির সহায়ক। অধর্ম্মেরও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোনও গুণ নাই। তাহা অমূর্ত্ত, কিন্তু সমগ্র লোকাকাশব্যাপী, স্থিতির উদাসীন হেতু। অধর্ম্ম না থাকিলে কোন বস্তুরই স্থিতিলাভ সম্ভবপর হইত না।

ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম উভয়ই নিষ্ক্রিয় ও অপ্রাকৃতিক। তাহাদের মধ্যে অণু নাই, অংশভেদও নাই। তাহারা বৈশ্বিক তত্ত্ব, গতি ও স্থিতির উদাসীন কারণ। দেশ, ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম না থাকিলে আত্মা ও জড় বস্তুর অবস্থিতি সম্ভবপর হইত না; দেশে ইহারা থাকিবার স্থান পায়; ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম গতি ও স্থিতির সম্ভব করে।

কর্ম্ম

জৈন মতে কর্ম্ম জড়দ্রব্য—পুদ্গলিক। ইহা এক প্রকার সূক্ষ্ম জড়বস্তু, অণু হইতেও সূক্ষ্মতর। এই জড়-বস্তু সমগ্র বিশ্বব্যাপী। ইহার মধ্যেই পাপ ও পুণ্যের ফল পরিপাক প্রাপ্ত হয়। বাহ্য জগতের সহিত আত্মার সংস্পর্শের ফলে এই সূক্ষ্ম জড়-কণা আত্মার মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয়। ইহাদের দ্বারা কর্ম্মশরীর নামে আত্মার এক সূক্ষ্ম শরীর গঠিত হয়। এই শরীর মোক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী। এই সূক্ষ্ম কার্ম্মিক জড়দ্বারা আত্মার শক্তি ব্যাহত হয়। তাহার স্বাভাবিক বিশুদ্ধি মালিন্যকর্তৃক আবৃত হয়। সংসারে জন্ম ও মৃত্যুর কারণ—দেব, নর ও তির্য্যক শরীরে জন্ম ও মৃত্যুর কারণ- কর্ম্ম। আত্মার মধ্যে কার্ম্মিক জড়ের প্রবেশকে "আশ্রব" বলে। ভাব ও কর্ম্মভেদে আশ্রব দ্বিবিধ। আত্মার চিন্তার মাধ্যমে কর্ম্মবর্গনা (কার্ম্মিক জড় কণা) আত্মার মধ্যে প্রবেশ করে। আত্মার এই সকল পরিণামই (চিন্তাই পরিণাম) ভাবাশ্রব। কর্ম্ম যাহাদ্বারা বিনষ্ট হয়, ভাবাশ্রব তাহার বিপরীত। আত্মার মধ্যে কর্ম্মবর্গনার বাস্তব প্রবেশকে কর্ম্মাশ্রব বলে।

ভাবাশ্রব পাঁচ প্রকার:—(১) মিথ্যাত্ব, (২) অবিরতি (সংযমের অভাব), (৩) প্রমাদ, (৪) কায়িক, বাচিক ও মানসিক ক্রিয়াপরতা (৫) কষায়। মিথ্যাত্ব পঞ্চবিধ: (১) একান্ত (মিথ্যা বিশ্বাস), (২) বিপরীত (সত্যের প্রকৃতি-সম্বন্ধে সংশয়), (৩) বিনয় (অভ্যাসবশতঃ মিথ্যা জানিয়াও কোনও বিশ্বাস বর্জ্জন না করা, (৪) সংশয় (ধর্ম্ম-কর্ম্ম-সম্বন্ধে সন্দেহ), (৫) অজ্ঞান (বুদ্ধি শক্তির অব্যবহারের ফলে কোনও বিশ্বাসের অভাব)। হিংসা, অনৃত, চৌর্য্য, অব্রহ্ম (ব্রহ্মচর্য্যহীনতা) এবং পরিগ্রহাকাঙ্ক্ষা (অপ্রাপ্ত বস্তু পাইবার ইচ্ছা) ভেদে অবিরতি পাঁচ প্রকার। প্রমাদও পাঁচ প্রকার: (১) বি-কথা (মন্দ আলাপ), (২) কষায় (কাম ক্রোধাদি চারি রিপু), (৩) পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার, (৪) নিদ্রা ও (৫) রাগ।

আত্মার মধ্যে প্রবেশকামী কর্ম্ম অষ্টবিধ: (১) জ্ঞানাবরণীয়, (২)

দর্শনাবরণীয়, (৩) বেদনীয়, (৪) মোহনীয়, (৫) আয়ু, (৬) নাম, (৭) গোত্র ও (৮) অন্তরায়। ভাবাশ্রব অর্থাৎ দূষিত চিন্তার ফলে এই সকল কর্ম্ম আত্মার মধ্যে প্রবেশ করে। চিন্তার ঈদৃশ অবস্থার নাম ভাববন্ধ। প্রবিষ্ট কর্ম্মকর্তৃক আত্মার বন্ধন দ্রব্যবন্ধ। ভাববন্ধের ফলেই আত্মার সহিত কর্ম্মবর্গনার সংযোগ হয়। ধূলিধূসরিত দেহের মতো আত্মা কর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদিত হয়। কর্ম্মবন্ধ পাপ ও পুণ্যের ফল। কর্ম্মের প্রকৃতি এবং বন্ধের স্থিতি, অনুভাগ (তীব্রতা) এবং প্রদেশ (বিস্তৃতি) অনুসারে বন্ধ চারি প্রকার। জ্ঞানাবরণীয় কর্ম্মের ফল সকল বস্তুর সকল অংশের জ্ঞানের অবরোধ। দর্শনাবরণীয় কর্ম্মের ফল সত্য প্রত্যক্ষ জ্ঞানের অবরোধ (যেমন স্বপ্ন)। বেদনীয় কর্ম্মের ফল আত্মায় সুখ-দুঃখের অনুভূতি। মোহনীয় কর্ম্মের ফল আত্মার মোহজনিত ন্যায়ান্যায়-বিচারাসামর্থ্য। আয়ু-কর্ম্মের ফল জীবনের স্থিতি-নির্দ্ধারণ। নাম-কর্ম্মদ্বারা আত্মার ব্যক্তিত্ব নিয়ন্ত্রিত হয়। গোত্র-কর্ম্মের ফল আত্মার বিশিষ্ট সামাজিক পরিবেশের মধ্যে স্থিতি। অন্তরায়-কর্ম্মের ফল আত্মার সৎকর্ম্মসাধনে বাধার উৎপাদন। আত্মার কর্ম্ম যতদিন থাকে, ততদিন বন্ধের স্থিতি। কর্ম্মের শক্তি উগ্র, মধ্যম অথবা মৃদু হইতে পারে। বন্ধও তদনুরূপ।

আত্মার যে সকল বিভিন্ন অংশে কর্ম্মফল লিপ্ত হয়, তাহাই প্রদেশ। আত্মার মধ্যে কর্ম্মের স্থিতি এবং তাহার উগ্রতার পরিমাণ কষায়দিগের উপর নির্ভরশীল। আত্মার সহিত কর্ম্মের সংযোগ বিভিন্ন প্রকারের। এই সংযোগের প্রকারের বিভিন্নতার উপর কর্ম্মের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ প্রতিষ্ঠিত।*

জৈন ধর্ম্ম ও চরিত্রনীতি

জৈন দর্শন মুখ্যতঃ চরিত্রনীতিমূলক। মোক্ষই জীবনের উদ্দেশ্য। মোক্ষ নির্ভর করে উপযুক্ত আচরণের উপর। মোক্ষের উপযোগী আচরণ কি, তাহা নির্দ্ধারণ করার জন্যই তাত্ত্বিক দর্শনের প্রয়োজন। স্পিনোজার দর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাঁহার Ethics নামক গ্রন্থে। Ethics-এর ভিত্তি-স্থাপনের জন্য প্রথমে তিনি তাঁহার দার্শনিক মতের ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

জৈন মতে প্রত্যেক জীবের মধ্যে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি এবং অনন্ত সুখের শক্যতা আছে। অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত সুখপ্রাপ্তির

* Das Gupta's History p. 194 vol—I.

বাধা আত্মার মধ্যেই বর্ত্তমান। মেঘাবৃত সূর্য্য যেমন মেঘাপসরণে জগৎ আলোকিত করিতে সমর্থ হয়, তেমনি আত্মার মধ্যস্থ বাধা অপসারিত হইলে, আত্মা অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত সুখ-লাভে সক্ষম হয়; যতদিন বাধা দূরীকৃত না হয়, ততদিন আত্মা জন্ম-মৃত্যু-স্রোতে ভাসিতে থাকে এবং তাহার আনুষঙ্গিক দুঃখ ভোগ করে। এই বাধা-দূরীকরণের জন্য তাহার স্বরূপ জানার যেমন প্রয়োজন, তেমনি উপযুক্ত উপায় অবলম্বন করিয়া তাহার দূরীকরণের জন্য চেষ্টারও প্রয়োজন। আত্মার জ্ঞান, শক্তি ও সুখ-লাভে বাধা উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে কর্ম্মবর্গনার প্রবেশদ্বারা। এই সূক্ষ্ম জড়কণাসকল আত্মার মধ্যে প্রবেশ করিয়া, তাহার স্বাভাবিক জ্ঞান, শক্তি ও সুখ আবৃত করে। আত্মা তখন দেহ হইতে আপনাকে অভিন্ন মনে করে। এই দেহও আত্মা আপনিই নির্ম্মাণ করে। পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফলে আত্মার যেরূপ কামনা সঞ্চিত হয়, তাহাদ্বারা বিশিষ্ট প্রকারের পুদ্‌গলকণা আকৃষ্ট হইয়া ঐ সকল কামনাতৃপ্তির উপযোগী দেহ গঠন করে। এই জন্য জৈনগণ দেহ আত্মা-কর্ত্তৃক নির্ম্মিত বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে স্থূল দেহ ব্যতীত আত্মার এক সূক্ষ্ম দেহও আছে, যাহা মোক্ষ পর্য্যন্ত স্থায়ী। কোন্ পরিবেশের মধ্যে, কোন্ বংশে, কোন্ পিতামাতার সন্তান হইয়া আত্মা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাও নির্ভর করে তাহার কর্ম্মের উপর। দেহের আকার, বর্ণ, ইন্দ্রিয়ের পটুতা ও সংখ্যা, রূপ, গুণ সমস্তই পূর্ব্বকৃত কর্ম্মদ্বারা নিয়ন্ত্রিত। কর্ম্মদ্বারা আত্মার মনের শক্তি, সৎকর্ম্ম-প্রবণতা বা অসৎ-কর্ম্ম-প্রবণতাও নিয়ন্ত্রিত হয়। যে কর্ম্মদ্বারা আত্মা কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহার নাম গোত্র-কর্ম্ম। আয়ুকর্ম্মদ্বারা আয়ু নির্দ্দিষ্ট হয়। এ সকল পূর্ব্বে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

চতুর্ব্বিধ কষায় (ক্রোধ, মান, মায়া ও মোহ) জীবের বন্ধের হেতু। আত্মায় ইহাদের অস্তিত্ববশতঃ জড়কণাসকল আত্মায় লগ্ন হয়। ইহারা আঠার মতো।

আত্মার দ্বিবিধ বন্ধ—ভাববন্ধ ও দ্রব্যবন্ধ—পূর্ব্বে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই বন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে হইলে জড় হইতে আত্মাকে সম্পূর্ণ বিশ্লিষ্ট করার প্রয়োজন। নূতন জড়ের প্রবেশ রোধ করা এবং প্রবিষ্ট জড়ের ধ্বংসসাধন-দ্বারা ইহা সম্ভবপর। জড়ের প্রবেশরোধকে "সম্বর" বলে। পূর্ব্ববর্ত্তী কর্ম্ম-জনিত যাবতীয় পাপের ধ্বংসের নাম "নির্জ্জরা।"

জৈন ধর্ম্মের প্রধান কথা অহিংসা—যাবতীয় প্রাণবান্ বস্তুর হিংসা হইতে

বিরতি। এই উদ্দেশ্যে বিস্তারিত নির্দ্দেশ জৈন শাস্ত্রে আছে। পাছে পথে গমনকালে পদতলে পিষ্ট হইয়া কীটাদির প্রাণহানি হয়, এই ভয়ে অনেক জৈন পথ মার্জ্জনা করিতে করিতে অগ্রসর হন। পাছে মুখের মধ্যে সূক্ষ্ম জীব প্রবেশ করিয়া বিনষ্ট হয়, এই ভয়ে পথ চলিবার সময় মুখ আবৃত করেন। মৌমাছি মারিয়া মধু সংগৃহীত হয় বলিয়া মধু খান না। পাছে জীব-হত্যা হয়, এই ভয়ে জৈনগণ সর্ব্বদা শঙ্কিত।

আত্মার মধ্যে বন্ধের হেতু কার্ম্মিক জড়ের প্রবেশ বন্ধ করিবার দ্বিবিধ উপায়—ভাব-সংবর এবং দ্রব্য-সংবর। আমাদের মনের মধ্যে যে সকল অসৎ চিন্তার উদয় হয়, তাহার বাহ্য কার্ম্মিক জড় কণাদিগকে আকর্ষণ করে। ভাব-সংবরদ্বারা চিন্তার গতি পরিবর্ত্তিত হয়, এবং চিন্তা অসৎ পথ হইতে নিবৃত্ত হয়। সপ্ত প্রকার ভাব-সংবর উল্লিখিত হইয়াছে: (১) অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ অবলম্বনে সংকল্প। (২) কীটাদির প্রাণহানি-পরিহারের উদ্দেশ্যে যে পথে সর্ব্বদা লোক চলে, সেই পথে চলা, মৃদু ভাবে পবিত্র ভাষণ, উপযুক্ত ভিক্ষাগ্রহণ (এষণা) প্রভৃতি; (৩) গুপ্তি অর্থাৎ কায়, বাক্য ও মনঃসংযম, (৪) ধর্ম্মসাধন অর্থাৎ ক্ষমা, বিনয়, অকপটতা, সত্যকথন, শৌচ, সংযম, প্রায়শ্চিত্ত, ত্যাগ, লাভালাভে ঔদাসীন্য এবং পূর্ণ ব্রহ্মচর্য্য, (৫) অনুপ্রেক্ষা অর্থাৎ সংসারের নশ্বরতা, সত্যের অভাবে আমাদের অসহায় অবস্থা, কল্পে কল্পে সৃষ্টি, আমাদের সৎ ও অসৎ কর্ম্মের জন্য আমাদের দায়িত্ব, আত্মা ও অনাত্মবস্তুর মধ্যে ভেদ, দেহের ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল বস্তুর অশুচিতা, আত্মার মধ্যে কর্ম্মের প্রবেশ ও তাহার প্রতিরোধ, দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট কর্ম্মের বিনাশ, আত্মা জড় বিশ্বের উপাদান, সত্য জ্ঞান-লাভের দুরূহতা এবং জগতের মূল তত্ত্ব, এই সকল সম্বন্ধে চিন্তা; (৬) পরিসহজয় অর্থাৎ শীত গ্রীষ্মাদি দ্বন্দ্ব সহিষ্ণুতা এবং (৭) চারিত্র অর্থাৎ সৎ কর্ম্ম। এই সকলের ফলে নির্জ্জরা বা আত্মার মধ্যগত কর্ম্মের বহিষ্কার বা ধ্বংস সাধিত হয়। নির্জ্জরা দ্বিবিধ—ভাব-নির্জ্জরা ও দ্রব্য-নির্জ্জরা। আত্মার যে অবস্থায় কর্ম্মকণাগণ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেই অবস্থার নাম ভাব-নির্জ্জরা, কর্ম্মকণাদিগের বাস্তব ধ্বংসের নাম দ্রব্যনির্জ্জরা। কর্ম্মের ফলভোগ সমাপ্ত হইলে সবিপাক কর্ম্মের ধ্বংস হয়। অবিপাক কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্তের ফলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। যাবতীয় কর্ম্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে মোক্ষ হয়।[৮]

উপরিলিখিত বিষয়সকলের চিন্তা করিতে করিতে আসক্তি তিরোহিত হয়, মন সর্ব্ববিষয়ে সমত্ব লাভ করে। সাংসারিক সুখ তাহাকে প্রলুব্ধ করে না।

মন শান্ত এবং কষায়-বিমুক্ত হয়। ইহার পরে জৈন সাধক ধ্যান অবলম্বন করেন। ধ্যানের অর্থ মনঃ-সমাধান। চিত্তের সমত্ব ব্যতীত ধ্যান সম্ভবপর হয় না। ধ্যানে মন স্থির রাখিবার জন্য মৈত্রী, করুণা, প্রমোদ (মুদিতা) এবং মাধ্যস্থের (উপেক্ষার) চিন্তা করা আবশ্যক। সর্ব্ব জীবের প্রতি বন্ধুত্বই মৈত্রী, সর্ব্ব জীবের দুঃখে দয়া করুণা, সর্ব্ব জীবের সৎকর্ম্মে সন্তোষ প্রমোদ এবং অসৎ কর্ম্মে উপেক্ষা মাধ্যস্থ। উপাসনা-মন্ত্রের উপর মনকে স্থির রাখাই ধ্যান। ধ্যানের ফলে মন কিছুতেই বিচলিত হয় না, চিত্তশুদ্ধি হয় এবং তাহার ফলে কর্ম্ম বিনষ্ট হয়।

জৈন ধর্ম্মে ঈশ্বর অস্বীকৃত, বেদের প্রামাণ্যও স্বীকৃত নহে। সাংখ্যদর্শনেও ঈশ্বরের স্থান নাই, কিন্তু বেদের প্রামাণ্য স্বীকার করায় তাহা আস্তিক দর্শনসমূহের অন্তর্গত। বেদ স্বীকার না করায় বৌদ্ধ দর্শনের মতো জৈন দর্শন নাস্তিক দর্শন বলিয়া পরিগণিত। জৈন ধর্ম্মে ঈশ্বরের স্থানে মুক্ত আত্মাগণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। মুক্তাত্মাগণ অনন্ত জ্ঞান, অনন্তশক্তি ও অনন্ত সুখের অধিকারী। পঞ্চ পরমেষ্টির উপাসনা জৈনদিগের নিত্যকর্ম্মের অন্তর্গত। জৈনদিগের ধর্ম্মপিপাসা এই উপাসনাদ্বারা পরিতৃপ্ত হয়। পরমেষ্টিদিগের স্মরণ করিয়া তাঁহারা চিত্তশুদ্ধিলাভ করেন এবং তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া মোক্ষলাভের আশা করেন। কর্ম্মের অমোঘ শক্তিতে বিশ্বাস থাকায় জৈনগণ পরমেষ্টিদিগের নিকট পাপের জন্য ক্ষমা এবং দয়া প্রার্থনা করেন না। আত্মশক্তিবলে মুক্তিলাভের পথে মুক্ত আত্মাগণ পথপ্রদর্শক। জৈন ধর্ম্ম আত্মশক্তি বলে মুক্তিলাভের ধর্ম্ম, বেদান্তের মতো বীরের ধর্ম্ম। মুক্ত আত্মাগণ বীর, তাঁহারা জিন।

জৈন ধর্ম্মে ক্ষেত্রবিশেষে আত্মহত্যা অনুমোদিত। বৈরাগ্য-অভ্যাস অসম্ভব হইলে অথবা তপস্যার কষ্ট সহ্য করিতে না পারিলে আত্মহত্যায় পাপ নাই। কেহ কেহ বলেন, বারো বৎসর তপস্যার পরে যখন নির্ব্বাণ-লাভ নিশ্চিত হয়, তখন আত্মহত্যা করা যাইতে পারে।

অন্যান্য ধর্ম্মের ন্যায় জৈন ধর্ম্মেও স্ত্রীলোক হইতে দূরে থাকিবার বিধি আছে। যে যে ধর্ম্মাবলম্বী হউক, সৎপথে থাকিলে সকলেই মোক্ষপ্রাপ্ত হইতে পারে, ইহাই জৈন মত।

জৈন সমাজে জাতিভেদ নাই। কর্ম্মানুসারে কেহ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, কেহ কেহ শূদ্র বলিয়া পরিগণিত হয়। "যিনি সর্ব্বকর্ম্মমুক্ত তিনিই ব্রাহ্মণ।" ব্রাহ্মণ-বংশোদ্ভূত না হইলেও এরূপ লোককেই জৈনগণ ব্রাহ্মণ বলিয়া সম্মান

করেন। জাত্যভিমান জৈন মতে পাপ। জৈনদিগের মধ্যে সন্ন্যাসী যেমন আছে, সন্ন্যাসিনীও তেমনি আছে।

জৈনগণ আপনাদিগের ধর্ম্মপ্রচারের জন্য বিশেষ চেষ্টা না করিয়াও ভারতবর্ষে টিকিয়া আছে। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারত হইতে নির্ব্বাসিত। ইহার কারণ জৈনগণ আপনাদিগকে হিন্দু সমাজ হইতে কখনও বিচ্ছিন্ন করে নাই। জৈনদিগের গৃহে ধর্ম্মকর্ম্মের জন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিত নিযুক্ত হয়। শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হয়। হিন্দু অবতারদিগের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তিও জৈনগণ পোষণ করেন।

অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ সন্ন্যাসী ও গৃহী সকলের জন্য বিহিত হইলেও গৃহী জৈনদিগের জন্য এই নিয়মের কঠোরতার হ্রাস করা হইয়াছে। হেমচন্দ্র বলেন, "সাধারণ গৃহস্থ সাধু ভাবে অর্থ-উপার্জ্জন করিবেন, সৎবংশের কন্যা বিবাহ করিবেন এবং দেশের প্রচলিত প্রথার অনুসরণ করিবেন। যাহারা মুক্তিকামী, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ তাহাদের কঠোরতম ভাবে পালনীয়। ইহার পালন তাঁহাদের "মহাব্রত।" কিন্তু সাধারণ গৃহস্থের পক্ষে ইহারা "অনুব্রত"। গৃহস্থের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যের অর্থ পরদারগমন হইতে বিরতি। কিন্তু মহাব্রতীদিগের পক্ষে ইহার অর্থ সর্ব্ব-প্রকার যৌন সংস্পর্শ ও তৎসম্বন্ধীয় চিন্তারও বিরতি। গৃহী জৈনের পক্ষে জীব-হত্যা হইতে বিরতিই অহিংসা, কিন্তু মহাব্রতীদিগের পক্ষে তাহা সকল জীবের সর্ব্বপ্রকার অনিষ্ট হইতে বিরতি।" গৃহস্থদিগের উপযোগী অহিংসা-সাধনের জন্য যে সকল উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে আছে, (১) বিভিন্ন স্থলে জীবহত্যার কারণ না হইয়া, এক জায়গায় বাস করা (দিক্‌বিরতি) (২) ভোগোপভোগমান (মদ্যপান এবং মাংস, মাখন, মধু ও কয়েকপ্রকার তরকারী, শাক ও ফল ভক্ষণ হইতে এবং নির্দ্দিষ্টকালে ভিন্ন অন্য সময়ে ভোজন হইতে বিরতি), (৩) অনর্থ দণ্ড—কাহারও কোনরূপ দৈহিক অনিষ্ট না করা, কুবিষয় সরবরাহ না করা এবং কাহাকেও চাষ করিতে পরামর্শ না দেওয়া; গানের মজলিসে অথবা থিয়েটারে না যাওয়া, যৌন সাহিত্য-পাঠ না করা, (৪) শিক্ষাপদব্রত (সকল জন্তুর প্রতি সমদৃষ্টি, অতিথি-সৎকার প্রভৃতি)। এই সকল আদেশ-ভঙ্গের নাম "অতিচার"।

একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত লিখিয়াছেন, অসভ্য অবস্থায় মানুষ জীবনের সকল প্রকার অভিব্যক্তিই ভক্তি ও ভয় মিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখে। ইহা হইতেই অহিংসা-মতের উদ্ভব।*

* (Mackenzi in his Hindu Ethics—P. 112)।

অসভ্য মানুষ গাছের পূজা করে, কোনও কোনও জন্তুরও পূজা করে, ইহা সত্য। কিন্তু সকল জীবকে যে ভক্তি ও ভয়ের দৃষ্টিতে দেখে, ইহা সত্য হইলে তাহাদের মধ্যে ব্যাধের বৃত্তি থাকিত না। সে যাহা হউক, জৈন অহিংসার মূলে আছে প্রত্যেক জীবের মধ্যে আত্মার অধিষ্ঠানে বিশ্বাস, এবং প্রত্যেক জীবের সহিত আত্মীয়তাবোধ। প্রত্যেক আত্মার মধ্যেই অন্য আত্মার সমান হইবার শক্তি বর্ত্তমান, সুতরাং পশুর জীবনের মূল্য মানুষের জীবনের মূল্যের সমান। এই ধারণা হইতেই অহিংসার উদ্ভব।

নিরীশ্বরবাদ

জৈন দর্শন মতে ঈশ্বরের অস্তিত্বের কোনও প্রমাণ নাই। বেদকে জৈনগণ প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন না। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহার সৃষ্টি হইতে পারে না। যাহা আছে, তাহার ধ্বংসও হইতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বর জগতের উপাদান সৃষ্টি করিয়া তাহাদ্বারা জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, এই মত অশ্রদ্ধেয়। জগতের উপাদান চিরকালই বর্ত্তমান। তাহাদের পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে নূতন নূতন গুণের উদ্ভব হয়, যদৃচ্ছা বা আপতিক ঘটনা হইতে জগতের উদ্ভবও অসম্ভব। জগৎ পরিচালিত হয় নিয়মানুসারে। প্রাকৃতিক নিয়ম যে হঠাৎ আবিভূত হইয়াছে, ইহাও সম্ভবপর নয়। জগতের উপাদান যেমন অনাদিকাল হইতে বর্ত্তমান, জগতের নিয়মাবলীও তেমনি চিরকাল বর্ত্তমান। বিশ্বের আদিকর্ত্তা একজনের অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন নাই। আদিকর্ত্তার (ঈশ্বরের) মনে জগৎ-সৃষ্টির ইচ্ছা হইয়াছিল, তাই তিনি জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন যদি বল, তাহা হইলে তিনি জগতের উপাদান পাইলেন কোথায়, এই প্রশ্ন ওঠে। ঈশ্বরের ইচ্ছা আমাদের বুদ্ধির অতীত বলিলে দর্শনের নিকট বিদায় লইতে হয়। ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই যদি সব হয়, তবে বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন গুণ কেন? ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই যদি সব হয়, তাহা হইলে অগ্নি দহন করে কেন, জল অগ্নি নির্ব্বাপিত করে কেন? বস্তুর গুণদ্বারাই জগৎ নিয়ন্ত্রিত। প্রত্যেক বস্তুর জন্য একজন সৃষ্টিকর্ত্তার যদি প্রয়োজন হয়, তাহা হইলে সেই সৃষ্টিকর্ত্তার সৃষ্টির জন্যও আর একজন সৃষ্টিকর্ত্তার প্রয়োজন। ফলে অনবস্থার উদ্ভব হয়। যদি এক স্বয়ম্ভু স্রষ্টাকর্তৃক জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে বল, তাহা হইলে তোমরা স্বীকার কর যে সনাতন এক ব্যক্তির অস্তিত্ব সম্ভবপর। যদি একজন সৃষ্ট না হইয়া অনাদিকাল হইতে থাকিতে

পারেন, তাহা হইলে জগতের জড় উপাদানই বা অনাদিকাল হইতে থাকিতে পারিবে না কেন? সমগ্র বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত—বহু আত্মা এবং জড়ীয় উপাদান। উভয়ই অনন্তকাল হইতে বর্ত্তমান। নানা পরিবর্ত্তন এই উভয় ভাগেই ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে। কিন্তু সে সকল পরিবর্ত্তন প্রকৃতির শক্তিতেই হইয়াছে ও হইতেছে। কোনও সনাতন ঈশ্বরের ক্রিয়া তাহাতে নাই। কাল, স্বভাব, নিয়তি, কর্ম্ম এবং উদ্যম—ইহারাই জগতের বৈচিত্র্যের মূল। বীজের মধ্যে শক্তি নিহিত থাকিলেও তাহার বিকাশের জন্য কাল ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রয়োজন।

ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলেও সাধনাবলে ঈশ্বরের গুণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, জৈনশাস্ত্রে ইহা স্বীকৃত। অর্হৎগণ সর্ব্বদোষ-মুক্ত হইয়া সর্ব্বজ্ঞতা ও সর্ব্বশক্তিমত্তা লাভ করিয়া অনন্ত আনন্দের অধিকারী হইয়াছেন। মানুষের আত্মার মধ্যে যে সকল শক্তি নিহিত আছে, তাহার পূর্ণতম সর্ব্বোত্তম বিকাশই ঈশ্বরত্ব।

ঈশ্বরবিহীন জৈন ধর্ম্মে প্রকৃত পক্ষে ভক্তির স্থান নাই। কিন্তু মানবমনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তিবশতঃ তীর্থঙ্করদিগের প্রতি ভক্তি ও তাহাদের পূজা জৈন সমাজে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। অনেক হিন্দু দেবতার উপাসনাও প্রচলিত হইয়াছে। জৈন সম্প্রদায়ের এক অংশ বৈষ্ণব। তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা করেন।

জৈনগণ দেবতাদিগের অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন। মানুষের মত দেবতাদিগেরও দেহ আছে। কিন্তু মানুষ অপেক্ষা তাঁহারা পূর্ণতর এবং অধিকতর ক্ষমতাশালী। পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের পুণ্যবলে তাঁহারা দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। কিন্তু মুক্ত আত্মাদিগের স্থান দেবতাদিগেরও উপরে। তাঁহারা জন্ম-মৃত্যু অতিক্রম করিয়াছেন। জগতের সহিত কোনও সম্বন্ধই তাঁহাদের নাই। যাঁহারা মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছেন, তাহাদিগকে তাঁহারা কোনও রূপ সাহায্য করেন না। তাহাদের প্রার্থনার উত্তরও দেন না। জগতের ব্যাপারে তাঁহারা উদাসীন। করুণা, অনুকম্পা প্রভৃতি চিত্তাবেগ হইতে তাঁহারা মুক্ত কিন্তু ভক্তের প্রার্থনা দেবতারা শোনেন। তাঁহারা ভক্তদিগকে অনুগ্রহ করেন। উপাসনাদ্বারা মুক্তি-প্রাপ্তির সাধন চিত্ত-শুদ্ধিমাত্র হইতে পারে। জিনদিগের উপদেশপালনই তাঁহাদের প্রকৃষ্ট উপাসনা। কঠোর বৈরাগ্য প্রধান ধর্ম্মে সাধারণ লোকের ধর্ম্মপিপাসা পরিতৃপ্ত হয় না। যে ধর্ম্মে উপাস্যের অনুগ্রহলাভের ও পাপের ক্ষমার কথা নাই, সে ধর্ম্মে সাধারণ লোক আকৃষ্ট হয় না। তাই পূজার ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।

মোক্ষ

জড়ের সহিত আত্মার সংযোগই বন্ধ; জড়-সংযোগ-বিনির্মুক্ত অবস্থাই মোক্ষ। মোক্ষে আত্মার ধ্বংস হয় না, তাহার জ্ঞান, শক্তি ও সুখ অনন্তত্ব প্রাপ্ত হয়। আত্মার মধ্যে প্রবিষ্ট জড়ের ধ্বংস ও নূতন জড়ের প্রবেশের প্রতিরোধ "সংবর" এবং প্রবিষ্ট জড়ের ধ্বংস "নির্জরা"।

অজ্ঞান হইতে—আত্মার স্বরূপের জ্ঞানের অভাব হইতে—ক্রোধ, মান, (মদ) মায়া ও মোহরূপ চারি কষায় উদ্‌ভূত হয়। সম্যক জ্ঞানদ্বারাই অজ্ঞান দূরীভূত হয়। তীর্থংকরদিগের উপদেশের অধ্যয়ন এবং অনুশীলন-দ্বারা সম্যক জ্ঞানলাভ হয়। কিন্তু তাহার জন্য তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার প্রয়োজন। "সম্যক চারিত্র" ব্যতীত শুধু অধ্যয়ন ও অনুশীলন ফলোপধায়ক হয় না। তাই "সম্যক-দর্শন-জ্ঞান-চারিত্রাণি মোক্ষ-মার্গাঃ"। সম্যক দর্শনের অর্থ সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ—এই পঞ্চ মহাব্রত পালনই চারিত্র। সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান, সম্যক চারিত্রদ্বারা অজ্ঞান দূরীভূত হয়, কায়িক জড়ের ধ্বংস হয়, নূতন জড়ের আত্মার মধ্যে প্রবেশ বন্ধ হয় এবং পরিণামে মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।

মোক্ষে আত্মার অবস্থা কিরূপ হয়? তাহার মধ্যে রাগ দ্বেষ থাকে না। কোন কিছুর প্রতি আসক্তি থাকে না। কোন কিছুর প্রতি বিদ্বেষও থাকে না। আত্মা তখন উদাসীন। কিন্তু জ্ঞানাবরণ উন্মোচিত হওয়ার ফলে আত্মার মধ্যস্থ জ্ঞানের প্রকাশ হয়। জ্ঞান অনন্ত হয়, শক্তি অনন্ত হয় এবং সুখও অনন্ত হয়। সাংখ্যদর্শনে মুক্তিতে জ্ঞান অনন্তত্ব প্রাপ্ত হয়, ইহা আছে। কিন্তু অনন্ত শক্তি ও অনন্ত সুখের কথা নাই। সাংখ্যদর্শনেও জড়ের বন্ধন হইতে মুক্ত হওয়াই মোক্ষ। কিন্তু সে বন্ধন আত্মার (পুরুষের) নহে। পুরুষ চিরমুক্ত; তাহার সান্নিধ্যে অহংজ্ঞানী এক ভাক্ত পুরুষ প্রকৃতির মধ্যে উদ্‌ভূত হয়। অহংজ্ঞান-বিনাশের সঙ্গে তাহার তিরোধান হয়। কিন্তু জৈন দর্শনে বন্ধন হয় আত্মার। অমুক্ত আত্মা অনন্ত কাল হইতে জড়ের বন্ধনে আবদ্ধ। এই বন্ধনের আদি না থাকলেও, অন্ত আছে। মোক্ষে ইহার নাশ হয়।

বন্ধের নাশ হইলে আত্মার ব্যক্তিত্ব থাকে, কিন্তু বন্ধকালের স্মৃতি থাকে কি? মুক্ত আত্মাদিগের মধ্যে ভেদই বা কোথায়? সকলের জ্ঞান, শক্তি ও সুখই তো অনন্ত। যে অবস্থায় কোনও কামনা নাই, কোনও কর্ম্ম নাই,

যাহা নিরবচ্ছিন্ন শান্তির অবস্থা, তাহা বর্ণনাতীত। বর্ণনাতীত হইলেও জৈন দার্শনিকগণ তাহাকে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি ও অনন্ত সুখের অবস্থা বলিয়াছেন। তাঁহারা ইহাও বলিয়াছেন যে মুক্ত আত্মাগণ পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট। প্রত্যেক মুক্ত আত্মার মধ্যে অতীতের স্মৃতি বর্ত্তমান থাকে। তীর্থংকরগণ (২৪) সকলেই মুক্তিলাভ করিয়াছেন।

মুক্ত আত্মাদিগের যে পরিণাম নাই, তাহা নহে। কিন্তু এই সকল পরিণামই সদৃশ পরিণাম। প্রত্যেক পরিণাম তাহার পরবর্ত্তী পরিণামের সহিত সম্পূর্ণ একরূপ। সুতরাং আত্মার জ্ঞান, শক্তি ও সুখের কোনও পরিবর্ত্তনই হয় না।

সমালোচনা

জৈন দর্শনে জ্ঞানের আপেক্ষিকতা স্বীকৃত হইয়াছে, কিন্তু সর্ব্ব-অপেক্ষা-বর্জ্জিত সর্ব্বাধার অসঙ্গের (absolute) অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। বিশ্ব দুই ভাবে বিভক্ত—জড় ও চেতন। চেতন আত্মা বহু। আত্মা যদি একমাত্র হইত, তাহা হইলে এক জীব হইতে অন্য জীবের কোনও ভেদ থাকিত না, তাহাদের কর্ম্মফল বিভিন্ন হইত না, পাপী ও পুণ্যবানের মধ্যে পার্থক্য থাকিত না। এই যুক্তি সাংখ্যদর্শনে একটু ভিন্ন আকারে আছে। সাংখ্য বলেন, দেহ ভোগায়তন। প্রত্যেক দেহে যে ভোগ হয়, তাহার ভোক্তা ভিন্ন। দেহ যখন বহু, তখন ভোক্তাও বহু, ইহা বলিতে হয়। আবার ত্রিগুণের বিপর্য্যয় অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন জীবে ত্রিগুণের ভিন্ন ভিন্ন ভাবদ্বারা (কোনও জীব সত্ত্ববহুল, কোনও জীব রজোবহুল, কোনও জীব তমোপ্রধান) জীবের বহুত্ব প্রমাণিত হয়।

জীব যে বহু বলিয়া প্রতীত হয়, ব্যবহারতঃ জীব যে বহু, তাহা সত্য। বহুসংখ্যক বস্তু যে আমাদের সঙ্গে বর্ত্তমান, তাহা আমরা প্রত্যক্ষ করি। কিন্তু এই প্রতীয়মান বহুত্বের অন্তরালে তাহাদের সংযোগ-ও একত্ববিধানকারী এক তত্ত্ব নাই কি? আমাদের মন এমন ভাবে গঠিত, যে চিন্তার জন্য ভেদের প্রয়োজন। চিন্তায় বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ বর্ত্তমান। চিন্তার বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে ও চিন্তার বাহিরে ভেদ বর্ত্তমান। এই ভেদ না থাকিলে চিন্তার সম্ভব হইত না। যে বস্তুর সহিত অন্য কোনও বস্তুর কোনও সম্বন্ধ নাই, যাহা অন্য যাবতীয় বস্তু হইতে একান্ত ভিন্ন, তাহা চিন্তার অযোগ্য। আবার যে বস্তুর অন্য বস্তুর সহিত কোনও ভেদ নাই, তাহাও চিন্তার অযোগ্য। বস্তুদিগের মধ্যে সাদৃশ্য ও ভেদ উভয়ই না থাকিলে তাহাদের চিন্তা করা যায় না। কিন্তু

সকল ভেদের মধ্যে একত্বও বর্ত্তমান। জৈন মতে যখন চিন্তাদ্বারাই সতের স্বরূপ বোধগম্য হয়, তখন সতের মধ্যে ভেদ ও অভেদ উভয়ের অস্তিত্বই স্বীকার করিতে হইবে। "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" এই বাক্যের অর্থ পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন একত্ববিহীন "নানার" অস্তিত্ব নাই। পরস্পর সম্বন্ধ, একসূত্রে গ্রথিত বহু যেমন বহু, তেমনি এক। বহু যেমন একবর্জ্জিত নয়, একও তেমনি বহুবর্জ্জিত নয়। যাবতীয় বস্তু যে জাতি বা কারণ-রূপে এক, এবং ব্যক্তি বা কার্য্যরূপে বহু, জৈন দর্শনে তাহা অস্বীকৃত নহে। জাতিরূপে একত্ব এবং ব্যক্তিরূপে বহুত্ব উভয়ই আংশিক ভাবে সত্য। বস্তুর বহুত্ব আপেক্ষিক ভাবে সত্য, পূর্ণ সত্য হইতেছে একত্বের মধ্যে অবস্থিত বহুত্ব। সমগ্রকে তাহার সর্ব্ব গুণের সহিত একত্র দেখাই পূর্ণ দৃষ্টি। জৈন দর্শনে এই পূর্ণ দৃষ্টির অভাব। ইহা বহুত্বের মধ্যে একত্বের অনুসন্ধান করে নাই এবং একত্বের দর্শনলাভ করে নাই। ইহা আপেক্ষিক সত্যকে পূর্ণ সত্যের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

বিষয়ী ও বিষয় যদি সম্পূর্ণ ভিন্ন হইত, তাহা হইলে জ্ঞান অসম্ভব হইত। বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে বাহ্য কোনও বন্ধন নাই। তাহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু নহে। তাহারা উভয়ে মিলিয়া এক—একের মধ্য দ্বিত্ব, দ্বিত্বের মধ্যে একত্ব। একটির অভাব হইলে আর একটি থাকে না। জ্ঞানের উদ্ভবের ফলে উভয়ে পরস্পর হইতে বিভক্ত হয়। উভয়ের ভেদ বিভিন্ন বস্তুর মধ্যে ভেদ নহে। জ্ঞানের ক্ষেত্রের মধ্যে জ্ঞানকর্ত্তৃক এই ভেদ কৃত হয়। জৈন দর্শনে এই একত্ববিধায়ক তত্ত্ব স্বীকৃত হয় নাই। বহুত্ববাদ আপেক্ষিকভাবে সত্য, পূর্ণ সত্য ইহাকে বলা যায় না।

আমাদের জ্ঞান আপেক্ষিক ও আংশিক হইলেও পূর্ণ অনপেক্ষ (absolute) জ্ঞানের অস্তিত্ব আছে। জ্ঞান আপেক্ষিক হইলেও জৈন মতে তাহা ক্ষণবিধ্বংসী বিজ্ঞানমাত্র নহে। বিষয়ে তাহার ভিত্তি। বিষয় যাহা, তাহাই জ্ঞানে প্রকাশিত হয়। বস্তুর যে অর্থ আংশিকভাবে জ্ঞানে প্রকাশিত হয়, তাহা তাহার সম্পূর্ণ স্বরূপ না হইলেও তাহার অন্তর্গত। বস্তুর সম্পূর্ণ স্বরূপ প্রকাশিত হয় পূর্ণ জ্ঞানে, যাবতীয় বস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধযুক্ত সমগ্রের জ্ঞানে। এতাদৃশ সমগ্রের অস্তিত্ব যেমন আছে, তেমনি তাহার জ্ঞানের অস্তিত্বও আছে। এই জ্ঞান কোথায় আছে? ইহা নিশ্চয় সর্ব্বজ্ঞানের আধার এক পূর্ণ পুরুষে বর্ত্তমান। এই জ্ঞানে বিষয় ও বিষয়ের ভেদ লুপ্ত হয়। জৈন দর্শনে এতাদৃশ জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকৃত। মুক্ত আত্মগণ যে এই জ্ঞান প্রাপ্ত হন, তাহা জৈন দার্শনিকগণ স্বীকার করেন।

কিন্তু মুক্ত আত্মা বহু। এই বহুত্বস্থাপনে যথেষ্ট যুক্তির অভাব। যাঁহারা মুক্ত হন, তাঁহাদের মধ্যে কোনও ভেদই নাই। তাঁহাদের জ্ঞান, শক্তি, সুখ, সকলই সমান। সর্ব্বাংশে একরূপ সর্ব্বভেদহীন একাধিক বস্তু কিরূপে থাকিতে পারে, তাহা দুর্ব্বোধ্য। এই কেবল জ্ঞানই ভিন্ন ভিন্ন জীবে বিভিন্ন পরিমাণে প্রকাশিত হয়। যাবতীয় জীবের আপেক্ষিক জ্ঞানের সমষ্টি এই কেবল জ্ঞান নহে। মানুষের চিন্তায় আপেক্ষিক জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু পাওয়া সম্ভবপর নহে। কিন্তু কেবল জ্ঞান সকল আত্মারই স্বরূপ। জড়ের বাধাবশতঃ তাহা ন্যূনাধিক আবৃত থাকিলেও, তাহা প্রত্যেক আত্মার মধ্যে বর্ত্তমান। বিভিন্ন জীবের জ্ঞানের বিভিন্নতার যাহা কারণ, তাহা স্থায়ী নহে। জড়ই এই বিভিন্নতার কারণ; জড় সকলের মধ্যে ভেদরেখা টানিয়া দেয়। তাহার বাধার নাশ হইলে ভেদরেখাও বিলুপ্ত হয়।

জৈন দর্শনের জীববাদের সহিত জার্ম্মান দার্শনিক লাইবনিট্জের মনাদ-বাদের কিছু সাদৃশ্য আছে। লাইব্‌নিট্জের মতে ক্ষুদ্রতম জড়কণার মধ্যে বহুসংখ্যক জীবের (Entelechies, souls) বাস। বৃক্ষে পরিপূর্ণ, উদ্যান এবং মৎস্যে পূর্ণ পুষ্করিণীর সহিত তিনি জড়কণার সাদৃশ্য বর্ণনা করিয়াছেন। উদ্যান যেমন বৃক্ষে পরিপূর্ণ, পুষ্করিণী মৎস্যে পরিপূর্ণ, প্রত্যেক জড়কণাও তেমনি জীবে পরিপূর্ণ। বৃক্ষের প্রত্যেক শাখা, প্রত্যেক জন্তুর প্রত্যেক অঙ্গ এবং তাহার শরীরের জলীয় অংশের প্রত্যেক বিন্দুও অসংখ্য জীবে পূর্ণ। উদ্যানের মাটি ও বাতাস এবং পুষ্করিণীর জল, মাটি, বাতাস ও জলরূপে প্রতীত হইলেও তাহাদের মধ্যে বহু জীবের অস্তিত্ব আছে। জগতে কিছুই "পতিত" নাই, কিছুই বন্ধ্যা নহে, কিছুই মৃত নহে।

এই সাদৃশ্য থাকিলেও উভয় দর্শনে পার্থক্যও আছে। লাইবনিট্জের মনাদগণ বাতায়নহীন। কোনও মনাদের সহিত অন্য কোনও মনাদের সম্বন্ধ নাই। বাহির হইতে তাহাদের মধ্যে কিছুই প্রবেশ করে না। ভিতর হইতে কিছুই বাহিরও হয় না। ইহা ব্যতীত লাইবনিট্জের দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত। জৈনদর্শন দুঃখ ভয়ে ভীত। লাইবনিট্জের মতে সম্ভাব্য যাবতীয় জগতের মধ্যে বর্ত্তমান জগৎ সর্ব্বোত্তম।

ফরাসী-ইহুদী দার্শনিক বার্গসঁ ও জগতের সর্ব্বত্র প্রাণের ক্রীড়া দেখিয়াছেন। তাঁহার প্রাণশক্তি (Elan vital) নূতন সৃষ্টি করিতে করিতে এক দূরস্থিত লক্ষ্যের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে এবং এক এক করিয়া জড়ের দুর্গ জয় করিয়া জড়কে স্বীয় উদ্দেশ্যসাধনে নিযুক্ত করিতেছে। ঈশ্বরকে বার্গসঁ অস্বীকার

করেন নাই। তাঁহার প্রাণশক্তি জড়কে বর্জন করিতে চাহে নাই। তাহার উদ্দেশ্যসাধনে জড় তাহার সহায়তাই করিয়াছে।

আকস্মিক অভিব্যক্তিবাদী আলেকজান্দার ঈশ্বরের বর্ত্তমান অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই, কিন্তু ভবিষ্যতে ঈশ্বরত্বের আবির্ভাব সম্ভবপর বলিয়াছেন। নিরীশ্বর জৈন দর্শন ঈশ্বর স্বীকার না করিলেও ইতিপূর্ব্বেই ঈশ্বরত্বের আবির্ভাব হইয়াছে বলিয়াছেন। অনন্ত জ্ঞান, অনন্তবীর্য্য এবং অনন্ত সুখই ঈশ্বরত্ব। জৈন মতে একাধিক মানব এই ঈশ্বরত্বলাভ করিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা জগৎ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়াছেন ; সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া জাগতিক ব্যাপার তাঁহারা জানিতে পারেন, ভক্তের প্রার্থনা ও শুনিতে পান, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের আকর্ষণ নাই, কিছুই তাঁহারা করেন না। জৈন দর্শন সাংখ্য ও বৌদ্ধ দর্শনের মত আত্ম-নির্ভরের দর্শন, পুরুষকারের দর্শন। পাতঞ্জল দর্শনে ঈশ্বর জীবকে মোক্ষলাভে সহায়তা করেন। কিন্তু জৈন দর্শনে এরূপ সাহায্য করিবার কেহ নাই।

৩

আজীবক সম্প্রদায়

মহাবীরের সমকালে মাক্‌খালি নামক এক ব্যক্তি আজীবক নামে এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রথমে মহাবীরের শিষ্য ছিলেন, পরে স্বতন্ত্র সম্প্রদায় স্থাপন করেন। তিনি সম্পূর্ণ নিয়তিবাদী ছিলেন। তাঁহার মতে স্বাধীন ইচ্ছা বলিয়া কিছু নাই, মানুষের নৈতিক দায়িত্ব নাই, পাপ ও পুণ্যের মধ্যে প্রভেদও নাই। কোনও মানুষ ধার্ম্মিক ও কোনও মানুষ যে ঘৃণিত-চরিত্র হয়, তাহার ব্যবহিত অথবা অব্যবহিত কোনও কারণই নাই। মানুষের চেষ্টার উপর কিছুই নির্ভর করে না। বস্তুতঃ শক্তি অথবা চেষ্টা বলিয়াই কিছু নাই। ভিন্ন ভিন্ন কালের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা নিয়তি অথবা পারিপার্শ্বিকদ্বারা উৎপন্ন হয়। জৈনদিগের মতো আজীবকগণ পরমাণু তত্ত্বে বিশ্বাস করিতেন।

অজিত কেশকম্বলী-নামক এক ব্যক্তি যে মত প্রচার করেন, সেই মত অনুসারে সৎ অথবা অসৎ কর্ম্মের কোনও ফলই উৎপন্ন হয় না। এই মতে জগতের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। ইহ লোক ভিন্ন অন্য লোকও নাই। পূর্ব্ব জন্মের কোনও ফল অথবা পিতা-মাতার কোনও প্রভাব জীবনের উপর নাই। কোনও কর্ম্মদ্বারাই মৃত্যুতে ঐকান্তিক বিনাশ হইতে উদ্ধার পাওয়া যায় না।*

*Das Gupta's History of Indian Philosophy, vol I. P. 80।

৪

বুদ্ধের ধর্ম্ম ও দর্শন

জীবনী

খৃষ্ট পূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্য ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর অধিকৃত ছিল। বর্ত্তমান বিহার প্রদেশের উত্তরে হিমালয়ের পাদদেশে শাক্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দিগের এক রাজ্য ছিল। রাজ্যের রাজধানীর নাম ছিল কপিলবাস্তু, রাজার নাম শুদ্ধোদন। শুদ্ধোদনের পত্নী মায়াদেবীর গর্ভে আনুমানিক ৬২৪ পূঃ খৃষ্টাব্দে (কোন মতে ৫৬৭ খৃঃ পূঃ অব্দে) এক পুত্র জন্মে। রাজা পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন সিদ্ধার্থ। পুত্রের জন্মের সাত দিন পরে তাহার মাতার মৃত্যু হয়। বিমাতা মহাপ্রজাপতির উপর তাহার লালন পালনের ভার পড়ে। জ্যোতির্বিদগণ গণনা করিয়া বলেন রাজপুত্র সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসগ্রহণ করিবেন। পুত্রস্নেহাতুর পিতা পুত্রকে সংসারে বাঁধিয়া রাখিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন। রূপলাবণ্যময়ী যশোধরা গোপার সহিত তাহার বিবাহ দিয়াছিলেন, একটি পুত্র সন্তানও জন্ম-গ্রহণ করিয়াছিল। কিন্তু পিতার স্নেহ, পত্নীর প্রেম, নবজাত পুত্রের আকর্ষণ, কিছুই সিদ্ধার্থকে বাঁধিয়া রাখিতে পারে নাই। তিনি বাল্যকাল হইতেই চিন্তাশীল ছিলেন। সংসারে দুঃখ-কষ্টের প্রাচুর্য্য তাঁহার মনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। প্রতি দণ্ডে শত শত জীব মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে, শত শত প্রাণী রোগযন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে, জরাগ্রস্ত হইয়া কত লোক জীবনের সুখে বঞ্চিত হইতেছে দেখিয়া করুণায় তাঁহার চিত্ত আর্দ্র হইয়া উঠিত। তাঁহার করুণ হৃদয়ের কথা পিতা জানিতেন। দুঃখজনক কোনও দৃশ্য যাহাতে তাঁহার দৃষ্টিপথে পতিত না হয়, তাহার ব্যবস্থা তিনি করিয়া-ছিলেন। কিন্তু ভ্রমণে বহির্গত হইয়া রাজপুত্র এক দিন দেখিলেন, এক জন লোক পীড়ার যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করিতেছে। আর এক দিন দেখিলেন, এক বৃদ্ধ কুব্জ হইয়া যষ্টির উপর দেহভার ন্যস্ত করিয়া কষ্টে পথ অতিবাহন করিতেছে। আর এক দিন দেখিলেন, কয়েক জন লোকে এক মৃতদেহ শ্মশানে বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে এবং মৃতের আত্মীয়গণ কাঁদিতে কাঁদিতে শবের অনুগমন করিতেছে। গভীর বেদনায় কুমারের অন্তর পীড়িত হইয়া উঠিল। পরে এক দিন দেখিলেন এক সৌম্যমূর্ত্তি সন্ন্যাসী। মনে হইল সন্ন্যাসীর অঙ্গ হইতে শান্তি বিকীর্ণ হইতেছে। সন্ন্যাসগ্রহণে দৃঢ়সংকল্প হইয়া সিদ্ধার্থ পিতার নিকট সংসার

ত্যাগের অনুমতি চাহিলেন। পিতার কাতর অনুনয় ব্যর্থ হইল। রাজপুত্র রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া মানুষের দুঃখ দূর করিবার উপায়-আবিষ্কার-উদ্দেশ্যে উনত্রিশ বৎসর বয়সে মহানিষ্ক্রমণ করিলেন। প্রথমে রাজগৃহ, পরে উরুবিল্ল গিয়া তিনি অন্য পাঁচজন সন্ন্যাসীর সহিত তপস্যা আরম্ভ করিলেন। শরীর শীর্ণ হইয়া অস্থিচর্ম্মসার হইল। এক দিন মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তপস্যায় সিদ্ধি মিলিল না। ছয় বৎসর কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া বুঝিতে পারিলেন ঐ পথে সিদ্ধি নাই। তখন কৃচ্ছ্র তপস্যা ত্যাগ করিয়া তিনি এক বটবৃক্ষতলে ধ্যানে বসিলেন। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে তিনি "বুদ্ধ" হইলেন—জ্ঞানলাভ করিলেন। নিজে বুদ্ধ হইয়া লব্ধ জ্ঞান জনসাধারণের মধ্যে বিতরণের জন্য তিনি প্রচারে বাহির হইলেন। তাঁহার করুণ প্রশান্ত আনন, মহৎ সুন্দর জীবন, জীবের প্রতি অপার করুণা, এবং সুমধুর বচন অচিরেই নরনারীর হৃদয় জয় করিল। যে পাঁচজন সন্ন্যাসীর সহিত তিনি প্রথম সন্ন্যাসজীবন আরম্ভ করিয়াছিলেন, প্রথমে তাঁহারাই তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল। তাঁহাদিগের প্রতি প্রদত্ত উপদেশদ্বারা তিনি বারাণসীক্ষেত্রে মৃগদাবে "ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন" করিলেন। তাঁহারাই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সংঘের প্রথম সভ্য হইলেন। শিষ্যসংখ্যা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। নব ধর্ম্ম-প্রচারের জন্য চতুর্দ্দিকে প্রচারক প্রেরিত হইল। প্রথম পাঁচজন শিষ্যের অন্যতম অশ্বজিৎ রাজগৃহে গমন করিয়া সারিপুত্র ও মোগল্লান নামক দুই জন ব্রহ্মচারীকে দীক্ষা দিলেন, এবং বুদ্ধ স্বয়ং তাহাদিগকে সংঘে স্থাপিত করিলেন। একে একে উপালি, কাশ্যপ, আনন্দ আসিয়া সংঘে প্রবিষ্ট হইলেন। দলে দলে লোক আসিয়া নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। তাহাদের মধ্যে বহু ব্রাহ্মণও ছিল। গৃহত্যাগের বারো বৎসর পরে বুদ্ধ কপিলবাস্তু গিয়া পিতা, মাতা, পত্নী ও পুত্রকে দীক্ষা দিয়া সংঘে গ্রহণ করিলেন, এবং নারী সন্ন্যাসিনীদিগের জন্য এক স্বতন্ত্র সংঘের প্রতিষ্ঠা করিলেন।

প্রায় চল্লিশ বৎসর ধর্ম্মপ্রচারের পর যখন বুদ্ধ বুঝিতে পারিলেন দেহত্যাগের সময় উপস্থিত হইয়াছে, তখন প্রিয় শিষ্য আনন্দ ও অন্য যাহারা উপস্থিত ছিল, তাহাদিগকে উপদেশ দিলেন এবং তাঁহার শেষ দীক্ষা সুভদ্র-নামক এক সন্ন্যাসীকে দান করিলেন। পরে সমাগত শিষ্যদিগকে তাহাদিগের কোনও বিষয়ে কোনও সন্দেহ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু সকলেই মৌনী রহিলেন। তাহাদিগের নিকট বিদায় লইয়া বুদ্ধ কহিলেন "জগতে সকলই ক্ষণভঙ্গুর। তোমরা আপনাদের চেষ্টায় আপন আপন মুক্তি-সাধন কর," এবং

অত্যল্প কালের মধ্যে দেহত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স আশী বৎসর। কুশীনগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

প্রাচীন বৌদ্ধশাস্ত্র

বুদ্ধের পরিনির্বাণ-লাভের কিছুদিন পরে তাঁহার উপদেশ-সম্বন্ধে শিষ্যদিগের মধ্যে মতভেদ হয়। তাহার সমাধানের জন্য রাজগৃহে এক সভা (সংগীতি) আহুত হয়। মহাপণ্ডিত কাশ্যপ এই সভার নেতৃপদে বৃত হইয়াছিলেন। সমবেত সভ্যদিগের অনুরোধে কাশ্যপ "অভিধর্ম্ম পিটক" আবৃত্তি করেন; বুদ্ধ-শিষ্যদিগের মধ্যে প্রাচীনতম উপালি "বিনয় পিটক" এবং বুদ্ধের প্রিয়তম শিষ্য আনন্দ "সূত্রপিটক" আবৃত্তি করেন। বুদ্ধের উপদেশসকল মুখে মুখেই চলিয়া আসিতেছিল; কখন তাহারা একত্র সংগৃহীত হয়, তাহা নিশ্চিত রূপে নির্দ্ধারিত হয় নাই। অশোকের রাজত্বকালে ২৪০ পূঃ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় বৌদ্ধ সংগীতির অধিবেশন হয়। সম্ভবতঃ তাহার পূর্ব্বেই সমগ্র বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। সূত্ত পিটকে বৌদ্ধ ধর্ম্মমত বিবৃত হইয়াছে, বিনয়পিটকে বৌদ্ধ শ্রমণদিগের পালনীয় নিয়মাবলী বর্ণিত হইয়াছে, অভিধর্ম্মপিটকে সূত্ত পিটকে বর্ণিত ধর্ম্মমত বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সিংহলরাজ বত্তগামিনীর রাজত্বকালে খৃঃ পূঃ ৮০ অব্দে ত্রিপিটক লিপিবদ্ধ হয়। পিটক শব্দের অর্থ ঝুড়ি (Basket)। এই শাস্ত্র-সংগ্রহের প্রথম ভাগ সূত্ত পিটক পাঁচ "নিকায়ে" বিভক্ত। প্রথম চারি নিকায়ে বুদ্ধের উপদেশ ভাষণ অথবা কথোপকথনের আকারে লিপিবদ্ধ আছে। প্রথম দীর্ঘ নিকায়ের ভাষণগুলি ৩৪টি দীর্ঘ সূত্রে নিবদ্ধ। দ্বিতীয় মজ্‌ঝিম নিকায়ের ভাষণগুলি মধ্যম আকারের। ১৫২টি ভাষণ ও কথোপ-কথনে এই নিকায়ে বৌদ্ধধর্ম্ম মত বিবৃত হইয়াছে। সংযুক্ত নিকায়ে নানাবিধ ভাষণ আছে। ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন সূত্র ইহার অন্তর্গত। অঙ্গুত্তর নিকায়ে ২৩০০ সূত্র ১১ অধ্যায়ে বিভক্ত। ক্ষুদ্রক নিকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাষণের সমষ্টি, ১৫ অধ্যায়ে বিভক্ত। ধম্মপদ, থেরাগাথা, থেরীগাথা, জাতক, বুদ্ধবংশ প্রভৃতি ইহার অন্তর্গত।

বিনয়পিটকে বৌদ্ধ শ্রমণদিগের পালনীয় নিয়মাবলী বর্ণিত আছে। অভিধর্ম্ম পিটকের বিষয় মনোবিজ্ঞান, চরিত্র-নীতি ও তাত্ত্বিক দর্শন। এই পিটক সাত অধ্যায়ে বিভক্ত: (১) ধর্ম্ম সংগনি (খৃঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দীতে রচিত), (২) বিভঙ্গ, (৩) কথাবত্থু, (৪) পুগ্‌গল পঞ্ঞত্তি, (৫) ধাতু, (৬) যমক, (৭) পথানা। অভিধর্ম্ম পিটকে প্রথম বৌদ্ধ সংগীতিতে সংগৃহীত প্রাচীন থেরাবাদ বর্ণিত আছে।

মিলিন্দ পংহা (মিলিন্দ প্রশ্ন) কোন কোন দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম শাস্ত্রের অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। মিনান্দার নামে গ্রীকরাজ ১২৫ হইতে ৯৫ খৃঃ পূঃ অব্দ পর্য্যন্ত পঞ্জাবের রাজা ছিলেন। নাগসেন নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক এবং মিনানদারের মধ্যে কথোপকথন এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। বুদ্ধঘোষ এই গ্রন্থকে বৌদ্ধধর্ম্মের একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বলিয়া গণ্য করিতেন। এই গ্রন্থে নাগসেন বুদ্ধের মতের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে ঈশ্বর, আত্মা ও মুক্ত জীবের নির্বাণোত্তর অস্তিত্ব অস্বীকৃত।

বুদ্ধঘোষের বিশুদ্ধিমার্গে (৪০০ খৃঃ অঃ) হীনযান সম্প্রদায়ের আদর্শ বর্ণিত হইয়াছে। বুদ্ধঘোষ ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। "ধর্ম্মসংগনি"র উপর তাঁহার "অর্থশালিনী" নামক টীকা বিখ্যাত।

"দীপবংশ"—(৫র্থ শতাব্দী) এবং "মহাবংশ" (৫ম শতাব্দী) ঐতিহাসিকের নিকট বিশেষ মূল্যবান্।

উপরে লিখিত গ্রন্থসকলে যে ধর্ম্মমত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা থেরাবাদ বা স্থবিরবাদ নামে প্রখ্যাত। দীপবংশে আছে, প্রথম বৌদ্ধ সংগীতিতে বৌদ্ধ স্থবিরগণ এই সকল মত সংগ্রহ করিয়াছিলেন বলিয়া এই মত থেরাবাদ নামে পরিচিত।

নাগসেনের "মিলিন্দ পংহা"য় বুদ্ধের প্রকৃত মত কতটা ব্যক্ত হইয়াছে, সে সম্বন্ধে অনেকের সন্দেহ আছে। বুদ্ধ যেখানে মৌনী, নাগসেন সেখানে স্পষ্ট "না" বলেন। "হাঁ" ও "না" ইহার কোনও পক্ষেই যথেষ্ট প্রমাণের অভাবই বুদ্ধের মৌনের কারণ। কিন্তু নাগসেনের নিকট প্রমাণের অভাবই অবিশ্বাসের পর্য্যাপ্ত কারণ; অসম্পূর্ণ প্রমাণের উপর বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা করা অপরাধ। বুদ্ধ যেখানে কোনও মত প্রকাশ করেন নাই, নাগসেন সেখানে বিশেষ জোরের সঙ্গে নেতিবাদ সমর্থন করিয়াছেন।

রাইস্ ডেভিড্স্ সুত্তপিটক-সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে ইহার দার্শনিক অন্তর্দৃষ্টি ও সক্রেটিসের প্রবর্ত্তিত তর্কপ্রণালীর ব্যবহার দেখিয়া প্লেটোকে মনে পড়ে।

বুদ্ধের উপদেশ

বৌদ্ধদিগের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে তাহারা দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতবর্ষের বাহিরে নানা দেশে প্রচারিত হইয়াছিল। সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যাম, চীন, জাপান, কোরিয়া, তিব্বৎ সর্বত্র বৌদ্ধ শ্রমণগণ গিয়া ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার যেরূপ দক্ষিণে সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও শ্যামে

(থাইল্যাণ্ড) প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা হীনযান, এবং উত্তর দিকে তিব্বৎ, চীন, কোরিয়া ও জাপানে প্রচলিত রূপ মহাযান নামে পরিচিত। হীনযানের ধর্ম্ম-সাহিত্য সকলই পালিভাষায় রচিত; মহাযানের ভাষা সংস্কৃত। মহাযানের অনেক গ্রন্থ চৈনিক ও তিব্বতী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। অনেক মৌলিক সংস্কৃত গ্রন্থ যাহা ভারতবর্ষে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, তাহা চৈনিক ভাষায় প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম বিভিন্ন দেশে প্রচারিত হইলে সেই সকল দেশের প্রাচীন ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সহিত মিশ্রণের ফলে ন্যূনাধিক পরিবর্ত্তিত রূপ ধারণ করে। ইহার ফলে বহুবিধ দর্শনের উদ্ভব এবং বহু দার্শনিক গ্রন্থ রচিত হয়। এই সকল গ্রন্থ পাঠ ও আয়ত্ত করা এক জীবনে সম্ভবপর হয় না, সুতরাং সকল প্রকার বৌদ্ধ-দর্শনের বর্ণনা করা অসম্ভব। আমরা প্রথমে আদিম বুদ্ধ মতের বর্ণনা করিয়া পরে কয়েকটি প্রধান বৌদ্ধমতের ব্যাখ্যা করিব।

প্রাচীন বৌদ্ধমত

বুদ্ধের বাণী

আর্য্যসত্য চতুষ্টয় ও অষ্টাঙ্গ মার্গ

বুদ্ধের দর্শন মুখ্যতঃ চরিত্রনীতি-মূলক। সক্রেটিসের মতো মানুষের জীবনের সঙ্গে যাহার সম্বন্ধ, তিনি প্রধানতঃ তাহারই আলোচনা করিতেন। জগতের উৎপত্তি কিরূপে হইল, যাহারা তাহার আলোচনা করে, সক্রেটিস তাহাদিগকে মূর্খ বলিতেন। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান-লাভ অসম্ভব। জগতের উৎপত্তির আলোচনা না করিয়া মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি, ধর্ম্মের স্বরূপ কি, ইহাই সক্রেটিস প্রধানতঃ আলোচনা করিতেন। গৌতম বুদ্ধ বুঝিয়াছিলেন মানব জীবন দুঃখময়। এই দুঃখ কেন উৎপন্ন হয়, তাহা হইতে মুক্তিলাভের উপায় কি, তাহাই তাঁহার প্রধান আলোচনার বিষয় ছিল। দেহ হইতে স্বতন্ত্র আত্মার অস্তিত্ব আছে কি না,মৃত্যুর পরে আত্মার অস্তিত্ব থাকে কি না, জগৎ কি সসীম, শাশ্বত অথবা সৃষ্ট, প্রভৃতি প্রশ্ন কেহ জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি সে সকল প্রশ্নের আলোচনা করিতেন না। যে সকল বিষয়ে কোনও পক্ষেই যথেষ্ট প্রমাণ নাই, তাহাদের আলোচনা নিষ্ফল। তিন জন অন্ধ লোক হাতীর ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা করিয়াছিল। যে কেবল হাতীর কাণ স্পর্শ করিয়াছিল সে বলিয়াছিল হাতী

কুলার মতো, যে পা দুটি স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলিয়াছিল স্তম্ভের মতো, আর একজন যে শুঁড় স্পর্শ করিয়াছিল, সে বলিয়াছিল স্থূল লতার মতন। প্রত্যেকের বর্ণনাই আংশিক সত্য। কাহারও বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য নহে। ব্রহ্মজাল সুত্তে বুদ্ধ বহুবিধ দার্শনিক মতের উল্লেখ করিয়াছিলেন, তাহাদের কোনটিই সম্পূর্ণ সত্য নহে। তাই বুদ্ধ এই সকল আলোচনা নিষেধ করিয়াছিলেন, কেননা উহাদের আলোচনাদ্বারা দুঃখমুক্তি নিকটতর হয় না। দুঃখনিবৃত্তিই মানুষের প্রধান সমস্যা। যন্ত্রণায় কাতর অবস্থায় আত্মা এবং জগৎ-সম্পর্কে দার্শনিক গবেষণায় ব্যাপৃত হওয়া মূর্খতার কাজ— বিষাক্ত শরবিদ্ধ ব্যক্তি যদি শর তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা না করিয়া কে শর নিক্ষেপ করিল, শর কোথায় নির্ম্মিত হইল প্রভৃতি আলোচনায় নিযুক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার আচরণের মতো। সুত্ত পিটকের অন্তর্গত সংযুক্ত নিকায়ে এক ভাষণে বুদ্ধ দশটি অবিচারণীয় (অব্যকৃতানি) প্রশ্নের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহারা এই : (১) জগৎ কি শাশ্বত? (২) জগৎ কি অশাশ্বত? (৩) জগৎ কি সসীম? (৪) জগৎ কি অসীম? (৫) আত্মা ও দেহ কি অভিন্ন? (৬) আত্মা কি দেহ হইতে ভিন্ন? (৭) যিনি সত্য কি, তাহা জানিয়াছেন, তিনি কি মৃত্যুর পরে পুনর্জীবিত হন? অথবা (৮) হন না? অথবা (৯) হন এবং হন না? অথবা (১০) মৃত্যুর পরে তিনি যে জীবিত হন, তাহা নয়, জীবিত যে হন না, তাহাও নয়? জগতের মূলে যে সকল তাত্ত্বিক (metaphysical) প্রশ্ন বর্ত্তমান, তাহাদের আলোচনা না করিয়া বুদ্ধ দুঃখ, তাহার উৎপত্তি ও কারণ এবং দুঃখনিবৃত্তি কিসে হয়, তাহারই আলোচনা করিতেন, কেননা এই সকলই ধর্ম্মের মূল, এবং এই আলোচনার ফলে রাগদ্বেষ হইতে মুক্তি এবং তাহা হইতে শান্তি, পরম জ্ঞান এবং নির্বাণ লাভ হয়।

বুদ্ধত্বলাভের পরে বারাণসীর ঋষিপত্তন মৃগদাবে ধর্ম্মচক্র প্রবর্তন-কালে বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন 'ভিক্ষুগণ জন্ম দুঃখ, জরা, ব্যাধি ও মৃত্যু দুঃখ, অপ্রিয় দর্শন ও প্রিয় বিচ্ছেদ দুঃখ, বাঞ্ছিত বস্তুর অপ্রাপ্তি দুঃখ সকলই মানুষ ভোগ করে। পঞ্চস্কন্ধ বা জড় চৈতন্যময় জীবন দুঃখের আগার, ইহা চিরন্তন সত্য। ইহাই প্রথম আর্য্যসত্য। তাহার পরে বলিয়াছিলেন তৃষ্ণা হইতে পুনর্জন্ম হয়। লোভ ও বাসনা তৃষ্ণার সহগামী। তাহাই দুঃখ-সমুদয়। (দুঃখ-উৎপত্তির কারণ) ইহা দ্বিতীয় আর্য্যসত্য। তৃষ্ণা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া এবং দুঃখোৎপত্তির বিনাশ করা দুঃখ নিরোধ (নির্ব্বাণ)। ইহা তৃতীয় আর্য্য সত্য। দুঃখনিরোধের উপায়—সম্যকদৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক বাক্,

সম্যক কর্মান্ত, সম্যক জীবিকা, সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি, এই অষ্টাঙ্গ মার্গচতুর্থ আর্য্যসত্য।

প্রথম আর্য্যসত্য—দুঃখ

প্রাণীর জীবন দুঃখে পরিপূর্ণ। জীবের দুঃখ দেখিয়াই বুদ্ধ তাঁহার নিরোধের উপায়-আবিষ্কারের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়াছিলেন। বুদ্ধ হইয়া তিনি আবিষ্কার করিলেন জীবের জীবন নিরবচ্ছিন্ন দুঃখে পরিপূর্ণ। জন্ম, জরা ব্যাধি, মৃত্যু, কামনা, শোক, তাপই জীবন। আসক্তি হইতেই এ সকলের উদ্ভব, সকলই দুঃখের আকর। এই নিরবচ্ছিন্ন দুঃখ, প্রথম আর্য্য সত্য। সোপেনহর বলিয়াছেন "বাঁচিবার ইচ্ছা" (will to live) হইতেই জীবনের উদ্ভব। ইচ্ছা যত চায়, তত পায় না, তাই দুঃখ। জীবনের মূলে দুঃখের বীজ। সাংখ্য ও জৈন দর্শনও দুঃখবাদী। কিন্তু জীবনে যেমন দুঃখ আছে, তেমনি সুখও আছে এবং সুখের পরিমাণ যদি দুঃখ অপেক্ষা অধিক না হইত, তাহা হইলে লোকে আত্মহত্যা করিয়া দুঃখ হইতে মুক্তিলাভ করিত, ইহা অনেকে বলেন। কিন্তু এই সকল তথাকথিত সুখ ক্ষণস্থায়ী। তাহার অর্জনে দুঃখ, রক্ষণে দুঃখ, নাশে দুঃখ, নাশের কল্পনায় দুঃখ। ইহাই বুদ্ধের মত। তিনি বলিয়াছেন এই সংসার যাত্রা চলিয়াছে অনন্তকাল ধরিয়া। কখন ইহার আরম্ভ হইল, কখন অজ্ঞানমোহে অভিভূত জীব বাঁচিয়া থাকিবার আকাঙ্ক্ষায় শৃঙ্খল পরিয়া বাহির হইল এবং ভ্রমিতে আরম্ভ করিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। শিষ্যগণ, চারি মহাসাগরের জলরাশির সহিত তোমাদের অশ্রুরাশির যদি তুলনা কর—তোমাদের দীর্ঘ যাত্রা-পথে যাহার তোমরা ভয় করিয়াছ, তাহাই তোমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, আর যাহা তোমরা কামনা করিয়াছ, তাহা প্রাপ্ত হও নাই বলিয়া যে অশ্রুরাশি তোমাদের নেত্র হইতে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহার যদি তুলনা কর—তাহা হইলে কোন্‌টি অধিক দৃষ্ট হয়? মাতার মৃত্যু, ভ্রাতার মৃত্যু, আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু, সম্পত্তি-নাশ, এসকল যুগে যুগে তোমরা ভোগ করিয়াছ, এবং যুগে যুগে এই সকল ভোগ করিবার সময় তোমাদের যাত্রা-পথে চারি মহাসাগরের জলরাশি হইতে অধিকতর অশ্রু তোমাদের নেত্র হইতে প্রবাহিত হইয়াছে। কেননা তোমরা যাহা চাও নাই তাহাই তোমাদের ভাগ্যে ঘটিয়াছে, এবং যাহা চাহিয়াছ, তাহা পাও নাই। (সংযুক্ত নিকায়)

লাইবনিটজ যাবতীয় সম্ভাব্যমান জগতের মধ্যে বর্ত্তমান জগৎকে সর্ব্বোত্তম বলিয়াছিলেন। রুশোর আশাবাদ খণ্ডন করিতে ভলটেয়ার তাঁহার শ্লেষপূর্ণ Candide গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। ইমানুয়েল ক্যাণ্ট লিখিয়াছিলেন "দীর্ঘকাল জীবিত আছেন, এবং মানব-জীবনের মূল্য-সম্বন্ধে চিন্তা করিয়াছেন, এরূপ সুস্থ বুদ্ধির অধিকারী কোনও লোক কি এই হীন জীবননাট্যের পুনরভিনয় করিতে স্বীকৃত হইবেন?" ক্যাণ্ট সসীম মানব-জীবনের কোনও মূল্য আছে মনে করেন নাই। উপনিষদের ঋষিও ভূমা ভিন্ন সুখ নাই, অল্পে সুখ নাই, বলিয়াছেন। ঋষি চাহিতেন অমৃতত্ব। বুদ্ধ চাহিয়াছিলেন শান্তি—নির্ব্বাণ। এই নির্ব্বাণের স্বরূপ আমরা পরে আলোচনা করিব। নির্ব্বাণলাভের পরে নির্ব্বাণ উপভোগ করিবার জন্য কেহ বর্ত্তমান থাকে কি না, আমরা দেখিতে পাইব। কিন্তু বর্ত্তমান জীবনেই যে দুঃখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়, বুদ্ধ তাহা বলিয়াছেন। বুদ্ধের দর্শন প্রকৃত দুঃখবাদ নহে। যে দর্শনে সকল আশার কণ্ঠরোধ করে, এবং বলে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকা ক্লান্তিজনক, পৃথিবীর বাইরেও কোন আশা নাই, তাহাই সত্য দুঃখবাদ। বুদ্ধ ইহা বলেন নাই। জীবনকে দুঃখের-প্রবাহ বলিয়া মনে করিলেও তিনি নৈতিক সংযমের মুক্তি-দানের শক্তিতে এবং মানব-চরিত্রের পূর্ণতায় সম্ভাবনায় বিশ্বাস করিতেন। বুদ্ধ কেবল জীবনের মূল্যহীনতার কথাই বলেন নাই। তিনি অপরিহার্য্য অদৃষ্টের বশ্যতা স্বীকার করিতে উপদেশ দেন নাই। তাঁহার বাণী হতাশার বাণী নয়। তিনি অমঙ্গলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিতে এবং অর্হৎ-জীবন প্রাপ্ত হইবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন।

জীবনের দুঃখ কষ্ট হইতে মুক্ত শান্তিই অর্হৎ জীবন। এই শান্তির মধ্যে ভাবাত্মক (positive) কিছু আছে অথবা ইহা শ্মশানের শান্তি, নির্বাণ অধ্যায়ে ইহা পরে আলোচিত হইবে।

দ্বিতীয় আর্য্য সত্য

প্রতীত্য সমুৎপাদ

দুঃখের কারণ কি, এই প্রশ্নের বুদ্ধ যে উত্তর দিয়াছিলেন, তাহাই দ্বিতীয় আর্য্যসত্য। সাধারণতঃ দার্শনিক আলোচনা পরিহার করিলেও এই প্রশ্নের উত্তর-আবিষ্কারে বুদ্ধ মনের বিশ্লেষণ এবং তাত্ত্বিক গবেষণার সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রাচীন বৌদ্ধ দর্শনে কোনও অপরিণামী স্থায়ী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। আছে কেবল ক্ষণস্থায়ী সমুৎপাদ (phenomena

ধর্ম্ম)। এই সকল "ধর্ম্ম" অনবরত উৎপন্ন এবং বিলীন হইতেছে। "কি হইলে কি হয়, কি না হইলে কি হয় না", ইহা বুদ্ধের প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল। সমুৎপাদগণ একের পর একটি, তাহার পর আর একটি, এইরূপ শ্রেণীবদ্ধ ভাবে উৎপন্ন হয়। কোনও সমুৎপাদের আবির্ভাবের পরে নির্দ্দিষ্ট আর একটির আবির্ভাব হয়, সেইটি ব্যতীত অন্য আর কিছু হয় না। দ্বিতীয় সমুৎপাদের পরে আর একটি নির্দ্দিষ্ট সমুৎপাদের আবির্ভাব হয়। ইহাকে বলে প্রতীত্য সমুৎপাদ। কিন্তু এই যে পরবর্ত্তী ঘটনার পূর্ব্ববর্ত্তী ঘটনার উপর নির্ভর, ইহার স্বরূপ কি, তাহা বোধগম্য হয় না।

জীব জন্মে, জরাগ্রস্ত হয়, মরে, আবার জন্মে, আবার জরাগ্রস্ত হয়, আবার মরে, কিন্তু ইহার কারণ জানে না। জরা ও মৃত্যু কেন হয়? কি না হইলে জরা ও মৃত্যু হইতে পারে না? যেখানে জন্ম (জাতি), কেবল সেই খানেই জরা ও মৃত্যু সম্ভবপর। সুতরাং "জাতি"র উপর জরা ও মৃত্যু নির্ভরশীল, জাতিই জরা ও মৃত্যুর কারণ) কিন্তু জাতি কিসের উপর নির্ভরশীল? "ভাব" না থাকিলে জন্ম হইতে পারে না। "ভাব" কি? রাইস্ ডেভিড্স্ বলেন "ভাব" অর্থ ভবনের প্রবণতা বা ইচ্ছা (disposition for becoming)। "ভাব" কিসের উপর নির্ভরশীল? ভাব নির্ভর করে "উপাদানের" উপর। জাগতিক বস্তু সাগ্রহে আঁকড়াইয়া থাকাই উপাদান; ইহাই ভবনের ইচ্ছার মূল। "উপাদান" তৃষ্ণার ফল। ভোগ্য বস্তুর ভোগের আকাঙ্ক্ষাই তৃষ্ণা। এই আকাঙ্ক্ষার উদ্ভব হয় কি হইতে? ইহার উদ্ভব হয় পূর্ব্বে ভুক্ত ইন্দ্রিয় বিষয়ের ভোগের সুখকর অনুভূতি (বেদনা) হইতে। বেদনাই তৃষ্ণার কারণ। বিষয়ের সহিত ছয় ইন্দ্রিয়ের (মন সহ) স্পর্শ ভিন্ন বেদনার উদ্ভব হইতে পারে না। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন না থাকিলেও স্পর্শ হয় না। ষড়ায়তন নাম-রূপের (দেহ-মন) অস্তিত্ব না থাকিলে ইন্দ্রিয়দিগের সম্ভব হয় না। কিন্তু মাতৃ-গর্ভে এই দেহ-মনের বিকাশের সম্ভব হইত না, যদি বিজ্ঞান (সংবিদ—consciousness) না থাকিত। পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার হইতেই বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। গত জন্মের যাবতীয় কর্ম্মের সংস্কার (impresson—ছাপ) গত জন্মের শেষ অবস্থায় ঘনীভূত হয় এবং তাহা হইতেই নূতন জন্মের বিজ্ঞান উদ্ভূত হয়। কিন্তু অবিদ্যা (অজ্ঞান) না থাকিলে সংস্কারের উদভব হইতে পারে না। অবিদ্যা যদি রুদ্ধ করা যায়, তাহা হইলে সংস্কারও রুদ্ধ হয়। সংস্কার রুদ্ধ হইলে বিজ্ঞানও রুদ্ধ হয়। যদি আমাদের পার্থিব জীবনের দুঃখদায়ক ভাব সম্পূর্ণ হৃদয়ঙ্গম করা যায়, তাহা হইলে কোনও কর্ম্মেরই উদ্ভব হইবে না।

সুতরাং আমাদের জীবনের সত্য রূপ-সম্বন্ধে অজ্ঞতাই জন্মপ্রবণতার কারণ। জন্মের এই কারণ পরম্পরা "ভবচক্র" নামে প্রসিদ্ধ।

রাইস্ ডেভিডস্ "ভাব" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "ভবন-প্রবণতা", কিন্তু "ভাব" শব্দের সাধারণ অর্থ অস্তিত্ব। অধ্যাপক দাসগুপ্ত বলেন যে চন্দ্রকীর্তি উক্ত শব্দের অর্থ করিয়াছেন "কর্ম, পুনর্ভব-জনক কর্ম"। এই শব্দ প্রাচীন উপনিষদে পাওয়া যায় না। পালি ভাষাতেই প্রথমে ইহা দার্শনিক অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছিল। এই পুনর্ভব-জনক কর্ম্ম পূর্ব্বজন্মকৃত। কিন্তু এই পূর্ব জন্ম সম্ভবপর হইত না, যদি "উপাদান" না থাকিত। তৃষ্ণা না থাকিলে উপাদান থাকিত না। উপনিষদে আমরা "ক্রতু" শব্দ পাই, এবং ক্রতু কাম হইতে উদ্ভূত, ইহাও পাই। "স যথা কামো ভবতি তৎক্রতুর্ভবতি"। অধ্যাপক দাসগুপ্তের মতে উপনিষদের কাম ও ক্রতু অর্থেই তৃষ্ণা ও উপাদান শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "নাম-রূপ" শব্দ উপনিষদে আছে, কিন্তু সার্বিক নাম ও রূপ অর্থে। এখানে ঐ শব্দ নাম-রূপের বিশিষ্ট ভাব—দেহ-মন—অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

প্রতীত্য সমুৎপাদে বুদ্ধ কার্য্যকারণ তত্ত্বের (Principle of causality) ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জীবের জীবন যে দুঃখময়, তাহা নিষ্কারণ নয়, তাহার কারণ আছে। যে কারণ হইতে দুঃখের উদ্ভব হয়, তাহা বিদুরিত করিতে পারিলেই দুঃখের নিরোধ হয়। সে কারণ পরম্পরা এই :—

(১) অবিদ্যা
(২) অবিদ্যা হইতে সংস্কারের উদ্ভব হয়।
(৩) সংস্কার হইতে বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়।
(৪) বিজ্ঞান হইতে নাম-রূপ অর্থাৎ দেহ মনের উদ্ভব হয়।
(৫) নামরূপ হইতে ষট্ আয়তন বা পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মনের উদ্ভব হয়।
(৬) ষট্ আয়তন হইতে স্পর্শ অথবা বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হয়।
(৭) স্পর্শের ফলে বেদনা বা ইন্দ্রিয়-বোধের উৎপত্তি হয়।
(৮) বেদনা হইতে তৃষ্ণার উদ্ভব।
(৯) তৃষ্ণা হইতে উপাদানের উদ্ভব।
(১০) উপাদান হইতে 'ভাব' বা কর্ম্ম।
(১১) ভাব হইতে জাতি বা জন্ম।
(১২) জন্ম হইতে জরা, মরণ, দুঃখ।

"প্রতীত্য সমুৎপাদ" এর অর্থ "প্রাপ্ত কারণ হইতে কার্য্যের উদ্ভব।" "প্রতীত্য" শব্দের অর্থ (প্রতি + ই + ল্যপ্) "পাইয়া"; "সমুৎপাদ" শব্দের

অথ উৎপত্তি বা আবির্ভাব। "ভবচক্র" বর্ণনা করিয়া তাহাদ্বারা বুদ্ধ প্রাণ ও তাহার আনুষঙ্গিক যাবতীয় ব্যাপারের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে দেহ-মন, দেহ-মন হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, তাহা হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভাব বা জন্মপ্রবণতা, ভাব হইতে জন্ম এবং জন্ম হইতে জরা ও মরণের উদ্ভবের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। জন্মের মূলে তিনি জন্মাভিমুখী প্রবণতা দেখিয়াছেন। এই জন্ম-প্রবণতা শক্তিবিশেষ। আধুনিক অভিব্যক্তিবাদে প্রাণের ক্রমবিকাশ আদিম জীবাণুর উপর পারিপার্শ্বিক অবস্থার ক্রিয়ার ফল। ইহা সম্পূর্ণ যান্ত্রিক ব্যাপার। বার্গসঁর মতে অভিব্যক্তির মূলে আছে প্রাণের অন্তর্নিহিত প্রেরণা। তাহার ফলেই প্রাণ ক্রমশঃ উচ্চ হইতে উচ্চতর সংঘাত (organisation) লাভ করিয়াছে। বার্গসঁর প্রাণপ্রেরণা ও "ভাব" এর মধ্যে সাদৃশ্য বিশেষ লক্ষণ-যোগ্য।

প্রতীত্য সমুৎপাদ তত্ত্বকে বুদ্ধ এত মূল্যবান মনে করিতেন, যে তিনি এই তত্ত্বকে "ধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "আদিতে কি ছিল, অন্তিমে কি হইবে, সে প্রশ্ন তুলিব না। ধর্ম্ম কি, তাহাই আমি তোমাদিগকে শিক্ষা দিব। "এইরূপ হইলে, উহার উৎপত্তি হয়। উহার উৎপত্তি হইতে ইহার আবির্ভাব হয়। উহার অভাব হইলে, ইহা ঘটে না উহার অভাব হইতে ইহার অভাব ঘটে"। "প্রতীত্য সমুৎপাদ যে দেখিতে পায়, সে ধর্ম্ম দেখিতে পায়, যে ধর্ম্ম দেখিতে পায়, সে প্রতীত সমুৎপাদ দেখিতে পায়। সোপান-শ্রেণীর সহিত বুদ্ধ প্রতীত্য সমুৎপাদের উপমা দিয়াছেন। ইহাতে আরোহণ করিয়া লোকে বুদ্ধের দৃষ্টি লাভ করিয়া জগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে। এই তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষমতাই আমাদের যাবতীয় দুঃখের নিদান।

বুদ্ধ জীবনকে যে মসী বর্ণে চিত্রিত করিয়াছেন তাহা অতি ভীষণ। তাহার বর্ণনা অতিরঞ্জিত। তাহার সহিত উপনিষদের মিল নাই। উপনিষৎ সৃষ্টির মূলে আনন্দ দেখিতে পাইয়াছেন। আনন্দ হইতে ভূতসকল উৎপন্ন হয়, আনন্দদ্বারা তাহারা জীবিত থাকে এবং অন্তিমে আনন্দে প্রবেশ করে। যদি হৃদয়াকাশে আনন্দ না থাকিত, তাহা হইলে কে বাঁচিয়া থাকিত? "এষ হি এব আনন্দয়তি (তৈঃ উঃ)। সৃষ্টির মূলে যিনি. তিনিই আনন্দ দান করেন। উপনিষৎ জগতে দুঃখের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে অন্ধ নহেন। "যো বৈ ভূমা, তৎসুখং। নাল্পে সুখমস্তি। ভূমৈব সুখং।" ভূমাই

সুখ, অল্পে সুখ নাই। "যো বৈ ভূমা তৎ অমৃতং। অথ যৎ অল্পং তৎ মর্ত্ত্যং"—যিনি ভূমা তিনিই অমৃত, যাহা অল্প, তাহা মরণশীল। কিন্তু ভূমার সুখ, ভূমার অমৃতত্ব লাভ করা যায়। জগৎ অপূর্ণ, মানুষও সসীম বলিয়া অপূর্ণ। দুঃখ এই সসীমত্বেরই ফল। কিন্তু জীবন কেবল দুঃখই নহে—দুঃখ ও সুখ উভয়েই জীবনের সাথী। সুখ যেমন স্বল্পকাল স্থায়ী, দুঃখও তেমনি। সুখ ও দুঃখ চক্রবৎ পরিবর্ত্তনশীল। জীবনে শোক আছে, ব্যাধি, জরা ও মৃত্যুও আছে, আশাভঙ্গ আছে, দারিদ্র্য আছে, সকলই সত্য। কিন্তু প্রফুল্ল-পদ্ম সরোবর, তারা-বিচিত্র নভোমণ্ডল, শারদীয় পূর্ণ চন্দ্র, রক্তিম পূর্ব্বাকাশে বাল সূর্য্যোদয়, সান্ধ্য আকাশে রঙ্গীন মেঘ-লীলা, ফুলের সৌন্দর্য্য, মাতার মুখ, পত্নীর প্রেম, শিশুর হাসি, ভ্রাতা ও ভগনীর স্নেহ, কারুণিকের চিত্ত, এসকলও আছে। দুঃখ যেমন আছে, তাহা ভুলাইয়া দিবার বস্তুও আছে। উপনিষৎ জীবনকে মূল্যহীন বলেন নাই। শত বৎসর বাঁচিয়া থাকিবার জন্য ইচ্ছা করিতে বলিয়াছেন। সৎ কর্ম্ম করিয়া দুঃখের ভার লঘু করিতে বলিয়াছেন। "শেবধি" (ধন-রত্ন) অনিত্য; যাহা অধ্রুব, তাহাদ্বারা ধ্রুবকে পাওয়া যায় না, বিত্তদ্বারা মনুষ্য তৃপ্ত হইতে পারে না, বলিয়াছেন। কিন্তু এই জীবনেই যাহা নিত্য, যাহা ধ্রুব, তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও বলিয়াছেন।

মানুষের জীবনে দুঃখের প্রয়োজন আছে। জীবনের পূর্ণতার জন্য দুঃখের প্রয়োজন আছে। কিন্তু বুদ্ধ সে সম্বন্ধে কিছুই বলেন নাই। দুঃখের প্রাচুর্য্যের জন্য জীবনকে অভিসম্পাত বলিয়াই গণ্য করিয়াছেন।

তৃতীয় আর্য্য সত্য

দুঃখ-নিরোধ

দুঃখের উৎপত্তি-রোধ ও দুঃখের বিনাশ-সাধনই দুঃখ-নিরোধ—তৃতীয় আর্য্য সত্য। তৃষ্ণা হইতে, উপাদান (জাগতিক বস্তুর প্রতি আসক্তি), উপাদান হইতে "ভাব" এবং ভাব হইতেই জাতি বা জন্ম হয়। তৃষ্ণা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হওয়া, এবং তৃষ্ণা নিঃশেষে বর্জ্জন করিয়া দুঃখের মূলোৎপাদন করাই দুঃখ-নিরোধ। ইহাই নির্ব্বাণ।

অনিত্যতাবাদ

বুদ্ধ বলিয়াছেন জগতে সকলই অস্থায়ী, স্থায়ী কিছুই নাই। দেহ, সংবেদন, প্রত্যক্ষ জ্ঞান, সংস্কার, সংবিদ সকলই অস্থায়ী, সকলই দুঃখময়। কিছুই আত্মা নহে। যাহা অবিনশ্বর ও স্থায়ী, তাহাই যদি আত্মা হয়, তাহা হইলে কিছুই আত্মা নহে। দেহ, মন প্রভৃতির মধ্যে স্থায়ী কিছুই নাই। সকলই প্রতিভাস, কিছুই সৎ নহে। প্রতিভাসের প্রবাহই জগৎ। এই প্রতিভাস-প্রবাহের মধ্যে একটি আর একটির পরে আবির্ভূত হয়। কিন্তু এই প্রতিভাস-দিগের মধ্যে—সমুৎপাদদিগের মধ্যে—সম্বন্ধ কি কেবল কালের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধ? কারণ ও কার্য্যের মধ্যে কি এই পৌর্ব্বাপর্য্য ভিন্ন অন্য কোনও সম্বন্ধ নাই? কেন কারণ উপস্থিত হইলে কার্য্য সর্ব্বদাই আবির্ভূত হয়? কারণের মধ্যে যদি কোনও কার্য্যোৎপাদক শক্তি থাকে, তাহা আমাদের গোচর হয় না। পরবর্ত্তী কালে বৌদ্ধ ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদিগণ শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন না। কিন্তু বুদ্ধ যাবতীয় দ্রব্যের মধ্যে—আত্মা ও প্রাকৃতিক দ্রব্যের মধ্যে—শক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার "ভাব" জন্মের অভিমুখে গতি। সমস্ত দ্রব্যই শক্তি ও শক্তির ক্রীড়া, কালব্যাপী ক্রিয়া। জীবন ভবনের (becoming) আবির্ভাব ও তিরোভাবের অতিরিক্ত কিছু নহে। ইহা ভবনের প্রবাহ। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ কালে অবস্থিত, ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্ত্তিত আগুনের শিখার ন্যায়। অগ্নিশিখার কোনও পরিবর্ত্তন দেখা যায় না, কিন্তু প্রতিক্ষণে তাহার প্রতি অংশেই পরিবর্ত্তন ঘটে। প্রায় শত বৎসর পরে গ্রীস দেশে হেরাক্লিটাস এই তত্ত্বই প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন "প্রকৃতি ও প্রাণের রুদ্ধ কক্ষের দ্বার মুক্ত করিবার জন্য যে চাবি-কাঠির প্রয়োজন, গতিহীনতা বা স্থাণুত্ব তাহা নহে। গতি ও পরিবর্ত্তনই সেই চাবিকাঠি। পরিবর্ত্তনের অর্থ একটির পরে আর একটির উদ্‌ভব—বহুর উদ্‌ভব। এই বহু বহমান—অনবরত বহিয়া যাইতেছে। কিছুই স্থির নাই। জীবন মৃত্যুতে রূপান্তরিত হয়, মৃত্যু নূতন জীবনের রূপ ধারণ করে। নদী-প্রবাহের মতো এই জগৎ। সত্তা নয় ভবনই সত্য।" "বিশ্বের কেন্দ্র হইতে পরিধি পর্য্যন্ত বিস্তৃত অগ্নি। নিত্য পরিবর্ত্তমান, নিত্য রূপান্তরিত এই অগ্নি অসংখ্য রূপ পরিগ্রহ করে। চঞ্চল সর্ব্বদাহক অগ্নি যেমন জীবনের প্রতীক, তেমনি জীবনের সারও বটে।' বুদ্ধ বলেন পরিবর্ত্তনই সৎ স্থাণু সৎ কিছু নাই। শক্তির সংক্রমনই জগৎ। "যিনি সত্যদ্রষ্টা তাঁহার নিকট "অস্তি" ও

নাই, "নাস্তি"ও নাই। তাঁহার নিকট "ইহা আছে" যেমন সত্য নহে, তেমনি "ইহা নাই"ও সত্য নহে। কোনও ক্ষণেই "ভবন" সৎ-ত্ব প্রাপ্ত হয় না। যখনই কোনও বস্তুকে নাম-রূপদ্বারা ধারণা করি, তখনই তাহা অন্য নাম রূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

এই নিত্য পরিবর্ত্তমান জগতের একত্ব সাধিত হয় "প্রতীত্য সমুৎপাদ"-দ্বারা, কার্য্য কারণের নিয়মদ্বারা। কারণ ও তাহার কার্য্যের মধ্যে সম্বন্ধ যদি কেবল কালিক সম্বন্ধ হইত, তাহা হইলে জগৎ কেবল উৎপত্তি ও বিনাশের সমষ্টিমাত্র হইত। এই সকল সমুৎপাদের একত্ব-বিধায়ক কিছুই থাকিত না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যেক সমুৎপাদকর্ত্তৃক পরবর্ত্তী সমুৎপাদ উৎপন্ন হয়। অতীতকর্ত্তৃক বর্ত্তমান এবং বর্ত্তমানকর্ত্তৃক ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রত্যেক অবস্থা হইতে তাহার "পচ্চয়-শক্তি" (প্রত্যয়-শক্তি,-কারণ-শক্তি) সংক্রামিত হইয়া নূতন অবস্থার উৎপাদন করে। বীজ যেমন বৃক্ষে পরিণত হয়, বীজ যেমন বৃক্ষের উদ্ভবের জন্য আবশ্যক, কারণও তেমনই কার্য্যের জন্য আবশ্যক। জীবন শক্তি ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বাহিরে এই শক্তির ক্রিয়া দেখা যায় না, কিন্তু আমাদের সংবিদের মধ্যে ইহার ক্রিয়ার অনুভব হয়। জগৎ পূর্ব্বাপর সমুৎপাদ-শ্রেণীরূপে প্রতিভাত হইলেও, ইহা অবকাশ-বিহীন অভিব্যক্তি বা বিকাশ। এই বিকাশের প্রেরণা-শক্তি ইহার মধ্যে ক্রিয়াপর। অতীত বর্ত্তমান কালে প্রকাশিত বিকাশের সহিত সংলগ্ন।

"মিলিন্দ পংহ" গ্রন্থে নাগসেন অতীত ও বর্ত্তমানের মধ্যে পারম্পর্য্য ভিন্ন অন্য কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই, এবং পারম্পর্য্যের মধ্যে সক্রিয় কোনও শক্তির অস্তিত্বও স্বীকার করেন নাই। নাগসেনের মতই পরবর্ত্তী কালে ক্ষণিক বিজ্ঞান বাদে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বুদ্ধ সকল বস্তুই অনিত্য বা অস্থায়ী বলিয়াছিলেন, কিন্তু "ক্ষণিক" বলেন নাই। তিনি কেবল সংবিদ্‌কে (consciousness) ক্ষণিক বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন দেখা যায় দেহ কখনও এক বৎসর থাকে, কখনও একশত বৎসর, কখনও বা তাহার অধিক কালও থাকে। কিন্তু যাহাকে মন, বুদ্ধি, সংবিদ্ বলে, তাহা দিবারাত্রি অনবরত একরূপে বিনষ্ট হইতেছে এবং অন্য রূপে উদ্ভূত হইতেছে। বুদ্ধ কেবল মনকেই অগ্নিশিখার সহিত উপমিত করিয়াছেন। অগ্নিশিখার মতো চিত্তও অনবরতঃ পরিবর্ত্তনশীল। কিন্তু মানসিক অবস্থার ক্ষণিকত্ব তিনি বাহ্য বস্তুতে আরোপ করেন নাই, যদিও বাহ্যবস্তুও অনিত্য বলিয়াছেন। ক্ষণিকবাদিগণ বলেন "অর্থ-ক্রিয়াকারিত্ব" অর্থাৎ বস্তুজগতে পরিবর্ত্তন

উৎপাদনের শক্তিই "সত্তা"। যে বস্তু স্থায়ী, তাহার এই শক্তি থাকিতে পারে না। অতীতে, বর্ত্তমানে ও ভবিষ্যতে যাহার পরিবর্ত্তন হয় না, তাহাই স্থায়ী। এরূপ বস্তু হইতে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য (কর্ম্ম) উৎপন্ন হইবার কোনও যুক্তি নাই। যদি বল পরিবর্ত্তন-উৎপাদনের শক্তিই স্থায়ী এবং উপযুক্ত অবস্থায় এই শক্তি কার্য্যকরী হয়, তাহা হইলে তাহার উত্তর এই যে যাহার কোনও কিছু করিবার সামর্থ্য আছে, তাহাই সেই কার্য্য করে, এবং যাহা তাহা করে না, তাহার সে শক্তি নাই। যদি বিশেষ অবস্থায় ভিন্ন কোনও বস্তু হইতে কোনও কার্য্যের উদ্ভব না হয়, তাহা হইলে সেই অবস্থাকেই সেই কার্য্যের কর্ত্তা বলিতে হইবে। সুতরাং অর্থ-ক্রিয়াকারিত্বই যদি সত্তা হয়, তাহা হইলে সত্তাবান সকল বস্তুই ক্ষণিক। ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদিগণ বলেন "জীবের জীবনের স্থিতি নিতান্তই ক্ষণিক, কোনও এক চিন্তার স্থিতি-কালের সমান। যখনই সেই চিন্তার শেষ হয়, তখনই জীবের অস্তিত্বেরও শেষ হয়।" ইহার অর্থ প্রতিক্ষণে জীবের নাশ, এবং পরক্ষণে আবার উদ্ভব হয়।

বুদ্ধ জগৎকে অসম্বদ্ধ সমুৎপাদপুঞ্জরূপে দেখেন নাই। তিনি যাবতীয় সমুৎপাদ দৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ বলিয়া গণ্য করিতেন। প্রত্যেক সমুৎপাদ হইতে সমগ্র বিশ্বে স্পন্দন সংক্রমিত হয়। বিশ্বের মধ্যে শাশ্বত শৃঙ্খলা বর্ত্তমান। পরবর্ত্তী কালে—ত্রিপিটক সংকলিত হইবার পরে—পঞ্চবিধ শৃঙ্খলা বা নিয়মের কথা বৌদ্ধ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়—কর্ম্ম নিয়ম, উতু নিয়ম, বীজ নিয়ম, চিত্ত-নিয়ম এবং ধর্ম্ম নিয়ম। কর্ম্ম নিয়মের ফলে সৎ কর্ম্ম হইতে সুখ এবং অসৎ কর্ম্ম হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়। বহির্জ্জগৎ—প্রাকৃতিক ও জীবজগৎ—যে নিয়মের অধীন, তাহা উতু নিয়ম। বার্গসঁর মতে প্রাণ কোনও নিয়মের অধীন নহে। কিন্তু বুদ্ধের মতে যাবতীয় জীবন নিয়মে আবদ্ধ। উদ্ভিদ জগতের নিয়ম বীজ নিয়ম, সংবিদের নিয়ম চিত্ত-নিয়ম। প্রকৃতি যে নিয়মের অনুসরণ করিয়া পূর্ণ আদর্শ সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে, তাহাই ধর্ম্ম-নিয়ম। বিশ্বশৃঙ্খলার মধ্যে কোনও অপরিণামী নিত্য বস্তু আছে কিনা, ইহা লইয়াই উপনিষদ্ ও বৌদ্ধদর্শনের মধ্যে মতভেদ। বুদ্ধ জীবন-প্রবাহ এবং জাগতিক সমুৎপাদ-প্রবাহের মধ্যে কোনও স্থির অপরিণামী বস্তু দেখিতে পান নাই। তিনি এই জীবনপ্রবাহ ও সমুৎপাদপ্রবাহের আরম্ভ কিরূপে হইল, তাহা বলেন নাই। তিনি ইহাদের কোনও উদ্দেশ্যের কথা বলেন নাই, যদৃচ্ছা হইতে যে ইহাদের উৎপত্তি তাহাও বলেন নাই। কিন্তু

বিশ্ব যে নিয়মের অধীন, এবং সে নিয়মের যে ব্যভিচার নাই, তাহা বলিয়াছেন। ওলডেন বার্গ বলেন "ব্রাহ্মণেরা সকল 'ভবনের' মধ্যে সত্তা (Being যাহা অপরিণামী) দেখিতে পাইতেন। বৌদ্ধেরা যাবতীয় প্রতীয়মান সত্তার মধ্যে 'ভবন' দেখিতে পাইতেন। ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টিতে কারণত্ব-বিহীন দ্রব্য (Substance without causality) এবং বৌদ্ধদিগের দৃষ্টিতে দ্রব্য-বিহীন কারণত্ব।" অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের দৃষ্টিতে কারণত্ব সত্য নয়, বৌদ্ধদিগের দৃষ্টিতে অপরিণামী দ্রব্য কিছু নাই। যাহা দ্রব্য হইতে উদভূত বলিয়া বোধ হয়, তাহার সত্য অস্তিত্ব ব্রাহ্মণের দৃষ্টিতে নাই। বৌদ্ধদিগের দৃষ্টিতে সমুৎপাদদিগের কারণরূপে কোনও অপরিণামী বস্তুর অস্তিত্ব নাই। এই প্রসঙ্গে ব্রাড্‌লের বচন উদ্ধৃত করিয়া ডাক্তার রাধাকৃষ্ণন্ বলেন ওলডেন-বার্গের উক্তিতে অত্যুক্তি আছে। উপনিষদ এবং বৌদ্ধ উভয়েই বিশ্বকে এক জীবন্ত সমগ্র বস্তু বলিয়া গণ্য করেন। এই সমগ্র বস্তুকে (বল-প্রয়োগ অথবা আংশিক নাশের কথা না ধরিয়া) ভিন্ন ভিন্ন নির্দিষ্ট অংশসমূহে বিভক্ত করা যায় না। এই বিশ্ব অবিভক্ত গতিরূপ। উপনিষদ ভবন (পরিণাম)-বর্জিত শুদ্ধ সত্তার কথা বলে না, জগতের ভবনরাশিকে মায়া বা মিথ্যা বলে না, অথবা পরস্পর অসংবদ্ধ অবস্থাসমূহের প্রবাহ বলে না। ইহা প্রতিভাস বটে, কিন্তু সতেরই প্রতিভাস। সমুৎপাদ-প্রবাহের তলদেশে অপরিণামী সৎ বর্ত্তমান বলিয়া উপনিষদ অনপেক্ষ (সৎ-নিরপেক্ষ) পরিণাম স্বীকার করে না। সমগ্র বিশ্ব অপরিণামী, তাহার সমগ্ররূপের কোনও পরিণাম নাই। তাহার মধ্যে পরিণাম আছে, সমগ্রের বিভিন্ন বিভাবের—আপেক্ষিক বিশিষ্ট রূপের—পরিবর্ত্তন আছে, কিন্তু সমগ্রের নিজের পরিবর্ত্তন নাই। এই সকল বিভাবের (aspects) পরিবর্ত্তন নিয়মে আবদ্ধ। বুদ্ধ এ কথা বলেন নাই যে সকল পরিণামের তলদেশে এক পরিণাম-বিহীন বস্তুর অস্তিত্ব আছে। এ কথাও তিনি বলেন নাই; যে পরিবর্ত্তনই কেবল সত্য, যদিও তাহার অনুবর্ত্তীদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার বাক্যের এই ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। বস্তুর সত্তা (Being)-সম্বন্ধে, তিনি উদাসীন। নাগসেন বলেন পারম্পর্য্য ব্যতীত কিছুই আমরা দেখিতে পাই না। ইহা যদি স্বীকারও করা যায়, তবুও প্রশ্ন আসে, যদি যাবতীয় বস্তুই অন্য বস্তুর উপর নির্ভরশীল, তবে কি অনপেক্ষ কিছুরই অস্তিত্ব নাই? তাহা যদি না থাকে, তাহা হইলে কারণত্বের কোনও অর্থ করা সম্ভবপর হয় না। যদি প্রত্যেক সমুৎপাদের কারণ-রূপে অন্য সমুৎপাদের উল্লেখ করা হয়, এবং শেষোক্ত সমুৎপাদ অন্য সমুৎপাদের

অপেক্ষা করে, তাহা হইলে কোনও সমুৎপাদের পর্যাপ্ত যুক্তি (Sufficient reason) পাওয়া যায় না। তাহার জন্য "কারণ" প্রত্যয় অতিক্রম করিয়া এমন কিছু ধরিতে হয়, যাহা তাহার নিজের কারণ, এবং সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে আপনা হইতে অভিন্ন থাকে। যখন কোন কিছুকে ক্ষণস্থায়ী বলা হয়, তখন "চিরস্থায়ী"র সহিত তাহার ভেদ সূচিত হয় এবং চিরস্থায়ী কিছু আছে কিনা, তাহা চিন্তা করিতে হয়। তখন যাহা চরম সত্য, তাহাকে হয় বিকাশ-শীল তত্ত্ব বলিতে হয়, নতুবা তাহার মধ্যে এমন একটি স্থায়ী অংশ আছে বলিতে হয়, যাহা সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করিয়া বর্ত্তমান থাকে। জগতে যদি পারম্পর্য্যক্রমে সংঘটিত ঘটনা ভিন্ন আর কিছু না থাকিত, তাহা হইলে পারম্পর্য্যই থাকিত না। পারম্পর্য্য থাকিতে হইলে অনুবর্ত্তী ঘটনার সহিত তুলনায় স্থিরত্বের—আপেক্ষিক স্থিরত্বের-প্রয়োজন। "খ"র আরম্ভের পূর্ব্বেই যদি "ক"র তিরোভাব হয়, এবং "গ"র আরম্ভের পূর্ব্বে "খ"র তিরোভাব হয়, তাহা হইলে অনুবর্ত্তন হইবে কাহার? যাহার পরে ঘটনার আবির্ভাব হইবে, আবির্ভাবের সময় তাহার অস্তিত্বই যে নাই। যখন বহুর সমবায়ে কোনও সমগ্র (whole) গঠিত হয়, তখন বহুও থাকে, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধও থাকে। কিন্তু সম্বদ্ধ বস্তুদিগকে বর্জন করিয়া সেই সমগ্রকে কেবল তাহাদিগের মধ্যের সম্বন্ধসমূহে বিশ্লিষ্ট করা যায় না। সম্বদ্ধ বস্তু না থাকিলে, সম্বন্ধ অর্থহীন হইয়া পড়ে, উড্ডীয়মান পক্ষীকে বর্জন করিয়া উড্ডয়ন যেমন অর্থহীন হয়। বুদ্ধের দৃষ্টি আবদ্ধ ছিল প্রত্যক্ষ জগতে। তাই তিনি সত্তাকে (Being) বিচ্ছেদহীন ক্রিয়া (continous process) বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বার্গস ভবনকেই সমুৎপাদের মধ্যে একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করিয়াছেন, ভবনের তলে অবস্থিত কোনও দ্রব্য স্বীকার করেন নাই। স্থায়ী বস্তুর যে ধারণা আমাদের হয়, তাহা ভ্রান্তি (অবিদ্যা)। (ছায়া চিত্রের ছবি যেমন ফিল্মে দৃষ্টির সময় স্থির রূপে দৃষ্ট হয়)। যাহাকে স্থির রূপে দেখি, তাহা বাস্তবিক চলন্ত। যাহা আমরা দেখি, তাহা পরিবর্ত্তন।*

কিন্তু এই সকল পরিবর্ত্তন স্থির বস্তুরই পরিবর্ত্তন, এবং তাহারা সেই স্থির বস্তুর অন্তঃস্থিত কারণ-শক্তির অনুগামী। ইহা স্বীকার না করিলে জগৎকে লক্ষ্যহীন শক্তিসমূহের তাণ্ডব নৃত্য বলিতে হয়। বৌদ্ধ ক্ষণিকবাদ খণ্ডন করিতে শঙ্করাচার্য্য বলেন "বৌদ্ধদিগের মতে প্রত্যেক বস্তুরই অস্তিত্ব ক্ষণিক। দ্বিতীয়

---

* Dr. Radhakrishnan's Indian Philosophy. Vol I P. 373 78.

মুহূর্ত যখন উপস্থিত হয়, তখন প্রথম মুহূর্তে যে বস্তু ছিল, তাহার অস্তিত্বের শেষ হইয়াছে, এবং সম্পূর্ণ নূতন এক বস্তু উদ্ভূত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুকে পরে আগত বস্তুর কারণ বলিতে পার না, পরবর্ত্তীকে পূর্ব্ববর্ত্তীর কার্য্য বলিতে পার না। পরের মুহূর্তে আগত বস্তু উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই পূর্ব্ববর্ত্তী মুহূর্তের বস্তু বিনষ্ট হয় বলিয়া পূর্ব্ববর্ত্তী বস্তুকে পরবর্ত্তী বস্তুর কারণ বলিয়া গণ্য করা যায় না। কেন না অস্তিত্বের অভাবকে (অসত্তাকে) অস্তিত্বের (সত্তার) কারণ বলা যায় না।" এই যুক্তির সারবত্তা স্বীকার করিয়া পরবর্ত্তী সর্ব্বাস্তিত্ববাদী বৌদ্ধগণ যাবতীয় পরিবর্ত্তনের তলদেশে স্থায়ী বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন।

রাধাকৃষ্ণন্ বলেন তাঁহার দৃষ্টি সমুৎপাদের আপেক্ষিক জগতে বদ্ধ ছিল বলিয়া বুদ্ধ উপনিষদের ঋষিদিগের ন্যায় জগতের কেন্দ্রস্থিত এবং প্রতি মানব-হৃদয়ে স্পন্দিত সার্ব্বিক প্রাণের উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু অসঙ্গ (absolute) জ্ঞানগম্য নহে বলিয়া তাহার সত্যতা অস্বীকার করা চলে না। বুদ্ধ যে তাহার কথা বলেন নাই, তাহার কারণ হয়তো এই যে তাঁহার মতে যাহা আমাদের গোচর নহে, তাহা আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় নহে এবং তাহার অনুসন্ধান নিস্ফল। উপনিষদ ভবনের অতীত এক চরম সত্যের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধ সে সম্বন্ধে কোনও মত প্রকাশ করেন নাই। তিনি যে জগতের পরিবর্ত্তনরাশির মধ্যে কোনও স্থায়ী বস্তুর, জাগতিক কোলাহলের অতীত দুঃখার্ত্ত মানবাত্মার কোনও বিশ্রাম-স্থানের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। তিনি বলিয়াছিলেন "অজাত, উৎপত্তিহীন, অপিণ্ডীকৃত এক জন (অথবা পদার্থ) আছেন। শ্রমণগণ, তাহা যদি না থাকিত, তাহা হইলে জাত, উৎপন্ন, সৃষ্ট ও পিণ্ডীকৃতের জগৎ হইতে কোনও পরিত্রাণ সম্ভবপর হইত না।" দৃশ্যমান জগতের পরিবর্ত্তমান প্রতিভাসের তলদেশে স্থায়ী এক সত্তায় বুদ্ধ বিশ্বাস করিতেন।*

কিন্তু এই মতের বিরোধী মতও আছে।

---

* Dr. Radhakrishnan's Indian Philosophy, Vol I P. 330।

চতুর্থ আর্য্য সত্য—অষ্টাঙ্গ মার্গ

বৌদ্ধ চরিত্র নীতি

দুঃখ নিরোধ-মার্গ বুদ্ধের চতুর্থ আর্য্য সত্য। জীবন দুঃখে পরিপূর্ণ, দুঃখ অকারণ নহে, তাহার কারণ আছে, ইহা বলিয়া বুদ্ধ দুঃখের উৎপত্তির কারণের বর্ণনা করিলেন। তাহার পরে বলিলেন, দুঃখের নিরোধ সম্ভবপর। চতুর্থ আর্য্য সত্যে কি কি উপায় অবলম্বন করিলে দুঃখের নিরোধ করা যায়, বুদ্ধ তাহার বর্ণনা করিয়াছেন। এই সকল উপায়ই দুঃখ-নিরোধ মার্গ। শ্রমণ ও গৃহী সকলেই এই মার্গ অনুসরণ করিতে পারেন।

অষ্টাঙ্গ মার্গ নির্ব্বাণ পর্য্যন্ত প্রসারিত, নির্ব্বাণ সেই মার্গের প্রান্তে বর্ত্তমান। যে যে কারণে দুঃখের উৎপত্তি হয়, অষ্টাঙ্গ মার্গকর্ত্তৃক তাহারা প্রতিহত হয়। সেই মার্গের প্রথম অঙ্গ সম্যক দৃষ্টি অর্থাৎ সত্য জ্ঞান। অবিদ্যার ফল মিথ্যাদৃষ্টি অর্থাৎ আত্মা ও জগৎ-সম্বন্ধে মিথ্যা জ্ঞানই দুঃখের মূল। তাই দুঃখ-নিরোধ মার্গের প্রথম অঙ্গই সম্যক দৃষ্টি—বুদ্ধকথিত চারি আর্য্য সত্য সম্বন্ধে সত্য জ্ঞান। সত্য কি তাহা অজ্ঞাত থাকিলে দুঃখ-মুক্তি হয় না। মিথ্যা জ্ঞান হইতে অন্যায় কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। আমাদের অহংভাব যে দুঃখের জনক, ইহা না জানিয়া আমরা আমাদের ব্যক্তিত্ব জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাই। সুতরাং নির্ব্বাণ-মার্গের প্রথমেই সম্যক্ দৃষ্টি।

সম্যক সংকল্প দ্বিতীয় অঙ্গ। সত্য জ্ঞান-লাভের পরে তাহার আলোকে জীবন পরিচালিত না করিলে সে জ্ঞান বৃথা। সংসারে আসক্তিবর্জ্জন, পরদ্বেষ বর্জ্জন এবং কাহারও ক্ষতি না করিতে সংকল্পই সম্যক্ সংকল্প।

তৃতীয় অঙ্গ সম্যক বাক্। সম্যক সংকল্প কার্য্যে পরিণত হওয়া চাই। ন্যায়সংগত বাক্য, ন্যায়সংগত কর্ম্ম, ন্যায়সংগত জীবনযাপন-প্রণালীতে সংকল্প প্রকাশিত হওয়া চাই। মিথ্যাভাষণ হইতে বিরতি, পরনিন্দা ও রূঢ়-বাক্য-বর্জ্জন এবং অনাবশ্যক লঘু বিষয়ের আলাপ-বর্জ্জনই সম্যক বাক্।

চতুর্থ অঙ্গ—সম্যক কর্ম্মান্ত। সম্যক সংকল্পের পরিণতি হওয়া চাই ন্যায়সংগত আচরণে। শুধু সৎভাষণই যথেষ্ট নহে। স্বার্থহীন কর্ম্মই সৎ কর্ম্ম। যাগ, যজ্ঞ অথবা ঈশ্বরোপাসনাকে বুদ্ধ সৎ কর্ম্মের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, শত বৎসর অগ্নির আরাধনা অপেক্ষা ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত মানুষের অর্চ্চনা ভাল। কোনও ব্রাহ্মণ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন বাহুকা নদীতে স্নান করিলে পাপী পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে কি না। উত্তরে বুদ্ধ

বলিয়াছিলেন, "বাহুকাই হউক বা আধিকাই হউক কোনও পাপীকে পাপমুক্ত করিতে পারে না, তা সে যতবারই তাহাতে স্নান করুক না কেন। কোনও নদীই পাপীকে অথবা পরদ্বেষী মানুষকে পবিত্র করিতে পারে না। ব্রাহ্মণ, সর্ব্ব জীবের প্রতি দয়ালু হও। তুমি যদি মিথ্যা না বল, জীব-হত্যা না কর এবং কাহারও দান গ্রহণ না কর, তাহা হইলে গয়ায় গিয়া তোমার কি লাভ হইবে? তোমার নিকট সকল জলই গয়ার তুল্য। ক্রোধ, সুরামত্ততা, প্রতারণা, ঈর্ষা, ইহারাই অপবিত্র, মাংসভোজন নহে।" "যে ভ্রান্ত বিশ্বাস হইতে মুক্ত হয় নাই, উপবাস, বসনবর্জ্জন, অথবা মস্তকমুণ্ডন, অথবা কর্কশবসন-পরিধান অথবা পুরোহিতকে দান অথবা দেবতা-পূজা তাহাকে পাপমুক্ত করিতে পারে না।" বুদ্ধ অত্যধিক কৃচ্ছ্রতারও অনুমোদন করেন নাই। জীবহত্যা, চৌর্য্য এবং অবৈধ ইন্দ্রিয়সেবা হইতে বিরতি সম্যক কর্ম্মের অন্তর্গত।

সম্যক কর্ম্মান্তের জন্য শীলের প্রয়োজন। 'তংথা জট'-(তৃষ্ণাজট) দ্বারা আমরা ভিতরে ও বাহিরে জড়িত। এই জট হইতে মুক্তি শীল অর্থাৎ নিয়মানুবর্ত্তিতা ভিন্ন সম্ভবপর নহে। সকল পাপকর্ম্ম হইতে বিরতিই শীল। শীলের অনুষ্ঠানে কিল্লিশ (পাপ) দূরীভূত হয়, এবং "স্রোতাপন্ন ভাব" এবং "সকৃদাগামী ভাব" অধিগত হয়। স্রোতাপন্ন ভাবের অর্থ সৎকর্ম্ম-স্রোতে স্থাপিত হওয়া এবং সকৃদাগামী ভাবের অর্থ সম্মুখে একটি মাত্র জন্ম অবশিষ্ট থাকার অবস্থা। শীলের পরে সমাধি, যাহার ফলে পুরাতন কিল্লিশের মূল-সকল উৎপাটিত হয়। শীল ও দানের মধ্যে প্রভেদ এই যে শীল নিষ্ক্রিয়, (নিবৃত্তি), দান সক্রিয় প্রবৃত্তি। অহিংসা প্রভৃতি নিয়মপালন শীল, আর আত্মত্যাগমূলক কর্ম্ম, দুর্গত লোকের সাহায্য, সর্ব্বজীবের মঙ্গলের জন্য জীবন-মরণ প্রভৃতি দান।

পঞ্চম অঙ্গ—সম্যক আজীব অর্থাৎ সাধু উপায়ে জীবিকা-অর্জ্জন। জীবন-রক্ষার জন্যও অসৎ ও নিষিদ্ধ উপায় অবলম্বন করা উচিত নহে।

অষ্টাঙ্গ মার্গের ষষ্ঠ অঙ্গ সম্যক ব্যায়াম অর্থাৎ মন হইতে যাবতীয় অসৎ চিন্তা বিদূরিত করিয়া সৎ-চিন্তা-পোষণ-দ্বারা নৈতিক-উন্নতি-পরিরক্ষণের চেষ্টা। উন্নত-জীবন-যাপনের চেষ্টার সময়ে পুরাতন দৃঢ়মূল অসৎ চিন্তাসকল থাকিয়া থাকিয়া উদিত হয় এবং সেই সঙ্গে নূতন অসৎ চিন্তার উদ্রেকদ্বারাও মন কলুষিত হয়। ইহার প্রতিবিধানের জন্য যেমন পুরাতন অসৎ চিন্তা উদিত হইবামাত্রই তাহাদিগকে দূর করিতে হইবে, তেমনি নূতন সৎ চিন্তাদ্বারা মনকে

পূর্ণ করিয়া রাখিতে হইবে। ইহাই সম্যক ব্যায়াম। ইহার জন্ত বুদ্ধ পাঁচ উপায়ের কথা বলিয়াছেন : (১) নূতন শুভ চিন্তায় মন নিয়োগ করা ; (২) অশুভ ভাবনা অর্থাৎ অসৎ চিন্তা কার্য্যে পরিণত হইলে, তাহা হইতে যে অমঙ্গল উদ্ভূত হইতে পারে, তাহার ভাবনা ; (৩) অসৎ চিন্তা হইতে মনকে নিবৃত্ত করা ; (৪) অসৎ চিন্তার পূর্ব্ববর্ত্তী যে চিন্তা হইতে অসৎ চিন্তার উদ্ভব হয়, তাহার বিশ্লেষণ করিয়া তাহার শক্তিহ্রাস করা। (৫) দেহ নিশ্চল করিয়া মন বশীভূত করা। সৎ কর্ম্মের মূলে সৎ চিন্তা। তাহার জন্ত মনঃ-সংযমনের প্রয়োজন এবং চিত্তের আবেগ পরিহার্য্য। চিত্তাবেগ নৈতিক স্বাস্থ্যের হানিকর। আধ্যাত্মিক অভিমানও হানিকর। "আমার মন পবিত্র" এই চিন্তাতেও মন অপবিত্র হয়। যে ভাবে, "আমার মন অপবিত্র" এবং পবিত্র হইতে চেষ্টা করে, সে পবিত্র চিন্তা করে।

সম্যক স্মৃতি অষ্টাঙ্গমার্গের সপ্তম অঙ্গ। যাহা জানা হইয়াছে, সর্ব্বদা তাহা স্মরণে রাখাই সম্যক্ স্মৃতি। দেহ আমি নহি, সংবেদন ও মনও আমি নহি, মানসিক কোন অবস্থাও আমি নহি। ইহাদের কিছুই আমার নহে, সর্ব্বদা ইহা মনে রাখিতে হইবে। এই সকল ভাব এত দৃঢ় ভাবে মনে গ্রোথিত থাকে, যে তাহা হইতে মুক্ত হওয়া সহজ নহে। এই সকল চিন্তা হইতেই আসক্তি উৎপন্ন হয়, এবং তাহার ফলে আমরা দুঃখ পাই। দেহ ভঙ্গুর, ক্ষণ-বিধ্বংসী এবং ঘৃণিত বস্তু, ইহা সর্ব্বদা মনে থাকিলে তাহার প্রতি আসক্তি জন্মে না। দেহ চারি ভূতে গঠিত, ইহা নানা ঘৃণ্য দ্রব্যে পূর্ণ, ইহা সর্ব্বদা মনে করিতে হইবে। মৃত দেহ মৃত্তিকার নিম্নে পচে, শকুনি ও শৃগাল কুক্কুরের ভক্ষ্য হয়, ইহা ভাবিতে হইবে। ইহার ফলে সকল বস্তুর প্রতি আসক্তির লোপ হয়।

অষ্টাঙ্গ মার্গের শেষ অঙ্গ সম্যক সমাধি। উপরি উক্ত সাত অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে সকল কষায় এবং অসৎ চিন্তা দমিত হয় এবং গাঢ়তর মনঃ-সমাধানের বা ধ্যানের সামর্থ্য জন্মে। এই ধ্যানের বা সমাধির চারি ক্রম। প্রথম ক্রমে সাধক বিশুদ্ধ ও শান্ত মনে কোনও এক বিষয় চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন, এবং বিতর্ক ও বিচারদ্বারা সত্য-নির্দ্ধারণের চেষ্টা করেন। ইহার ফলে তাহার মনে অলৌকিক আনন্দ এবং শান্তির আবির্ভাব হয়। দ্বিতীয় ক্রমে সাধক অবলম্বিত বিষয়ে মনকে স্থির রাখিয়া বিতর্ক ও বিচার হইতে নিবৃত্ত হন ; চারি আর্য্য সত্যে পূর্ণ বিশ্বাস তখন উদ্ভূত হয়, সকল সন্দেহের নিরসন হয় এবং গাঢ় অচঞ্চল ধ্যান হইতে আনন্দ, শান্তি ও মানসিক স্থৈর্য্য

উদ্ভূত হইতে থাকে। এই ক্রমে আনন্দ ও শান্তির অনুভূতি থাকে। তৃতীয় ক্রমে পূর্ব্বের মত মন স্থির রাখিয়া আনন্দের অনুভূতি হইতে মনকে বিযুক্ত করিতে হয়। ফলে গভীরতর ধ্যানের সহিত পরিপূর্ণ সমতা এবং দৈহিক স্বস্তির অনুভূতি উৎপন্ন হয় এবং আত্মমোহের (আপনার প্রতি আসক্তির) শান্তি হয়। তখন সমতা ও স্বস্তির জ্ঞান থাকে, কিন্তু আনন্দের প্রতি ঔদাসীন্য জন্মে। চতুর্থ ক্রমে এই সমতা ও স্বস্তির জ্ঞান এবং আনন্দের অনুভূতি-পরিহারের চেষ্টার ফলে সম্পূর্ণ সমতা ও নিশ্চলতা লব্ধ হয়, সুখ-দুঃখে ঔদাসীন্য উৎপন্ন হয়, মন জিত হয়, কোনও উদ্বেগ অথবা কষ্ট থাকে না, স্বস্তির অনুভবও হয় না, দুঃখের নিবৃত্তি হয়, সাধক নির্ব্বাণ লাভ করিয়া অর্হৎ হন। অহংভাব হইতে মুক্ত হইয়া সত্যের মধ্যে ডুবিয়া থাকাই ধ্যান। বৌদ্ধ সংঘের প্রত্যেক ব্যক্তিকেই দিনের কিয়দংশ ধ্যানে অতিবাহিত করিতে হয়। মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা সকলের পক্ষেই উপদিষ্ট হইয়াছে। ইহাদ্বারা প্রেম ক্রমশঃ প্রসারিত হইয়া সমগ্র জীব জগতে ব্যাপ্ত হয়।

উপরি-উক্ত অষ্টাঙ্গ-মার্গের বর্ণনা হইতে দেখিতে পাওয়া যায় যে বুদ্ধের চরিত্রনীতি মুখ্যতঃ প্রজ্ঞা (জ্ঞান), শীল (আচরণ) এবং ধ্যানের সাধনা। সক্রেটিস জ্ঞান ও ধর্ম্মকে অভিন্ন বলিতেন। বুদ্ধও জ্ঞান এবং সুনীতিকে অবিচ্ছেদ্য গণ্য করিতেন। পুরুষার্থের জ্ঞানের উপরই সুনীতি প্রতিষ্ঠিত এবং সুনীতির অনুষ্ঠান ব্যতীতও পূর্ণ জ্ঞান-লাভ অসম্ভব। সেই জন্যই অষ্টাঙ্গ মার্গের প্রথমেই বুদ্ধ সম্যক জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন। এই জ্ঞানদ্বারা ভ্রান্তি এবং তাহার ফল কষায় এবং অনিষ্টকর চিন্তাবেগ বিদূরিত না হইলে চরিত্রের উন্নতি অসম্ভব। সম্যক জ্ঞানের পরে কর্ম্মে সেই জ্ঞানের প্রয়োগের জন্য সম্যক সংকল্প, সম্যক বাক্, এবং সম্যক কর্ম্ম, সাধুজীবিকা-অবলম্বন, চিত্ত হইতে অসৎ চিন্তা বিদূরিত করিয়া সর্ব্বদা সৎ চিন্তায় তাহাকে ব্যাপৃত রাখা, এবং তাহার পরে লব্ধ জ্ঞান সর্ব্বদা স্মরণে রাখার প্রয়োজন। যাহা সত্য ও মঙ্গল, তাহা সর্ব্বদা মনের সম্মুখে উপস্থিত রাখিতে, এবং ইচ্ছাকে তাহার দিকে চালিত করিতে হয়। জ্ঞানের সকল বাধা এইরূপে দূর করিয়া ধ্যানে নিযুক্ত হইতে হয়। অপ্রতিহত ধ্যানের ফলে পূর্ণদৃষ্টি-লাভ হয়, জীবনরহস্য উদ্ঘাটিত হয়, অজ্ঞান ও তদুদ্ভূত তৃষ্ণার মূল ছিন্ন হয়, দুঃখের বীজ ভস্মসাৎ হয় এবং নির্ব্বাণ অধিগত হয়।

বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশের সময় যে পঞ্চশীল গ্রহণ করিতে হয়, তাহা এই ;

(১) জীবহিংসা হইতে বিরতি, (২) অদত্ত বস্তু গ্রহণ হইতে বিরতি, (৩) কামজনিত ব্যভিচার হইতে বিরতি, (৪) মিথ্যা বাক্য হইতে বিরতি, এবং (৫) সুরা ও মাদক দ্রব্যাদি সেবন হইতে বিরতি।

বুদ্ধের দশটি আদেশ: (১) প্রাণীহত্যা করিও না, (২) চুরি করিও না, (৩) পরস্ত্রী-গমন করিও না, (৪) মিথ্যা কথা বলিও না, (৫) পিশুন বাক্য বলিও না, (৬) কর্কশ বাক্য বলিও না, (৭) বৃথা গল্প করিও না, (৮) পরদ্রব্যে লোভ করিও না, (৯) ক্রোধ করিও না, (১০) কর্ম্মফলে বিশ্বাস কর।

বুদ্ধ আরও বলিয়াছেন:

(১) বিদ্বেষদ্বারা বিদ্বেষ প্রশমিত হয় না। বিদ্বেষহীনতার দ্বারাই বিদ্বেষের প্রশমন হয়। ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। (ধর্ম্মপদ)

(২) অপরের ত্রুটি এবং অপরের কৃত ও অকৃত কর্ম্মের দিকে মন না দিয়া আপনার কৃত ও অকৃত কর্ম্মের দিকে দৃষ্টি রাখিবে। (ধর্ম্মপদ)

(৩) পুষ্পের গন্ধ বায়ুর বিপরীত দিকে যায় না। কিন্তু সৎ পুরুষের যশের সৌরভ সর্ব্বদিকে প্রবাহিত হয়। (ধর্ম্মপদ)

(৪) সহস্রবার সহস্র ব্যক্তিকে সংগ্রামে জয় করিতে পারা যায়। কিন্তু যিনি কেবল আপনাকে জয় করিয়াছেন তিনিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিজয়-লাভ করিয়াছেন (ধর্ম্মপদ)

(৫) এমন ক্ষুদ্র অন্যায়ও করিবে না, যাহার জন্য অন্যে নিন্দা করিতে পারে। কামনা করিবে সকল প্রাণী সুখী হউক, নিরাপদ হউক ও সুস্থ হউক।

(৬) অক্রোধদ্বারা ক্রোধ জয় করিবে, সাধুতাদ্বারা অসাধুকে জয় করিবে, ত্যাগেরদ্বারা কৃপণকে জয় করিবে, সত্যেরদ্বারা মিথ্যাবাদীকে জয় করিবে। (ধর্ম্মপদ)

(৭) আপনিই আপনার রক্ষাকর্ত্তা, অপর কে কাহার রক্ষাকর্ত্তা হইতে পারে? সংযত পুরুষ আপনার মধ্যে দুর্লভ আশ্রয় লাভ করেন। (ধর্ম্মপদ)

(৮) অল্পমাত্র সুখ পরিত্যাগ করিয়া যদি বিপুল সুখ লাভ করা যায়, তবে পণ্ডিত ব্যক্তি সামান্য সুখ ত্যাগ করেন।

জীবহত্যা নিষেধ করিলেও বুদ্ধ দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ সমর্থন করিয়াছেন। সিংহ নামক এক সৈন্যাধ্যক্ষ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যাহারা অন্যায় করে, তাহাদিগের দণ্ডবিধান তথাগত অনুমোদন করেন কিনা? আমাদের

গৃহ, স্ত্রী ও সন্তান এবং সম্পত্তি-রক্ষার জন্য যুদ্ধ করা কি অন্যায়? অন্যায়-কারী যখন আমার সম্পত্তি বলপ্রয়োগ করিয়া আত্মসাৎ করিতে অগ্রসর হয়, তখন তাহাকে বাধা না দিয়া তাহার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিতে কি তথাগত উপদেশ দেন? ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ করা কি অন্যায়? সকল প্রকার যুদ্ধই কি নিষিদ্ধ?" এইসকল প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন "শাস্তি যাহার প্রাপ্য, শাস্তি তাহাকে দিতেই হইবে। অনুগ্রহ যাহার প্রাপ্য, তাহাকে অনুগ্রহ করাই কর্ত্তব্য। ইহা সত্ত্বেও তথাগতের উপদেশ এই যে কোনও প্রাণীর কোনও অনিষ্ট করিবে না। তাহাদের ভাল বাসিবে এবং তাহাদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবে। এই দুই উপদেশের মধ্যে বিরোধ নাই। কেননা যাহারা স্বকৃত অপরাধের জন্য শাস্তি প্রাপ্ত হয়, তাহাদের কষ্টভোগের কারণ বিচারকের বিদ্বেষ নহে, তাহাদিগের আপনাদের অন্যায় আচরণই তাহার জন্য দায়ী। বিচারক তাহার যে দণ্ডবিধান করেন, তাহা তাহার স্বকৃত কর্ম্মের ফল। বিচারক যখন শাস্তি বিধান করেন, তখন অপরাধীর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা তাহার কর্ত্তব্য নহে। কিন্তু নরহত্যাকারী যখন মৃত্যুদণ্ড লাভ করে, তখন তাহার মনে করা উচিত যে এই মৃত্যু তাহার কর্ম্মের ফল। যখন সে ইহা বুঝিতে পারিবে, তখন তাহার এই ভাগ্যের জন্য আক্ষেপ না করিয়া সে আনন্দলাভ করিবে।

যুদ্ধে মানুষ তাহার ভ্রাতা মানুষকে হত্যা করে। উহা দুঃখের বিষয় বলিয়া তথাগত শিক্ষা দেন। কিন্তু যুদ্ধ-পরিহারের সকল চেষ্টা বিফল হইলে যাহারা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হন, তথাগত তাহাদিগকে দোষী বলেন না। যাহার দোষে যুদ্ধ বাধে, সেই তাহার জন্য দায়ী।

তথাগত আমিত্বের বর্জ্জন শিক্ষা দেন, কিন্তু অশুভ শক্তির নিকট আত্ম-সমর্পণ শিক্ষা দেন না— সে মানুষই হউক অথবা দেবতাই হউক অথবা প্রাকৃতিক শক্তিই হউক। সকল জীবনই একপ্রকার সংগ্রাম। সুতরাং সংগ্রাম পরিহার করিবার উপায় নাই। কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির জন্য সত্য ও ধর্ম্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যেন না হয়।

যুদ্ধে যিনি জয়লাভ করেন, তিনি যদি সকল বিদ্বেষ মন হইতে দূরীভূত করিয়া, বিজিত শত্রুকে তুলিয়া ধরিয়া বলেন "এস, এখন শান্তি স্থাপিত হোক, আমরা ভাই ভাই হই", তাহা হইলে তাহার জয় স্থায়ী হইবে, তাহার ফল চিরস্থায়ী হইবে।

স্কন্ধ

মানুষের মধ্যে চিরস্থায়ী অবিনশ্বর কোনও আত্মা আছে কি না, তাহার আলোচনা বর্জ্জন করিয়া বুদ্ধ ব্যক্তির জীবনে যাহা প্রকাশিত, তাহার আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যখন কেহ বলে "আমি", তখন সকল "স্কন্ধের" সমষ্টিকে অথবা তাহাদের কোনও একটিকে সে "আমি" মনে করিয়া ভ্রান্তিতে পতিত হয়। স্কন্ধের সংখ্যা পাঁচটি : (১) রূপ, (২) বেদনা, (৩) সংজ্ঞা, (৪) সংস্কার ও (৫) বিজ্ঞান।

ছান্দোগ্য উপনিষদে স্কন্ধশব্দ বিভাগ বুঝাইতে ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত উপনিষদে যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন, এই তিনটি ধর্ম্মস্কন্ধ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে "সমবায়" অর্থে স্কন্ধ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। দৈহিক ও মানসিক সমুৎপাদদিগের মধ্যে অনেকগুলি যখন সংযুক্ত হইয়া আমাদের গোচর হয়, তখন সেই সংহত সমুৎপাদদিগকে স্কন্ধ বলে। মানুষ পঞ্চ স্কন্ধের সমবায়, অন্যান্য বস্তুতে স্কন্ধ সংখ্যা পাঁচ অপেক্ষা কম। মানুষের মন পরস্পর সম্বন্ধ সমুৎপাদদিগের একত্বপ্রাপ্ত সংঘাত।

প্রত্যেক ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের দুইটি উপাদান—নাম ও রূপ। ইহার মানসিক অংশ নাম এবং দৈহিক জড়ীয় অংশ রূপ। দেহ ও মন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। যাহা স্থূল, তাহাই রূপ; যাহা সূক্ষ্ম, তাহা নাম। ইন্দ্রিয়ে প্রকাশিত (রূপায়িত) হয় বলিয়া যাহা স্থূল, তাহা রূপ। নাম ও রূপ পরস্পর সংযুক্ত বলিয়া এক সঙ্গেই উদ্ভূত হয়। ডিমের খোসা ও তাহার শাঁস যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে জন্মে না, নাম ও রূপও তেমনি। নাম না থাকিলে রূপও থাকিত না। সাংখ্য ও অন্যান্য দর্শনের ন্যায় বৌদ্ধ দর্শনেও মন জড়পদার্থ বলিয়া পরিগণিত।

জাগতিক সমুৎপাদদিগকে বৌদ্ধশাস্ত্রে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে—রূপী ও অরূপী। চারি মহাভূত (ক্ষিতি, অপ্, অগ্নি ও মরুৎ) ও তাহাদের হইতে উৎপন্ন যাবতীয় পদার্থ রূপী, এবং আকারবিহীন চিত্তের অবস্থাসকল অরূপী। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান—ইহারাই অরূপী। পঞ্চস্কন্ধের মধ্যে রূপ-স্কন্ধ জড়জগৎ ও তাহার গুণাবলী। বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান মনোজগতের অন্তর্গত। এই সকল শব্দ সর্ব্বত্র একই অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। বেদনার অর্থ সুখদুঃখ ও সুখদুঃখহীন অবস্থার অনুভূতি—মানসিক অনুভবের এক রূপ। বেদনা হইতে তৃষ্ণার উদ্ভব হয়। ইন্দ্রিয় ও মন হইতে উদ্ভূত

প্রতীতি (Perception and Conception) সংজ্ঞা। রূপ, সংজ্ঞা ও বিজ্ঞানের শ্রেণীভুক্ত সু-সম্বন্ধ অবস্থা সংস্কার। বিজ্ঞান অর্থ সংবিদ। বুদ্ধির ক্রিয়ার আরম্ভ হইতে জ্ঞানের উদ্ভব পর্য্যন্ত সকলই সংবিদের অন্তর্গত।

মানুষ পঞ্চ স্কন্ধের সমবায়। স্কন্ধগুলি যেমন মিলিত, তেমনি বিশ্লিষ্টও হয়। মানুষের মধ্যে স্থায়ী অবিনশ্বর কিছু নাই। অথচ তাহার পুনর্জ্জন্ম কিরূপে হয় এবং কাহার পুনর্জ্জন্ম হয়, উহা পরে আলোচিত হইবে।

কর্ম্ম ও জন্মান্তর

প্রতীত্য সমুৎপাদের বর্ণনায় জীবের দুঃখের যে কারণগুলি উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে "কর্ম্মের" উল্লেখ নাই। না থাকিলেও, কর্ম্মবাদ এই মতের একটি রূপ। কর্ম্মবাদ উপনিষদ দর্শনেরও সম্মত। বুদ্ধ উপনিষদের মতই গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মত অনুসারে মানুষের বর্ত্তমান জীবন তাহার অতীত জীবনের ফল, এবং তাহার ভাবী জীবন তাহার বর্ত্তমান জীবনের যাহা ফল, তাহাই হইবে। "মিলিন্দ পন্‌হ" গ্রন্থে নাগসেন বলিয়াছেন, "কর্ম্মের পার্থক্য হেতু সকল মানুষ একপ্রকার হয় না, কেহ হয় স্বল্পজীবী, কেহ হয় দীর্ঘজীবী, কেহ হয় স্বাস্থ্যবান, কেহ হয় স্বাস্থ্যহীন, কেহ হয় সুশ্রী, কেহ হয় কুৎসিৎ, কেহ হয় বলবান, কেহ দুর্ব্বল, কেহ ধনী, কেহ দরিদ্র, কেহ উচ্চ, কেহ নীচ, কেহ জ্ঞানী, কেহ মূর্খ।"

কিন্তু সকল কর্ম্মেরই ফল উৎপন্ন হয় না। যে সকল কর্ম্মের মূলে আসক্তি নাই, রাগ, দ্বেষ ও মোহ নাই, তাহাদের কোনও ফল উৎপন্ন হয় না। তৃষ্ণা-বর্জ্জিত কর্ম্ম নিজে কোনও ফল উৎপাদন করিতে পারে না। তৃষ্ণার যখন নিবৃত্তি হয়, তখন লোকে অর্হৎ হয়। অর্হৎ হইবার পরে যে সকল কর্ম্ম কৃত হয়, তাহারা কোনও ফল উৎপাদন করে না। শুভ অথবা অশুভ কোনও ফলই তাহাদের হয় না। কর্ম্মের প্রবর্ত্তক কামনাদ্বারাই কর্ম্মের ফল উৎপন্ন হয়। কামনার নিবৃত্তি হইলে অজ্ঞান, দ্বেষ ও উপাদানেরও নিবৃত্তি হয়; সুতরাং পুনর্জ্জন্মজনক কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। পূর্ব্বজন্মে কৃতকর্ম্মের ফল-ভোগ করিলেও তৃষ্ণার নিবৃত্তি হেতু অর্হৎ মুক্ত পুরুষ।

কায়িক, বাচিক ও মানসিক ভেদে কর্ম্ম ত্রিবিধ। কর্ম্মের মূল চেতনার (ইচ্ছার) মধ্যে নিহিত। জীবহত্যার উদ্দেশ্যে বনে ঘুরিয়া পশু দৃষ্টিগোচর না হইবার ফলে, যখন কেহ জীবহত্যা করে না, তখন তাহার কর্ম্ম দৈহিক না হইলেও মানসিক। জীবহত্যার আদেশ-প্রদানের পরে কোনও কারণে যদি

সে আদেশ প্রতিপালিত না হয়, তাহা হইলে সেই আদেশ হইবে বাচিক পাপ কর্ম্ম। অসৎ চিন্তা বা ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত না হইলেও, তাহা মানসিক কর্ম্ম। কায়িক ও বাচিক কর্ম্মের মূলে যদি মানসিক কর্ম্ম না থাকে, তাহা হইলে তাহা কর্ম্ম নহে, এবং তাহার ফল উৎপন্ন হয় না। ফলের দিক হইতে দেখিলে কর্ম্ম চতুর্ব্বিধ,—(১) অসৎকর্ম্ম, (২) সৎকর্ম্ম, (৩) অংশতঃ সৎ, অংশতঃ অসৎ কর্ম্ম এবং (৪) যাহা সৎও নহে, অসৎও নহে। অসৎ কর্ম্ম অশুদ্ধিজনক ও সৎকর্ম্ম শুদ্ধিজনক। সদসৎ কর্ম্ম শুদ্ধি ও অশুদ্ধি উভয়ের জনক। যে কর্ম্ম সৎও নহে, অসৎও নহে, তাহা শুদ্ধিজনকও নহে, অশুদ্ধি জনকও নহে। তাহাদ্বারা কর্ম্মের বিনাশ হয়।

দেব, মনুষ্য সকলেই যদি কর্ম্মের অধীন হয়, এবং মানুষের কর্ম্ম যদি তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়, তাহা হইলে স্বাধীন ইচ্ছার কোনও স্থান দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্মের গুণাগুণ-সম্বন্ধে বিচার করিবার প্রয়োজনও থাকে না। মানুষকে তো তাহার পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ফল অনুসারে বাধ্য হইয়াই কর্ম্মের নিয়মানুযায়ী কর্ম্ম করিতে হইবে। তবে আর কোনও কর্ম্ম করি বা না করি, এ চিন্তার প্রয়োজন কি? কর্ম্মের স্বাধীনতা মানুষের আছে কিনা, সে সম্বন্ধে বুদ্ধ স্পষ্ট কিছু বলেন নাই। কিন্তু তাঁহার উপদেশ হইতে কর্ম্মে মানুষের স্বাধীনতা আছে, ইহা যে তিনি বিশ্বাস করিতেন, তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি রাগ-দ্বেষ বর্জ্জন করিতে, অবিদ্যার বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন। মানুষের কর্ম্মের স্বাধীনতাই যদি না থাকে, তবে এ সকল উপদেশের মূল্য কি? সকল কর্ম্মই যদি বাধ্য হইয়া করিতে হয়, তবে "সংবেগ" বা অনুতাপের স্থান কোথায়?

কিন্তু অতীতের সহিত বর্ত্তমানের সম্বন্ধ কি যান্ত্রিক নিয়মে নির্দ্ধারিত? তাহার অন্যথা কি অসম্ভব? বর্ত্তমানই কি অতীতের একমাত্র সম্ভাব্য ফল? বুদ্ধ বলিয়াছিলেন (অংগুত্তর নিকায় ৩।৯৯) "কেহ যদি বলে মানুষে যেমন কর্ম্ম করিবে, তেমন ফল পাইবে, তাহা হইলে ধার্ম্মিক জীবনের সম্ভাবনা থাকে না, এবং দুঃখের ঐকান্তিক নাশের কোনও সুযোগও পাওয়া যায় না। কিন্তু যদি কেহ বলে মানুষ যে পুরস্কার লাভ করে, তাহা তাহার কৃত কর্ম্মের সহিত সামঞ্জস্যযুক্ত, তাহা হইলে ধার্ম্মিক জীবনের সম্ভব হয়, এবং দুঃখের ঐকান্তিক বিনাশের সুযোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়।" যান্ত্রিক নিয়মে কর্ম্মফল উৎপন্ন হয়, এই ভাবে কর্ম্ম-নিয়মের ব্যাখ্যা ধর্ম্ম ও চরিত্র-নীতির বিরোধী। বুদ্ধ সেভাবে ব্যাখ্যা করেন নাই।

উপনিষদের কর্ম্মবাদের সহিত ইচ্ছার স্বাধীনতার বিরোধ নাই, কেননা উপনিষদে মন ও মানসিক অবস্থাসকলের নিম্নে স্বাধীন আত্মার অস্তিত্ব স্বীকৃত। বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে নীরব। সমুৎপাদিক জগতের কার্য্যকারণ নিয়মদ্বারা তিনি বাহ্য ও আন্তর উভয় জগতেরই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। অথচ তিনি যে সকল উপদেশ দিয়াছেন, ইচ্ছার স্বাধীনতা না থাকিলে, তাহারা অর্থহীন হইয়া পড়ে। বুদ্ধ মনের যে বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহাতে সমুৎপাদ ভিন্ন অন্য কিছুই পাওয়া যায় না। সমুৎপাদগণও কার্য্যকারণ শৃঙ্খলে বদ্ধ। সেখানে স্বাধীনতার কোনও স্থানই নাই। কিন্তু মানসিক সমুৎপাদদিগকে একসূত্রে গ্রথিত করিবার জন্য এক আত্মার প্রয়োজন। আত্মাই মানসিক সমুৎপাদদিগের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া তাহাদের একত্ববিধান করেন, এবং তাহাদিগের ঊর্দ্ধে থাকিয়াও সমগ্র মন নিয়ন্ত্রিত করেন। বুদ্ধ জীবাত্মার সম্বন্ধে কিছু না বলিলেও তাঁহার শিক্ষার মধ্যে মানুষের অন্তরে একত্ব বিধায়ক এক তত্ত্ব স্বীকৃত।

বিশ্বে স্থায়ী কিছু নাই। মানব-জীবন পরিবর্ত্তনের সমষ্টি। তাহাতে সমস্ত পরিবর্ত্তনের মধ্যে একপ্রকার একত্ব ও তাহার অনুভূতি বর্ত্তমান। মৃত্যু ও জন্মও পরিবর্ত্তন—যুগযুগান্তস্থায়ী জীবন-প্রবাহের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন। এক জীবন যে সকল কর্ম্মের ফলভোগের জন্য উদ্দিষ্ট, সেই সকল কর্ম্মের ভোগ শেষ হইলে মৃত্যু উপস্থিত হয়, এবং নূতন জন্মে নূতন সুযোগ উপস্থিত হয়। কিন্তু সেই সুযোগের ব্যবহার করিয়া পাপ-পুণ্যের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বাণ লাভ করিবে কে, যদি নির্ব্বাণ ভোগ করিবার জন্য বহু পরিবর্ত্তনের মধ্যে উপস্থিত সুযোগের সৎব্যবহার করিবার কেহ না থাকে ?

আত্মা যে এক জন্মের পর জন্মান্তর গ্রহণ করে, একথা বৌদ্ধধর্ম্মে বলে না। আত্মার অস্তিত্বই তো বুদ্ধ স্বীকার করেন নাই। মানুষের ভৌতিক দেহই তাহার মানসিক দেহের প্রতিষ্ঠা-ভূমি। মৃত্যুতে যখন ভৌতিক দেহ তাহার বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়, তখন তাহাতে প্রতিষ্ঠিত মানসিক জীবনেরও পরিসমাপ্তি হয়। তখন থাকে কি, যাহার পুনর্জন্ম হইবে ? যে মরিয়া গেল, সে পুনর্জীবিত হয় না। যাহার জন্ম হইল, সে ভিন্ন ব্যক্তি। যে মরিয়া গিয়াছে, তাহার চরিত্রই থাকে এবং সেই চরিত্রই নূতন দেহে অধিষ্ঠিত হয়। সে চরিত্র দেহের সহিত বিনষ্ট হয় না। কিন্তু কি প্রকারে দুই জীবনের মধ্যে এই সাতত্য, এই অনবচ্ছিন্নতা রক্ষিত হয়, তাহার ব্যাখ্যা কোথাও নাই। ইহা স্বীকার করিয়া লওয়া হইয়াছে। পর পর সকল জীবন কার্য্যকারণের নিয়ম-

দ্বারা সংযোজিত, ইহা উক্ত হইয়াছে। মুমূর্ষুর সর্বশেষ চিন্তা এক সূক্ষ্ম দেহের সহিত তাহার উপযোগী মাতৃগর্ভে প্রবেশ করে। এই শেষ চিন্তাই মুমূর্ষুর নৈতিক ও মানসিক জীবনের সার ভাগ, এবং যখন মৃত্যু আসে, তখন ইহাই নূতন জীবনের আকাঙ্ক্ষারূপে থাকিয়া যায়। কর্ম্মের স্বকীয় শক্তি হইতে এই আকাঙ্ক্ষার উৎপত্তি হয়; ইহাই উপাদান। ইহার শক্তিবশেই মৃত্যুতে বিচ্ছিন্ন জীবনের অংশসকল নূতন ভাবে সংশ্লিষ্ট হয়। এই "উপাদান' ব্যতীত কর্ম্মের কিছু করিবার সামর্থ্য নাই।

"বিশুদ্ধিমার্গ" গ্রন্থে বুদ্ধঘোষ পুনর্জ্জন্মের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা এই। মৃত্যুকালে ইন্দ্রিয়শক্তি যখন লুপ্ত হয়, যখন বেদনা ও চিন্তাশক্তি হৃদয়ের মধ্যে অন্তিম দশায় উপনীত হয়, তখন কর্ম্ম-সংস্কার কর্তৃক বিজ্ঞানের (Consciousness) অস্তিত্ব রক্ষিত হয়। জীবিতকালে বহুবার অনুষ্ঠিত অভ্যস্ত গুরুতর কর্ম্মের সংস্কার অথবা ঐ সকল কর্ম্মের প্রতিবিম্ব অথবা আরভমান নূতন জীবনের প্রতিবিম্ব তখন উপস্থিত হয়। ইহাই তখন বিজ্ঞানের বিষয় হয়। তখনও অবিদ্যা ও কামনার অস্তিত্ব থাকে বলিয়া বিজ্ঞান তাহার বিষয়ের প্রতি লোলুপ হয়, এবং উপস্থিত কর্ম্মকর্তৃক তাহার দিকে চালিত হয়। বিজ্ঞান যখন তাহার আশ্রয়স্থান দেহ ত্যাগ করে, তখন তাহার অবলম্বন হয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় প্রভৃতি। তখন কর্ম্মসৃষ্ট অন্য দেহ আশ্রয় করিতে পারে, নাও পারে। পূর্ব্ব বিজ্ঞানের তখন বিলোপ হয়; নূতন বিজ্ঞানের জন্ম হয়। ইহাই পুনর্জ্জন্ম। কিন্তু এই শেষোক্ত বিজ্ঞান পূর্ব্ববর্ত্তী বিজ্ঞান হইতে উদ্ভূত নহে। পূর্ব্ববর্ত্তী জীবনে ইহার কারণ কর্ম্ম অথবা সংস্কাররূপে বর্ত্তমান ছিল। তাহা হইতেই ইহার উদ্ভব।

উপরিউক্ত বর্ণনা হইতে প্রতীত হয়, জীবের মৃত্যুর পরে পূর্ব্বজন্মের কর্ম্মই কেবল অবশিষ্ট থাকে। কিন্তু কোথাও কোথাও বিজ্ঞান অবশিষ্ট থাকে ইহাও উক্ত হইয়াছে। নির্ব্বাণে কর্ম্ম ও বিজ্ঞান উভয়েরই বিলোপ হয়, ব্যক্তিগত জীবনের তখন অবসান হয়।*

কিন্তু আত্মার অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহা হইলে পুনর্জ্জন্ম অর্থহীন। পূর্ব্বজন্মে যে কর্ম্ম করিয়াছে, পরজন্মে তাহার অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহা হইলে সেই কর্ম্মের পুরস্কার বা শাস্তির কোনও অর্থই হয় না। যে পাপ বা পুণ্য করিয়াছে, সে যদি না থাকে, তাহা হইলে সেই পাপপুণ্যের ফল পরজন্মে অন্যে ভোগ করে বলিতে হয়।

* ডাঃ রাধাকৃষ্ণের Indian Philosophy Vol-I P P 444-45

বৌদ্ধ ধ্যান ও যোগ

নির্ব্বাণ স্বীয় চেষ্টাদ্বারা লভ্য। ইহা কেহ কাহাকেও দিতে পারে না। তাহার জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে বুদ্ধ বলেন নাই। আপনাকে জয় করিতে পারিলে যে শক্তিলাভ হয়, তাহার বিরুদ্ধে কেহই দাঁড়াইতে পারে না।

পাতঞ্জল যৌগিক প্রক্রিয়ার ন্যায় বৌদ্ধ ধ্যান প্রক্রিয়াও মনঃসংযমের সৌকর্য্যের জন্য কল্পিত। বাহ্যবিষয় হইতে মনকে বিযুক্ত করিবার চেষ্টা উভয় পদ্ধতিতেই আছে। উভয় যোগেই মনকে স্থির করিয়া তাহা হইতে তাহার সকল আধেয় বহিষ্কৃত করিবার চেষ্টা আছে। দেহসংযম মনঃসংযমের সহায়ক। তাহার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের গতির উপর মনঃসংযমও বৌদ্ধ ধ্যানে বিহিত হইয়াছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি-নিয়ন্ত্রণের জন্য সংখ্যা-গণনার ব্যবস্থাও আছে।

বৌদ্ধ ধ্যানের শেষ অবস্থায় সাধক যাহা প্রাপ্ত হন, তাহার স্বরূপ কি? সুখ, দুঃখ, কামনা, সংবেদন ইচ্ছা সকলই মন হইতে বিদূরিত করিয়া সাধক শূন্য আকাশের ধ্যান করেন, এবং পরিশেষে এমন অবস্থায় উপনীত হন, যাহাতে চৈতন্যও নাই, অচৈতন্যও নাই। এই অবস্থায় মনের সমস্ত ক্রিয়াই রুদ্ধ হয়। ইহা মানুষের স্বাভাবিক অবস্থা হইতে উন্নততর অবস্থা বলিয়া গণ্য, কিন্তু সে অবস্থার সহিত আমাদের পরিচয় নাই। হয়তো তখন সসীম ব্যবহারিক আত্মার স্থানে সার্ব্বিক আত্মা প্রকাশিত হন। কিন্তু বুদ্ধ সার্ব্বিক আত্মার কথা বলেন নাই। উপনিষদে ব্রহ্মের সহিত যুক্ত হইবার কথা আছে। পাতঞ্জল দর্শনে অসম্প্রজ্ঞাত যোগে কৈবল্য-প্রাপ্তির কথা আছে। তখন পুরুষ অনন্ত জ্ঞান প্রাপ্ত হয়। কিন্তু বৌদ্ধনির্ব্বাণে জ্ঞানলাভের কথা নাই। পাতঞ্জল দর্শনে যোগবলে অলৌকিক শক্তিলাভের উপায় বর্ণিত আছে। কিন্তু বুদ্ধ অলৌকিক শক্তিপ্রদর্শন নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন জ্ঞান ও সুকৃতি ব্যতিরেকে এতাদৃশ শক্তিলাভ করা যায় না। অলৌকিক শক্তি-লাভ-দ্বারা আধ্যাত্মিক উন্নতি-লাভ হয় না।

দশবিধ শৃঙ্খলে মানুষ পৃথিবীর সহিত বদ্ধ। অষ্টাঙ্গমার্গের অনুসরণে এই শৃঙ্খল ভগ্ন হয় এবং মানুষ বন্ধন-মুক্ত হয়। প্রথম শৃঙ্খল সৎকায়দৃষ্টি অর্থাৎ অহংভাবযুক্ত আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস। এই বিশ্বাস ভ্রান্ত। এই বিশ্বাসই স্বার্থপরতার জনক। স্থির আত্মা বলিয়া কিছু নাই, আছে কেবল পাঁচ স্কন্ধের সমবায়। আত্মায় বিশ্বাস হইতে ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তির ইচ্ছার উদ্ভব হইতে পারে। যাহাতে তাহা না হয়, সে বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজনীয়। দ্বিতীয় শৃঙ্খল বিচিকিৎসা বা সংশয়। ইহা হইতে আলস্য এবং দুর্নীতির

উদ্ভব হয়। প্রায়শ্চিত্ত এবং অন্তবিধ অনুষ্ঠানদ্বারা সংগতি লাভ হয়, এ বিশ্বাসও বর্জনীয়। আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস এবং বুদ্ধ ও তাঁহার উপদেশ সম্বন্ধে সংশয় হইতে মুক্ত হইয়া সাধক অষ্টাঙ্গমার্গের প্রথম ক্রম উত্তীর্ণ হন। তখন তাহাকে "স্রোতাপন্ন" বলে। ধর্ম্মপদ বলেন "এই প্রথম সোপান পৃথিবীর আধিপত্য, স্বর্গবাস এবং সর্ব্বলোকের আধিপত্য হইতে অধিকতর শ্রেয়স্কর।" তৃতীয় শৃঙ্খল কাম এবং চতুর্থ শৃঙ্খল প্রতিঘ (পরের অনিষ্ট চিন্তা)। এই দুই শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া সাধক "সকৃৎ-আগামী" হন এবং অষ্টাঙ্গমার্গের দ্বিতীয় ক্রম উত্তীর্ণ হন। তাহার আর একবার মাত্র পৃথিবীতে আসিতে হয়। তাহার পরেই মুক্তি। কাম ও প্রতিঘ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেও তখনও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় নাই। তাহাদের সম্পূর্ণ বিনাশ হইলে সাধক তৃতীয় ক্রম উত্তীর্ণ হন এবং "অনাগামী" হন। তাঁহাকে আর পৃথিবীতে আসিতে হয় না। রাগ (আসক্তি), মান (অভিমান), ঔদ্ধত্য (আত্মম্ভরিতা) এবং জগতের স্বরূপ-সম্বন্ধে অজ্ঞতা জয় করিতে অবশিষ্ট থাকে। এই চতুর্থ শৃঙ্খল ভগ্ন করিয়া সাধক অর্হৎ হন এবং নির্ব্বাণের শক্তিলাভ করেন। তাহার পুনর্জন্ম হয় না। অর্হত্বের ফল "উপাধিশেষ নির্ব্বাণ"। যখন তিনি দেহত্যাগ করেন, তখন তিনি পরিনির্ব্বাণ (অনুপাধিশেষ নির্ব্বাণ) লাভ করেন, তাঁহার অস্তিত্বের শেষ হয় (কোনও কোনও মতে)।

সন্ন্যাস ও কর্ম্ম

বুদ্ধের ধর্ম্ম সন্ন্যাস-মূলক। সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সম্পূর্ণ ভাবে ন্যাস বা ত্যাগ। বুদ্ধ কি মানুষের মধ্যে যাহা কিছু আছে সকলই ত্যাগ করিতে বলিয়াছেন? মানুষের মধ্যে আছে বুদ্ধি, বেদনা (feeling) ও ইচ্ছা (will)। বুদ্ধ জ্ঞান অর্জন করিতেই বলিয়াছেন, কিন্তু ধ্যানে সুখ-দুঃখ অতিক্রম করিবারও উপদেশ দিয়াছেন, এবং ইচ্ছার মূলে যে কামনা তাহাও বর্জন করিতে বলিয়াছেন। তাঁহার নির্ব্বাণের স্বরূপ যাহাই হউক না কেন, সংসারে তিনি কর্ম্মত্যাগের উপদেশ করেন নাই এবং ইচ্ছার বিনাশ চাহেন নাই। তিনি তৃষ্ণার সহিত, পাপের সহিত সংগ্রামের উপদেশ করিয়াছেন। ইচ্ছা ব্যতীত এই সংগ্রাম সম্ভবপর হয় না। সুখ-দুঃখ জয় করিয়া সমতার উপদেশ করিলেও, তিনি সকল চিত্তাবেগের (emotion) ধ্বংস চাহেন নাই। মিসেস্ রাইস্ ডেভিড্স্ লিখিয়াছেন "বুদ্ধের সমালোচক যদি বৌদ্ধনীতির ভাবাত্মক-ফলের দিকে দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে সাহিত্যে

ও শিল্পে অঙ্কিত বৌদ্ধ অর্হতের বাহ্য মুখাকৃতির নিম্নে চিত্তাবেগ (emotion) এবং ইচ্ছার প্রাবল্য, গভীর বিশ্বাস এবং উচ্ছ্বিত আশা চতুর্দিকে প্রসারিত দেখিতে পাইবেন। কেন না এমন কোনও মত নাই (প্লেটোর মতও নহে) যাহা মানবজীবনে—বর্ত্তমান জীবনে—পূর্ণতার অধিকতর সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াছে; এমন কোনও প্রস্থানও (system) নাই (খৃষ্টীয় প্রস্থানও নহে) যাহা মানবীয় প্রেমের নিম্নতর রূপ হইতে তাহার উন্নততর অভিব্যক্তির দর্শন পাইয়াছে।" বুদ্ধ সর্ব্বজীবের প্রতি করুণা ও প্রেমের উদ্বোধন করিতে চাহিয়াছেন। সমগ্র বিশ্ব প্রেম ও কারুণ্যপূর্ণ চিন্তাদ্বারা পূর্ণ করিতে চাহিয়াছেন। তাঁহার জীবের প্রতি করুণার প্রমাণ জাতক গল্পসকলের মধ্যে নিহিত আছে।

বুদ্ধ সকল কামনার বিলোপ চাহেন নাই, শুভ কামনার বিনাশ চাহেন নাই। তিনি বলিয়াছেন "আমি বৈরাগ্য প্রচার করি, তাহার কারণ অন্তরের যে সকল অবস্থা অমঙ্গলকর, আমি তাহাদের পুড়াইয়া ফেলিতে চাই। যিনি তাহা করেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। (মহাপরিনির্ব্বাণ সূত্র—৭)

তিনি শরীরের প্রতি আসক্তিই নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু শরীরের যত্ন নিষেধ করেন নাই। "তোমরা কখনও কি যুদ্ধে বাণবিদ্ধ হইয়াছ?" "আমি হইয়াছি"। "তোমার ক্ষতে কি মলম দেওয়া হইয়াছিল এবং কাপড় দিয়া বাঁধা হইয়াছিল?" "হাঁ হইয়াছিল।" "তোমার ক্ষতের প্রতি কি তোমার অনুরাগ ছিল?" "না।" ঠিক ঐরূপই শ্রমণগণ তাহাদের দেহ ভালবাসেন না। দেহে আসক্ত না হইয়া, তাঁহারা দেহের যত্ন করেন ধর্ম্ম-সাধনের সৌকর্য্যের জন্য।" বুদ্ধ ভিক্ষুদিগের পক্ষেও উপযুক্ত বসন, পথ্য এবং রোগের চিকিৎসার উপদেশ করিয়াছেন, কিন্তু অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতার অনুমোদন করেন নাই।

বুদ্ধের পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে সন্ন্যাসীর অভাব ছিল না। বুদ্ধ যে সন্ন্যাস-সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন, প্রথমে তাহাতে স্ত্রীলোকদিগকে গ্রহণ করা হয় নাই। স্ত্রীলোকের সন্মুখে কিরূপ আচরণ করিতে হইবে জিজ্ঞাসিত হইয়া বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, "তাহার দিকে চাহিও না। যদি তাহা সম্ভবপর না হয়, তাহার সহিত কথা বলিও না। তাহাও যদি সম্ভবপর না হয়, তাহা হইলে দূরে থাকিও।" তাঁহার বিমাতা বিধবা হইবার পরে ৫০০ রাজ-মহিষীদিগের সহিত তাঁহার নিকট গিয়া দীক্ষা প্রার্থনা করেন। কিন্তু বুদ্ধ দীক্ষা দিতে সম্মত হন না। তিন বার তিনি তাঁহাদের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করেন।

তাঁহারা চতুর্থ বার সমাগত হইলে আনন্দ বলেন, "বুদ্ধগণ কি কেবল পুরুষদিগের উদ্ধারের জন্য পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন?" ইহার পরে নারীগণ সংঘে প্রবেশ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন। বৌদ্ধ সংঘে গৃহী ও সন্ন্যাসী উভয়ই আছে।

বর্ণভেদ

বৌদ্ধ সংঘে জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলেই প্রবেশ করিতে পারে। বুদ্ধের সময়ে জাতিভেদ জন্মগত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু বুদ্ধ বলিয়াছেন, "যে ব্রাহ্মণ পাপ এবং অপবিত্রতা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, যাহার ঔদ্ধত্য নাই, যিনি আত্মসংযত, জ্ঞানের পারদর্শী, যিনি পবিত্রতা-সাধক সকল কর্তব্য পালন করিয়াছেন, তাহারই আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিবার ন্যায়সংগত অধিকার আছে। যে ক্রোধ দমন করিতে অক্ষম, যাহার অন্তরে অপরের প্রতি ঘৃণা বর্তমান, যে অসাধু, ভণ্ড, প্রতারণাশীল এবং ভ্রান্ত মতে বিশ্বাসী, সে শূদ্র। জীবের প্রতি যাহার দয়া নাই, সেও শূদ্র। জন্মদ্বারা কেহ ব্রাহ্মণ হয় না, পতিতও হয় না; কর্মদ্বারাই কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ শূদ্র হয়।"

বুদ্ধ বর্ণ-ভেদের বিলোপ-সাধন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, ইহা বলা যায় না। পুণ্যের ফলে ব্রাহ্মণ-বংশে জন্ম হয়, তিনি বলিয়াছেন। অশিক্ষিত লোকের পক্ষে তাঁহার ধর্ম বোঝা সম্ভবপর ছিল না। তাঁহার উপদেশ বহু স্থলেই ব্রাহ্মণ ও শ্রমণদিগকে লক্ষ্য করিয়াই প্রদত্ত হইয়াছিল। তিনি ধর্মে বিপ্লব আনিয়াছিলেন, কিন্তু সামাজিক বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছিলেন, বলা যায় না। হরণলে (Hoernle) বলিয়াছেন "একটা ধারণা আছে যে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম সমাজের সংস্কার করিতে চাহিয়াছিল এবং জাতিভেদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিল। এই ধারণা ভুল। তাহারা ব্রাহ্মণ সন্ন্যাসীদিগের বর্ণভেদের উপর প্রতিষ্ঠিত বর্জন-নীতির প্রতিবাদ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাদের গণ্ডীর বাহিরে বর্তমান বর্ণভেদ তাহারা স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। তাহাদের সম্প্রদায়ের দ্বার যদিও সকলের পক্ষেই উন্মুক্ত ছিল, তথাপি প্রথমে উচ্চ বর্ণের লোকদিগকেই তাহার মধ্যে গ্রহণ করা হইত। ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয়, যে যদিও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের গৃহস্থ সভ্যগণ ধর্মবিষয়ে তাহাদের নিয়ম পালনে বাধ্য ছিলেন, তথাপি জাতকর্ম, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ পুরোহিতদিগেরই ডাক পড়িত।" ওলডেন বার্গ লিখিয়াছেন "উৎপীড়কের বিরুদ্ধে উৎপীড়িতের সমর্থকরূপে দাঁড়াইবার জন্য যে উৎসাহের প্রয়োজন,

বুদ্ধের মনে তাহার স্থান ছিল না। রাষ্ট্র ও সমাজের অবস্থা যাহা আছে, সেইরূপই থাকুক। যিনি ধর্ম্মসাধনার জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার সহিত রাষ্ট্র ও সমাজের কোনও সম্পর্কই নাই। তাঁহার নিকট বর্ণভেদের কোনও মূল্যই নাই। কেন না পার্থিব সমস্ত ব্যাপারের সঙ্গে তিনি সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়াছেন। বর্ণভেদের বিলোপ অথবা সাংসারিক লোকদিগের প্রতি তাহার কঠোরতার হ্রাস করিবার জন্য চেষ্টার কথা তাঁহার মনেও হয় নাই।"

বেদনিন্দা

বুদ্ধ বেদের নিন্দা করিয়াছিলেন সত্য, কিন্তু এই নিন্দা মুখ্যতঃ যজ্ঞে পশুবলি-প্রথার।

উপনিষদ্ ও বৌদ্ধধর্ম্ম

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যাবতীয় বস্তুই যে অস্থায়ী ও বিনশ্বর এ বিষয়ে বৌদ্ধধর্ম্ম উপনিষদের সহিত একমত। কিন্তু উপনিষদ যাবতীয় জাগতিক সমুৎপাদের তলদেশে এক অপরিণামী সত্তার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। মনোজগতেও উপনিষদের মতে মানসিক সমুৎপাদের নিম্নে অবিনাশী আত্মা বর্ত্তমান। কিন্তু বুদ্ধ বাহ্য ও আন্তর জগতে কোনও অপরিণামী সত্তা স্বীকার করেন নাই। উপনিষৎ বলিয়াছেন "যো বৈ ভূমা, তৎ সুখং। যো বৈ ভূমা, তৎ অমৃতং। যৎ অল্পং, তৎ মর্ত্ত্যং।" ভূমা সর্ব্বময়—অসীম। আত্মাই ভূমা। বুদ্ধ স্থির আত্মার কথা বলেন নাই। বুদ্ধত্বলাভের পূর্ব্বে বুদ্ধ আলারা কালম নামে এক যোগীর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। আলারা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "আত্মা যখন আপনার উচ্ছেদ সাধন করে, তখন দেখিতে পায়, কিছুরই অস্তিত্ব নাই। তখন তাহাকে উচ্ছেদবাদী বলে। তার পরে পিঞ্জর হইতে মুক্ত পক্ষীর ন্যায় দেহ-বিমুক্ত আত্মাকে মুক্ত বলা হয়। তখন তিনি পরম ব্রহ্ম, অবিকারী, শাশ্বত এবং লিঙ্গহীন। যাঁহারা সৎকে জানেন, তাঁহারা এই অবস্থাকেই মুক্তি বলেন।" বুদ্ধ গুরুর এই মত গ্রহণ করেন নাই। তাহার কারণ এই মুক্ত আত্মা তখনও আত্মা। যে অবস্থাই প্রাপ্ত হউন না কেন, তিনি পুনর্জ্জন্মের অধীন। সর্ব্বত্যাগ (সর্ব্ব বন্ধনমুক্তি) ভিন্ন আমাদের পুরুষার্থ সম্পূর্ণরূপে অধিগত হয় না। কিন্তু উপনিষৎ যে আত্মার কথা বলিয়াছেন, তিনি জন্মমৃত্যুহীন। বুদ্ধ জন্মমৃত্যুহীন শাশ্বত পরমাত্মার অস্তিত্ব

কোথাও স্বীকার করেন নাই। তিনি বলিয়াছেন, দেহ শাশ্বত আত্মা নহে, কেননা দেহ ভঙ্গুর। আমাদের রূপ, বেদনা (feeling), সংজ্ঞা, সংস্কার, বুদ্ধি, ইহারা শাশ্বত আত্মা নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সংবিদ নশ্বর হইত না। যাহা ক্ষণস্থায়ী, অশুভ এবং পরিণামী, তাহা শাশ্বত আত্মা নহে। সুতরাং বলিতে হইবে যে "ভূত, বর্ত্তমান বা ভাবী, দূরবর্ত্তী অথবা সমীপস্থ, উচ্চ অথবা নীচ, বাহ্য অথবা আন্তর কোনও রূপই আমার নহে, অথবা "আমি" নহে; তাহা আমার শাশ্বত আত্মা নহে।" (১) কিন্তু ইহারা আত্মা না হইলেও শাশ্বত আত্মার অস্তিত্ব যে আছে, বুদ্ধ তাহাও বলেন নাই। "অজ্ঞ, অদীক্ষিত লোকে আত্মাকে দৈহিক রূপ বলিয়া মনে করে, অথবা দৈহিক রূপবান্ কোনও বস্তু মনে করে; অথবা দৈহিক রূপকে আত্মার মধ্যে অবস্থিত মনে করে, অথবা আত্মাকে দৈহিক রূপের মধ্যে অবস্থিত মনে করে। অথবা আত্মাকে বেদনা অথবা বেদনাযুক্ত বস্তু মনে করে; অথবা বেদনাকে আত্মার মধ্যস্থিত অথবা আত্মাকে বেদনার মধ্যস্থিত মনে করে।" (২) কিন্তু কোনও আত্মা অথবা পুদ্গল (পুরুষ) অথবা সত্ত্ব অথবা জীব চিরস্থায়ী নহে। মানুষের মধ্যে এরূপ অপরিণামী শাশ্বত তত্ত্বের আমরা সাক্ষাৎ পাই না। যাহা দেখিতে পাই, তাহা কার্য্য-কারণ-শৃঙ্খল মাত্র।

একদিন বচ্ছগোত্ত নামক শ্রমণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "জীবাত্মার অস্তিত্ব আছে কিনা।" তথাগত প্রশ্ন শুনিলেন, কিন্তু কোনও উত্তর দিলেন না। তার পরে বচ্ছগোত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, জীবাত্মার অস্তিত্ব কি তবে নাই (৩)? এবারও তথাগত কোনও উত্তর দিলেন না। বচ্ছগোত্ত উঠিয়া চলিয়া গেলেন। তখন আনন্দ বলিলেন "শ্রমণের প্রশ্নের উত্তর দিলেন না তথাগত, ইহার কারণ কি?" বুদ্ধ কহিলেন "আমি যদি বলিতাম জীবাত্মার অস্তিত্ব আছে, তাহা হইলে যে সকল শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস করে, তাহাদের মতের সমর্থন করা হইত। আমি যদি বলিতাম জীবাত্মার অস্তিত্ব নাই, তাহা হইলে যে সকল ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ উচ্ছেদবাদী, তাহাদের মতের সমর্থন করা হইত।" ইহা হইতে বোধ হয় বুদ্ধ "আত্মার অস্তিত্ব নাই" ইহা বলিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অথচ "আত্মার অস্তিত্ব আছে" ইহাও বলিতেন না। ইহার কারণ কি? আত্মা বলিয়া কিছুর অস্তিত্ব যদি না থাকে, তাহা হইলে নির্ব্বাণের অর্থ তো হয় ঐকান্তিক বিনাশ। কিন্তু বুদ্ধ তাহাও স্বীকার করেন নাই। তা

(১) মহাবগ্‌গ [illegible] (২) [illegible] (৩) সংযুক্ত নিকায় [illegible]

রাধাকৃষ্ণণের মতে আমাদের প্রত্যক্ষ আত্মার (Empirical Self) অতীত যে কিছু আছে, বুদ্ধ তাহা স্বীকার করিতেন। বুদ্ধ আত্মাকে পঞ্চ স্কন্ধের সহিত অভিন্ন বলেন নাই, তাহাদিগের হইতে সম্পূর্ণ ভিন্নও বলেন নাই। তাঁহার মতে আত্মা দেহ ও মনের সমবায়মাত্র নহে, অপরিণামী শাশ্বত পদার্থও নহে। বুদ্ধ ভারবাহী পুদ্‌গল (পুরুষ) এবং তাহার ভার (পঞ্চ স্কন্ধ) ভিন্ন বলিয়াছেন। ইহাও বলিয়াছেন "যে বলে আত্মার অস্তিত্ব নাই, সে ভ্রান্ত।"

বুদ্ধ আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেন কি না, সে সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ আছে। "প্রজ্ঞাপারমিতার" ভাষ্যে নাগার্জুন লিখিয়াছেন, তথাগত কখনও কখনও বলিয়াছেন আত্মার অস্তিত্ব আছে। কখনও কখনও বলিয়াছেন "নাই"। যখন বলিয়াছেন আত্মা আছে এবং জীব তাহার কর্ম্মের ফল দুঃখ অথবা সুখ ভোগ করে, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য উচ্ছেদবাদরূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ মত হইতে মানুষকে রক্ষা করা। যখন বলিয়াছেন, পঞ্চ স্কন্ধের সমবায়ের অতিরিক্ত এমন কোনও আত্মা নাই, যাহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা বলে, অথবা যিনি বস্তুজাত প্রত্যক্ষ করেন, অথবা যিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন, তখন তাঁহার উদ্দেশ্য শাশ্বতবাদরূপ বিপরীত ধর্ম্মবিরুদ্ধ মত হইতে মানুষকে রক্ষা করা। এখন এই দুই মতের মধ্যে কোন্‌টি সত্য ? নিশ্চয়ই আত্মার অস্তিত্ব-অস্বীকৃতিই সত্য। এই মত বুঝিতে পারা খুব কঠিন। যাহাদের বুদ্ধি স্থূল, যাহাদের অন্তরে কল্যাণের বীজ অঙ্কুরিত হয় নাই, তাহাদের জন্য বুদ্ধের এই উপদেশ উদ্দিষ্ট নহে। কেননা তাহারা এই অনাত্মবাদ শুনিয়া নিশ্চয়ই উচ্ছেদবাদ-রূপ ধর্ম্মবিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিবে। ভিন্ন ভিন্ন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য বুদ্ধ এই দুই মত প্রকাশ করিয়াছেন। প্রচলিত মত যখন তিনি শ্রোতাদিগকে জানাইতে চাহিয়াছেন, তখন তিনি আত্মার অস্তিত্ব আছে, বলিয়াছেন। আবার যখন অতীন্দ্রিয় বিষয়ের শিক্ষা দিতে চাহিয়াছেন, তখন তিনি আত্মা নাই, বলিয়াছেন।

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ্‌ বলেন, বুদ্ধ যে আত্মা-সম্বন্ধে প্রশ্নের সময় নিরুত্তর থাকিতেন, তাহার কারণ এই যে প্রত্যক্ষ (অহং ভাবযুক্ত) আত্মাকে "জাহির" করিবার জন্য প্রবল স্বাভাবিক প্রেরণা যাবতীয় আধ্যাত্মিক অমঙ্গলের মূল, ইহা তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। এই জন্য তিনি ব্যক্তিগত আত্মা অস্বীকার করিতেন। আত্মা-সম্বন্ধে ভ্রান্ত যে সকল ধারণা আছে, তিনি দৃঢ়ভাবে তাহাদের প্রতিবাদ করিয়াছেন। যে সকল বস্তুর সহিত আমরা আমাদিগকে অভিন্ন বলিয়া মনে করি, সে সকল বস্তু আত্মা নহে। "এইটি জগৎ আর এইটি আত্মা ;

আমি ভবিষ্যতেও থাকিব; চিরস্থায়ী অপরিণামী শাশ্বত এবং সর্ব্বপরিবর্ত্তন-বিহীন থাকিব; অনন্তকাল থাকিব" ইহা নিতান্ত মূর্খদিগের মত। বুদ্ধ প্রতিবাদ করিয়াছেন সেই মতের যাহা, ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র আত্মার (Small self) চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস করে। যখন দুইটি ক্ষণও আমরা অপরিবর্ত্তিত থাকি না, তখন কোন্ আত্মার চিরস্থায়িত্ব আমরা কামনা করিব? প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে এক আত্মার অস্তিত্বে বুদ্ধ বিশ্বাস করিতেন না, দৃশ্যমান গুণের আধার-স্বরূপ কোনও দ্রব্যের অস্তিত্বও তিনি অস্বীকার করিয়াছেন। কেননা এইরূপ কোনও দ্রব্যের স্বরূপ আমরা অবগত নহি। আত্মা কি নহে, তাহা বুদ্ধ স্পষ্টই বলিয়াছেন। কিন্তু তাহা কি, তাহার স্পষ্ট বিবরণ দেন নাই। কিন্তু বুদ্ধের মতে আত্মার অস্তিত্ব নাই, ইহা মনে করা ভুল।

বৌদ্ধধর্ম্মের নিরীশ্বরতা

বুদ্ধ দেবদেবীর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন নাই, কিন্তু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। অশ্বঘোষ-রচিত বুদ্ধ চরিতে যে যে কারণে বুদ্ধ ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই, তাহা বর্ণিত আছে। অনাথপিণ্ডিককে বুদ্ধ বলিতেছেন "জগৎ যদি ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট হইত, তাহা হইলে জগতে কোনও পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হইত না, কিছুর বিনাশও থাকিত না; দুঃখ ও বিপদ্ থাকিত না, ন্যায় ও অন্যায় থাকিত না, কেননা শুদ্ধই হউক আর অশুদ্ধই হউক, সকলের উৎপত্তি-স্থলই তিনি। দুঃখ ও সুখ, রাগ ও দ্বেষ, যাহা সকল জীবের অন্তরেই উদ্ভূত হয়, তাহা যদি ঈশ্বরকৃত হয়, তাহা হইলে তিনিও সুখ-দুঃখ ও রাগ দ্বেষের অতীত নহেন। তাঁহাতে যদি সুখ-দুঃখ ও রাগদ্বেষ থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে পূর্ণ ও অনবদ্য বলা যায় না। ঈশ্বর যদি সৃষ্টিকর্ত্তা হন, এবং স্রষ্টার শক্তির সম্মুখে সকলকে বিনা প্রতিবাদে নত হইতে হয়, তাহা হইলে ধর্ম্মসাধনার প্রয়োজন কি? দুঃখ ও কষ্ট যদি অন্য কাহারও সৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরকে সর্ব্বস্রষ্টা বলা যায় না। ঈশ্বর সৃষ্টি করেন নাই, এমন কোনও বস্তু যদি থাকিতে পারে, তাহা হইলে যাহা কিছুর অস্তিত্ব আছে, সে সকলের কাহারও কোনও কারণই নাই, তাহারা অকারণ-সম্ভূত, ইহা বলিতে বাধা কি? ঈশ্বর যদি স্রষ্টা হন, তাহা হইলে তাঁহার সৃষ্টির নিশ্চয়ই কোনও উদ্দেশ্য আছে। তাহা যদি থাকে, তাহা হইলে তাঁহার নিশ্চয়ই অভাব আছে, এবং তিনি পূর্ণ নহেন। আর উদ্দেশ্য যদি না থাকে, তাহা হইলে তাঁহাকে হয় উন্মাদ অথবা স্তন্যপায়ী শিশু বলিতে হইবে।...ঈশ্বরের যদি

স্রষ্টা না থকে, তাহা হইলে লোকে একাধিক দেবতার উপাসনা করে কেন ?” জগৎ যদি সৃষ্ট না হইয়াও থাকে, তাহা হইলেও সমস্ত ব্যক্ত জগতের পশ্চাতে এক অসঙ্গ, কারণহীন অজ্ঞেয় সত্তা বর্ত্তমান, জগৎ তাহারই প্রকাশ, ইহা বলা যায় কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে, বুদ্ধ বলিয়াছিলেন অসঙ্গ বলিতে যদি যাবতীয় জ্ঞাত পদার্থের সহিত সম্বন্ধহীন বস্তু বুঝায়, তাহা হইলে এরূপ বস্তুর অস্তিত্ব “হেতু বিদ্যা শাস্ত্র” দ্বারা প্রমাণ করা যায় না। অন্যান্য বস্তুর সহিত অসম্বদ্ধ কোনও বস্তু যে আছে, তাহা জানিব কিরূপে ? আমাদের জ্ঞাত সমগ্র বিশ্ব বিবিধ বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধরূপে ব্যবস্থিত,এমন কিছুরই জ্ঞান আমাদের নাই, যাহা কিছুর সহিত সম্বদ্ধ নহে। যাহারা কিছুর উপর নির্ভর করে না এবং কিছুর সহিত যাহাদের সম্বন্ধ নাই, তাহারা কিরূপে অস্তিত্বের জন্য পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং পরস্পরের সহিত সম্বদ্ধ বস্তু সৃষ্টি করিতে পারে ? আবার অসঙ্গ হয় একটিমাত্র অথবা বহু। যদি একটিমাত্র হয়, তাহা হইলে তাহা কিরূপে বিভিন্ন কারণ হইতে উৎপন্ন বিভিন্ন বস্তুর কারণ হইতে পারে ? যদি বহু হয়, যত বস্তু আছে, যদি তত অসঙ্গ থাকে, তাহা হইলে এই সকল বস্তুর মধ্যে সম্বন্ধের সৃষ্টি হয় কিরূপে ? অসঙ্গ যদি সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হয় এবং সর্ব্বদেশ পূর্ণ করিয়া অবস্থিত হয়, তাহা হইলে তাহা তাহাদের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতে পারেনা, কেননা তাহা হইলে সৃষ্টি করিবারই তো কিছু থাকে না। অসঙ্গ যদি নির্গুণ হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে উদ্‌ভূত যাবতীয় বস্তুও নির্গুণ হওয়া উচিত। কিন্তু জগতের সকল বস্তুই গুণাবচ্ছিন্ন। সুতরাং অসঙ্গ তাহাদের কারণ হইতে পারে না। অসঙ্গ যদি গুণ হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে অনবরত গুণবৎ বস্তুর সৃষ্টি করিয়া কিরূপে তাহাদের মধ্যে আপনাকে প্রকাশিত করে ? অসঙ্গ যদি অপরিণামী হয়, তাহা হইলে সকল বস্তুই অপরিণামী হওয়া উচিত, কেননা কার্য্য স্বরূপে কারণ হইতে ভিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু জাগতিক যাবতীয় বস্তুই পরিণামী ও নশ্বর। আবার সর্ব্ব বস্তুর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট অসঙ্গই যদি সর্ব্ব বস্তুর কারণ হয়, তাহা হইলে তাহা তো আমাদের অধিগত হইয়াই আছে, এবং তাহা হইতে উৎপন্ন সকল দুঃখ-কষ্ট আমাদের ধৈর্য্যের সঙ্গে সহ্য করাই কর্ত্তব্য। দুঃখকষ্ট হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা কেন করিব ?

আত্মা

বিশ্ব দুই ভাগে বিভক্ত—বৃহৎ জগৎ (macrocosm) ও ক্ষুদ্র জগৎ (microcosm)। বহির্বিশ্বই বৃহৎ জগৎ এবং মানুষই ক্ষুদ্রজগৎ। অনন্ত

বহির্বিশ্ব উপনিষদের মতে বিরাট ব্রহ্মের প্রকাশিত রূপ। মানুষের অন্তরে হৃদয়-পুণ্ডরীকে দহর (ক্ষুদ্র) আকাশে আত্মা অবস্থিত। এই আত্মা ও বহির্জগতে অনুস্যূত ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন। ইহাই সমগ্র উপনিষদে উপদিষ্ট হইয়াছে।

বহির্বিশ্ব নানাবিধ সমুৎপাদের সমষ্টিরূপেই আমাদের গোচর হয়। কোনও বস্তুই স্থির নাই, পরিবর্ত্তন-স্রোত অনবরত বহিয়া যাইতেছে। যাহা পরিবর্ত্তিত হইতেছে, তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না, পরিবর্ত্তনই কেবল দেখা যায়। অন্তর্জগতেও কেবলই পরিবর্ত্তন—প্রতীতি, বেদনা, ইচ্ছা, একটির পরে একটি উঠিতেছে ও বিলীন হইতেছে। যাহাতে এই সকল উঠিতেছে ও বিলীন হইতেছে, তাহার দেখা পাওয়া যায় না। ক্যাণ্ট উভয় জগতে এক অপরিণামী স্থির বস্তু আছে বলিয়াছিলেন। তাহাকে তিনি স্বগত বস্তু (Ding-en-Sich) নাম দিয়াছিলেন। কিন্তু বৈজ্ঞানিকগণ বাহ্যজগতে তাহার সন্ধান পান নাই। মনোবিজ্ঞান অন্তরের মধ্যে কোনও স্থির বস্তুর সাক্ষাৎ না পাইয়া তাহার আলোচনা করে না। মানবমনের বিশ্লেষণে বুদ্ধ প্রত্যক্ষবাদী মনোবৈজ্ঞানিকের পদ্ধতিই অবলম্বন করিয়াছেন। মানসিক সমুৎপাদদিগের তলদেশে কোনও স্থায়ী আত্মা প্রত্যক্ষ হয় না বলিয়া, তিনি তাহার কথা বলেন নাই।

বুদ্ধের পরিনির্বাণের বহু পরে তাঁহার রচনাবলী লিপিবদ্ধ হয়। তাঁহার সকল বচন যে লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বলা যায় না। আত্মা ও ঈশ্বর-সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠিলে তিনি নিরুত্তর থাকিতেন, ইহা লিখিত আছে। কিন্তু তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করিতেন। নাগসেনের মিলিন্দ পন্‌হা খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীর রচনা। উক্ত গ্রন্থে নাগসেন বলিতেছেন যে যদিও তিনি নাগসেন নামে পরিচিত, তথাপি তাঁহার মধ্যে কোনও স্থির আত্মা নাই। মিলিন্দ কহিলেন, "যদি স্থায়ী আত্মা কেহ না থাকে, তাহা হইলে শ্রমণদিগকে তাহাদিগের প্রয়োজনীয় বসন, আহার্য্য, বাসস্থান এবং রোগীর জন্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি দান করে কে? এই সমস্ত দ্রব্য ভোগই বা করে কে? ধার্ম্মিক জীবন যাপন করে কে? ধ্যান করে কে? অর্হৎ-ত্ব ও নির্ব্বাণই বা লাভ করে কে? আবার জীবহত্যা ও চুরী করে কে? যে কামাতুর অসৎ জীবন যাপন করে, মিথ্যা কথা বলে, মদ্যপান করে, এবং ইহজন্মেই যে পাপের ফল ভোগ করিতে হয়, সেই পাপ করে, সে কে? আত্মা যদি না থাকে, তাহা হইলে পাপ ও পুণ্য নাই, সৎ ও অসৎ কর্ম্মের কর্ত্তাও কেহ নাই। সৎ ও অসৎ কর্ম্মের কোনও ফলও নাই।... আপনাকে আপনার সম্প্রদায়ের শ্রমণগণ নাগসেন বলে। এই নাগসেন কি?

আপনার কেশ, আপনার গাত্রলোম, নখ, দাড়ি, চর্ম্ম, মাংস স্নায়ু ও মস্তিষ্ক, ইহারা সকলে মিলিয়া অথবা ইহাদের কোন একটি কি নাগসেন?” নাগসেন কহিলেন “না”। তবে আপনার রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার অথবা বিজ্ঞান কি নাগসেন? উত্তর—না। “তবে এই সকল স্কন্ধের সমবায় কি নাগসেন?” উত্তর—না। “পঞ্চ স্কন্ধের বাহিরের কিছু কি নাগসেন?” উত্তর—না। “তবে নাগসেনকে তো আমি খুঁজিয়া পাই না। আমার সম্মুখে যে নাগসেন, তিনি তবে কে?” তখন নাগসেন বলিলেন, “মহারাজ, আপনি যে রথে আসিয়াছেন, তাহার চাকা, তাহার অর, দণ্ড প্রভৃতি কোনও অংশই তো রথ নহে, এই সকল মিলিয়াও রথ নহে, ইহাদের বহিঃস্থ কোনও কিছুও রথ নহে। তবে রথ কি?” রাজা কহিলেন, “চাকা, অর, দণ্ড প্রভৃতি ইহার আছে বলিয়া, ইহাকে রথ বলা হয়। রথ শব্দে ইহাই বুঝায়।” তখন নাগসেন কহিলেন “ঠিক সেইরূপ দেহে এক প্রকার জৈব দ্রব্য এবং সত্তার পাঁচ উপাদানের অস্তিত্ববশতঃ আমি নাগসেন নামে অভিহিত হই।...বিভিন্ন অংশের একত্র অবস্থান আছে বলিয়া যেমন রথ শব্দ তাহা বুঝাইতে ব্যবহৃত হয়, সেইরূপ স্কন্ধদিগের একত্রাবস্থান থাকিলে সেখানে আমরা কোনও ব্যক্তির কথা বলি। তখন তাহার বিভিন্ন অংশের অতিরিক্ত এক বস্তুর কল্পনা করি। কিন্তু সেরূপ কোনও বস্তুর অস্তিত্ব নাই। তেমনি মনের নানাবিধ সমুৎপাদ হইতে ভিন্ন এক আত্মার যে কল্পনা আমরা করি, তাহারও অস্তিত্ব নাই। মানসিক সমস্ত অবস্থার সমষ্টিই আত্মা।”

নাগসেনের এই মত আধুনিক অনেক মনোবৈজ্ঞানিকের অনুমোদিত। অধ্যাপক ষ্টাউট বলেন, যে প্রত্যেক মানুষের জীবনের সদা পরিবর্ত্তমান বহুবিধ অভিজ্ঞতার মধ্যে যে এক প্রকার একত্ব আছে, যাহাকে “অহং” বলা হয়, তাহা সকলেই স্বীকার করেন। এই অহং বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে এক ও অভিন্ন থাকে। কিন্তু এই অহংএর একত্ব ও অভিন্নতার স্বরূপ-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন, এই একত্ব ত্রিভুজের, সুরের অথবা জীবদেহের একত্বের মতো। কোনও ত্রিভুজের তিন বাহু যে বিশিষ্টভাবে মিলিত হয় (নির্দিষ্ট পরিমাণ কোণ ও বাহুদিগের দৈর্ঘ্যের সহিত), তাহার উপরই তাহার একত্ব নির্ভর করে। সুর ও জীবদেহের অংশদিগের বিশিষ্ট প্রকারের সমবায়ের উপরই তাহাদিগের অভিন্নতা এবং একত্ব নির্ভর করে। তেমনি কোনও মানুষের মনের অভিন্নত্ব নির্ভর করে তাহার অভিজ্ঞতাসকল পরস্পরের সহিত যে বিশিষ্ট রূপে সংযুক্ত, তাহার উপর। যখন আমরা কোনও এক

বিশেষ কামনাকে কোনও ব্যক্তিবিশেষের কামনা বলি, তখন আমাদের কথার অর্থ এই, যে সেই কামনা এক পরস্পর সম্বদ্ধ ও একত্বপ্রাপ্ত অভিজ্ঞতা-সমষ্টির অন্তর্ভুক্ত, যে প্রকার একত্ব কেবল মাত্র অভিজ্ঞতা-সমষ্টিরই হইতে পারে, জড় বস্তুর হইতে পারে না। আবার কাহারও কাহারও মতে এই অভিন্নতা ও একত্ব কেবল একীভূত অভিজ্ঞতার অভিন্নত্ব ও একত্ব নহে। ইহা এক স্বতন্ত্র তত্ত্ব, অভিজ্ঞতা হইতে ভিন্ন; এই তত্ত্ব হইতেই অভিজ্ঞতা-সমষ্টি তাহার একত্ব-লাভ করে। ইহা অভিজ্ঞতার মধ্যে বর্তমান এবং ইহা অভিজ্ঞতাসকলকে সংবদ্ধ ও সংযুক্ত করে। বহু অভিজ্ঞতা পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া যে এক আত্মারূপে পরিগণিত হয়, তাহা নহে। এক অভিন্ন অহংএর সহিত সংবদ্ধ বলিয়াই তাহারা পরস্পরের সহিত সংবদ্ধ। এই দুই মতের মধ্যে প্রথম মতই অধ্যাপক ষ্টাউটের মত। কিন্তু ত্রিভুজের ও সুরের একত্বের সহিত অহংএর একত্বের উপমা সংগত হয় না, কেননা ত্রিভুজে ও সুরে কোনও পরিবর্তন হয় না, পরিবর্তন হইলে তাহাদিগের অভিন্নতা থাকে না। জীবদেহের সহিত তুলনা হইতে পারে। শৈশবের দেহের উপাদানসকলের কিছু বার্দ্ধক্যের দেহে থাকে না, তবু শৈশবের দেহ ও বার্দ্ধক্যের দেহ এক বলিয়া পরিগণিত হয়। অহমের আধেয় সদা পরিবর্তমান। শৈশবের অনেক অভিজ্ঞতাই যৌবনের অভিজ্ঞতা-সমষ্টির মধ্যে থাকে না এবং যৌবনের অনেক অভিজ্ঞতা বার্দ্ধক্যে বিস্মৃতির মধ্যে ডুবিয়া যায়। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই একত্বের বোধ বর্তমান থাকে; শৈশবের দেহ ও বার্দ্ধক্যের দেহ অভিন্ন, শৈশবের অহং, যৌবনের অহং এবং বার্দ্ধক্যের অহং এক ও অভিন্ন, এই বোধ থাকে। যুবক অহমের অভিজ্ঞতা-রাশি যে ভাবে সংযুক্ত, বার্দ্ধক্যে তাহাদের অনেকগুলির স্মৃতিও থাকে না বলিয়া, এবং যৌবনের মানসিক গতি ও বার্দ্ধক্যের মানসিক গতি বিভিন্ন বলিয়া, যৌবনের অভিজ্ঞতা-সমষ্টি এবং বার্দ্ধক্যের অভিজ্ঞতা-সমষ্টি যে একভাবে সংযুক্ত, তাহা বলিবার কারণ নাই। যৌবন ও বার্দ্ধক্যের কতকগুলি অভিজ্ঞতা অভিন্ন হইলেও যৌবনের যে সকল অভিজ্ঞতা স্মৃতিতে বর্তমান থাকে, তাহারা নূতন অভিজ্ঞতার সহিত বিভিন্নভাবে মিলিত হয়, সুতরাং সংযোগের প্রকারের মধ্যে একত্ব থাকে না। এই জন্য এবং শৈশব হইতে বার্দ্ধক্য পর্যন্ত প্রত্যেক অভিজ্ঞতা "আমার অভিজ্ঞতা" এই জ্ঞানের সহিত লব্ধ হয় বলিয়া, এবং স্মৃতিতেও তাহারা "আমার অভিজ্ঞতা" রূপে উপলব্ধ হয় বলিয়া, প্রত্যেক মানুষের মধ্যে তাহার সর্ব অভিজ্ঞতার আধার এক স্থায়ী অহং স্বীকার করিতে হয়। প্রত্যেক মানুষের নিকট বিভিন্ন বয়সে তাহার

দেহের অভিন্নতাও এই অহমের বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। এক জনের দেহের এই একত্ববোধ অন্যের নাই বলিয়া অন্যের নিকট তাহা এক বলিয়া বোধ হয় না। বহু দিন দেখা না হইলে অনেক সময় অতি পরিচিত লোককেও চিনিতে পারা যায় না। সেখানে একত্বেরই অভাব।*

নাগসেনের মতের সহিত আধুনিক অনেক দার্শনিক মতের সাদৃশ্য থাকিলেও, তাহার সহিত জন্মান্তরবাদের সংগতি নাই। অশ্বঘোষ বলিয়াছেন, তথাকথিত পুনর্জন্ম হয় তথাকথিত পূর্ব্বজন্মের বিজ্ঞানের নহে। যে বিজ্ঞান নূতন দেহে অধিষ্ঠিত হয়, তাহা নূতন। পূর্ব্ব-জীবনের কর্ম্ম অথবা সংস্কার হইতে এই বিজ্ঞানের উদ্‌ভব হয়। পুত্র যেমন পিতা হইতে উদ্‌ভূত হয়, এই মত অনুসারে পরজন্মও তেমনি পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম হইতে উদ্‌ভূত হয়। পূর্ব্বজন্মেও আত্মা বলিয়া কিছু ছিল না, পরজন্মেও থাকে না। পূর্ব্বজন্মে যে কর্ম্ম করিয়াছিল, সে এবং পরজন্মে যে দুঃখ ভোগ করে, সে এক নহে। নাগসেনের মতে মৃত ব্যক্তির মৃত্যুকালের বিজ্ঞান হইতে উদ্‌ভূত নূতন বিজ্ঞান মৃত ব্যক্তির কর্ম্মের ফল ভোগ করে। ইহার কোন সুনীতি-সঙ্গত যুক্তি পাওয়া যায় না। ইহাই যদি সৃষ্টির নিয়ম হয়, তাহা হইলে সে নিয়মকে "নৈতিক ব্যবস্থা" (moral order) বলা যায় না। যে অর্থে জন্মান্তরবাদ গৃহীত হয়, নাগসেনের মত সত্য হইলে, বৌদ্ধ জন্মান্তরবাদ তাহা হইতে ভিন্ন। কিন্তু আত্মার-অস্তিত্ব সম্বন্ধে বুদ্ধের কি মত ছিল, সে সম্বন্ধে মত-ভেদ আছে।

মনোবিজ্ঞান

বৌদ্ধ শাস্ত্রে জগৎকে রূপী ও অরূপী এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। রূপস্কন্ধই রূপী জগৎ এবং বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান-স্কন্ধ অরূপী জগৎ। চারি মহাভূত আপনাদিগকে নানারূপে প্রকাশিত করে বলিয়া, তাহারা "রূপ"। বাহ্য জগতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ গুণযুক্ত বস্তু আছে। তাহারা রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ রূপে ইন্দ্রিয়ের নিকট প্রকাশিত হয়। বৌদ্ধ শাস্ত্রে দ্রব্যের মধ্যে বর্ত্তমান রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের সহিত ইন্দ্রিয়ে অনুভূত রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শের—ইন্দ্রিয় বিষয়ের—ভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না। বাহ্য জগতে অবস্থিত ভূতগণ এবং ইন্দ্রিয়ের নিকট

* Some Fundamental Points in the Theory of knowledge by Stout, quoted in Radha Krishnan's Indian Pholosophy.

প্রকাশিত তাহাদের রূপ এবং ইন্দ্রিয়গণ সকলই রূপ-শব্দ-বাচ্য। বাহ্য জগতে অবস্থিত ভূতগণ (মহাভূতগণ) স্থায়ী বস্তু নহে। তাহারা নিত্য পরিবর্ত্তমান সমুৎপাদের শ্রেণী। তাহারা প্রকাশমাত্র। তাহাদের সহিত সংহত সকলই রূপ।

চারি মহাভূতকে তাহাদের জ্ঞানের হেতু এবং প্রত্যয় পচ্চয়) উভয়ই বলা হইয়াছে। (রূপস্কন্ধস্য প্রজ্ঞাপনায়)। হেতু অর্থ কারণ এবং প্রত্যয় অর্থ "উপস্থিতির কারণ"—কার্য্যের উৎপত্তির জন্য যাহার উপস্থিতির প্রয়োজন (condition)। ইন্দ্রিয়ের সহিত মহাভূতদিগের স্পর্শই বেদনার উৎপত্তির কারণ। ইন্দ্রিয়ের সহিত স্পর্শ সংজ্ঞা-স্কন্ধের এবং সংস্কার-স্কন্ধের হেতু ও প্রত্যয়, এবং নামরূপ বিজ্ঞান-স্কন্ধের হেতু ও প্রত্যয়। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য-বস্তুর স্পর্শ সুতরাং কেবল বেদনার নহে, সংজ্ঞা ও সংস্কারেরও কারণ।

সংজ্ঞার দুইটি ক্রম - প্রতীতি (Preception) এবং সম্প্রতীতি (Cognition)। ইন্দ্রিয়ের সহিত বাহ্য বস্তুর স্পর্শ হইলে, প্রথমে একটি প্রতিরোধের অনুভব হয়, এবং বাহ্য বস্তু ভিন্ন ভিন্ন বস্তুমাত্ররূপে অনুভূত হয়। তখন ইন্দ্রিয়ে যে বেদনা বা সংবেদন উদ্ভূত হয়, পূর্ব্বে অনুভূত সংবেদনদিগের সহিত (যাহারা স্মৃতিতে উদিত হয়), তাহারা তুলিত হয়, এবং তাহাদিগের সহিত সাদৃশ্য বা ভেদের অনুভব হইতে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুরূপে তাহাদের জ্ঞান হয়। ইহার পরে মনের ক্রিয়া হয়, এবং ইন্দ্রিয়দ্বারে অনুভূত ভিন্ন ভিন্ন বস্তু নামদ্বারা বিশেষিত হয়। উভয় ক্রিয়াই সংজ্ঞা। প্রথমোক্ত ক্রিয়ার নাম প্রতিঘ সংজ্ঞা, দ্বিতীয়ের নাম অধিবাচন সংজ্ঞা। ইন্দ্রিয়ে লব্ধ বিষয়ের চিন্তা এবং পরে তাহাদের বিশিষ্টরূপে জ্ঞান ও নামকরণ, সংজ্ঞার এই দুই ক্রম।

সংস্কার অর্থ সংশ্লেষণ—রূপ, সংজ্ঞা, ও বিজ্ঞানের সংশ্লেষণ। রূপ, সংজ্ঞা ও বিজ্ঞানের সংশ্লেষণ-ক্রিয়াও যেমন সংস্কার, তেমন ইহাদের সংশ্লিষ্ট অবস্থাও সংস্কার নামে অভিহিত হয়। সংস্কার ৫২ প্রকার বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। জ্ঞান ক্রিয়ার প্রারম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত যাহা যাহা হয়, সকলই বিজ্ঞানের অন্তর্গত। সংবেদন, প্রতীতি, সম্প্রতীতি, সংস্মরণ সকলই বিজ্ঞানের (সংবিদ—Consciousness) এর অন্তর্ভুক্ত।

বুদ্ধঘোষ বলিয়াছেন প্রথমে চিত্তের (Consciousness) সহিত তাহার বিষয়ের (আলম্বনের) স্পর্শ হয়। এই স্পর্শ হইতে বেদনা, সংজ্ঞা ও চেতনার (Volition) উদ্ভব হয়। স্পর্শের উপর অন্য সকল প্রতিষ্ঠিত ("দ্রব্যসম্ভার সদৃশ")। ইহাদের মধ্যে কোন্‌টি আগে, কোন্‌টি পরে উদ্ভূত হয়, তাহা

বলা সম্ভবপর নহে। ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের স্পর্শকে দুই মেষের মধ্যে যুদ্ধের সহিত তুলনা করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয়ের উপর বিষয়ের সম্পাতকে উভয়ের সংঘর্ষ বলা হইয়াছে। দুই হস্তে তালি এবং করতাল-দ্বয়ের সংঘর্ষের সহিত তাহার উপমা দেওয়া হইয়াছে। "বিষয়, বিজ্ঞান এবং ইন্দ্রিয় এই তিনের সম্মেলনই স্পর্শ; বিষয়ের স্বাদ অনুভবই ইহার প্রধান লক্ষণ।" *

অভিজ্ঞানের সাহায্যে প্রত্যভিজ্ঞাই সংজ্ঞার বিশেষ লক্ষণ। চেতনার (Volition) কার্য্য "অভিসন্দহান"—একত্র বন্ধন করা। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি সংস্কারের কার্য্যও রূপ, সংজ্ঞা, বিজ্ঞানের সংশ্লেষণ। সুতরাং চেতনাকে সংস্কারের অন্তর্ভূক্ত বলা যায়—সংস্কারের সক্রিয় রূপই চেতনা।

ইন্দ্রিয়-বিষয়দিগকে অশ্বঘোষ অসম্প্রাপ্তরূপ এবং সম্প্রাপ্তরূপ এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। দেহ যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে না আসিলেও ইন্দ্রিয়-জ্ঞান উৎপন্ন হয় (যেমন দর্শন এবং শ্রবণে) তখন ইন্দ্রিয়-বিষয় অসম্প্রাপ্ত রূপ। ঘ্রাণ, আস্বাদ, ও স্পর্শ জ্ঞানে ইন্দ্রিয়ের সহিত জ্ঞাত বস্তুর বাস্তব স্পর্শ হয়, এই জন্য তাহাদের বিষয় সম্প্রাপ্তরূপ।

মনের বিষয় পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত: (১) চিত্ত (মন) (২) চেতসিক (মনের গুণ) (৩) পসদরূপ (দেহের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যগুণ), এবং সূক্ষ্মরূপ (৪) প্রজ্ঞপ্তি (নাম, প্রত্যয়) এবং (৫) নির্ব্বাণ। ইহারা ধর্ম্মাবলম্বন। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ এখানে মানসিক রূপ। ইন্দ্রিয়ে বস্তুর প্রকাশ কিরূপে জ্ঞানে রূপান্তরিত হয়, তাহার সুস্পষ্ট বর্ণনা পাওয়া যায় না। মন সংবেদন উপাদান দ্বারা প্রত্যয় (idea) ও সম্প্রত্যয় (notion) গঠন করে, ইহা উক্ত হইয়াছে, কিন্তু জড়ীয় মন কিরূপে ইহা করে তাহার বর্ণনা নাই। চিত্ত অর্থে মনন ও মন্তা বস্তু উভয়কেই বুঝায়। এই চিত্ত-কর্ত্তৃকই সংবেদনগণ হইতে সংবিদ-প্রবাহের (Stream of Consciousness) সৃষ্টি হয়। বিষয়ী ও বিষয়ের মধ্যে যে অসাধারণ সম্বন্ধ, তাহাই বিজ্ঞান।

মনোবিজ্ঞানে মানসিক অবস্থাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়: (১) জ্ঞান (Cognition), (২) বেদনা বা অনুভূতি (feeling) এবং চিকীর্ষা বা ইচ্ছা (Conation, will)। অধ্যাপক ষ্টাউট বেদনা ও চিকীর্ষাকে এক পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া উভয়কে Interest বা এষণার বিভিন্ন বিভাব বলিয়াছেন। তাঁহার মতে জ্ঞান ও এষণাই মনের দুই ভাগ। কিন্তু জ্ঞানও চিকীর্ষা হইতে একান্ত ভিন্ন নহে। জ্ঞান চিকীর্ষারই এক বিভাব। কোনও কর্ম্মের দিকে

* সংযুক্ত—২৫-২৮ পৃঃ

যখন প্রবৃত্তি হয়, তখন সেই কর্ম্মের বিষয়ের জ্ঞান সেই প্রবৃত্তির সহিত মিলিত থাকে, প্রবৃত্তি হইতে জ্ঞানকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বৌদ্ধ মনোবিজ্ঞানে চিকীর্ষা বা প্রবৃত্তিই মানসিক জীবনের প্রধান অংশ। প্রতীত্য সমুৎপাদ মতে প্রত্যক্ষ দ্বারাই কামনা উত্তেজিত হয়। চিকীর্ষার বিষয় হয় ইন্দ্রিয়ে প্রত্যক্ষ নতুবা স্মৃতিতে উদ্বুদ্ধ হয়। তাহা মননের বিষয়। জ্ঞান ও ইচ্ছা চিকীর্ষারই দুইরূপ—সর্ব্বদা একত্র বর্ত্তমান। অধ্যাপক ষ্টাউটের মত অনুসারে বেদনাকেও চিকীর্ষার রূপভেদ গণ্য করিলে, চিকীর্ষাই মনের প্রধান রূপ বলিয়া গণ্য হয়।

বৌদ্ধ-দর্শনে আত্মার স্থান গ্রহণ করিয়াছে বিজ্ঞান। বিজ্ঞানই এক জীবন হইতে অন্য জীবনে সংক্রামিত হয়। বিজ্ঞান সন্ততির—বিজ্ঞান প্রবাহের—বিচ্ছেদ নির্বাণের পূর্ব্বে হয় না। বিজ্ঞান অপরিবর্ত্তিত স্থির বস্তু নহে, ক্ষণস্থায়ী বিজ্ঞানসমূহের প্রবাহ—বেদনা ও রূপস্কন্ধ হইতে স্বতন্ত্র।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে নাম (মনোজগৎ) ও রূপ (বহির্জগৎ) পরস্পর সংযুক্ত বলিয়া তাহারা এক সঙ্গে উদ্‌ভূত হয়। কিন্তু নামজগৎ ও রূপজগৎ অনবরত পরিবর্ত্তিত হইতেছে। প্রত্যেক ক্ষণেই এই পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইতেছে। সুতরাং কোনও নাম এবং কোনও রূপই পূর্ব্বে উদ্‌ভূত কোনও নাম এবং রূপের সহিত এক নহে। সুতরাং কোনও বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শকালে যে বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ হয়, তাহা নূতন এবং সেই স্পর্শের ফলে যে নামের উদ্‌ভব হয়, তাহাও নূতন। এই বস্তুরও যেমন পূর্ব্বে অস্তিত্ব ছিল না, উদ্‌ভূত নামেরও তেমনি পূর্ব্বে অস্তিত্ব ছিল না। বিশিষ্ট নাম (বেদনা, সংজ্ঞা প্রভৃতি) যে বিশিষ্ট রূপের সঙ্গে আবির্ভূত হয়, অন্যপ্রকারের নাম আবির্ভূত হয় না, ইহার কারণ কি? বিশিষ্ট নাম ও বিশিষ্ট বস্তু—সর্ব্ববিধ বস্তু ও নাম—যদি পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে বলিতে পারা যাইত যে প্রত্যেক বস্তু এক নামের সহিত চির সম্বন্ধে আবদ্ধ। কিন্তু প্রত্যেক বস্তু প্রাচীন বৌদ্ধ মতে ক্ষণিক না হইলেও প্রতিক্ষণে আংশিকভাবে পরিবর্ত্তিত হইতেছে। সুতরাং কোনও বিশেষ বস্তুর সহিত বিশেষ নাম সংশ্লিষ্ট থাকা অসম্ভব। যাহাদের উদ্‌ভবের পূর্ব্বে অস্তিত্বই ছিল না, তাহারা সংশ্লিষ্ট হইবে কিরূপে? এই প্রশ্নের যে উত্তর নাগসেন দিয়াছেন, তাহা সন্তোষজনক নহে। বিশেষ বিশেষ প্রত্যয় বিশেষ বিশেষ ইন্দ্রিয়-বিষয়ের সহিত আবির্ভূত হয় কেন, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ ঢালু ভূমি (incline) মতো, দ্বারের মতো। তাহাদের একসঙ্গে আবির্ভূত হওয়

ইহাদের অভ্যাস (habit), তাহারা পরস্পরের সঙ্গী (associated)। যখন বৃষ্টি হয়, তখন জমি যেদিকে ঢালু, সেই দিকেই বৃষ্টির জল বহিয়া যায়। পুনরায় বৃষ্টি হইলে, সেই পথেই জল বহিয়া যায়। কিন্তু এই সঙ্গ, এই সহগামিতা, এই অভ্যাস স্থায়ী বস্তুদিগের মধ্যেই সম্ভব, অস্থায়ী নূতন বস্তুদিগের মধ্যে সম্ভবপর নহে। বস্তুর প্রতিবিম্ব মনের মুকুরে পতিত হয়; একথা নাগসেন বলেন নাই। অন্তরের মধ্যে একজন জ্ঞাতার অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে জ্ঞানের ব্যাখ্যা করা অসম্ভব।

দুঃখনিবৃত্তি—নির্বাণ

দুঃখের নিবৃত্তি আছে, ইহাই বুদ্ধদেবের ঘোষিত তৃতীয় আর্য সত্য। দুঃখের কারণ যখন আছে, তখন সেই কারণ দূরীভূত হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হইবে। 'কষায়'দিগকে (passions) দমন করিয়া যখন সত্যজ্ঞান লাভ হয়, তখন বন্ধন হইতে জীব মুক্তিলাভ করে এবং দুঃখের নিবৃত্তি হয়। তখন মানুষ 'অর্হৎ' হয়। এই অবস্থা 'নির্বাণের অবস্থা—কষায়ের বিনাশ এবং দুঃখের বিনাশের অবস্থা। ইহ জন্মেই এই অবস্থা লাভ করা যায়। বুদ্ধ তাঁহার দেহত্যাগের পূর্বেই নির্বাণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

নির্বাণের স্বরূপ কি সে সম্বন্ধে প্রচুর মতভেদ বর্তমান। 'নির্বাণ' শব্দের ধাতুগত অর্থ নিভিয়া যাওয়া—দীপ যেমন নিভিয়া যায়, সেইরূপ। নির্বাণের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা নেতিবাচক। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, "বন্ধনমুক্ত মন অগ্নিশিখার নির্বাণের সদৃশ" (দীর্ঘনিকায়, ২।১৫)। তৃণ অথবা কাষ্ঠ পুড়িয়া শেষ হইলে অগ্নির যে অবস্থা হয়, তাহার সহিতও বুদ্ধ নির্বাণের উপমা দিয়াছেন। উপনিষৎ যে মুক্তির কথা বলিয়াছেন—পরমাত্মার সহিত মিলিত হওয়া,—নির্বাণ তাহা নহে। বুদ্ধ তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে ৩৫ বৎসর বয়সে নির্বাণ লাভ করিয়াছিলেন এবং নির্বাণলাভের পর অশীতি বৎসর বয়স পর্যন্ত বাঁচিয়াছিলেন ; ইহা হইতে বোঝা যায় যে নির্বাণের অর্থ অস্তিত্বের নাশ নহে। নির্বাণ-লাভের পর ৪৫ বৎসর তিনি ধর্মপ্রচার করিয়াছিলেন। দ্বিবিধ নির্বাণের কথা বৌদ্ধ শাস্ত্রে পাওয়া যায়—উপাধিশেষ নির্বাণ ও অনুপাধিশেষ নির্বাণ। চাইলডার্সের (Childers) মতে অর্হতের নির্বাণ উপাধিশেষ নির্বাণ, তাহাতে পঞ্চস্কন্ধরূপ উপাধিমাত্র অবশিষ্ট থাকে, কিন্তু কামনার বিলোপ হয়। অনুপাধিশেষ নির্বাণে মৃত্যুর পরে অর্হতের সমগ্র সত্তার বিলোপ হয়। যে নির্বাণে উপাধি অবশিষ্ট

থাকে না, তাহাই যদি অনুপাধিবিশেষ হয়, তাহা হইলে সে নির্বাণে অস্তিত্বেরও বিনাশ হয় বলিলে অত্যুক্তি হয়। উপাধিবিহীন অস্তিত্ব অসম্ভব নহে। পৃথিবীতে জীবিত থাকিতে থাকিতে যখন কেহ নির্বাণ লাভ করে, তখন সেই নির্বাণ উপাধিশেষ নির্বাণ। তাদৃশ নির্বাণপ্রাপ্ত অর্হৎ যখন নশ্বর জগৎ হইতে প্রস্থান করেন, তখন সেই নির্বাণকে পরিনির্বাণ বলে। তাহাই অনুপাধিশেষ নির্বাণ। কেহ কেহ বলেন সত্তার ঐকান্তিক পূর্ণতাই পরিনির্বাণ। "বুদ্ধ সংবিদের অনবদ্য অবস্থার প্রবাহকে পরিনির্বাণ বলিয়াছেন (সর্ব্বসিদ্ধান্তসার-সংগ্রহ—ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের গ্রন্থে উদ্ধৃত) নির্বাণ পূর্ণতার শেষ সীমা, পরিপূর্ণ আনন্দের অবস্থা, বিনাশের অতল গহ্বর নহে। নির্বাণে ব্যক্তিত্বের—অহংকারের—নাশ হয়, আমরা সমগ্র বিশ্বের অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হই, সমগ্রের সঙ্গে—অতীত, আগত ও অনাগত সকলের–সঙ্গে একীভূত হই। সত্তার পরিধি তখন সত্যের (Reality) প্রান্তসীমা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ইহা অহংভাব-বর্জিত কালাতীত শান্তিপূর্ণ পবিত্র আনন্দের অবস্থা।" ১

'মিলিন্দপঞ্হে' নাগসেন নির্বাণ সম্বন্ধে ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়াছেন: "তথাগত (সংসার হইতে) চলিয়া গিয়াছেন, এমন ভাবে গিয়াছেন যে কোনও মূল অবশিষ্ট নাই, যাহা হইতে অন্য আর এক ব্যক্তির উদ্ভব হইতে পারে। তথাগতের সমাপত্তি হইয়াছে এবং তিনি এখানে বা ওখানে আছেন, ইহা নির্দেশ করা যায় না, কিন্তু তাঁহার প্রচারিত মতের মধ্যে তাঁহার নির্দেশ করা যায়।" "বুদ্ধের অস্তিত্ব আর নাই, সেইজন্য আমরা তাঁহার পূজা করিতে পারি না, সেইজন্য আমরা তাঁহার দেহাবশেষের পূজা করি।" এই সকল উক্তি হইতে মনে হয় নাগসেন নির্বাণকে ঐকান্তিক বিনাশ বলিয়াই মনে করিতেন। কিন্তু মাক্সমুলার এবং চাইলডার্স নির্বাণ সম্বন্ধে সমস্ত উক্তির পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন, যে তাঁহারা এমন কোনও উক্তি দেখিতে পান নাই যাহাতে ঐকান্তিক বিনাশ অর্থে নির্বাণ শব্দ গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু মিসেস্ রাইস্ ডেভিড্স (Rhys-Davids বলিয়াছেন, "বৌদ্ধধর্মের নির্বাণ ঐকান্তিক বিনাশ।" ওলডেনবার্গের (Oldenberg) মতও ঐরূপ। বিশপ বিগান্‌ডেট্ বলিয়াছেন, বৌদ্ধধর্মে নৈতিক উন্নতির জন্য চেষ্টার পুরস্কার হইতেছে বিনাশের অতল সমুদ্র। ডাহ্‌লক্ লিখিয়াছেন, "কেবলমাত্র বৌদ্ধধর্মেই দুঃখ হইতে মুক্তির ধারণার মধ্যে

১ Dr. Radhakrishnan.

ভাবমূলক কিছু নাই, ইহা সম্পূর্ণ অভাবাত্মক ধারণা। ইহার মধ্যে স্বর্গীয় আনন্দের ভাব নাই।"

জীবের মধ্যে অবিনশ্বর কিছু আছে অথবা নাই, এই প্রশ্ন উত্থাপন করা বৌদ্ধশাস্ত্রে নিষিদ্ধ। তথাগতকে শাশ্বত অথবা অশাশ্বত রূপে চিন্তা করা, অথবা তাঁহার অস্তিত্ব আছেও এবং নাইও—এই ভাবে চিন্তা করা, অথবা তিনি আছেন, ইহা নহে এবং আছেন না, ইহাও নহে—এইরূপে তাঁহার সম্বন্ধে চিন্তা করা বৌদ্ধধর্মবিরোধী। নির্বাণ কি ভাবাত্মক ও শাশ্বত অবস্থা অথবা অভাবাত্মক ঐকান্তিক বিনাশের অবস্থা, ইহার আলোচনা করাও নিষিদ্ধ।[১]

এই মতের অনুসরণ করিয়া পরবর্তীকালে নাগার্জুন এবং চন্দ্রকীর্তি বলিয়াছিলেন, কোনও বস্তুর প্রকৃত অস্তিত্ব নাই, সুতরাং বস্তুর অস্তিত্ব ও অনস্তিত্ব সম্বন্ধে আলোচনা অর্থহীন। সংসার ও নির্বাণের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই, কেননা সকলই প্রতিভাস মাত্র, কিছুর মধ্যেই কোনও সার নাই। সংসারের মধ্যে কখনও কিছুই ছিল না ও নাই, এবং নির্বাণেও বিনষ্ট হইবার কিছু নাই।[২]

বুদ্ধের সময়েও তাঁহার মত-সম্বন্ধে মতভেদ ছিল। তিনি বলিয়াছেন, "আমি ইহা (নির্বাণের অবস্থা বর্ণনার অযোগ্য) বলিয়াছি বলিয়া আমাতে মিথ্যা দোষের আরোপ করে।...তাহারা বলে শ্রমণ গৌতম নাস্তিক। সে বলে সৎবস্তু নশ্বর, তাহার ঐকান্তিক বিনাশ হয়, তাহার কিছুই থাকে না। আমি যাহা নহি, তাহারা আমাকে তাহাই বলে, যাহা আমার মত নহে, তাহারা তাহাই আমার মত বলে।" (মাজ্ঝিম নিকায়—২২)

মহাযানী বৌদ্ধশাস্ত্রে 'ভবাঙ্গ' বা সত্তাসাগরের বর্ণনা আছে। সত্তাসাগরের উপর অবিদ্যা বায়ু প্রবাহিত হইবার ফলে তাহার শান্ত প্রবাহে তরঙ্গের উদ্ভব হয়। তখন সুপ্ত আত্মা জাগরিত হয় এবং তাহাতে চিন্তার এবং সসীম ব্যক্তিত্বের উদ্ভব হইয়া সত্তাসমুদ্র হইতে তাহা পৃথক হইয়া পড়ে। এই ব্যক্তিত্বের প্রাচীর সুষুপ্তিকালে বিদূরিত হয়। এই ব্যক্তিত্ববিহীন অবস্থাই নির্বাণ। সুষুপ্তিতে সুষুপ্ত ব্যক্তির সত্তা শান্ত প্রবাহে প্রবাহিত। তখন চিন্তার তরঙ্গে সে প্রবাহে চঞ্চলতার সৃষ্টি হয় না। শাশ্বত সত্তার সহিত একীভূত হওয়াই নির্বাণ, ঐকান্তিক বিনাশ নহে। সত্তা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহাও

১ Das Gupta, History of Indian Philosophy Vol, 1-P 109
২ Das Gupta, History of Indian Philosophy.

নহে। বুদ্ধ স্পষ্টভাবে এই শাশ্বত সত্তা স্বীকার করেন নাই, কেননা তাহা মানবীয় চিন্তার অতীত অবস্থা। নেতি, নেতি বলিয়াই তাহার বর্ণনা করা যায়, তাহার ভাবাত্মক বর্ণনা অসম্ভব, কেননা তাহার সদৃশ কিছু আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে নাই বলিয়া তাহার উপযোগী ভাষাও নাই। ইহার মধ্যে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ নাই, আত্মসংবিদের কোনও চিহ্নই নাই। ইহা সক্রিয় অবস্থা, কিন্তু কার্যকারণ-নিয়মাধীন নহে, কারণহীন স্বাধীনতার অবস্থা, দেশকালের অতীত অবস্থা। থের-গাথা ও থেরী গাথায় এই অবস্থার প্রগাঢ় সুখ ও অবিনশ্বর আনন্দের মনোরম বর্ণনা আছে। ব্যক্তির সসীম সংবিদ্ তখন যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাতে আপেক্ষিক সত্তাবান কিছুই থাকে না। থাকে নিরবচ্ছিন্ন মৌন ও শান্তি। ইহা আত্মনাশ, কেননা ইহাতে অহংকারের লেশমাত্র থাকে না। আবার ইহা পূর্ণ স্বাধীনতা। সূর্যোদয়ে নক্ষত্ররাজির এবং গ্রীষ্মাগমে মেঘের তিরোভাব ইহার উপমাস্থল। নির্বাণ ঐকান্তিক বিনাশ নহে।

নির্বাণ আমাদের অভিজ্ঞতার বিষয় নহে বলিয়া বুদ্ধ তাহার আলোচনা করিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তেবিজ্জসুত্তে তিনি নির্বাণকে ব্রহ্মার সহিত মিলন বলিয়াছেন। ব্রহ্মার সহিত মিলনের অর্থসম্বন্ধে মতভেদ আছে, কেননা বুদ্ধের মতে জগতে সকলই অস্থায়ী। কিন্তু এক স্থায়ী বস্তু যে আছে, বুদ্ধ তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, "তাহা যদি না থাকিত, তাহা হইলে জাত বস্তুর সংসার হইতে বাহির হইবার উপায় থাকিত না।"

নির্বাণ সম্বন্ধে জগদীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এই :

বুদ্ধ বলিয়াছেন, "লোকের অন্তে (লোকস্স অন্তম্) গমন করাই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়। অনন্ত আকাশপথে ধাবমান হইয়া এই লোকের অন্ত পাওয়া যায় না। যেখানে কাহারও জন্ম হয় না, কাহারও মৃত্যু হয় না, যেখানে কাহারও কোনও পরিবর্তন হয় না, সেখানে পদব্রজে যাওয়া যায় না। আবার সেখানে পৌঁছিতে না পারিলে দুঃখের অন্তও হয় না (সংযুক্ত নিকায়)। এই লোক (বিশ্ব) মানুষের দেহের মধ্যে অবস্থিত। জ্ঞান ও অনুভূতি-সমন্বিত দেহের মধ্যেই এই বিশ্ব উদ্ভূত হয়, এবং তাহার মধ্যে বিলীন হয়। যে পথে গমন করিলে লোকের (বিশ্বের) বিলয় হয়, তাহাও দেহের মধ্যেই অবস্থিত।"

বুদ্ধ বলেন, লোকের উদ্ভবই (লোক সমুদয়) দুঃখের উদ্ভব (দুঃখ-সমুদয়) [সংযুক্ত নিকায়, নিদান সংযুক্ত], এবং লোকের অন্তই দুঃখের অন্ত বা নির্বাণ। যেখানে কাহারও জন্ম হয় না, কাহারও মৃত্যু হয় না, কাহারও

পরিবর্তন হয় না, তাহা নির্বাণ ভিন্ন অন্য কিছু নহে। বুদ্ধ বলিয়াছেন, লোকের অন্ত দেহের মধ্যে, সুতরাং নির্বাণও দেহেরই মধ্যে। বুদ্ধ নির্বাণকে "তথাগতের বিজ্ঞান" বলিয়াছেন। ইহার বর্ণনায় তিনি বলিয়াছেন, ইহার কোনও নিদর্শন নাই (অনিদস্সন); ইহার স্থান নির্দেশ করা সম্ভব নহে, ইহা অনন্ত ও 'সর্বতোপহম্' (যাহা অন্য সমস্ত পদার্থ অপসারণ করে)। ইহার মধ্যে পার্থিব কোনও বস্তু নাই। হ্রস্ব বা দীর্ঘ, স্থূল বা সূক্ষ্ম, ভাল বা মন্দ, নাম বা রূপ কিছুই ইহার মধ্যে নাই।

এই 'তথাগত বিজ্ঞান'ই যে নির্বাণ, বুদ্ধঘোষ তাহা স্পষ্ট করিয়াই বলিয়াছেন। এই তথাগত বিজ্ঞানকে বুদ্ধ অনির্দেশ্য বলিয়াছেন বলিয়া অনেকে তাঁহাকে বৈনাশিক (Nihilist) বলিত, বুদ্ধ উহা বলিয়াছেন। কিন্তু মুক্ত পুরুষের গতি যে অনির্দেশ্য, মহাভারতের শান্তি-পর্বেও এক শ্লোকে (১৮১,১৯) তাহা পাওয়া যায়। যথা:

শকুন্তানামিবাকাশে মৎস্যানামিব চোদকে।
পদং যথা ন দৃশ্যতে তথা জ্ঞানবিদাং গতি॥

—আকাশে উড্ডীয়মান পক্ষীদিগের এবং জলস্থ মৎস্যদিগের গতির যেমন কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না, জ্ঞানবিদ্‌গণের গতিও তেমনি।

বুদ্ধ বলিয়াছেন, নির্বাণ পরম সুখ এবং 'অনির্দেশ্যমনন্তং সর্বতোপহং বিজ্ঞানম্'—ইহার উচ্ছেদ ও বিনাশ নাই। যাহারা অজ্ঞ অথবা বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন, তাহারাই নির্বাণকে বলে বিনাশ (অলগদ্দূপমা সুত্তঃ— মাজ্ঝিম নিকায়)। ত্রিশজন যুবককে বুদ্ধ এই নির্বাণের অনুসন্ধান করিতে এবং 'আত্মা' রূপে আবিষ্কার করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই নির্বাণ সমস্ত পরিবর্তন, ক্ষয় ও বিনাশের অতীত এবং 'স্কন্ধ'সমূহ হইতে ভিন্ন (বিনয়পিটক)। এই আত্মাকেই বুদ্ধ তাহার শিষ্যদিগকে 'আত্মদ্বীপ' করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, যে দ্বীপ কোন প্লাবনে বিধ্বস্ত বা অভিভূত হয় না।

৫

মহাভারত

উপনিষদ যুগের পরে সমাজে ও ধর্মে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়। বেদে জীবহিংসা নিষিদ্ধ হইলেও (মা হিংস্যাৎ সর্বভূতানি) যজ্ঞে পশুবলি অনুমোদিত হইয়াছিল। অনেকের মতে যজ্ঞে পশুবলির ব্যবস্থার উদ্দেশ্য

ছিল জীবহত্যার সঙ্কোচ সাধন। যজ্ঞে ভিন্ন অন্যত্র জীবহত্যা নিষিদ্ধ হওয়ায়, মাংসলোলুপদিগের মাংস খাইতে হইলে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হইত। কিন্তু যজ্ঞানুষ্ঠান অর্থশালী লোক ভিন্ন অন্যের অসাধ্য ছিল। ফলে অধিকাংশ লোকের পক্ষেই মাংসভোজন অসম্ভব হইয়াছিল, এবং জীবহত্যা সংকোচিত হইয়াছিল। পরবর্তী কালে যজ্ঞে পশুবলিও নিন্দিত হইয়াছিল। উপনিষদেই যাগযজ্ঞ নিকৃষ্ট উপাসনা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল; এবং তাহার স্থলে ধ্যানের ব্যবস্থা হইয়াছিল। অনার্য্যদিগকে সমাজে গ্রহণ করার ফলে তাহাদের মধ্যে প্রচলিত অনেক বিশ্বাস সাধারণ লোকের মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। উপনিষদের ব্রহ্মতত্ত্ব সাধারণ লোকের বুদ্ধিগ্রাহ্য ছিল না। আবার যাগযজ্ঞের প্রতি শ্রদ্ধাও হ্রাসপ্রাপ্ত হইতেছিল। এই অবস্থায় সাধারণ লোকের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া উপনিষদের তত্ত্ব-প্রচারের প্রয়োজন উপলব্ধ হইয়াছিল। বৈদিক ও ঔপনিষদ যুগেও বেদবিরোধী লোকের অভাব ছিল না। যাহারা ইহলোককেই একমাত্র সত্য বলিয়া মনে করিত এবং পরলোকে বিশ্বাস করিত না, তাহাদের প্রভাব হইতে সাধারণ লোকদিগকে রক্ষা করিবার প্রয়োজনও ব্রাহ্মণেরা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। ধর্ম্মের সারতত্ত্ব সমাজের সর্বস্তরে প্রচার এবং সমাজ-কল্যাণকর নীতির মাহাত্ম্য-খ্যাপনের জন্য উপনিষদের পরবর্তী যুগে দুইখানি মহাকাব্য দুই জন ঋষি কর্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই দুই মহা-কাব্যের নাম রামায়ণ ও মহাভারত। রামায়ণে সূর্য বংশীয় রাজাদিগের এবং মহাভারতে চন্দ্রবংশীয় রাজাদিগের কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে এবং সাধারণ জনগণের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া দর্শন, আচরণনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

মহাভারত মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস-কর্তৃক রচিত বলিয়া প্রখ্যাত। এই গ্রন্থে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের বিবরণের সঙ্গে অনেক প্রাচীন কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ইহাতে ধর্ম, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতি, আচরণনীতি প্রভৃতি বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। কথা আছে, "যাহা নাই ভারতে, তাহা নাই ভারতে"।

মহাভারত এক বিরাট গ্রন্থ। ইহার সকল ভাগ যে ব্যাসরচিত নহে, এ বিষয়ে বর্তমানে সকল পণ্ডিতই একমত। যুগে যুগে অনেক অজ্ঞাত কবি এই গ্রন্থের মধ্যে তাঁহাদের রচনা সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহার ফলে অনেক স্থলে একই ঘটনা বিভিন্নভাবে বর্ণিত দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মতে "প্রক্ষিপ্তকারদিগের রচনাবাহুল্যে আদিম মহাভারত প্রোথিত হইয়া

গিয়াছে।” উদাহরণস্বরূপ তিনি দেখাইয়াছেন, যে আদিপর্বের দ্বিতীয় অধ্যায়ে —পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে—বর্তমান মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব্বের অন্তর্ভুক্ত অনুগীতা ও ব্রাহ্মণগীতার উল্লেখ নাই। সুতরাং এই দুই অংশ যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার পর বর্তমান মহাভারতে ১০৭৩৯০ শ্লোক পাওয়া যায়। কিন্তু অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে মহাভারতের শ্লোক সংখ্যা একলক্ষ। পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে প্রত্যেক পর্বের যে শ্লোক-সংখ্যা দেওয়া আছে, তাহাতে ৮৭,৮৩০ শ্লোক হয়, একলক্ষ হয় না। কিন্তু পর্বসংগ্রহাধ্যায়ে এই প্রসঙ্গে আছে যে মহর্ষি মহাভারত রচনা করিয়া দ্বাদশ সহস্র শ্লোকাত্মক “হরিবংশ”ও রচনা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে হরিবংশকে যদি মহাভারতের অংশ বলিয়া গণ্য করা যায়, তাহা হইলেও মহাভারতের মোট শ্লোক সংখ্যা হয় ৯৬,৮৩৬, লক্ষ শ্লোক হয় না। সুতরাং বর্তমান মহাভারতে যে ১০৭৩৯০ শ্লোক পাওয়া যায় তাহার অনেকগুলি যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ থাকে না।

পূর্বোক্ত অনুক্রমণিকাধ্যায়ে লিখিত আছে ব্যাসদেব প্রথমতঃ উপাখ্যান-ভাগ ত্যাগ করিয়া ২৪০০০ শ্লোকে “ভারত-সংহিতা” রচনা করেন। ইহাই “ভারত” নামে আখ্যাত, এবং তিনি পুত্র শুককে ইহাই শিক্ষা দিয়াছিলেন। শুকদেবের নিকট বৈশম্পায়ন ইহা শিক্ষা করেন। বৈশম্পায়ন যখন জনমেজয়ের সভায় এই মহাভারত পাঠ করিয়া ছিলেন, তখন উগ্রশ্রবা তাহা শুনিয়াছিলেন, পরে উগ্রশ্রবাই নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষিগণকে তাহা শুনাইয়াছিলেন। ইহাই মহাভারতে আছে। অনুক্রমণিকাতে আছে যে ২৪০০০ শ্লোকে ভারত-সংহিতা রচনার পর ব্যাসদেব ষষ্টিলক্ষ-শ্লোকাত্মক মহাভারত রচনা করিয়া-ছিলেন। তাহার কিয়দংশ দেবলোকে, কিয়দংশ পিতৃলোকে, কিয়দংশ গন্ধর্ব-লোকে এবং মনুষ্যলোকে প্রচলিত। কিন্তু এই অনৈসর্গিক ব্যাপার-ঘটিত কথাটাই যে প্রক্ষিপ্ত, তাহাতে সন্দেহ নাই।*

মহাভারতে আছে (আদিপর্ব ৬৩।৯৫-৯৬) ব্যাসদেব বেদ ও মহাভারত পাঁচ জনশিষ্যকে শিখাইয়া ছিলেন—সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, শুক ও বৈশম্পায়ন। তাঁহারা পৃথক পৃথক ভারত-সংহিতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সুমন্তু, জৈমিনি, পৈল, ও শুক প্রচারিত ভারত-সংহিতা বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। বৈশম্পায়ন কথিত ভারত-সংহিতাই বর্তমানে মহাভারত নামে প্রচলিত আছে।

* বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণচরিত্র, নবম পরিচ্ছেদ।

মহাভারতের রচনাকাল

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খ্রী: পূ: ১৪৩০ অব্দে হইয়াছিল, ইহা বঙ্কিমচন্দ্রের মত। ব্যাসদেব কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সমকালিক। সুতরাং উক্ত যুদ্ধের পরের কয়েক বৎসরের মধ্যে মহাভারত রচিত হইয়াছিল, ইহা অনুমান করা যাইতে পারে। কিন্তু ডা: রাধাকৃষ্ণণের মতে খ্রী: পূ: ৫০০ অব্দে অথবা তাহার নিকটবর্তী কালে মহাভারত রচিত হয়, এবং বর্তমান মহাভারতের অধিকাংশই খ্রী: পূ: ২০০ অব্দ হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত একই আকারে প্রচলিত আছে। ম্যাকডনেলের মতে মহাভারতের মূল অংশ খ্রী: পূ: পঞ্চম শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু পাণিনিসূত্রে যুধিষ্ঠির, কুন্তী, বাসুদেব, অর্জুন, নকুল ও দ্রোণের নাম পাওয়া যায় এবং আশ্বলায়ন এবং সাংখ্যায়ন গৃহ্য সূত্রে মহাভারতের প্রসঙ্গ আছে। এই সকল প্রমাণ হইতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের অত্যল্পকাল পরেই যে মহাভারতের মূল অংশ রচিত হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যায়।

মহাভারতে বর্ণিত বিষয়

কুরু পাণ্ডবের যুদ্ধ মহাভারতের প্রধান বর্ণনার বিষয় হইলেও প্রাচীন অনেক কাহিনী ও কিংবদন্তী ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টাদশ পর্বে বিভক্ত এই গ্রন্থের দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ পর্বে ধর্ম, দর্শন, আচরণ নীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি নানা বিষয়ের আলোচনা আছে। ভীষ্ম-পর্বের অন্তর্গত শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌-গীতায় জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তিবাদের সমন্বয় সাধন করিয়া ভক্তিমূলক ঈশ্বরবাদ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রাচীন উপনিষৎগুলিতে ত্রিমূর্তির কথা নাই। সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকর্তা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবরূপী একই ঈশ্বরের তিন মূর্তির ধারণা উপনিষদোত্তর যুগে প্রবর্তিত হয় এবং বাসুদেব কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া সর্বত্র গৃহীত ও পূজিত হন। মহাভারত হইতে ইহা জানিতে পারা যায়। মহাভারতে কোথাও বিষ্ণু, কোথাও শিব পরমদেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

মহাভারত পঞ্চম বেদ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। স্ত্রীজাতি ও শূদ্রদিগের বেদপাঠে অধিকার ছিল না। তাহাদিগের জন্য মহাভারত রচিত হইয়াছিল। মহাভারতে সকলেরই সমান অধিকার। লোকশিক্ষা এই গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। "যতো ধর্মস্ততো জয়:" গ্রন্থের সর্বত্র ধ্বনিত হইয়াছে।

মহাভারতে দার্শনিক তত্ত্ব

মহাভারতে বহু দার্শনিক মতের বর্ণনা আছে, কিন্তু ভগবদ্গীতা ভিন্ন অন্যত্র বিভিন্ন মতের সমন্বয়ের চেষ্টা নাই। সনৎ-সুজাত অধ্যায়ে সনৎ-সুজাত ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন, "যদি জীবাত্মা ও পরমাত্মা ভিন্ন হয়, তাহা হইলে অভেদে একত্ব-সম্পাদন অসম্ভব। পরমাত্মা জলচন্দ্রের ন্যায় অজ্ঞান-প্রভাবে স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর সংযোগে জীব বলিয়া খ্যাত হন। ঔপাধিক ভেদদ্বারা তাঁহার মহত্ত্বের হানি হয় না।" "সমগ্রবেদ ও মন যাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না, সেই পরম ব্রহ্ম 'মৌন' বলিয়া অভিহিত। তিনি মৌনময়।" "এই বিশ্ব ব্রহ্মের উপাধিবিশেষ মাত্র।" "তপস্বী বেদ অনুসন্ধান না করিয়া পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া থাকেন। তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া তাঁহার উপাসনা করিবে। কিন্তু মনদ্বারা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিবে না। 'আমি দাস' এইরূপ বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিবে না, কারণ ধ্যানপরায়ণ ব্যক্তিরা ব্রহ্মের স্বরূপ প্রাপ্ত হন।" "বিদেহাধিপতি জনক বলিয়াছিলেন, আমার ঐশ্বর্য্যের পরিসীমা নাই, কিন্তু আমি যারপর নাই অকিঞ্চন। এই মিথিলা নগরী ভস্মাবশেষ হইলেও আমার কিছু মাত্র দগ্ধ হয় না।"

পঞ্চশিখ-জনদেব সংবাদে, সাংখ্যযোগ কথন, জনক-পঞ্চশিখ-সংবাদ প্রভৃতি অধ্যায়ে সাংখ্য ও যোগদর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পঞ্চশিখ-জনদেব-সংবাদে নাস্তিক জড়বাদ ও সৌগত (বৌদ্ধ) ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদ (বৌদ্ধমতের উল্লেখ হইতে এই অধ্যায় যে প্রক্ষিপ্ত, ইহা প্রমাণিত হয়) খণ্ডন করিয়া আত্মার দেহাতিরিক্ত অস্তিত্ব প্রমাণ করা হইয়াছে। পরে "মোক্ষদশাতে, যদি বিশেষ জ্ঞান না থাকে, তবে জ্ঞান ও অজ্ঞানের বিশেষ ফল কি? যখন আত্মনাশ-হেতু যমনিয়মাদি সকলই বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন লোকের প্রমত্ততা ও অপ্রমত্ততায় লাভালাভ কি? আর মোক্ষদশাতে যদি বিষয়ের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে, কিংবা থাকিলেও উহা চিরস্থায়ী না হয়, তবে কোন্ ফলের নিমিত্ত লোকে মোক্ষবিষয়ে অভিলাষ করিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হয়?" এই প্রশ্নের উত্তরে পঞ্চশিখ বলিতেছেন, "জ্ঞান-প্রভাবে বুদ্ধি, মন, প্রভৃতি নিরাকৃত হইলে অবিদ্যানাশ-জনিত স্বরূপানন্দ-প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যাহারা দৃশ্য পদার্থ কখন আত্মা হইতে পারে না বিবেচনা করিয়া অহংকার ও মমতা পরিত্যাগ করে, তাহাদিগের সাংসারিক দুঃখ নিরাশ্রয় হইয়া তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে। মোক্ষলাভার্থীদিগের কর্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য।

সুষুপ্তি সময়ে জাগ্রদবস্থার ন্যায় ইন্দ্রিয়বিষয়, মন ও বুদ্ধি একত্র সমবেত থাকে না। কিন্তু সে জন্য যে আত্মার নাশ হয়, তাহা নহে। সুষুপ্তি তমোগুণের কার্য্য। মন ও ইন্দ্রিয়াদির একত্র সংযোগকে ক্ষেত্র এবং ক্ষেত্রের মূলীভূত মনোমধ্যে যে আত্মা অবস্থান করেন তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলে।

"সাংখ্যযোগকথন" অধ্যায়ে যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করিতেছেন, "মোক্ষলাভ হইলে জন্মমৃত্যুবৃত্তান্ত স্মরণ হয় কিনা? কোন বেদে কহে মোক্ষাবস্থাতেও বিশেষ জ্ঞান থাকে, কোন বেদে কহে থাকে না। যদি জ্ঞান মাত্র না থাকে, তাহা হইলে সুষুপ্তির ন্যায় পুনরায় বিশেষ জ্ঞানের আবির্ভাব তো হইতে পারে।" উত্তরে ভীষ্ম বলিতেছেন, "জীবাত্মা যখন দ্বন্দ্ববিহীন নারায়ণাত্মক পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন, তখন আর তাঁহার পাপপুণ্য থাকে না, আর তাঁহাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক হইতে হয় না। জ্ঞানী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মুক্ত হইলেও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন দেহনিপাত পর্যন্ত তাহার শরীর মধ্যে অবস্থান করিয়া, তাঁহাকে জন্মান্তরীণ পাপপুণ্য ফল ভোগ করায়, কিন্তু সেই ফলভোগদ্বারা জীবন্মুক্তের সুখদুঃখের আবির্ভাব হয় না।" ইহা সাংখ্যমত বলিয়া কথিত হইলেও প্রচলিত সাংখ্যে পরমাত্মার কথা নাই। পরে ভীষ্ম বলিতেছেন, "পুরাকালে মহর্ষি বশিষ্ঠ রাজর্ষি করালকে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা এই সমুদায় জগৎই 'ক্ষর', দেবযানে দ্বাদশ সহস্র বৎসরে যুগ, চারি যুগে এক কল্প, দুই সহস্র কল্পে ব্রহ্মার একদিন ও একরাত্রি হয়; ব্রহ্মার দিনাবসানে রাত্রি হইলেই পৃথিবী ক্ষয় হইয়া যায়। রাত্রি প্রভাত হইলে ভগবান জাগরিত হইয়া ব্রহ্মার সৃষ্টি করেন। এই নারায়ণই হিরণ্যগর্ভ। বেদে তিনি মহান্, বিরিঞ্চি ও অজ নামে এবং সাংখ্যশাস্ত্রে বিচিত্ররূপ, এক ও অক্ষর প্রভৃতি বিবিধ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ত্রৈলোক্য ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। উনি আপনি আপনার সৃষ্টি করিবার মানস করিলে সত্ত্বপ্রধানা প্রকৃতি হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। পরে মহত্তত্ত্ব হইতে অহংকার, অহংকার হইতে সূক্ষ্ম ভূতগণ, সূক্ষ্ম ভূত হইতে স্থূল ভূতগণ, পরে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও মনের উদ্ভব হয়। এই চতুর্বিংশতি তত্ত্বাতীত সনাতন বিষ্ণুই অক্ষর। তিনি তত্ত্বমধ্যে পরিগণিত না হইলেও সকল তত্ত্বে অবস্থান করেন বলিয়া পণ্ডিতেরা তাঁহাকে পঞ্চবিংশতত্ত্ব বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন। ঐ নিরাকার সর্বশক্তিমান মহাত্মা চেতনরূপে সর্বশরীরে অবস্থান করিতেছেন। নির্গুণ হইয়াও তিনি যখন সৃষ্টিসংহারকারিণী প্রকৃতির মধ্যে একীভাব অবলম্বন করেন, তখন তিনি

শরীররূপে পরিণত হইয়া সকলের গোচর ও জন্মমৃত্যুর বশীভূত হন। তখন তাঁহার দেহে আত্মাভিমান জন্মে। ইহার পরে আছে "জ্ঞানবান্ ব্যক্তি পঞ্চবিংশতত্ত্বাতীত ষড়বিংশ পরমাত্মাকে জীবাত্মা হইতে অভিন্ন মনে করেন।" প্রচলিত সাংখ্যে ষড়বিংশ তত্ত্বের কথা নাই।

অনুগীতা পর্বাধ্যায়ে আছে "সমাধিবলে বিশ্বরূপ আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিয়া ধ্যানভঙ্গ হইলেও তাহার অভিজ্ঞতা-লাভ হইয়া থাকে। মন প্রাণের গতির অধীন; প্রাণ মনের গতির অধীন নহে। এই জন্য মনের লয়ে প্রাণের লয় হয় না। আত্মা দুই প্রকার, ক্ষর ও অক্ষর। উপাধিযুক্ত আত্মা ক্ষর, উপাধিবিহীন আত্মা অক্ষর। লোকে মহৎ তত্ত্বকে 'মতি, বিষ্ণু, জিষ্ণু, শম্ভু, বুদ্ধি, প্রজ্ঞা, উপলব্ধি, খ্যাতি, ধৃতি ও স্মৃতি প্রভৃতি নামে নির্দেশ করিয়া থাকে।...ঐ মহৎতত্ত্বের হস্ত, পদ, চক্ষু, মস্তক, মুখ, কর্ণ, সর্বত্র বিদ্যমান। উনি সকল স্থানে ব্যাপ্ত হইয়া আছেন।......যে মহাত্মা গুহাশায়ী, বিশ্বরূপী, বুদ্ধিমান ব্যক্তিদিগের একমাত্র গতি, পুরাতন পরম পুরুষ মহৎতত্ত্বের গতি সবিশেষ অবগত হইতে পারেন...তিনি বুদ্ধিতত্ত্বকে অতিক্রম করিয়া অবস্থান করেন।" এই অধ্যায়ের অন্যত্র নানাবিধ দার্শনিক মতের উল্লেখ আছে। "কোন কোন ব্যক্তি আত্মার অস্তিত্বে সংশয় করেন। কাহারও কাহারও ঐ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই।....কেহ কেহ আত্মাকে অনিত্য, কেহ কেহ নিত্য বলেন। কেহ বলেন আত্মা ক্ষণভঙ্গুর, কেহ কেহ তাহাকে একমাত্র বস্তু বলেন। কেহ কেহ প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কেহ কেহ পুরুষকে প্রকৃতির সহিত মিলিত বলেন। জ্যোতির্বিদ পণ্ডিতেরা দেশ ও কালকে চিরস্থায়ী বলিয়া কীর্তন করেন। কোন কোন ব্যক্তির মতে এই মত নিতান্ত হেয়।...কেহ কেহ কর্মানুষ্ঠানের, কেহ কেহ কর্মত্যাগের প্রশংসা করেন। কেহ কেহ সতত অহিংস, কেহ কেহ হিংসাপরায়ণ।...."

ভগবদ্গীতা অধ্যায়ে যে দর্শন বিবৃত হইয়াছে, তাহা পরে আলোচিত হইবে। মহাভারতে বৌদ্ধ ও দিগম্বর জৈনদিগের উল্লেখ আছে। গ্রন্থের সর্বত্র বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত এবং নাস্তিক মত নিন্দিত হইয়াছে। কিন্তু দুই এক স্থলে বেদ-সম্বন্ধে সংশয়ও প্রকাশিত হইয়াছে।

সমাজনীতি

এই যুগে বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত এবং সমাজ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণে বিভক্ত হইয়াছিল। ক্রোধবর্জন, সত্যকথন, সম্যক্‌রূপে ধনবিভাগ, ক্ষমা, স্বীয় পত্নীতে পুত্রোৎপাদন, পাতিব্রত্য, অহিংসা, সরলতা ও ভৃত্যের পোষণ—এই নয়টি সর্বধর্ম্মের সাধারণ ধর্ম্ম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছিল। ব্রাহ্মণের প্রধান ধর্ম্ম ইন্দ্রিয়দমন ও বেদাধ্যয়ন। শান্তস্বভাব, জ্ঞানবান ব্রাহ্মণ অসৎকার্য্যের অনুষ্ঠান ত্যাগ করিয়া সৎপথে থাকিয়া যদি ধন লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে দারপরিগ্রহপূর্বক সন্তান-উৎপাদন, দান ও যজ্ঞানুষ্ঠান তাঁহার অবশ্য কর্তব্য। ধন বিভাগ করিয়া ভোগ করাই সাধু ব্যক্তির কর্তব্য। ব্রাহ্মণেরা বেদ রক্ষা করিয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহারা ক্ষত্রিয়দিগের নমস্য। কিন্তু অত্যাচারপরায়ণ ব্রাহ্মণের দণ্ডবিধান অবশ্য কর্তব্য। অধর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্রাহ্মণকে প্রহার করিলে অধর্ম্ম হয় না। পাপাচারী ব্রাহ্মণকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিবে।

ধনদান, যজ্ঞানুষ্ঠান, অধ্যয়ন ও প্রজাপালন ক্ষত্রিয়ের প্রধান ধর্ম্ম; যাচ্ঞা ও যাজন নিষিদ্ধ। দস্যুবধে উদ্যত হওয়া ও সমরে পরাক্রম প্রকাশ ক্ষত্রিয়ের অবশ্য কর্তব্য। রাজা অন্য কোনও কর্ম করুন বা না করুন, আচারনিষ্ঠ হইয়া প্রজাপালন করিলেই ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইতে পারেন।

দান, অধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, সদুপায়ে ধন-সঞ্চয় এবং পুত্র-নির্বিশেষে পশুপালন বৈশ্যের নিত্যকর্ম্ম। বৈশ্য যদি অন্যের ধেনুর রক্ষক হয়, তাহা হইলে ছয়টি ধেনুরক্ষার বিনিময়ে একটি ধেনুর দুগ্ধ, শত ধেনুরক্ষার জন্য বৎসরে একটি গো-মিথুন পাইবে। অন্যের ধন লইয়া বাণিজ্যে লিপ্ত হইলে লব্ধ ধনের সপ্তম ভাগ এবং কৃষিকার্যে প্রবৃত্ত হইলে উৎপন্ন শস্যের সপ্তমাংশের একাংশ বেতনস্বরূপ গ্রহণ করিবে।

তিন বর্ণের পরিচর্য্যাই শূদ্রের কর্তব্য। রাজাদেশ ব্যতীত অর্থ-সঞ্চয় শূদ্রের পক্ষে নিষিদ্ধ। শূদ্রের ভরণপোষণ এবং ছত্র, বেষ্টন, শয়ন, আসন, উপানৎযুগল, চামর ও বস্ত্র প্রদান করা অন্যান্য বর্ণের অবশ্য কর্তব্য।

ব্রাহ্মণ হইতেই অন্য তিন বর্ণ উৎপন্ন হইয়াছে। এই জন্য ঐ তিন বর্ণের স্বভাবতঃই যজ্ঞে অধিকার আছে। মানস যজ্ঞে সকল বর্ণেরই অধিকার আছে। ব্রাহ্মণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ব্রাহ্মণের জ্ঞাতিস্বরূপ। সকল বর্ণই সর্বপ্রকার যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে পারেন।

বেদবিৎ ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থাশ্রমকে সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ বলেন। যিনি ধর্ম্মপথে থাকিয়া, ধন উৎপাদন করিয়া যজ্ঞে ব্যয় করেন, তিনি সাত্ত্বিক সন্ন্যাসী। যিনি গার্হস্থ্য সুখ বর্জন করিয়া মোক্ষ-কামনায় বনে ভ্রমণ করতঃ দেহত্যাগ করেন, তিনি তামস সন্ন্যাসী। আর যে জিতেন্দ্রিয় ঋষি বৃক্ষমূলে অবস্থান করিয়া কাহারও নিকট কিছু প্রার্থনা না করিয়া ভিক্ষায় পর্যটন করেন, তিনি ভিক্ষুক সন্ন্যাসী। গৃহস্থাশ্রম ব্রহ্মচর্য্যাদি তিন আশ্রমের তুল্য।

আচরণনীতি

মহাভারতে বহুস্থানে সদাচারের মহিমা কত্তিত হইয়াছে। সদাচারের আদর্শ-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে বেদ বিভিন্ন, স্মৃতি বিভিন্ন, মুনিদিগের বিভিন্ন মত। ধর্ম্মের তত্ত্ব গুহায় নিহিত; মহাজনেরা যে পথে গিয়াছেন, তাহাই উৎকৃষ্ট পন্থা। সত্য সকল ধর্ম্মের সার। সত্যই তপঃ, যাগযজ্ঞ ও পরব্রহ্মস্বরূপ। একমাত্র সত্যেই সকল প্রতিষ্ঠিত। মানদণ্ডের একদিকে সহস্র অশ্বমেধ ও অন্যদিকে সত্য আরোপিত হইলে সহস্র অশ্বমেধ অপেক্ষা সত্যই গুরুতর হয়। কিন্তু যেখানে সত্য মিথ্যারূপে এবং মিথ্যা সত্যরূপে পরিণত হয়, সেখানে সত্য কথা না বলিয়া মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ করা কর্তব্য। প্রাণিগণের অভ্যুদয়, ক্লেশনিবারণ ও পরিত্রাণের জন্যই ধর্ম্মের সৃষ্টি। অতএব যাহাদ্বারা প্রজাগণ অভ্যুদয়শালী, ক্লেশবিহীন ও পরিত্রাণপ্রাপ্ত হয়, তাহাই ধর্ম্ম।

ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ ইহারা পুরুষার্থ। ইহাদের মধ্যে ধর্ম্ম মোক্ষলাভের উপায়। মোক্ষই পরম পুরুষার্থ। ইহা ধর্ম্মদ্বারা লভ্য। মোক্ষলাভের উপায়-স্বরূপ যে সকল নিয়ম উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহাই মোক্ষধর্ম্ম।

সকলেই সুখ কামনা করে এবং দুঃখ পরিহারের জন্য চেষ্টা করে। কিন্তু সুখ ও দুঃখ উভয়ই অনিত্য। সুখদুঃখে সমতা, সুখে নিস্পৃহতা ও দুঃখে অনুদ্বিগ্ন থাকা - ইহাই শান্তিলাভের উপায়।

অহিংসা-সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে, "অহিংসাই মানুষের পরম ধর্ম্ম, পরম দান, পরম তপ, পরম যজ্ঞ, পরম বল, পরম মিত্র, পরম সুখ, পরম সত্য, পরম জ্ঞান। পৃথিবীস্থ সমুদায় বস্তুদানের ফলও অহিংসা-ফল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট নহে। পৃথিবীতে আত্মা অপেক্ষা প্রিয়তর কিছু নাই। অতএব সমস্ত প্রাণীর আত্মাতে দয়াবান হওয়া কর্তব্য। মাংসভোজিগণ নরকে গমন করে এবং বার বার তির্য্যক্ যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে এবং ভূমিষ্ঠ হইয়া অন্য-কর্তৃক আক্রান্ত ও নিহত হয়। যজ্ঞ ব্যতীত অন্য কার্য্য উপলক্ষ্যে পশুহিংসা করিলে রাক্ষসবৎ ব্যবহার করা হয়।

তবে মৃগয়াকালে মানুষের মনে এই ভাবের উদয় হয় যে, হয় মৃগেরা আমাকে বিনাশ করুক, না হয় আমি উহাদের সংহার করিব। এই জন্য মৃগয়া পাপজনক নহে।

সকলেই সুখ কামনা করে, কিন্তু সুখ পুরুষার্থ নহে। কামনার পরিতৃপ্তি-দ্বারা কামনার শান্তি হয় না। যত পাওয়া যায়, তৃষ্ণা ততই বর্দ্ধিত হয়। "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ঃ এবাভিবর্দ্ধতে॥' কাম্য বস্তুর উপভোগে কাম শান্ত হয় না। আগুনে ঘৃত ঢালিলে যেমন অগ্নি বর্দ্ধিত হয়, উপভোগের ফলেও তেমনি কামনা বর্দ্ধিত হয়। সমাজের মঙ্গলের জন্য ধর্ম্মের প্রয়োজন, কিন্তু ধর্ম্মের ফল সুখ নহে। "যতো ধর্ম্মস্ততো জয়:" মহাভারতে উক্ত হইয়াছে বটে কিন্তু কৌরবদিগের পরাজয়ে ধর্ম্মের যে জয় ঘোষিত হইয়াছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে জয় নহে। পুত্রগণ হত, বন্ধুগণ সমরক্ষেত্রে পতিত, সমগ্র ভারতে গৃহে গৃহে আর্তনাদ। এই অবস্থায় রাজ্যলাভকে যুধিষ্ঠির জয় বলিয়া গণ্য করেন নাই এবং তাহাতে সুখবোধ করেন নাই। তবুও মহাভারতকার ধর্ম্মকেই আশ্রয়ণীয় বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন, কেননা মানবসমাজ ধর্ম্মদ্বারাই বিধৃত।

বেদ ও উপনিষদের মতো মহাভারতেও কর্ম্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের একটি বিশিষ্ট স্থান আছে। এই কর্ম্মবাদের সহিত ইচ্ছার স্বাধীনতার সামঞ্জস্য বিধান করা হইয়াছে। মানুষের কর্ম্মদ্বারা পূর্ব্বকৃত কর্ম্ম রূপান্তরিত হয়। পূর্বজন্মে কৃত যে সকল কর্ম্মের ফল বর্তমান জীবনে আরব্ধ হইয়াছে, তাহারা প্রারব্ধ কর্ম্ম, এবং যে সকল কর্ম্ম ভবিষ্যতে ফলদানের জন্য সঞ্চিত আছে, তাহারা সঞ্চিত কর্ম্ম। বর্তমান জীবনের কর্ম্ম আগামী কর্ম্ম। প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল হইতে নিষ্কৃতি নাই, কিন্তু সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্ম জ্ঞানাগ্নিদ্বারা দগ্ধ করা সম্ভবপর।

ঈশ্বরের অনুগ্রহেই সঞ্চিত ও আগামী কর্ম্মের ধ্বংস হইতে পারে। ঈশ্বরই কর্ম্মফলদাতা।

৬

রামায়ণ

রামায়ণ মহর্ষি বাল্মীকির রচিত। ইহাতে সূর্য্যবংশীয় রাজগণের কাহিনী বর্ণিত হইলেও, প্রধানতঃ রামের জীবনচরিত্রই কীর্ত্তিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ সপ্তকাণ্ডে বিভক্ত। তাহাদের মধ্যে আদি ও উত্তর কাণ্ড বাল্মীকির রচিত

কিনা, সে সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ কাণ্ডে রামকে আদর্শ মানবরূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে, তাঁহার অবতারত্বের কথা নাই। প্রথম ও সপ্তম কাণ্ডে তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলা হইয়াছে।

রামায়ণে বৈদিক দেবতাদিগের সঙ্গে কয়েকটি নূতন দেবতার নাম পাওয়া যায়। গঙ্গা, লক্ষ্মী, উমা ও কার্ত্তিকেয়, এই নূতন দেবতাদিগের অন্তর্গত। বৈদিক যজ্ঞের সঙ্গে সর্প, নদী ও বৃক্ষের উপাসনার কথাও দেখিতে পাওয়া যায়। শক্, যবন ও পহ্লব জাতির উল্লেখও আছে।

চিত্রকূট পর্ব্বতে রাম যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন ভরত তাঁহাকে অযোধ্যায় ফিরাইয়া আনিবার জন্য বহুলোকের সহিত তথায় গমন করেন। জাবালি নামক এক ব্রাহ্মণ তখন পিতার সত্য পালনের জন্য বনবাসের ক্লেশ সহ্য করা মূঢ়তা, ইহা প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে যে দর্শন তাহার নিকট ব্যাখ্যা করেন, তাহা চার্বাক দর্শন" "স নাস্তি পরমিত্যেতৎ, কুরু বুদ্ধিং মহামতে, প্রত্যক্ষং যৎ, তৎ আতিষ্ঠ, পরোক্ষং পৃষ্ঠতঃ কুরু।" ইহার পরে কিছুই নাই। যাহা প্রত্যক্ষ তাহাই আশ্রয় কর, যাহা পরোক্ষ তাহা পরিহার কর। ইহা স্পষ্টই নাস্তিক জড়বাদ। ইহাদ্বারা প্রমাণিত হয় যে রামায়ণ রচনার পূর্ব্বেই চার্বাক দর্শন উদ্ভূত হইয়াছিল। রামায়ণে বুদ্ধের নামও পাওয়া যায়। বুদ্ধ নাস্তিক বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। মহাভারতে বুদ্ধের উল্লেখ নাই। (যদিও সৌগত ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদের খণ্ডন আছে, কিন্তু এই অধ্যায় প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে)। ইহা হইতে মহাভারতের পরে রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, ইহা মনে করা যায়। কিন্তু রামায়ণে বর্ণিত ঘটনা মহাভারতের যুদ্ধের পূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল, ইহাই সম্ভবপর।

রামায়ণে দার্শনিক আলোচনা বিশেষ নাই। আর্য্যগণ যখন পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভারতে বসতি স্থাপন করিতেছিলেন, তখনকার প্রচলিত ধর্ম্ম ও আচার-ব্যবহারের পরিচয় এই গ্রন্থ হইতে পাওয়া যায়। ইহাতে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের গৌরব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কেহ কেহ ইহাকে বৌদ্ধ সন্ন্যাস প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই গ্রন্থ বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের এক প্রধান ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত।

৭

মনুসংহিতা

উপনিষদোত্তর যুগের আর এক গ্রন্থ মনুসংহিতা। ঋগ্বেদে এক মনুর উল্লেখ আছে। মনু মানবজাতির পিতা, তিনিই প্রথম যাজ্ঞিক। শতপথ ব্রাহ্মণেও মনুর উল্লেখ আছে। কাঠক সংহিতা, তৈত্তিরীয় সংহিতা ও তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে এই বচনটি পাওয়া যায়—"যৎ বৈ কিঞ্চ মনুঃ অবদৎ, তৎ ভেষজম্।"—মনু যাহা বলিয়াছেন, তাহা ঔষধের ন্যায় হিতকারী। সুতরাং মনুপ্রণীত একখানা সংহিতা যে প্রাচীনকালে রচিত হইয়াছিল, তাহা নিশ্চিত। সার উইলিয়ম জোন্সের মতে ১২৮০ খৃঃ পূঃ অব্দ মনুসংহিতার রচনা কাল। শ্লেগেল বলেন ১০০০ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের পরে এই গ্রন্থ রচিত, ইহা বলা যায় না। মনিয়ার উইলিয়ম্সের মতে ইহা খৃঃ পূঃ ৫০০ অব্দের নিকটবর্ত্তী কালে রচিত। ওয়েবর বলেন ইহা মহাভারতের সর্ব্বাপেক্ষা পরবর্ত্তী কালে রচিত অংশেরও পরবর্ত্তী। মাক্স মূলারের মতে বর্ত্তমান মনুসংহিতা প্রাচীন সংহিতার ভিত্তির উপর রচিত। প্রাচীন সংহিতা ছিল গদ্যে রচিত। মনুসংহিতার ভাষা ও রচনাপ্রণালী হইতে ইহাকে খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমান সংহিতা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত হইলেও প্রাচীন একখানি মনুসংহিতা যে ছিল, এবং বর্ত্তমান সংহিতা সেই প্রাচীন সংহিতা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে, ইহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। মহাভারতে আছে—পুরাণ সকল, মানব ধর্ম্মশাস্ত্র, বেদবেদাঙ্গ ও চিকিৎসা শাস্ত্র ঈশ্বরের আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত। মনুসংহিতাই মানব ধর্ম্মশাস্ত্র। এই গ্রন্থ যে মনুর রচিত নহে, গ্রন্থের প্রারম্ভেই তাহার প্রমাণ আছে। ঋষিগণ মনুর নিকট উপস্থিত হইয়া সকল বর্ণের ধর্ম্ম জানিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, মনু প্রথমে জগতের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া পরে বলিয়াছিলেন, "ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে এই শাস্ত্র প্রস্তুত করিয়া আমাকে অধ্যয়ন করাইয়াছিলেন, আমি মরীচি প্রভৃতি মুনিগণকে অধ্যয়ন করাইয়াছি। ভৃগু আমার নিকট এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি ইহা তোমাদিগকে শুনাইবেন।" ইহার পরে যাহা আছে, তাহা ভৃগুবাক্য। গ্রন্থ শেষে এই শাস্ত্রকে "ভৃগু-প্রোক্ত মানব শাস্ত্র" বলা হইয়াছে। মনুসংহিতার টীকাকার গোবিন্দরাজ লিখিয়াছেন, "এই গ্রন্থে যাহা কিছু বলা হইয়াছে, তাহা অনাদি পরম্পরায় প্রাপ্ত যে সকল স্মার্ত্ত ধর্ম, তাহাই কোনও ভৃগু-শিষ্য বলিয়াছেন।" ইহা হইতে বুঝা যায়

ভৃগুও এই গ্রন্থের রচয়িতা নহেন। তাঁহার কোন শিষ্যই ইহা রচনা করিয়াছেন।

এই ভৃগুপ্রোক্ত মনুসংহিতা ব্যতীত "বৃদ্ধ মনু" ও "বৃহন্মনু" নামে প্রসিদ্ধ আরও এক বা দুইখানি ধর্ম্ম সংহিতা প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল। সেই গ্রন্থ এখন বিলুপ্ত হইয়াছে। কতকগুলি শ্লোকমাত্র অবশিষ্ট আছে। মহাভারতে, পুরাণে, ধর্ম্মসূত্রাদিতে বহু স্থানে মনুর নাম পাওয়া যায়। সুতরাং মনু নামে একজন ধর্ম্মশাস্ত্রকার যে ছিলেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ বর্ত্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান মনুসংহিতায় প্রাচীন গ্রন্থের সার সংকলিত হইয়াছে, ইহাই সম্ভবপর।

মনুসংহিতার দশম অধ্যায়ে যবন, শক, পারদ, পহ্লব প্রভৃতি জাতির উল্লেখ আছে। ইহা হইতে অনেকে বর্ত্তমান মনুসংহিতা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর পরে রচিত বলিয়া মনে করেন।

সে যাহা হউক গ্রন্থের প্রথমে যে সৃষ্টির বর্ণনা আছে, তাহা এইরূপ:

এই জগৎ প্রথমে "তমোভূত", অপ্রজ্ঞাত, অলক্ষণ, অপ্রতর্ক্য, অবিজ্ঞেয় ছিল। যেন প্রসুপ্ত ছিল। তারপরে স্বয়ম্ভু অব্যক্ত বৃত্তৌজা (অব্যাহত সৃষ্টি-সামর্থ্যসম্পন্ন) তমোনুদ (প্রকৃতির প্রেরক বা চালক) ভগবান মহাভূতাদি সহ মহদাদি তত্ত্ব স্থূলরূপে ব্যক্ত করিয়া স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইলেন। যিনি অতীন্দ্রিয়, সূক্ষ্ম, অব্যক্ত, সনাতন, সর্ব্বভূতময়, অচিন্ত্য ছিলেন, তিনি (মহদাদি কার্য্যরূপে) আবির্ভূত হইলেন। তিনি স্বীয় শরীর (প্রকৃতিরূপে পরিণত) হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া অভিধ্যান (সংকল্প) করিয়া প্রথমে জলের সৃষ্টি করিলেন এবং তাহাতে (আপন শক্তিরূপ) বীজ অর্পণ করিলেন। সেই বীজ সূর্য্যপ্রভামণ্ডিত সুবর্ণের দ্বারা নির্ম্মিতের ন্যায় একটি অণ্ড হইল। সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা তাহাতে শরীর গ্রহণ করিলেন। সেই অণ্ড দ্বিধা বিভক্ত হইল এবং তাহার ঊর্দ্ধখণ্ড স্বর্গ এবং অপর খণ্ড পৃথিবী হইল এবং মধ্যভাগ আকাশ, অষ্ট দিক ও সমুদ্র হইল। পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন ব্রহ্মা সৎ ও অসৎ-স্বভাব মন ও অহংকার সৃষ্টি করিলেন। তাহার পূর্ব্বে মহৎ তত্ত্বের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। পরে সত্ত্ব-রজ-তমোগুণ যুক্ত অন্যান্য পদার্থ সৃষ্টি করিলেন।

এই সৃষ্টি তত্ত্বের সঙ্গে সাংখ্যের সৃষ্টি তত্ত্বের সাদৃশ্য থাকিলেও ইহাতে পরমাত্মাই সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া বর্ণিত। নিরীশ্বর সাংখ্যের সহিত এইখানে প্রভেদ। সাংখ্য এখানে সেশ্বর রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। মনুসংহিতা প্রধানতঃ

ধর্ম্মশাস্ত্র। ইহাতে প্রাচীন আচার ও ব্যবহার সর্ব্বকালে পালনীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। বর্ণ-ধর্ম্মকে ঈশ্বর-সৃষ্ট বলা হইয়াছে, এবং বৈদিক যজ্ঞের বিধান দেওয়া হইয়াছে। "সন্তানার্থে মানব এবং প্রজনার্থে স্ত্রী সৃষ্ট হইয়াছে।" "পুরুষ একলা নহে, ভার্য্যা, আপনি ও অপত্য এই তিনে মিলিয়া পুরুষ সংজ্ঞা হয়। পুরুষ একাকী অর্দ্ধেক—ভার্য্যাসহ সম্পূর্ণ হয়। যে ভর্ত্তা সেই স্ত্রী।" "দ্বিজাতিরা বেদাধ্যয়ন, সন্তানোৎপাদন ও যজ্ঞের অনুষ্ঠান না করিয়া যদি মোক্ষ ইচ্ছা করেন, তবে নরকে গমন করেন।" "যে দ্বিজাতিগণ প্রাণিমাত্রের কোনও ভয় উৎপাদন করেন না, তাঁহাদের দেহনাশ হইলে কোনও ভয় থাকে না।" "ইহলোকে আমি যাঁহার মাংস ভোজন করিতেছি পরলোকে সে আমাকে ভক্ষণ করিবে।" "পণ্ডিত লোকেরা কেহ অপকার করিলে প্রত্যপকার না করিয়া ক্ষমা করেন।" যদি পাপকারী কোনও লোকে প্রকাশ করে "আমি অতি পাপী", তাহা হইলে অনুতাপ, তপস্যা ও অধ্যয়নদ্বারা সে পাপ হইতে মুক্ত হয়। "পাপ করিয়া কেহ যদি অনুতাপ করে, এবং আর পাপ করিব না, এইরূপ সংকল্প থাকে, তবে সে পাপ হইতে মুক্ত হয়।" ধর্ম্মের লক্ষণ সম্বন্ধে আছে—

"বেদঃ স্মৃতিঃ সদাচারঃ স্বস্য চ প্রিয়মাত্মনঃ
এতৎ চতুর্বিধং প্রাহুঃ সাক্ষাৎ ধর্ম্মস্য লক্ষণম্।"

বেদ, স্মৃতি, সদাচার এবং আত্মতুষ্টি, ইহাই ধর্ম্মের লক্ষণ। বেদ, স্মৃতি ও শিষ্টাচারের সঙ্গে নিজের তৃপ্তিকেও ধর্ম্মের নিয়ামক বলা হইয়াছে। বেদ, স্মৃতি ও শিষ্টাচার অনুমোদিত হইলেও কোনও কর্ম্ম হইতে যদি আত্মতুষ্টি না হয়, অর্থাৎ স্বকীয় ধর্ম্মবিবেক যদি তাহা অনুমোদন না করে, তাহা হইলে তাহা ধর্ম্ম নহে। যজ্ঞে পশুবধের বিধি থাকিলেও, যদি তাহা কাহারও ধর্ম্মবুদ্ধির বিরোধী হয়, তাহা হইলে পশুবলি তাহার কর্ত্তব্য নহে। ইহাদ্বারা সামাজিক নিয়মের পরিবর্ত্তনের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন মনুসংহিতায় একদিকে যেমন ব্রাহ্মণ জাতির শ্রেষ্ঠত্ব ও গৌরব খ্যাপিত হইয়াছে, তেমনি নিম্ন স্তরের জাতিদিগের প্রতি একটা অবজ্ঞা প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু মনুসংহিতায় ব্রাহ্মণ্যেরই গৌরব কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম হইলেও যদি কেহ ব্রাহ্মণ্য-বর্জ্জিত হয়, তাহাকে শূদ্র বলা হইয়াছে। মনুসংহিতায় আছে "কাষ্ঠনির্ম্মিত হস্তী, চর্ম্মনির্ম্মিত মৃগ যেমন বস্তুতঃ হস্তীও নহে, মৃগও নহে, তাহারা কেবল নামেই হস্তী বা মৃগ, সেইরূপ যে ব্রাহ্মণ হইয়া বেদাধ্যয়ন করে না, সেও নামমাত্রই ব্রাহ্মণ (২।১৬৮)। এই প্রসঙ্গে

মনে রাখিতে হইবে, যে বেদের রক্ষার ভার ব্রাহ্মণের উপরই ন্যস্ত ছিল এবং ব্রাহ্মণ ছিলেন আর্য্য-সংস্কৃতির ধারক ও পোষক। অর্থ-সঞ্চয়ের দ্বার তাহার নিকট রুদ্ধ ছিল। জাতীয় সংস্কৃতির রক্ষণ ও পোষণের জন্য ব্রাহ্মণের প্রয়োজন ছিল। এই জন্যই ব্রাহ্মণের রক্ষণের জন্য কর্ত্তব্যানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণের প্রতি সমাজের কর্ত্তব্য বিশেষ ভাবে ব্যবস্থিত হইয়াছিল। কিন্তু কর্ত্তব্য-পরাঙ্মুখ অসদাচারী ব্রাহ্মণের নির্ব্বাসনের ব্যবস্থাও হইয়াছিল।

৮

পাশুপত দর্শন

"ত্রয়ী, সাংখ্যং, যোগঃ, পশুপতিমতং, বৈষ্ণবমিতি" এই পাঁচ বিভিন্ন প্রস্থানের কথা মহিম্ন স্তোত্রে উল্লিখিত আছে। ইহাদের মধ্যে পশুপতি-মত যে সাংখ্য ও যোগের পরবর্ত্তী, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা বৈষ্ণব মতের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমানের কারণ আছে। পশুপতি বেদের রুদ্র দেবতা। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে তিনিই হর ও শিব। বেদে রুদ্রের ভীষণ ও শান্ত উভয় মূর্ত্তিই প্রকটিত হইয়াছে। ঈশ্বর কেবল করুণাময় নহেন, তিনি ভীষণও বটেন। ইহা স্বীকার না করিলে তাঁহার বাহিরে একটি অমঙ্গল তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়। তাই শ্বেতাশ্বতর উপনিষদের ঋষি ব্রহ্মকে যেমন অক্ষর ও অমৃত এবং তাঁহার তনু শিবা (মঙ্গলময়ী), অঘোরা (অভয়া), অপাপকাশিনী (পুণ্য-প্রকাশিনী), শন্তমা (সুখতমা) বলিয়াছেন, তেমনি তাঁহার অস্ত্রদ্বারা জগৎকে ধ্বংস না করিতে এবং পুত্র, পৌত্র, গো, অশ্ব ও বলবান ভৃত্যদিগকে বধ না করিতেও প্রার্থনা করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদের শতরুদ্রীয়ে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে, "পিতা নোঽসি, পিতা নো বোধি। নমোঽস্তু মা মা হিংসি।" তুমি আমাদের পিতা। পিতৃরূপে আমাদিগকে জ্ঞানদান কর। তোমাকে নমস্কার। আমাদিগকে হিংসা (বিনাশ) করিও না। তাঁহাকে পিতা বলিয়া ডাকিলেও, তিনি যে বিনাশ করিতে পারেন, এ ধারণা রহিয়াছে।

বেদে একাধিক রুদ্রের উল্লেখ আছে—ভব, সর্ব্ব, পশুপতি, মহাদেব, ঈশান, রুদ্র, উগ্র। শত পথ ব্রাহ্মণে আছে, এ সকল এক রুদ্রের বিভিন্ন নাম। শ্বেতাশ্বতরে আছে "একো হি রুদ্র, ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ, য ইমান্ লোকান্ ঈশনীভিঃ ঈশতে"—রুদ্র একমাত্র, (ব্রহ্মবিৎগণ) দ্বিতীয় স্বীকার

করেন না। তিনি এই সকল লোক নিজ শক্তিসমূহদ্বারা নিয়মিত করিতেছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে শিবই যে জগতের আদি তত্ত্ব, তাহা নানা ভাবে বিভিন্ন স্থানে প্রকাশিত হইয়াছে। "সৃষ্টি যখন হয় নাই, তখন দিবাও নহে, রাত্রিও নহে। তখন সৎও ছিল না, অসৎও ছিল না। ছিলেন কেবল শিব। তিনিই অক্ষর, সবিতুঃ বরেণ্যং। তাঁহা হইতেই পুরাণ প্রজ্ঞা প্রসৃত হইয়াছিল" (৪।১৮)। "যিনি দেবতাদিগের প্রভব ও উদ্ভব, যিনি মহর্ষি (সর্ব্বজ্ঞ), বিশ্বাধিপ, রুদ্র, যিনি প্রথমে হিরণ্যগর্ভকে উৎপাদন করিয়াছিলেন, তিনি শুভ বুদ্ধির সহিত আমাদিগকে যুক্ত করুন (৩।৪)।

শৈবধর্ম্ম বেদ হইতে উদ্ভূত এবং প্রাচীন। কালে ইহা নানা রূপ ধারণ করিয়া নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়িলেও বেদই ইহার ভিত্তি। ইহার দর্শন পাশুপত দর্শন নামে প্রসিদ্ধ। মাধবাচার্য্য তাঁহার "সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহে" পাশুপত মতকে নকুলীশ পাশুপত মত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উৎকীর্ণ এক লিপিতে বর্ণনা আছে, যে শিব ভট্টারক শ্রীনকুলীশ নামে লতাদেশে অবতীর্ণ হন এবং কুশিক, গর্গ, কৌরুষ্য ও মৈত্রেয় নামে তাঁহার চারি জন শিষ্য হইতে পাশুপত ধর্ম্মের চারি শাখা উৎপন্ন হয় *

নকুলীশ পাশুপত দর্শন মাধবাচার্য্যকর্তৃক নিম্নোক্ত ভাবে বিবৃত হইয়াছে।

বৈষ্ণব মতে ভগবানের দাসত্বাদি করিতে হয়। সুতরাং উহা পরতন্ত্র এবং দুঃখজনক। উহাতে দুঃখের অন্ত হয় না। মুক্তাত্মা পুরুষ সমস্ত দুঃখবীজ উন্মূলিত করিয়া পরমেশ্বরের ন্যায় হন।

লাভ, মল, উপায়, দেশ, অবস্থা, বিশুদ্ধি, দীক্ষাকারিক ও বল এই আটটিকে পঞ্চক বলে। এই আট ও তিন বৃত্তির বিশেষত্ব যিনি অবগত আছেন এবং তাহাদের সংস্কার করিতে সমর্থ, তাঁহাকে গুরু বলে।

উপায়-প্রয়োগদ্বারা যে ফললাভ হয়, তাহা লাভ। এই ফল পাঁচটি— জ্ঞান, তপস্যা, নিত্যত্ব, স্থিতি ও শুদ্ধি। যে দোষযুক্ত ভাব আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহার নাম "মল"। মিথ্যা জ্ঞান, অধর্ম্ম, শক্তি, হেতু ও চ্যুতি, ইহারা পশুত্ব-মূলক ও হেয়। ইহারাই মল।

যাহাদ্বারা শুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহাই উপায়। যাহাদ্বারা অর্থানুসন্ধান-পূর্ব্বক জ্ঞান ও তপস্যার বৃদ্ধি হয়, তাহার নাম দেশ। গুরুজন, শ্মশান

---

* সুরেশ চন্দ্র সিংহে শৈব ধর্ম্ম—১২ পৃঃ

গুহা ও রুদ্র ইহারাই দেশ। যত দিন লাভ-প্রাপ্তি না হয়, তত দিন এই সকলের একটিতে অবস্থানকে "অবস্থা" বলে। অবস্থা পাঁচটি—ব্যক্ত, অব্যক্ত, জপ, আদান ও নিষ্ঠা।

মিথ্যা জ্ঞানাদি পঞ্চ মলের আত্যন্তিক বিনাশের নাম বিশুদ্ধি। দীক্ষা-কারিক পঞ্চক পাঁচটি—দ্রব্য, কাল, ক্রিয়া, মূর্ত্তি ও গুরু। গুরুভক্তি, চিত্তের প্রসাদ, সুখ-দুঃখাদি দ্বন্দ্ব-জয়, ধর্ম্ম ও অপ্রমাদ এই পাঁচটির নাম বল। পঞ্চবিধ মলের লঘুকরণের উদ্দেশ্যে মান ও অপমানের বিরোধী অন্ন-অর্জ্জনের উপায়ের নাম বৃত্তি। তাহা ত্রিবিধ ভিক্ষালব্ধ, উৎসৃষ্ট ও যথালব্ধ।

"পশু" শব্দের অর্থ জীব। তাহা কার্য্য (কারণ হইতে উদ্‌ভূত) ও পরতন্ত্র। "পতি" শব্দের অর্থ ঈশিতা, প্রভু, জগৎ-কারণ ঈশ্বর।

দুঃখান্ত দ্বিবিধ—অনাত্মক ও সাত্মক। সর্ব্ব দুঃখের অত্যন্ত ছেদই অনাত্মক দুঃখনিবৃত্তি। দর্শন, শ্রবণ, মনন, বিজ্ঞান ও সর্ব্বজ্ঞত্ব এই পঞ্চ দৃকক্রিয়া শক্তিতে প্রকাশিত। ঐশ্বর্য্যই সাত্মক দুঃখনিবৃত্তি।

সূক্ষ্ম, ব্যবহিত ও বিপ্রকৃষ্ট (দূরবর্ত্তী) বস্তুর দর্শন শক্তিই-দর্শন। শব্দ-বিষয়ক এতাদৃশ জ্ঞান শ্রবণ। সম্যক্ চিন্তাবিষয়ক সিদ্ধি মনন। শাস্ত্র-বিষয়ক সকল জ্ঞান বিজ্ঞান। সকল বিষয়ের জ্ঞান সর্ব্বজ্ঞত্ব।

ক্রিয়াশক্তি ত্রিবিধ—নিরতিশয় শীঘ্র গমনশক্তি মনোজবিত্ব, যথেচ্ছ রূপ-ধারণ শক্তি কামরূপিত্ব এবং ইন্দ্রিয় সাহায্য ব্যতীত জ্ঞানশক্তি বিক্রমধর্ম্মিত্ব।

বিদ্যা, কলা ও পশু (জীব) ভেদে অস্বতন্ত্র কার্য্য ত্রিবিধ। জীবের বিদ্যা বোধ-স্বভাব ও অবোধ-স্বভাব ভেদে দ্বিবিধ। বিবেক-প্রবৃত্তি ও অবিবেক-প্রবৃত্তি ভেদে বোধ-স্বভাব বিদ্যা দ্বিবিধ, বিবেক-প্রবৃত্তি বিদ্যাই চিত্ত। চিত্ত-দ্বারাই বাহ্য বিষয়ের জ্ঞান জন্মে।

কলা দ্বিবিধ—কার্য্যকলা ও কারণকলা। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ ও ব্যোম এবং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ, এই দশটি কার্য্যকলা। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, বুদ্ধি, অহংকার ও মন এই ত্রয়োদশটী কারণকলা।

পশু দ্বিবিধ—সাঞ্জন (সমল) ও নিরঞ্জন (নির্ম্মল)। সাঞ্জন জীব শরীর ও ইন্দ্রিয়-বিশিষ্ট। তৎরহিত জীব নিরঞ্জন।

চিত্তদ্বারা আত্মা ও ঈশ্বরের মধ্যে সম্বন্ধ-স্থাপনের নাম যোগ। চিত্তকে স্থির করিবার ও সমল মন পরিষ্কার করিবার উপযোগী কার্য্যের নাম বিধি।

বিবিধ বিধির উল্লেখ সর্ব্ব দর্শন সংগ্রহে করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ভস্মস্নান, ভস্ম-শয়ন প্রভৃতি আছে।

সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে পাশুপত দর্শন সুসম্বদ্ধ ভাবে প্রকাশিত হয় নাই। কিন্তু ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায়, যে এই দর্শনে যিনি জগৎ-কারণ, তিনি সগুণ ঈশ্বর; যোগদ্বারা তাঁহার সহিত জীবের সংযোগ স্থাপিত হয়। এই যোগ দ্বিবিধ—ধ্যান-যোগ ও ক্রিয়াযোগ। এই যোগের ফল কৈবল্য ও পরম ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি (অলৌকিক ক্ষমতা-লাভ)। ঈশ্বর নিরপেক্ষ। তাঁহার কিছুরই অপেক্ষা নাই। তবুও তিনি সৃষ্টি ও সংহারের কারণ। জীবেরও তিনি প্রভু। তিনি কর্ম্মাদি-নিরপেক্ষ, স্বেচ্ছাচারী। সেইজন্য শাস্ত্রে তাহাকে সর্ব্বকারণ-কারণ বলে। পাশুপতশাস্ত্র ভিন্ন ঈশ্বরের প্রকৃত জ্ঞান অন্য শাস্ত্রে দিতে পারে না। সুতরাং নির্বাণের জন্য এই শাস্ত্র আশ্রয়নীয়।

পাশুপত ধর্ম্মই শৈব ধর্ম্মের আদিম রূপ ইহার ধর্ম্মশাস্ত্রকে আগম বলে। কাপাল, কালামুখ, শৈব, বীর শৈব (বা লিঙ্গায়েৎ) ও কাশ্মীর শৈব এই পাঁচ শাখায় এই সম্প্রদায় বিভক্ত। শৈব ধর্ম্ম দক্ষিণ ভারতে বিশেষ প্রসার লাভ করিয়াছিল। তামিল ভাষায় এই ধর্ম্ম-সম্বন্ধে এক বিশাল শাস্ত্র রচিত হইয়াছিল। তাহা পরে বিবৃত হইবে।

৯

ভাগবত বা পাঞ্চরাত্র ধর্ম্ম

বেদে একই দেবতা বহু নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। এক সময়ে বরুণ সকল দেবতার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া পূজিত হইতেন। তাহার পরে ইন্দ্রের স্থান হয় সকলের উপরে। আর্য্যগণ যখন গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেন, তখন অনাবৃষ্টির ফলে শস্য-হানির আশঙ্কা বহুল পরিমাণে বিদূরিত হওয়ায় ইন্দ্রের উপাসনার প্রয়োজনেরও হ্রাস হয়। বরুণ ঋতের দেবতা। বহির্জ্জগতের ঋৎ ও অন্তর্জ্জগতের ঋত, উভয়েরই দেবতা। বেদে বিষ্ণুর নাম আছে। 'বিষ্ণুর পরমপদ' সূরিগণ সর্ব্বদা দেখিতে পান। বিষ্ণু সর্ব্বব্যাপী। শত পথ ব্রাহ্মণে তাঁহার অলৌকিক শক্তির বর্ণনা আছে। মহাভারতের যুগে বিষ্ণু ঈশ্বর বলিয়া গৃহীত হন। তখন বরুণ স্থানচ্যুত হন।

উপনিষদে নির্গুণ ও সগুণ এই উভয়ের কথা থাকিলেও নির্গুণ ব্রহ্মই চরম তত্ত্ব বলিয়া বর্ণিত। পরবর্ত্তী যুগে যখন চার্ব্বাক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি

নাস্তিক দর্শনের আবির্ভাব হয়, এবং তাহার ফলে যাগযজ্ঞের প্রতি লোকের শ্রদ্ধার হ্রাস হইতে থাকে, তখন জনগণের বুদ্ধির উপযোগী করিয়া ধৰ্ম্ম-প্রচারের প্রয়োজন অনুভূত হয় এবং ভক্তিমূলক বৈষ্ণব ধৰ্ম্ম প্রচারিত হয় এবং বিষ্ণু ও নারায়ণ অভিন্ন বলিয়া গৃহীত হন। এই বিষ্ণুই বাসুদেব। তিনিই মথুরায় কৃষ্ণ রূপে ধৰ্ম্ম-সংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হন। মহাভারতে কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব নানা ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, এবং তিনি ঈশ্বরের অবতার বলিয়া সৰ্ব্বত্র গৃহীত হইয়াছেন। এই ধৰ্ম্ম শ্বেতদ্বীপে নারদ নারায়ণের নিকট প্রাপ্ত হন। হরিগীতা এবং ভগবদ্গীতায় এই ধৰ্ম্ম বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া মহাভারতে উল্লিখিত হইয়াছে।

মহাভারতের শান্তি পর্ব্বে আছে, যে নারায়ণ নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ এই চারি অংশে অবতীর্ণ হইলে নর ও নারায়ণ বদরিকাশ্রমে তপস্যায় নিরত হন। নারদ তাঁহাদিগকে তদবস্থায় দেখিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলে নারায়ণ ঋষি কহিলেন, তাঁহারা পরমাত্মার উপাসনা করিতেছেন। এই পরমাত্মা শ্বেতদ্বীপে আদ্যা মূর্ত্তিতে বিরাজিত আছেন। ইহা শুনিয়া নারদ এই আদ্যা মূর্ত্তির দর্শনাভিলাষে শ্বেতদ্বীপে গমন করেন এবং দেখেন যে বিশুদ্ধ-সত্ত্ব-সম্পন্ন স্থূল দেহ-বর্জিত পুরুষগণ তথায় বাস করিতেছেন। নারদ নারায়ণের দর্শনাভিলাষে একান্ত মনে তাঁহার স্তব করিতে থাকেন। তখন নারায়ণ তাঁহার নিকট প্রকাশিত হইয়া বলেন, "ঐকান্তিক ভক্তি না থাকিলে কেহই আমাকে দেখিতে পায় না। আমার এই মূর্ত্তি ধৰ্ম্মের ঘরে চারি অংশে প্রকাশিত হইয়াছে। তুমি আমার প্রতি একান্ত ভক্তিমান বলিয়া আমাকে দেখিতে পাইলে। তুমি নিরন্তর আমার আরাধনা করিবে। যিনি রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শহীন ও ত্রিগুণাতীত, যিনি সৰ্ব্বলোকের আত্মা ও সাক্ষীস্বরূপ, অজ, নিত্য, নিরাকার ও চতুর্বিংশ তত্ত্বের অতীত, সেই পরমাত্মাই বাসুদেব। ইহলোকে সকলই অনিত্য, কেবল সৰ্ব্বভূতের আত্মভূত বাসুদেবই নিত্য।" বাসুদেব চতুর্ব্যূহে প্রকাশিত—বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ। সংকর্ষণ জীবাত্মা, প্রদ্যুম্ন মন এবং অনিরুদ্ধ অহংকার। বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ পরমাত্মারই চারিমূর্ত্তি। ইহা হইতে দেখা যায় যে সাংখ্যদর্শনের বুদ্ধি, অহংকার ও মন (যাহা অচেতন প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে) ভাগবত ধৰ্ম্মে ঈশ্বরের ব্যূহ (রূপ)। বাসুদেবই পরমাত্মা, সকল জীবাত্মার আশ্রয়, সৃষ্টির মূলাধার; জীবরূপী সংকর্ষণ, মনোরূপী প্রদ্যুম্ন এবং অহংকাররূপী অনিরুদ্ধ সকলই তাঁহার এক একটি

ব্যূহ। বাসুদেবই সব (বাসুদেবঃ সর্ব্বং—গীতা)। ইহা অদ্বৈতবাদ—কিন্তু বিশিষ্টাদ্বৈত বাদ, একদিকে সাংখ্যদর্শন, অন্যদিকে শঙ্করাচার্য্যের নির্বিশেষ অদ্বৈতবাদ হইতে ভিন্ন।

কৃষ্ণ কিরূপে নারায়ণের অবতার বলিয়া পরিগণিত হইলেন, সে সম্বন্ধে অনেক পণ্ডিত আলোচনা করিয়াছিলেন। উদ্দাম কল্পনার বশে কেহ বলিয়াছেন (ডাক্তার ভাণ্ডারকর) আভীর-নামক এক অনার্য্য জাতি এক শিশুদেবতার উপাসনা করিত। এই দেবতাই কৃষ্ণ। আভীরদিগের নৈতিক চরিত্র হীন ছিল বলিয়া কৃষ্ণের চরিত্রে অনেক কালিমা আরোপিত হইয়াছে। বৈদ্য বলেন, কৃষ্ণ যাদব নামে এক ক্ষত্রিয়-কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। যাদবগণ পশুপালন করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত। ওয়েবর বলেন পাণ্ডবেরা ছিল এক অনার্য্য জাতি। কৃষ্ণ তাহাদিগেরই উপাস্য দেবতা ছিলেন। গার্বের মতে বুদ্ধের দুইশত বৎসর পূর্ব্বে বসুদেবের পুত্র কৃষ্ণ জীবিত ছিলেন। তিনি সুনীতিমূলক এক একেশ্বরবাদী ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধর্ম্মের উপাস্য ঈশ্বর বাসুদেব নামে পূজিত হইতেন। পরে কৃষ্ণ দেবত্বে উন্নীত হন এবং যে বাসুদেবের উপাসনা তিনি প্রচার করেন, তাঁহারই অবতার বলিয়া গৃহীত হন।

বৌদ্ধশাস্ত্রে কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। তথায় তিনি অসুর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। নাস্তিক বৌদ্ধগণ কৃষ্ণকে অসুর বলিবে, ইহা বিচিত্র নহে। কিন্তু বেদে অসুর শব্দ ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। দেবগণকেও অসুর বলা হইয়াছে। "মহৎ দেবানাং অসুরত্বমেকং।" বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাবের পূর্ব্বে ছান্দোগ্য উপনিষদে "দেবকীপুত্র" কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। আঙ্গিরস বংশীয় ঘোর নামক ঋষি দেবকীপুত্র কৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন "অন্তকালে তিনটি কথা অবলম্বন করিবে। তুমি অক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুমি প্রাণ-সংশিত।" ঘোর ঋষির পুত্র ও পৌত্র ঋগ্বেদের অনেকগুলি সূক্তের ঋষি। সুতরাং ঐসকল সূক্ত রচনার পূর্ব্বে কৃষ্ণ জীবিত ছিলেন, ইহাতে সন্দেহ করা যায় না।

ঋগ্বেদের কয়েকটি সূক্তের রচয়িতা এক কৃষ্ণের নাম পাওয়া যায়। কৌষীতকি ব্রাহ্মণেও এক কৃষ্ণের নাম আছে। সেখানে তিনি আঙ্গিরস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কোনও কোনও ক্ষত্রিয়ও আঙ্গিরস বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

মেগাস্থিনিসের বিবরণ হইতে পাওয়া যায় যে তাহার সময়ে (৩০০ খৃঃ পূঃ) মথুরায় কৃষ্ণের উপাসনা প্রচলিত ছিল।

কৃষ্ণকে তাঁহার জীবিত কালে সকলে যে ঈশ্বর বলিয়া স্বীকার করে নাই, তাহা মহাভারতেই আছে। কিন্তু পরে তিনি সমগ্র হিন্দু সমাজেই ঈশ্বর বোধে পূজিত হইতে থাকেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময়েই অনেকে তাঁহাকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কৃষ্ণই গীতার প্রবক্তা। গীতায় যে ঈশ্বরবাদ প্রকটিত, তাহাই কৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্ম্ম।

বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ও শ্রীমদ্‌ভাগবতে কৃষ্ণের যে বৃন্দাবনলীলা বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ভক্ত সাধকের গুহ্য অনুভূতির রূপক-আকারে প্রকাশ। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার নিবিড় মিলন নানা ভাবে বিভিন্ন দেশের সাধকগণ বর্ণনা করিয়াছেন। এই বর্ণনায় জীবাত্মা পরমাত্মার বধূ বলিয়া ভারতবর্ষের বাহিরেও বর্ণিত হইয়াছেন।

ভারতবর্ষে ভক্তিধর্ম্মের উদ্‌ভব অতি প্রাচীন কালেই হইয়াছিল। ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাভারতে বর্ণিত নারদের শ্বেতদ্বীপে গমনকে কয়েক জন বৈষ্ণবের মিশর অথবা এশিয়া মাইনরে গমন বলিয়া মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "মহাভারতেরএই নারায়ণ-মাহাত্ম্য-বর্ণনা-দ্বারা প্রমাণিত হয়, যে কয়েক জন বৈষ্ণব মিশর অথবা এশিয়া মাইনরে গমন করিয়াছিলেন, এবং মহাভারতে তাহার বর্ণনা খৃষ্টকে পরমাত্মার অবতার-রূপে প্রচার করিবার চেষ্টা। ওয়েবর ও ল্যাসেনও এই মতাবলম্বী। ল্যাসেন বলেন "সম্ভবতঃ কয়েক জন ব্রাহ্মণ ভারতের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত কোনও দেশে গমন করিয়া তথায় খৃষ্টধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন।" তাহার মতে পার্থিয়াই এই দেশ, কেননা তথায় সেইণ্ট্ টমাস খৃষ্টধর্ম্ম-প্রচারের কার্য্যে গিয়াছিলেন বলিয়া এক প্রাচীন প্রবাদ আছে। কিন্তু এই অনুমানের কোনও দৃঢ় ভিত্তি নাই। প্রথমতঃ, সেইণ্ট্ টমাস তো ভারতেও আসিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে। খৃষ্টধর্ম্মের পরিচয়-লাভের জন্য ভারতীয় ব্রাহ্মণের বিদেশে যাইবার প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, একেশ্বরবাদ ভারতে বিদেশ হইতে আমদানী নহে। ছান্দোগ্য উপনিষদে নারদ-সনৎকুমার সংবাদে (৭।১।৪) নারদ "একায়ন" বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন। গার্বে বলেন "প্রাচীন ভারতে প্রচলিত বিদ্যার সংবাদ যিনি অবগত আছেন, তাঁহার নিকট ভক্তি-ধর্ম্ম ভারতের স্বকীয় ধর্ম্ম বলিয়াই প্রতীত হয়।" শ্বেতদ্বীপ মেরু পর্ব্বতের উত্তরে ভারতের মধ্যেই অবস্থিত ছিল। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় কি তৃতীয় শতাব্দীতে খৃষ্ট-ধর্ম্ম ভারতে আগমন করে। তাহার বহু পূর্ব্বে রচিত পাণিনির ব্যাকরণে বাসুদেবের নাম ও তাঁহার উপাসকের কথা দেখিতে পাওয়া যায়। বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রেও ভক্তিবাদের উল্লেখ

আছে। বার্থ লিখিয়াছেন। "দেবকীপুত্র কৃষ্ণের উপাসক ভাগবত, সাত্বত অথবা পাঞ্চরাত্র সম্প্রদায় জৈন ধর্ম্মের আবির্ভাবের বহুপূর্ব্ববর্ত্তী।" খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে উৎকীর্ণ বেশনগর লিপিতে ভাগবত ধর্ম্মাবলম্বী গ্রীকরাজ হেলিও ডোরাস কর্ত্তৃক বাসুদেবের উদ্দেশ্যে নির্ম্মিত ও উৎসৃষ্ট এক গরুড়স্তম্ভের কথা আছে। সংকর্ষণ ও বাসুদেবের উপাসনার কথা ঘোসুন্দি ও নানাঘাটে আবিষ্কৃত লিপিতেও দেখিতে পাওয়া যায়।

১০
শাক্ত দর্শন

মহাভারতে দুর্গার উপাসনার কথা আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কৃষ্ণ অর্জুনকে দুর্গার পূজা করিতে বলিয়াছিলেন।

কেনোপনিষদে "বহু শোভমানা" উমা হৈমবতীর কথা আছে। দেবাসুর যুদ্ধে ব্রহ্মই দেবতাদিগকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দেবগণ ভাবিয়াছিলেন, এই গৌরব তাহাদেরই। ইহা জানিয়া ব্রহ্ম দেবতাদিগের নিকট আবির্ভূত হইলেন। দেবগণ তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন না। প্রথমে অগ্নি ব্রহ্মের নিকট উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্ম বলিলেন "তুমি কে? তোমার কি শক্তি আছে?" অগ্নি কহিলেন "পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, সকলই আমি দগ্ধ করিতে পারি"। "তবে এই তৃনটি দগ্ধ কর দেখি।" সর্ব্ব শক্তি প্রয়োগ করিয়াও অগ্নি তৃণটি দগ্ধ করিতে পারিলেন না। তারপর গেলেন বায়ু। তিনিও সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও একটি তৃণ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। পরিশেষে যখন ইন্দ্র গেলেন, তখন হৈমবতী উমা (ব্রহ্মবিদ্যা) আবির্ভূত হইয়া ইন্দ্রকে বলিলেন "ইনি ব্রহ্ম"। ব্রহ্মের শক্তিই মহাভারতের যুগে উমা বা দুর্গা নামে উপাসিত হইতেন।

ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলে যে দেবী সূক্ত আছে, অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক্ তাহার ঋষি। মার্কণ্ডেয় চণ্ডীপাঠের পরে এই সূক্ত পাঠ করা বিধি। এই সূক্তে বাক্ (ব্রহ্মশক্তিকে স্বীয় আত্মারূপে অনুভব করিয়া) বলিতেছেন, "আমি একাদশ রুদ্র, অষ্ট বসু, দ্বাদশ আদিত্য এবং সকল দেবতা-রূপে বিচরণ করি; মিত্র ও বরুণ উভয়কে ধারণ করি; ইন্দ্র, অগ্নি ও অশ্বিনী কুমারদ্বয়কে ধারণ করি। সোম, ত্বষ্টা পুষা, ভগ সকলকে আমি ধারণ করি। আমি সকল জগতের ঈশ্বরী, উপাসকগণের ধন-প্রদাত্রী দেবী ও পরব্রহ্মশক্তি ইত্যাদি। এই ব্রহ্মশক্তিই দুর্গারূপে পূজিত হন। পুরাণে ইহাকে শিবের

পত্নী ও লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্ত্তিক ও গণেশের (সম্পৎ, বিদ্যা, বল ও জ্ঞানের) মাতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ঋগ্বেদের রাত্রিসূক্ত (১০।১০।১২৭) ব্রহ্মশক্তি দুর্গারই স্তব। এই সূক্তের ঋষি কুশিক। ইহাতে প্রার্থনা করা হইয়াছে "জননি, আপনি দয়াবতী। করুণা-পূর্ব্বক আপনি আমাদের অনুষ্ঠিত পাপ উপেক্ষা করিয়া ব্যাঘ্রী ও ব্যাঘ্রসদৃশ হিংসাকারী পাপসকল হইতে আমাদিগকে রক্ষা করুন।...আপনি পরমাকাশ-রূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মার কন্যা। আপনার প্রসাদে আমি (কামাদি শত্রু) জয় করিব।"

১১

শ্রীমৎভগবদ্‌গীতা

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা মহাভারতের ভীষ্ম পর্ব্বের একটা অংশ। ইহা আধুনিক হিন্দু ধর্ম্মের ভিত্তি। ইহা শ্রুতি বলিয়া পরিগণিত না হইলেও এবং স্মৃতি বলিয়া গণ্য হইলেও সর্ব্ব উপনিষৎই ইহার ভিত্তি। ইহার মাহাত্ম্য অপরিসীম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

> সর্ব্বোপনিষদঃ গাবঃ, দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ।
> পার্থো বৎসঃ, সুধীঃ ভোক্তা, দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥

সর্ব্ব উপনিষৎ গাভী। অর্জ্জুন বৎস, শ্রীকৃষ্ণ দোগ্ধা। সকল উপনিষৎ দোহন করিয়া তিনি যে দুগ্ধ বাহির করিয়াছেন, তাহাই গীতারূপ অমৃত। সুধীগণ সেই অমৃত পান করেন। ইহা কেবল বৈষ্ণবদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ নহে, সকল সম্প্রদায়ের হিন্দুই ইহার প্রতি প্রচুর শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। শ্রাদ্ধকালে ইহা সর্ব্বত্র পঠিত হইয়া থাকে। শ্রুতি না হইলেও প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে ইহা "গীতোপনিষৎ" বলিয়া কথিত হইয়াছে।

কাহারও কাহারও মতে গীতা মহাভারতের মধ্যে প্রক্ষিপ্ত। যুদ্ধ যখন আরব্ধ হইয়াছে, শস্ত্রসম্পাত প্রবৃত্ত হইয়াছে তখন অর্জ্জুনের সারথি শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের সহিত দর্শন, নীতি ও ধর্ম্মের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা অনেকে অসম্ভব বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ডাঃ রাধাকৃষ্ণণের মতে মহাভারতের রচনা-কাল হইতেই গীতা তাহার অংশ বলিয়া গণ্য হইয়া আসিয়াছে। মহাভারত ও গীতার রচনা-শৈলীর মধ্যে যে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেও গীতা ও মহাভারত একই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে হয়। অন্যান্য দর্শন-সম্বন্ধেও মহাভারত ও

গীতায় একই মত ব্যক্ত হইয়াছে। কর্ম্ম যে অকর্ম্ম অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর, তাহা উভয়ত্রই বলা হইয়াছে। বৈদিক যজ্ঞ-সম্বন্ধে উভয়ের একই মত। সৃষ্টির ক্রম, একই ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। সাংখ্য ও যোগ দর্শনের বর্ণনাও উভয়ত্রই একরূপ। যুদ্ধের প্রাক্কালে দার্শনিক আলোচনা সংগতিবিহীন বলিয়া মনে হইতে পারে। "কিন্তু ইহাও সত্য যে যুদ্ধের মত সংকট কালেই চিন্তাশীল লোকের মনে "চরম মূল্য" (ultimate values) সম্বন্ধে চিন্তার উদয় হয়। কেবল তখনই আধ্যাত্মিক ভাবাপন্ন মনে এমন টান পড়ে, যে ইন্দ্রিয়ের বাধা অতিক্রম করিয়া তাহা জগতের অন্তরস্থ চরম সত্তার সম্মুখীন হয়। ইহা সম্ভবপর যে অর্জ্জুন কৃষ্ণের নিকট হইতে যে উপদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাই কবি সাত-শত শ্লোকে বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। মহাভারতকার সুযোগ পাইলেই ধর্ম্মতত্ত্ব ব্যাখ্যা করিবার জন্য উৎসুক ছিলেন। গীতাতে তিনি সেই সুযোগের ব্যবহার করিয়াছেন।"

গীতার রচনাকাল-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। মহাভারতে বিভিন্ন কালের রচনা একত্রিত হইয়াছে। তেলাংএর মতে ইহা খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত। ভাণ্ডারকরের মতে ইহা খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীর পরে রচিত নহে। গার্বের মতে ইহা খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে রচিত। কিন্তু বোধায়নের গৃহ্যসূত্রে ভগবানের কথিত বলিয়া এক শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা গীতা হইতে উদ্ধৃত বলিয়া মনে হয়। আপস্তম্বের কাল খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক। বোধায়ন আপস্তম্বের পূর্ব্ববর্ত্তী। সুতরাং গীতা খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতকের রচনা মনে করিলে ভুল হইবে না।

গীতার পটভূমি

কৌরব ও পাণ্ডব সৈন্যগণ কুরুক্ষেত্রে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দণ্ডায়মান। শ্রীকৃষ্ণ-সারথি অর্জ্জুন উভয় সেনাদল পরিদর্শনের জন্য বাহির হইয়াছেন। উভয় সেনা-বাহিনী হইতে শঙ্খ ভেরী প্রভৃতি বাদিত হইতেছে। অর্জ্জুন উভয় সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধে উদ্যত আত্মীয়গণকে দেখিতে পাইলেন। যুদ্ধে তাহা-দিগের অনেকেই হত হইবেন। বিপক্ষ দলভুক্ত ভীষ্ম, দ্রোণ প্রভৃতি গুরু ও স্বজনদিগকে বধ না করিয়া রাজ্যলাভ সম্ভবপর হইবে না। মনে হইল, এই ভীষণ মূল্যের বিনিময়ে যে রাজ্যলাভ হইবে, তাহার মূল্য কি? তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া পড়িল, মুখ শুকাইয়া গেল, গাণ্ডীব ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকে কহিলেন, "আমি জয় চাহি না, রাজ্য চাহি না, সুখ চাহি না। আমি যুদ্ধ করিব না।" ইহাই গীতার আরম্ভ। শ্রীকৃষ্ণ তখন নানা যুক্তিদ্বারা অর্জ্জুনের মনের সংশয়

দূরীভূত করিয়া তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করেন। এই উপলক্ষে তিনি ধর্ম্মের যে ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, কেবল হিন্দু সমাজে নহে, জগতের সর্ব্বত্র অতি সমাদরের সহিত তাহা গৃহীত হইয়াছে। আড়াই হাজার বৎসর যাবৎ তাহা লোকের ধর্ম্ম-পিপাসা তৃপ্ত করিয়াছে, শোকার্ত্তকে সান্ত্বনা দিয়াছে, দর্শনের গহনারণ্যে পথভ্রষ্টদিগকে সত্যের পথ দেখাইয়া দিয়াছে।

গীতার মর্ম্ম

অষ্টাদশ অধ্যায়ে বিভক্ত গীতার প্রথম অধ্যায়ের নাম অর্জ্জুন-বিষাদ যোগ। দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম সাংখ্য বা জ্ঞান যোগ। এই দুই অধ্যায়ে আত্মা যে অবিনশ্বর, তাহার জন্ম-মৃত্যু নাই, ইহা বিশেষ ভাবে উক্ত হইয়াছে। লোকে জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করিয়া যেমন নূতন বাস পরিধান করে, তেমনি দেহী জীর্ণ দেহ ত্যাগ করিয়া নূতন দেহ ধারণ করে। সুতরাং ধর্ম্মযুদ্ধে যদি লোক-হত্যা করিতে হয়, তাহার জন্য শঙ্কিত হইবার কারণ নাই। কেন না আত্মা কখনও হত হয় না। বেদ ত্রিগুণবিষয়াত্মক। বৈদিক যজ্ঞ ফলকামনায় অনুষ্ঠিত হয়। তাহার ফলে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়। কিন্তু স্বর্গের উপরেও প্রাপ্তব্য আছে। যিনি তাহা জানেন, বেদে তাহার প্রয়োজন নাই। কর্ম্মেতে লোকের অধিকার আছে, কিন্তু কর্ম্মফলে নাই। নিষ্কাম ভাবে আসক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্ম করিলে, সে কর্ম্মে বন্ধন হয় না। সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিয়া, কর্ম্মের ফল কামনা না করিয়া যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহার কোনও ফল উৎপন্ন হয় না। সমত্বই যোগ। যে কৌশলে কর্ম্ম করিলে, কর্ম্মফল উৎপন্ন হয় না, কর্ম্মে সেই কৌশলই যোগ। যিনি সকল কামনা ত্যাগ করিয়া আপনাতে আপনি তুষ্ট থাকেন, তিনি স্থিত-প্রজ্ঞ। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন, সুখে বিগতস্পৃহ, বীতরাগভয়ক্রোধ স্থিতপ্রজ্ঞই মুনি। যিনি সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগ করিয়া নিস্পৃহ, নির্ম্মম, নিরহংকার ভাবে বিচরণ করেন, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন। ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। এই ব্রাহ্মী-স্থিতিবান অন্তকালে ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন।

তৃতীয় অধ্যায়ের নাম কর্ম্মযোগ। কর্ম্ম না করিয়া কেহ ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। কর্ম্ম না করিলে শরীররক্ষাই হয় না। কর্ম্ম না করিয়া যে মনে মনে ইন্দ্রিয়ের বিষয়ের চিন্তা করে, সে মিথ্যাচারী। যিনি আত্ম-রতি, আত্ম-তৃপ্ত, তাহার করণীয় কোনও কার্য্য নাই। অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিয়া পরম পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রেষ্ঠ লোকে যাহা করে, ইতর জনে তাহার অনুকরণ করে। শ্রেষ্ঠ লোকে যদি কর্ম্ম না করে, ইতর লোকেও কর্ম্ম করিবে

না। সুতরাং "লোক সংগ্রহের" জন্যও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। কিন্তু অনাসক্ত ভাবে ফল কামনা না করিয়া কর্ম্ম করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়ে জ্ঞানযোগ বিবৃত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন "আমি পূর্ব্বে বিবস্বানকে এই জ্ঞানযোগ বলিয়াছিলাম। বিবস্বান মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। রাজর্ষিরা এই যোগের কথা জানিতেন। কিন্তু কালে তাহা নষ্ট হইয়াছে। অর্জ্জুন তুমি আমার ভক্ত, আমার সখা, তাই তোমাকে সেই যোগ আমি বলিলাম। আমি অজ, অব্যয়াত্মা, ভূতদিগের ঈশ্বর হইলেও নিজের প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া আপনার মায়াবলে আবির্ভূত হই। যখনই ধর্ম্মের গ্লানি হয় ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই আমি আপনাকে সৃষ্টি করি। সাধুদিগের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতকারীদিগের বিনাশ এবং ধর্ম্ম সংস্থাপনের জন্য আমি যুগে যুগে (মানবরূপে) আবির্ভূত হই। যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করুক না কেন, আমি তাহাকে তাহার অভিলষিত ফল দান করি। যে ভাবেই করুক না কেন, সকলে আমাকেই ভজনা করে। দ্রব্যময় যজ্ঞ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। অখিল কর্ম্ম জ্ঞানে পরিসমাপ্ত হয়। জ্ঞানাগ্নি সকল কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে।

পঞ্চম অধ্যায়ে কর্ম্মসন্ন্যাস যোগ ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে ধ্যান যোগ বিবৃত হইয়াছে সন্ন্যাস (কর্ম্মত্যাগ) ও কর্ম্মযোগ উভয়ই নিঃশ্রেয়সকর। কিন্তু কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে কর্ম্মযোগ উৎকৃষ্টতর। জ্ঞানযোগ ও কর্ম্মযোগে কোনও ভেদ নাই। উভয়ের মধ্যে একটি অবলম্বন করিলেই উভয়ের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মে কর্ম্মফল অর্পণ করিয়া অনাসক্ত ভাবে যে কর্ম্ম করে, পাপ তাহাকে স্পর্শ করে না। যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা সর্ব্বলোক-মহেশ্বর, সর্ব্বভূতের সুহৃৎ ভগবানকে জানিয়া লোকে শান্তি প্রাপ্ত হয়।

কর্ম্মফল কামনা না করিয়া যে করণীয় কর্ম্ম করে, তাহাকেই সন্ন্যাসী বলে। যোগীও তাহাকেই বলে—যে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছে তাহাকে বলে না। যাহা সন্ন্যাস, তাহাই যোগ (কর্ম্মযোগ)। কামনা ত্যাগ না করিয়া কেহ যোগী হয় না। যোগারোহণে ইচ্ছুক যিনি, তাঁহার সাধন কর্ম্ম, আর যিনি যোগে আরূঢ় হইয়াছেন, তাঁহার সাধন শম বা শান্তি।

ধ্যান যোগ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে :

যোগী নির্জ্জনে একাকী আকাঙ্ক্ষাহীন, পরিগ্রহশূন্য, সংযতচিত্ত ও সংযতদেহ হইয়া মনকে সমাহিত করিবেন। পবিত্র স্থানে আসন স্থাপন করিবেন—আসন অতি উচ্চ অথবা অতি নীচ হইবে না। প্রথমে কুশ, তাহার উপরে

অজিন, তাহার উপর বস্ত্র পাতিয়া আসন রচনা করিতে হইবে। আসনে উপবিষ্ট হইয়া দেহ, ইন্দ্রিয় ও চিত্ত সংযত করিয়া যোগী একাগ্র মনে আত্মবিশুদ্ধির নিমিত্ত যোগানুষ্ঠান করিবেন। দেহ, মস্তক ও গ্রীবা সমস্ত অচল ভাবে ধারণ করিয়া, চতুর্দ্দিক হইতে দৃষ্টি অপসারিত করিয়া স্বীয় নাসিকাগ্রে নিবদ্ধ করিবেন। প্রশান্তচিত্ত, ভয়রহিত, ব্রহ্মচর্য্য-ব্রতে অবস্থিত যোগী সংযত মনে ভগবানে চিত্ত স্থির করিয়া তাঁহাতেই আপনাকে ঢালিয়া দিবেন। সংযতমনা যোগী এই ভাবে মনঃসমাধান করিয়া ভগবানের মধ্যে যে নির্ব্বাণ-ফল শান্তি আছে, তাহা প্রাপ্ত হন। যে অতিরিক্ত অথবা অতি অল্প আহার করে, যে অতিরিক্ত নিদ্রাবশ অথবা অতিরিক্ত জাগরণশীল, তাহার যোগ আয়ত্ত হয় না। নির্বাত প্রদেশে স্থিত নিশ্চল দীপশিখার মতো যতচিত্ত যোগীর চিত্ত নিশ্চল থাকে। যে অবস্থায় যোগ-সেবাদ্বারা নিরুদ্ধ চিত্ত বিনষ্টপ্রায় হয় এবং আত্মা আপনি আপনাকে দর্শন করিয়া পরিতুষ্ট হয়, যে অবস্থায় বুদ্ধিগ্রাহ্য আত্যন্তিক সুখের অনুভব হয় এবং আত্মা স্ব-ভাব হইতে বিচলিত হয় না, যাহা লাভ করিয়া অপর কোনও লাভকেই তাহা অপেক্ষা অধিক মনে হয় না, যাহাতে অবস্থিত চিত্ত গুরু দুঃখেও বিচলিত হয় না, তাহাই দুঃখ-সংযোগরহিত যোগ। নির্ব্বেদরহিত (ইষ্ট-সিদ্ধিতে বিলম্বহেতু যে চেষ্টাশৈথিল্য, তাহাই নির্বেদ) চিত্তে স্থিরবিশ্বাসে যোগ সাধন করিবে। ধৈর্য্যশালিনী বুদ্ধি-দ্বারা ক্রমশঃ সমস্ত বিষয় হইতে উপরত হইবে। আত্মাতে মন স্থির রাখিবে এবং কোন বিষয় চিন্তা করিবে না।

যোগ আরম্ভ করিয়া যদি কেহ যোগভ্রষ্ট হয়, তাহার কি গতি হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন "কল্যাণকৃৎএর কখনও দুর্গতি হয় না। যোগভ্রষ্ট বহুদিন যাবৎ স্বর্গে বাস করিয়া পরে শুচি ও শ্রীমান্ লোকের গৃহে, অথবা ধীমান্ যোগিকুলে জন্মগ্রহণ করেন এবং পূর্ব্বজন্মে অর্জ্জিত জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করেন। ইচ্ছা না থাকিলেও পূর্ব্বের অভ্যাসবশতঃ তিনি যোগতত্ত্ব জানিতে উদ্‌যোগী হন, কর্ম্মফল অতিক্রম করিয়া জ্ঞান লাভ করেন এবং অনেক জন্মের পরে পাপমুক্ত হইয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হন।

গীতায় তাত্ত্বিক দর্শন

সপ্তম, অষ্টম, ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ অধ্যায়ে গভীর দার্শনিক তত্ত্বসকল ব্যাখ্যাত হইয়াছে। গীতায় সাংখ্যের পঞ্চবিংশ তত্ত্ব গৃহীত হইয়া তাহাতে নূতন অর্থ সন্নিবেশিত হইয়াছে, এবং পঞ্চবিংশতি তত্ত্বের অতিরিক্ত

পুরুষোত্তম-তত্ত্ব সংযোজিত হইয়াছে। সাংখ্যের প্রকৃতি স্বয়ম্ভু, স্বতন্ত্র ও অচেতন। পুরুষ চেতন, সংখ্যায় অনন্ত এবং স্বরূপে প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। প্রকৃতি হইতে পঞ্চভূত ও তাহাদের বিকার জড় জগৎ এবং মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় উদ্‌ভূত হইয়াছে। কিন্তু গীতায় প্রকৃতি পরমাত্মার প্রকৃতি—পরমাত্মার শক্তি—বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। অপরা ও পরা—পরমাত্মার দ্বিবিধ প্রকৃতি। পঞ্চভূত ও মন, বুদ্ধি ও অহংকার, ইহারা অপরা প্রকৃতি। পরা প্রকৃতি হইতে জীব উদ্‌ভূত হইয়াছে। জীব পরমাত্মারই অংশ। পরা ও অপরা প্রকৃতি উভয়ই পরমাত্মারই প্রকৃতি, এবং উভয়ের মধ্যেই পরমাত্মা বর্ত্তমান। তথাকথিত জড় জগৎ দৃশ্যতঃ অচেতন হইলেও, বাস্তবিক অচেতন নহে; তাহা চিৎস্বরূপ পরমাত্মার শক্তি। প্রত্যেক জীব পরমাত্মার অংশ, এবং তাহার মধ্যে পরমাত্মা বর্ত্তমান। চেতনা দ্বিবিধ—জীব ও আত্মা। ব্রহ্মা হইতে তির্য্যকযোনি প্রাণিগণ পর্য্যন্ত সকলে জীব। আর পুরুষোত্তম একমাত্র আত্মা, তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু নাই। জড় ও চেতন সকলই আত্মা। বাসুদেবঃ সর্ব্বম্। কৃৎস্ন জগৎ তাঁহা হইতেই উদ্‌ভূত এবং তাঁহাতেই লয়-প্রাপ্ত হয়। সূত্রে যেমন মণিগণ গ্রথিত থাকে, তেমনি পরমাত্মা যাবতীয় বস্তুর মধ্যে সূত্ররূপে বর্ত্তমান ও তাহাদিগকে ধারণ করিয়া আছেন। জলের মধ্যে তিনি রস, শশী ও সূর্য্যের মধ্যে তাহাদের প্রভা, সর্ব্ববেদের মধ্যে তিনি প্রণব, নরের মধ্যে পৌরুষ, পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ, অগ্নিতে তেজ, সর্ব্বভূতে জীবন, তপস্বীতে তপস্যা। তিনিই সর্ব্বভূতের বীজ। তিনি বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ, বলবানের কামরাগ-বর্জিত বল এবং প্রাণীদিগের ধর্ম্মের অবিরোধী কাম। মানুষের সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক সকল ভাবই তিনি। সত্ত্ব, রজ, তমোময় প্রকৃতি তাঁহা হইতে ভিন্ন নহে। ইহা তাঁহারই মায়া—তাঁহার সক্রিয় ইচ্ছা, চিৎশক্তি। পুরুষোত্তম ও তাঁহার পরা প্রকৃতি অভিন্ন। পুরুষোত্তম সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ। তাঁহার পরা প্রকৃতি তাঁহার অনন্ত শক্তি। এই পরা প্রকৃতিই জীবরূপে অংশতঃ অভিব্যক্ত। কিন্তু এই আংশিক ও কালিক অভিব্যক্তির পশ্চাতে কালাতীত পুরুষোত্তম তাঁহার অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত শক্তিতে বর্ত্তমান। তিনি বিশ্বে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াও বিশ্বাতিগ। জীব তাঁহার অংশমাত্র।

পুরুষোত্তমের মধ্যে যাবতীয় জীবাত্মা বর্ত্তমান, তিনি জীবাত্মাদিগের আত্মা। তিনি এক হইয়াও বহু। জগতে যেখানেই শক্তির ক্রীড়া দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা তাঁহার পরা প্রকৃতিরই অংশ। তাঁহার পরা প্রকৃতিই বিশ্বের সমগ্র শক্তি।

ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত, অধিদৈব এবং অধিযজ্ঞ—যাবতীয় সত্তা ইহাদের অন্তর্ভূক্ত। পরম অক্ষরই ব্রহ্ম। অপরিণামী, স্বয়ম্ভু, কালাতীত পুরুষ, যিনি জাগতিক সমস্ত ব্যাপারের অন্তরালে বর্ত্তমান, তিনিই অক্ষর। তিনি ব্রহ্ম—সর্ব্বউপাধিশূন্য, অব্যাকৃত, আকাশান্ত কৃৎস্ন প্রপঞ্চের ধারয়িতা এবং ইন্দ্রিয়-সমন্বিত দেহে নিরুপাধিক চৈতন্য। স্বভাবই অধ্যাত্ম। পুরুষোত্তমের পরাপ্রকৃতির স্বরূপই "স্বভাব।" প্রত্যক্-আত্মারূপে দেহ অধিকার করিয়া ভোক্তৃরূপে অবস্থান এই স্বরূপ। "ভূত-ভাবোদ্‌ভবকর বিসর্গ" কর্ম্ম। ভূত অর্থাৎ উৎপত্তিশীল স্থাবর জঙ্গমের "ভাব" অর্থাৎ উৎপত্তি এবং উদ্‌ভব অর্থাৎ বৃদ্ধির কারণ-স্বরূপ সৃষ্টি-প্রেরণা এবং সৃষ্টিই কর্ম্ম। (বিসর্গ=সৃষ্টি)। অধিভূত অর্থে উৎপন্ন যাবতীয় নশ্বর বস্তু। প্রকৃতির মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট পুরুষ, বিশ্বের যিনি আত্মা, তিনিই অধিদৈবত। পুরুষোত্তমই অধিযজ্ঞ—যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, সর্ব্বলোক মহেশ্বর। পুরুষোত্তম ব্রহ্ম বিশ্বের আত্মা। জীবাত্মা, ভূতগণ ও কর্ম্ম—সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্ব এই সূত্রের অন্তর্নিবিষ্ট। যিনি পুরুষোত্তম, তিনিই প্রাকৃতিক যাবতীয় সমুৎপাদের তলদেশে অবিকারী নিশ্চল ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান। তিনিই আবার বিশ্বের চৈতন্যময় সাবিক আত্মা (অধিদৈবত)। তাঁহার শক্তিই নিশ্চল নির্বিকার ব্রহ্মের উপরিভাগে নানা ক্ষর বস্তুর উৎপাদন-ক্রীড়া-পর, এবং তিনিই জীবদেহে প্রত্যক্ আত্মারূপে অবস্থিত। তিনি অবিভক্ত হইয়াও সর্ব্বত্র বিভক্তের মতো অবস্থিত।

লোকে—সৃষ্টি-প্রপঞ্চের মধ্যে—দুই পুরুষ, ক্ষর ও অক্ষর। "সর্ব্বাণি ভূতানি"—যাবতীয় ভূত (চেতন ও অচেতন নিখিল বস্তু) ক্ষর, প্রকৃতির মধ্যে চঞ্চল, নিত্যপরিণামী, ক্রীড়াশীল। সাব্বিক আত্মাই ক্ষর পুরুষ। কার্য্যরূপে এই ক্ষর আত্মাই প্রকৃতির উপরিভাগে দৃষ্টিগোচর হয়। কিন্তু এই ক্ষর পুরুষের অন্তরালে অক্ষর পুরুষ বর্ত্তমান। অক্ষরে কোনও চাঞ্চল্য নাই। তাহা স্থির অপরিণামী কূটস্থ, প্রকৃতির বহিভাগের কলকোলাহলের তলদেশে অবিচ্ছেদ মৌনী শান্তিরূপে বিরাজিত। তাহা হইতেই সমস্ত গতির উদ্‌ভব, কিন্তু তাহা নিজে গতিহীন। যাবতীয় জীবাত্মা ক্ষর-পুরুষের মধ্যে অবস্থিত হইলেও অক্ষর পুরুষই তাহাদের আধার।

নিত্য ক্রিয়াপর ও পরিণামী বিশ্বের সাবিক আত্মা ক্ষর পুরুষ এবং নিষ্ক্রিয় অপরিণামী নিশ্চল মৌনী অক্ষর পুরুষ দৃশ্যতঃ ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও উভয়েই একই সনাতন পুরুষের বিভাব। ঈশোপনিষদে প্রথমেই উক্ত হইয়াছে যে জগতে যাহা কিছু "জগৎ" (গতিশীল, পরিণামী) তাহা ঈশ্বরই। তিনি

"অনেজৎ" (গতিহীন, অপরিণামী) হইলেও মন অপেক্ষাও বেগবান্। তিনি "এজতি" (গমন করেন), আবার "ন এজতি" (গমন করেন না)। গতিমান্ তিনি ক্ষর, গতিহীন তিনি অক্ষর। চঞ্চল মন-সমন্বিত জীব ক্ষর। মনকে অতিক্রম করিয়া "নিবাত নিষ্কম্প প্রদীপে"র ন্যায় জীব যখন সমাধির অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন অক্ষরকে অনুভব করে।

যিনি ক্ষর ও অক্ষরের অতীত, তিনিই পুরুষোত্তম। বিশ্বে অক্ষর ব্রহ্মই পর-তত্ত্ব। যাবতীয় প্রাকৃতিক সমুৎপাদের পশ্চাদ্‌ভাগে এবং যাবতীয় জীবের বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ানুভূতি, সুখ দুঃখ, ইচ্ছা, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি মানসিকভাবের নিম্নদেশে অক্ষরই তাঁহার অবিচলিত মৌন ও শান্তির মধ্যে নিশ্চল স্থিতিতে বর্ত্তমান। কিন্তু যে শক্তিবশে অক্ষর হইতে চঞ্চল বিশ্বের উদ্‌ভব হয়, তাহা পুরুষোত্তমেরই শক্তি। অক্ষর পুরুষোত্তমেরই বিভাব। চঞ্চল বিশ্বে ও জীবে পুরুষোত্তমই অচঞ্চল অক্ষররূপে বর্ত্তমান। তাঁহার শক্তির ক্রিয়ার ফলে, তাঁহার পরাপ্রকৃতির সৃষ্টি-প্রেরণার ফলে, তাঁহার অপরিণামিত্বের অপহ্নব হয় না।

অক্ষর ও পুরুষোত্তম বস্তুতঃ এক হইলেও পুরুষোত্তম অক্ষর অপেক্ষা উন্নততর রূপ। সাধক অক্ষরকে প্রাপ্ত হইবার পরে, অক্ষরকে অতিক্রম করিয়া, তাঁহার উৎকৃষ্টতর রূপ পুরুষোত্তমের সাক্ষাৎকার লাভ করেন। পুরুষোত্তম অক্ষর ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠাভূমি। তিনি অব্যয়, তিনি অমৃত। শাশ্বত ধর্ম্ম ও ঐকান্তিক সুখ তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত।

অক্ষর ব্রহ্ম হইতে জগৎ উদ্‌ভূত এবং তাঁহাতে বিলীন হয়। ব্রহ্ম-লোক (ব্রহ্মার লোক) সহ যাবতীয় লোক পুনরাবর্ত্তী—তাহাদের একবার ধ্বংস হয়, আবার আবির্ভাব হয়। মানুষের যাহা সহস্র চতুর্যুগ (অর্থাৎ মনুষ্য পরিমাণে চারি সহস্র যুগ) তাহা ব্রহ্মার একদিন, এবং তাহার পরে চতুঃসহস্র যুগ ব্রহ্মার একরাত্রি। চতুঃসহস্র যুগ পরিমাণ দিনের প্রারম্ভে সৃষ্টি হয়, অর্থাৎ অব্যক্ত নির্গুণ অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্ম হইতে ব্যক্ত জগতের আবির্ভাব হয়। আবার এই দিনের অবসানে রাত্রির আগমনে ব্যক্ত জগৎ অব্যক্তে বিলীন হয়। এই-ভাবে সকল ভূত বারংবার উদ্‌ভূত ও বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতের উদ্‌ভব হয় এবং যাহাতে তাহা বিলীন হয়, তাহা হইতে ভিন্ন আর এক অব্যক্ত আছেন, সর্ব্বভূত বিনাশ প্রাপ্ত হইলেও যাহার বিনাশ হয় না। এই দ্বিতীয় অব্যক্তও অক্ষর অর্থাৎ বিকার-রহিত, অপরিণামী। তিনিই গতির শেষ। তিনি উত্তম পুরুষ, তিনিই পরম ধাম। সকল ভূত তাঁহার অন্তঃস্থ, তিনি সর্ব্বব্যাপী। দেশ ও কালাতীত হইয়াও

তিনি দেশ-কালে জগৎরূপে প্রকাশিত। তাঁহাকে অনন্যা ভক্তিদ্বারা লাভ করা যায়। তিনি সর্ব্বভূতের সুহৃৎ। তিনি কবি (সর্বজ্ঞ), পুরাণ (চিরন্তন), অনুশাসিতা (সর্ব জগতের নিয়ন্তা), অণু হইতেও সূক্ষ্মতর, সকলের বিধাতা (কর্ম্মফল-দাতা), অচিন্ত্যরূপ, আদিত্য-বর্ণ (সর্ব্ব জগতের প্রকাশক) এবং তমঃ পারে (প্রকৃতির পারে) অবস্থিত। যিনি অনন্য-চিত্ত ও নিত্য সমাহিত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাকে স্মরণ করেন, তাহার নিকট তিনি সুলভ।

পরমাত্মা অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম রূপে জগতে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন। যাবতীয় বস্তু তাঁহাতেই অবস্থিত; কিন্তু তাঁহাকে তাহাদের মধ্যে অবস্থিত বলা যায় না। বস্তুসকল তাঁহাতে অবস্থিত হইলেও তিনি অসঙ্গ। বায়ু যেমন আকাশে অবস্থিত হইলেও, তাহার সহিত আকাশের স্পর্শ নাই, সেইরূপ পরমাত্মার সহিত বস্তু-জগতের সংসর্গ নাই। তবু এই জগৎ তাঁহা হইতে স্বতন্ত্র নহে। তিনিই গতি (কর্ম্মফল), ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, জীবের নিবাসস্থান, শরণ ও সুহৃৎ। তাঁহা হইতে জীব উৎপন্ন এবং তাঁহাতে বিলীন হয়, তিনিই সর্ব্ব বস্তুর বীজ (কারণ)। এই বিশ্বে যাহা কিছু আছে, সকলই তিনি। চেতন ও অচেতন জগতে যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ, সকলই তিনি। তিনি কাল, তিনি মৃত্যু। তিনি কীর্ত্তি, শ্রী, বাক, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা। তিনি তাঁহার এক অংশ-দ্বারা সমগ্র জগৎ ব্যাপিয়া আছেন।

ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, অক্ষর ব্রহ্ম, প্রত্যক্ আত্মা (অধ্যাত্ম), স্থাবর, জঙ্গম, যাবতীয় বস্তুর উৎপত্তি ও বৃদ্ধির কারণ-স্বরূপ পরমাত্মার সৃষ্টিশক্তি (কর্ম্ম), সৃষ্ট যাবতীয় নশ্বর বস্তু, বিশ্বাত্মা এবং পুরুষোত্তম, ইহারা ব্যতীত বিশ্বেই হউক অথবা বিশ্বের বাহিরেই হউক অন্য কিছুরই অস্তিত্ব নাই। কিন্তু ইহারা সকলেই পরমাত্মার বা পুরুষোত্তমের বিভিন্ন রূপ, পরমাত্মাই বিভিন্ন রূপে সর্বত্র প্রকাশিত। ইহা কেবল যুক্তির মীমাংসা নহে—সাধনার বিভিন্ন স্তরে ইহার অনুভূতি সাধক লাভ করেন। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে এই তত্ত্ব বিশদীকৃত হইয়াছে।

জীবের শরীর ক্ষেত্র এবং শরীরে অধিষ্ঠিত যে প্রত্যক্ আত্মা শরীরকে জানেন, তিনি ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া অভিহিত। সকল ক্ষেত্রেই পরমাত্মাই ক্ষেত্রজ্ঞ। পঞ্চভূত ও তৎসহ অহংকার, বুদ্ধি, একাদশ ইন্দ্রিয়, পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের বিষয় এবং

অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি—স্বগুণ-কর্তৃক আচ্ছাদিত পরমেশ্বরের শক্তি)—সাংখ্যের এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব, এবং ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, শরীর, চেতনা (জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি), এবং ধৃতি—এই সকল মিলিয়া ক্ষেত্র। অব্যক্তই তাহা হইতে উদ্ভূত যাবতীয় ভৌতিক ও মানসিক সমুৎপাদের নিম্নদেশে অবস্থিত ইন্দ্রিয়াতীত নিশ্চল কূটস্থ অক্ষর ব্রহ্ম, এবং যাবতীয় সমুৎপাদ পরমাত্মার সৃষ্টিপ্রেরণা হইতে উদ্ভূত। অব্যক্ত এবং তাহার উপরিভাগের সমস্ত সমুৎপাদ ক্ষেত্র এবং ইহাদের জ্ঞাতা পরমাত্মা এই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। প্রত্যেক জীবদেহই যে শুধু ক্ষেত্র, তাহা নহে। সমগ্র বিশ্বই ক্ষেত্র। প্রত্যেক জীবদেহে অধিষ্ঠিত যে প্রত্যক্ আত্মা, তিনি সমগ্র বিশ্বেরও আত্মা, এবং বিশ্বাত্মাই বিশ্ব-ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। কিন্তু জীবে অধিষ্ঠিত আত্মা অজ্ঞানবশতঃ জানেন না, যে তিনি ক্ষুদ্র দেহের মধ্যে বদ্ধ নহেন, সমগ্র বিশ্বই তাঁহার ক্ষেত্র এবং তিনি সেই ক্ষেত্রের ক্ষেত্রজ্ঞ। তিনি জ্ঞাতা এবং তিনি জ্ঞেয়, এবং জ্ঞাতা-জ্ঞেয়-রূপ দ্বৈতের অতীত অবর্ণনীয় সত্তা—যাহা হইতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ই উদ্ভূত ; তিনি জীবদেহে অধিষ্ঠিত আত্মার আত্মা এবং প্রকৃতির প্রভু। প্রকৃতি তাঁহার শক্তিরই ক্রীড়া, যাবতীয় শক্তি তাঁহারই শক্তি। আবার প্রত্যেক জীবদেহে তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ-রূপে অবস্থিত—যাবতীয় জীবদেহে তিনিই এক ক্ষেত্রজ্ঞ। বিভিন্ন দেহে জগৎ তাঁহার নিকট বিভিন্ন রূপে প্রকাশিত হয়, ইহা সত্য, কিন্তু যিনি জ্ঞানী, তিনি সমগ্র বিশ্ব আপনার মধ্যে অবস্থিত দেখিতে পান। ভিতরে ও বাহিরে একই সত্তা, জীব ও প্রকৃতি এক, ইহাই প্রকৃত জ্ঞান। একই ব্রহ্ম এক দিকে পরিণামী, অপর দিকে অপরিণামী, তিনি সর্বত্র অবস্থিত ও সর্বাতিগ। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের সম্বন্ধের তিনি ভিত্তি। তিনি সৎ ও অসতের (ব্যক্ত ও অব্যক্তের) দ্বন্দ্বের অতীত। তিনি কালাতীত। জীবাত্মা ও প্রকৃতির মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা তাঁহার সনাতন সত্তার অন্তর্গত। ইন্দ্রিয় ও তাহাতে প্রকৃতির প্রতিফলন প্রকৃতির জ্ঞানলাভের জন্য পরমাত্মা কর্তৃক কল্পিত। কিন্তু তাঁহার জ্ঞান ইন্দ্রিয়দ্বারা সীমিত নহে। তিনি অনিন্দ্রিয়, কিন্তু সকল ইন্দ্রিয়-শক্তি তাহাতে বর্তমান। তাহার পাণি, পাদ, অক্ষি, শির, মুখ, শ্রুতি, সর্বত্র বিদ্যমান। চক্ষুরাদি বাহ্য ইন্দ্রিয়ে এবং মন ও বুদ্ধিতে তিনি তাহাদের বিষয় রূপে প্রকাশিত হন। তিনি নির্গুণ হইয়াও গুণের ভোক্তা, অবিভক্ত হইয়াও বিভক্ত-রূপে সর্বভূতে অবস্থিত। প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই অনাদি—অনাদিকাল হইতে পরমাত্মা প্রকৃতি ও পুরুষরূপে ক্রীড়া করিতেছেন। কার্য্য ও করণ (শরীর ও ইন্দ্রিয়) প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত। তাহাদের দ্বারা

পুরুষ সুখ ও দুঃখ ভোগ করে। নানাবিধ যোনিতে জন্মগ্রহণের হেতু গুণসঙ্গ, অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শে সঙ্গ বা আসক্তি। স্থাবর বা জঙ্গম যাহা কিছু উৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগের ফলেই উৎপন্ন হয়।

জগতে সকল কর্ম্ম প্রকৃতি বা ঈশ্বরশক্তিদ্বারাই কৃত হয়। আত্মা অকর্ত্তা বা নিষ্ক্রিয়।

ত্রিগুণ

চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের ব্যাখ্যা আছে। সাংখ্য-মতে এই তিন গুণ হইতেই যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থের উৎপত্তি হয়। ইহাদের সাম্যাবস্থা প্রকৃতি, এবং সাম্যাবস্থার বিচ্যুতি হইতে সৃষ্টির উদ্‌ভব হয়। গুণ-শব্দের অর্থ-বিষয়ে ভাষ্যকারদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ গুণ-শব্দে বৈশেষিক গুণ, কেহ বা দ্রব্য বুঝিয়াছেন। সে যাহা হউক, গীতাকার পরমাত্মার শক্তি হইতে ইহাদের উদ্‌ভব হয়, বলিয়াছেন। তাঁহার অপরা প্রকৃতিই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ রূপে বিভিন্ন বস্তুতে প্রকাশিত হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ পরমাত্মার শক্তির বিভিন্ন ক্রিয়া। এই শক্তির অব্যক্ত ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থাই সাংখ্যের প্রকৃতি। তাহাতেই সর্ব্বভূতের বীজ নিহিত। এই বীজ পরমাত্মার সংকল্প (Idea)। আকার-বিশিষ্ট যাবতীয় বস্তু ইহার ফলেই তাঁহার অপরা প্রকৃতি হইতে আবির্ভূত হয়। এই সকল বস্তুই ত্রিগুণাত্মক—সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণান্বিত। প্রত্যেক গুণ কোনওটিতে কম, কোনটিতে অধিক। সত্ত্ব নির্ম্মল, প্রকাশ-স্বভাব, চাঞ্চল্যরহিত ও শান্ত (নিরাময়)। রজঃ রাগাত্মক অর্থাৎ বিষয়ের রাগে (রংএ) চিত্তকে রঞ্জিত করে, এবং বিষয়ে আসক্তি ও তৃষ্ণার জনক। তমঃ জ্ঞানের আবরক, ভ্রান্তির জনক ও অজ্ঞান, আলস্য ও নিদ্রার হেতু। জাগতিক প্রত্যেক বস্তুতে এই তিন গুণই বর্ত্তমান, এবং ইহারা প্রত্যেকেই বন্ধের হেতু। সত্ত্ব বন্ধের কারণ হয় সুখ ও জ্ঞানের প্রতি আসক্তির উৎপাদনদ্বারা। রজঃ তৃষ্ণার জনক বলিয়া তৃষ্ণার পরিতৃপ্তিকর কর্ম্মেরও জনক। কর্ম্মদ্বারাই রজঃ বন্ধের হেতু হয়। প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রাদ্বারা তমঃ বন্ধের কারণ হয়। প্রত্যেক বস্তুতে এই তিন গুণের একটির আধিক্য থাকে। যখন সর্ব্ব ইন্দ্রিয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তখন রজঃ ও তমঃ শান্ত থাকে, সত্ত্ব তাহাদিগকে অভিভূত করিয়া বিবৃদ্ধ হয়। যখন রজঃ প্রবৃদ্ধ হয়, তখন লোভ ও কর্ম্মের প্রবৃত্তি উদ্‌ভূত হয়। তমো-

গুণের বৃদ্ধি হইলে অপ্রকাশ (বিবেক-ভ্রংশ), কর্ম্মে অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উদ্ভূত হয়। সাত্ত্বিক ভাবে যে কর্ম্ম কৃত হয়, তাহার ফল হয় সত্ত্বপ্রধান নির্ম্মল সুখ। রাজসিক কর্ম্মের ফল দুঃখ, এবং তামসিক কর্ম্মের ফল অজ্ঞান।

যাবতীয় কর্ম্ম এই গুণদিগের কর্ত্তৃকই কৃত হয়, অর্থাৎ পরমাত্মার শক্তির ক্রিয়াই জাগতিক সকল ক্রিয়া। জীব যে কর্ম্ম করে, তাহাও এই শক্তিরই ক্রিয়া। আত্মা গুণাতীত ও নিষ্ক্রিয়, কোনও কর্ম্ম করে না। যিনি ইহা জানেন, তিনি পরমাত্মার ভাব (তদ্রূপতা, সাধর্ম্য) প্রাপ্ত হন।

দেহে সত্ত্ব: রজঃ ও তমঃ—প্রকাশ, কর্ম্ম-প্রবৃত্তি ও মোহ (অজ্ঞান)—তিন গুণেরই প্রকাশ হয়। কিন্তু যিনি ইহাদের উৎপত্তি হইলে দ্বেষ করেন না (বিরক্তিবোধ করেন না), ইহাদের নিবৃত্তি হইলে ইহাদের কামনা করেন না, কিন্তু অবিচলিতভাবে উদাসীনের মত থাকেন, ইহাদের সহিত তাহার কোনও সম্বন্ধ স্বীকার করেন না, যাঁহার নিকট দুঃখ ও সুখ, প্রিয় ও অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতি, মিত্র ও অরি সমান, যিনি সর্ব্ব উদ্যম পরিত্যাগ করিয়া স্বভাবে সুপ্রতিষ্ঠ, তিনি গুণাতীত। যিনি একান্ত ভক্তির সহিত পরমাত্মা বা পুরুষোত্তমের সেবা করেন, তিনি গুণাতীত হইয়া ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন।

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তির সমন্বয়

মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার গীতার টীকার উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন, "সহেতুক সংসারের অত্যন্ত উপরমই নিঃশ্রেয়স। পর নিঃশ্রেয়সই গীতা-শাস্ত্রের প্রয়োজন। বিষ্ণুর সৎচিদানন্দরূপ পরমপদই নিঃশ্রেয়স। তাহার প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে তিন কাণ্ডযুক্ত বেদ সমারব্ধ। কর্ম্ম, উপাস্তি (উপাসনা) এবং জ্ঞান—বেদের তিন কাণ্ড। অষ্টাদশ অধ্যায়যুক্ত গীতাও তিন কাণ্ডযুক্ত। প্রত্যেক কাণ্ডে ছয় অধ্যায়। প্রথম কাণ্ডে কর্ম্মনিষ্ঠা এবং শেষ কাণ্ডে জ্ঞাননিষ্ঠা কথিত হইয়াছে। জ্ঞান ও কর্ম্মের অত্যন্ত বিরোধবশতঃ তাহাদের সমুচ্চয় নাই। ভগবৎনিষ্ঠা মধ্যম কাণ্ডে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সর্ব্ব-বিঘ্নাপনোদিনী ভগবৎনিষ্ঠা, কর্ম্মনিষ্ঠা, ও জ্ঞাননিষ্ঠা উভয়ের অনুগত। এই নিষ্ঠা ত্রিবিধ—কর্ম্মমিশ্রা, শুদ্ধা ও জ্ঞানমিশ্রা। প্রথম কাণ্ডে কর্ম্ম ও কর্ম্মত্যাগ-বর্ণনা দ্বারা "ত্বং"-রূপ বিশুদ্ধ আত্মা যুক্তির সহিত নিরূপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় কাণ্ডে ভগবদ্-ভক্তি-নিষ্ঠা-বর্ণনাদ্বারা ভগবান্ পরমানন্দরূপ "তৎ" পদার্থ

অবধারিত হইয়াছে। তৃতীয় কাণ্ডে উভয়ের ঐক্য প্রস্ফুটিত করা হইয়াছে। এইরূপে তিন কাণ্ডের পারস্পরিক সম্বন্ধ প্রদর্শিত হইয়াছে।”

গীতা মুখ্যতঃ চরিত্রনীতি শাস্ত্র। ইহাতে মানুষের কর্ত্তব্য নির্ণীত হইয়াছে। মানুষের কর্ত্তব্য কি, তাহা নির্দ্ধারণ করিতে হইলে তাহার স্বরূপ ও তাহার সহিত সমাজের ও সমগ্র জগতের সম্বন্ধ কি, তাহা জানার প্রয়োজন। তাই গীতায় গভীর দার্শনিক তত্ত্বসকলও আলোচিত হইয়াছে। এক পরমাত্মাই বিভিন্ন রূপে জগতে প্রকাশিত। তাঁহারই শক্তি বাহ্য জগতে রূপগ্রহণ করিয়াছে। তিনিই প্রতি জীবে “জীবভূত” হইয়াছেন। স্বরূপতঃ জীব ও পরমাত্মা এক। ইহাই গীতার মীমাংসা। এই মীমাংসা গীতা মানুষের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণে প্রয়োগ করিয়াছেন।

সৃষ্টির ব্যবস্থা অতিশয় জটিল। পরমাত্মার এক শক্তিই তিন বিভিন্ন গুণে প্রকাশিত। জীব স্বরূপে পরমাত্মার সদৃশ হইলেও, দৃশ্যতঃ এই তিন গুণের প্রভাবাধীন। এই গুণদিগের বিভিন্ন পরিমাণে বিভিন্ন জীবে অবস্থানের ফলে তাহাদের প্রকৃতিও বিভিন্ন হয়। কিন্তু সকলেই রাগ ও দ্বেষের বশীভূত; সকলেই বিভিন্ন প্রবৃত্তির অধীন। বিভিন্ন প্রবৃত্তির বশে জীব যে কর্ম্ম করে, তাহার ফল সুদূর প্রসারী; তাহার ফলে তাহাকে বারংবার জন্মগ্রহণ করিতে হয়। জীবনে সুখ যেমন আছে, দুঃখকষ্টও তেমনি প্রচুর পরিমাণে আছে। শ্রেয়ঃ কি, এই প্রশ্ন মানুষের মনে উঠে। যাহা শ্রেয়ঃ, তাহাই জীবনের লক্ষ্য, তাহাই পরম পুরুষার্থ। যাবতীয় কর্ম্ম শ্রেয়ের অভিমুখী করাই মানুষের কর্ত্তব্য। কিন্তু যাহা শ্রেয়ঃ, তাহা প্রেয়ের বিপরীত। যাহাকে আমরা সুখ বলি, তাহা অল্প হইতে উদ্ভূত হয়, তাহা ক্ষণস্থায়ী, তাহা পুরুষার্থ নহে। যাহা ভূমা, তাহাই সুখ। এই ভূমাপ্রাপ্তিই পুরুষার্থ, তাহাই প্রত্যেক জীবের লক্ষ্য।

বেদে “ইষ্টাপূর্ত্তে”র ব্যবস্থা আছে। দেবোদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যাগ-যজ্ঞই ইষ্ট, এবং জীবের সাংসারিক মঙ্গলের জন্য বাপী, কূপ তড়াগাদি খননই “পূর্ত্ত।” ইষ্টা-পূর্ত্তের ফলে স্বর্গবাস হয়। সুতরাং সংসারী জীবের তাহাই কর্ত্তব্য। ইহাই কর্ম্মমার্গ। উপনিষদে জ্ঞানকেই প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। যাগ-যজ্ঞ (দ্রব্য যজ্ঞ) বর্জ্জন করিতে বলা না হইলেও তাহাকে ধ্যান-যজ্ঞে পরিণত করিবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ, দান তপস্যা ও অনশন দ্বারা তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিতে ইচ্ছা করেন। তাঁহাকে জানিয়াই “মুনি” হয়। তাঁহাকে কামনা করিয়া সন্ন্যাসিগণ প্রব্রজ্যা অবলম্বন করেন। প্রাচীন কালের বিদ্বান্‌গণ সন্তান কামনা করেন নাই। তাঁহারা বলিতেন

"আমরা যখন ব্রহ্মকে লাভ করিয়াছি, তখন সন্তানদ্বারা কি করিব ?" তাঁহারা পুত্রৈষণা, বিত্তৈষণা, লোকৈষণা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচর্য্যা অবলম্বন করিয়াছিলেন। (বৃহৎ আরণ্যক ৪।৪।২২)। "ব্রাহ্মণের এই মহিমা অবগত হইলে পুরুষ কর্ম্মে লিপ্ত হয় না।" (৪।৪।২৩)। অক্ষরকে না জানিয়া যে ইহলোক হইতে প্রস্থান করে, সে কৃপাপাত্র" (বৃ-আ: ৩।৮।১০)। জ্ঞান ভিন্ন মুক্তি হয় না। যে এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে না জানিয়া, তাঁহাকে "নানা"র মতো দেখে, সে মৃত্যু হইতে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। "সর্ব্বং খলু ইদম্ ব্রহ্ম।" ইহাই পরম জ্ঞান। এই জ্ঞানেই মুক্তি হয়। ইহাই জ্ঞানমার্গ।

উপনিষদে যে ভক্তির কথা একেবারে নাই, তাহা নহে। কিন্তু সর্ব্ব উপনিষদে জ্ঞানের মাহাত্ম্যই প্রধানতঃ কীর্ত্তিত হইয়াছে, এবং জ্ঞানদ্বারাই ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়, বলা হইয়াছে। গীতার রচনাকালে ঈশ্বর ভক্তির বশ এবং ভক্তিদ্বারা পরমপুরুষার্থ লাভ করা যায়, এই মত প্রচারিত হইয়াছিল। ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি। সেই অনুরক্তির ফলে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ ও শরণাগতি। গীতায় কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের সমন্বয় সাধিত হইয়াছে।

জ্ঞানমার্গী বলেন কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী ; এই জন্য কর্ম্ম বন্ধের কারণ। সুতরাং মুক্তিকামীর পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অপরিহার্য্য। গীতা বলেন, কর্ম্ম নিজে বন্ধের কারণ হয় না। কর্ম্মের সহিত যে আসক্তি যুক্ত থাকে, তাহা হইতেই বন্ধের উৎপত্তি। আসক্তি যদি না থাকে, কর্ম্মের ফল যদি কামনা না করা যায়, শুধু কর্ত্তব্যবোধে যদি কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সে কর্ম্মের ভাবী কোনও ফল উৎপন্ন হয় না, এবং তাহা বন্ধেরও কারণ হয় না। কর্ম্ম সম্পূর্ণ বর্জ্জন করা সম্ভবপর নহে। ইচ্ছা না থাকিলেও প্রকৃতির বশে কর্ম্ম করিতে হয়। কর্ম্ম না করিলে দেহরক্ষাও হইতে পারে না। আবার কর্ম্ম না করিলেই যে কর্ম্মত্যাগ হয়, তাহা নহে। কর্ম্ম না করিয়া যে মনে মনে কর্ম্মলভ্য বিষয়ের চিন্তা করে, সে মিথ্যাচারী। যিনি আত্মরতি, আত্মতৃপ্ত, আপনাতে সন্তুষ্ট, তাঁহার কোনও কিছুরই প্রয়োজন নাই, তাঁহার করণীয়ও কিছু নাই। কিন্তু লোকসংগ্রহের জন্য তাঁহারও কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য। শ্রেষ্ঠ লোকে যদি কর্ম্ম না করে, ইতর লোকেও করিবে না। প্রকৃতপক্ষে কর্ম্ম কৃত হয় প্রকৃতির গুণদিগের দ্বারা। জীব প্রকৃতির সঙ্গে (দেহের সঙ্গে) আপনাকে অভিন্ন মনে করিয়া আপনাকে কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া ভাবে। এই অহংকার, এই আমিত্ব যখন যায়, তখন কর্তৃত্ব-জ্ঞান থাকে না। নিষ্কাম হইয়া কেবল কর্ত্তব্যবোধে

কর্ম্ম করাই কর্ম্মের ফল হইতে মুক্ত হওয়ার কৌশল। কর্ম্ম—যাগ, যজ্ঞ ও অন্য কর্ম্ম—ত্যাজ্য নয়ে, নিষ্কামভাবে করণীয়। কর্ম্মফল ব্রহ্মে সমর্পণ করিয়া কর্ম্ম করাই কর্ম্মত্যাগ। অজ্ঞানী আসক্তির বশে যে ভাবে কর্ম্ম করে, লোক-সংগ্রহের জন্য সেই ভাবে কর্ম্ম করিবে, অনাসক্ত হইয়া। সকল কামনা ত্যাগ করিয়া যখন কেহ আপনাতে তুষ্ট থাকে, তখন তাহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। যাহার সকল কর্ম্ম কাম-সংকল্প-বর্জিত, জ্ঞানাগ্নিকর্ত্তৃক তাহার কৃত কর্ম্ম দগ্ধ হয়, অর্থাৎ তাহাদ্বারা বন্ধন হয় না। শ্রদ্ধার সহিত জ্ঞান-লাভে সচেষ্ট জন জ্ঞানলাভ করিয়া সংশয়মুক্ত হয়। জ্ঞানদ্বারা ছিন্নসংশয় প্রমাদহীন যিনি ব্রহ্মে সর্ব্ব কর্ম্ম অর্পণ করেন, কর্ম্ম তাহাকে বন্ধন করিতে পারে না। যিনি জ্ঞানী, তিনি প্রিয় প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় প্রাপ্ত হইয়া উদ্বিগ্ন হন না। লোষ্ট্র, প্রস্তর ও কাঞ্চন সর্ব্বত্রই তিনি ব্রহ্মদর্শন করেন বলিয়া সকলই তাহার নিকট সমান। নিন্দা ও স্তুতি, শীত ও গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখ তাঁহার নিকট সমান। তিনি কাম-ক্রোধরহিত, তাঁহার চিত্ত সংযত। এতাদৃশ দ্বন্দ্বরহিত লোকের চতুর্দিকেই নির্ব্বাণ বর্ত্তমান—তিনি নির্ব্বাণের মধ্যে অধিষ্ঠিত। তিনি সর্ব্বভূতের মঙ্গলের জন্য কর্ম্ম করেন। ইহাই জ্ঞান ও কর্ম্মের সমন্বয়।

ইহার পরে ভক্তির কথা। জ্ঞানী নিষ্কামভাবে কর্ম্ম করিয়া যদি ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে ভক্তির স্থান কোথায়? আর ভক্তি করিবই বা কাহাকে? কি জন্যই বা করিব?

সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি যিনি সকল ইন্দ্রিয় সংযত করিয়া অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বত্র-গম, অচিন্ত্য, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব, অক্ষরের উপাসনা করেন, তিনি অক্ষররূপী পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। আর যে ভক্ত পরমাত্মায় মন স্থির রাখিয়া শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার উপাসনা করেন, তিনিও পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হন। কিন্তু অব্যক্তের উপাসনা সহজ নহে, তাহা অধিকতর ক্লেশদায়ক, অতি কষ্টে অব্যক্ত অক্ষরকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যিনি সর্ব্ব কর্ম্ম ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়া অন্য অবলম্বনহীন হইয়া কেবলমাত্র ঈশ্বরেরই উপাসনা করেন, ঈশ্বর তাহাকে মৃত্যু-যুক্ত সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করেন। তিনি শরীরপাতের পরে ঈশ্বরের মধ্যে গমন করেন। ভক্তিদ্বারা মুক্তি অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য হয়। সুতরাং সাধনায় ভক্তির স্থান আছে।

ভক্তি অক্ষরকে করা যায় না। কেননা অক্ষর অনির্দ্দেশ্য ও অচিন্ত্য। যাহার সম্বন্ধে কিছুই জানি না, তাহাকে ভক্তি করা অসম্ভব। ভক্তির পাত্র পুরুষোত্তম পরমাত্মা—যিনি গীতার বক্তা। যাহারা সতত যুক্ত হইয়া তাঁহার

ভজনা করেন, তিনি তাহাদিগকে বুদ্ধিযোগ (জ্ঞান) দান করেন, তিনি তাহাদের অজ্ঞান নাশ করেন। অতি দুরাচার ব্যক্তিও যদি অন্য কাহারও ভজনা না করিয়া তাঁহার ভজনা করে, তাহা হইলে সে সাধু হয়, ধর্ম্মাত্মা হয়, শাশ্বত শান্তি প্রাপ্ত হয়। তাঁহার ভক্তের বিনাশ নাই। অনন্য হইয়া যে তাঁহার উপাসনা করে, তিনি তাহার যোগক্ষেম বহন করেন—অপ্রাপ্ত দ্রব্য দান করেন, এবং প্রাপ্ত দ্রব্য রক্ষা করেন। তিনি যজ্ঞ ও তপস্যার ভোক্তা, তিনি সর্ব্ব লোকের মহেশ্বর এবং সর্ব্ব জীবের সুহৃৎ। ভক্তিপূর্ব্বক তাঁহাকে যাহাই দেওয়া যায়—পত্র, পুষ্প, ফল ও জল, তাহাই তিনি গ্রহণ করেন। তিনি জগতের পিতা, ধাতা ও পিতামহ। তিনি জীবের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ ও সুহৃৎ। এ বিশ্বে যাহা কিছু আছে, সকলই তিনি।

যিনি সকলের পিতা, যিনি সর্ব্বজীবের সুহৃৎ, যিনি শরণাগতের যোগ-ক্ষেম বহন করেন, যিনি অজ্ঞান নাশ করিয়া জ্ঞানদান করেন, তাঁহার প্রতি ভক্তি স্বতঃই সঞ্জাত হয়। কিন্তু তাঁহাকে না জানিলে ভক্তি হয় না। সুতরাং ভক্তির জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। যে তাঁহাকে ভক্তি করে, সে তাঁহাকে সর্ব্ব লোকের সুহৃৎ জানিয়া সর্ব্ব ভূতের হিতসাধনে রত হয়। সুতরাং জ্ঞান ও কর্ম্মের সহিত ভক্তির বিরোধ নাই, বরং ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

সাধারণ মানুষ পুরুষোত্তমের অংশ হইলেও প্রকৃতির অধীন, এবং প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের ক্রিয়ার অবশ্যম্ভাবী ফল সুখ, দুঃখ ও অশান্তি ভোগ করে। সে জানে না, যে সে অব্যয়, অমৃত, শাশ্বত, ঐকান্তিক সুখের আধার পুরুষোত্তমের অংশ, এবং সে স্বকীয় চেষ্টায় ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া পুরুষোত্তমের পরা শান্তি ও সুখলাভে সক্ষম। জ্ঞানলাভের পরে চিত্তসমাধান করিয়া সে প্রথমে ক্ষর পুরুষকে অতিক্রম করে এবং অক্ষর পুরুষের স্পর্শ লাভ করে। সংবিদের এই অবস্থায় সে পরিণামী জগতের অন্তরালে অবস্থিত পুরুষোত্তমের নিষ্ক্রিয় রূপের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া সুখ ও দুঃখের অতীত এক শান্তিপূর্ণ অবস্থায় উপনীত হয়। কিন্তু পুরুষোত্তমের সে রূপ তাঁহার আনন্দময় রূপ নহে—সর্ব্বভূতের সুহৃৎ প্রেমমূর্ত্তি নহে। তাঁহার স্বরূপ অবগত হইয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশে সমস্ত কর্ম্ম করিয়া, সর্ব্ব কর্ম্মফল তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া এবং আপনাকে একান্ত ভাবে তাঁহাকে নিবেদন করিয়া মানুষ তাঁহার স্পর্শ-লাভ করিতে পারে ও জন্মমৃত্যু হইতে মুক্ত হইয়া চিরকাল তাঁহার ক্রোড়ে বাস করিতে ও অক্ষয় সুখ ও শান্তির অধিকারী হইতে পারে। সর্ব্ব ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণ লইলে তিনি শরণাগতকে সর্ব্ব পাপ হইতে

রক্ষা করেন। যে যে ভাবে তাঁহাকে পাইতে চায়, তিনি সেই ভাবেই তাঁহার কামনা পূর্ণ করেন। ইহাই গীতায় কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়

গীতায় চরিত্রনীতি

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি মানব-জীবনের তিনটি প্রধান ভাগ—জীবনের সার্থকতা-সম্পাদনের তিনটি উপায়। কেহ জ্ঞান-পথের পথিক হইয়া নিঃশ্রেয়স-লাভের জন্য চেষ্টিত, কেহ কর্ম্মের পথে, কেহ ভক্তির পথে জীবনের পূর্ণতা-সম্পাদনে সচেষ্ট। গীতা এই তিন পথের কোনটিকেই তুচ্ছ জ্ঞান করেন নাই; এই তিনের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া মানুষের কর্ত্তব্য-নির্দ্ধারণের চেষ্টা করিয়াছেন।

গীতা বলিয়াছেন গুণ ও কর্ম্ম অনুসারে মানুষ চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। শম, দম, তপ, শৌচ, ক্ষান্তি (ক্ষমা), আর্জব (সরলতা), জ্ঞান, বিজ্ঞান (কর্ম্মকাণ্ডে যজ্ঞাদিকর্ম্মে কুশলতা, ব্রহ্মকাণ্ডে ব্রহ্মের সঙ্গে একত্বের অনুভব), আস্তিক্য (পরলোকে বিশ্বাস)—ইহাই ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম। ক্ষত্রিয়ের স্বভাবজাত কর্ম্ম শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, (ধৈর্য্য), দাক্ষ্য (দক্ষের ভাব—কৌশল), যুদ্ধে অপলায়ন, দান ও ঈশ্বর ভাব (প্রভুশক্তি-প্রকটন)। কৃষি, গোরক্ষা ও বাণিজ্য বৈশ্যের স্বভাবজ কর্ম্ম। শূদ্রের স্বভাবজ কর্ম্ম অন্যের পরিচর্য্যা। প্রত্যেকে স্ব স্ব কর্ম্মে রত থাকিয়াই সিদ্ধিলাভ করে। যাঁহা হইতে সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়াছে, যিনি সর্ব্বব্যাপী, তাঁহাকে স্বীয় কর্ম্মদ্বারা অর্চ্চনা করিয়া লোকে সিদ্ধিলাভ করে। নিজের স্বাভাবিক কর্ম্ম যদি বিগুণও হয়, তাহা হইলেও অন্য বর্ণের কর্ম্ম অপেক্ষা তাহা শ্রেয়স্কর। কেন না স্বভাব-নিয়ত কর্ম্ম করিয়া কেহ পাপ অর্জ্জন করে না। স্বভাবজ কর্ম্ম দোষযুক্ত হইলেও তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে। কিন্তু স্বভাবজ কর্ম্ম কি, তাহা জানিবার উপায় কি? গীতার সময় বর্ণধর্ম্ম জাতিগত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই যে যে জাতিতে জাত, সেই জাতির জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মই তাহার স্বভাবজ কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু ব্যাধের বংশে যদি কেহ ব্রাহ্মণের গুণ লইয়া জন্মগ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকেও কি ব্যাধের কর্ম্ম করিতে হইবে? এরূপ ব্যতিক্রমে দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে আছে। তাহাদিগকে তাহাদের প্রাপ্য সম্মানও সর্ব্ব কালেই প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু স্ববর্ণের জন্য নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-সম্পাদনই সাধারণ নিয়ম ছিল। সমাজ-স্থিতির জন্য গীতা তাহার সমর্থন করিয়াছেন।

গীতায় দৈব ও আসুরী নামে দ্বিবিধ সম্পদের ব্যাখ্যা আছে অভয়,

সত্ত্বসংশুদ্ধি (চিত্তের প্রসন্নতা), জ্ঞান-যোগে ব্যবস্থিতি (আত্মজ্ঞান-লাভে পরিনিষ্ঠা), দান, দম (বাহ্য ইন্দ্রিয়ের সংযম), যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (বেদপাঠ), তপ, আর্জব (সরলতা), অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, অপৈশুন (পরদোষ-প্রকাশ বর্জ্জন), ভূতে দয়া, অলোলুপ্ত (লোভের অভাব), মার্দব (অক্রূরতা, হ্রী (অকার্য্যে লজ্জা), অচাপল (অপ্রয়োজনে বাক্য ও ক্রিয়া-বর্জ্জন), তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ (পরজিঘাংসা-রাহিত্য), নাতিমানিতা (অভিমানহীনতা)—এই সকল দৈবী সম্পৎ। দম্ভ (ধর্ম্মধ্বজিত্ব), দর্প (ধন ও স্বজনাদি নিমিত্ত আপনাকে বড় বলিয়া ধারণা), অভিমান (আপনাতে পূজ্যত্বের আরোপ), ক্রোধ, পারুষ্য (নিষ্ঠুরতা) ও অজ্ঞান আসুরী সম্পৎ। দৈবী সম্পৎ হইতে মোক্ষ এবং আসুরী সম্পৎ হইতে বন্ধ হয়। আসুর-প্রকৃতি লোকের ধর্ম্মে প্রবৃত্তি ও অধর্ম্মে নিবৃত্তি নাই। শৌচ, সদাচার ও সত্য তাহাদের মধ্যে নাই। তাহারা জগৎকে অসত্য, অপ্রতিষ্ঠ ও অনীশ্বর বলে। এবং প্রাণিদিগকে কামপ্রযুক্ত স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গের ফল বলিয়া মনে করে। দুষ্পূরণীয় কামনার পরিতৃপ্তির জন্য তাহারা দম্ভ, মান ও মদের সহিত অশুভ উদ্দেশ্য-সাধনে কৃতনিশ্চয় হইয়া অশুচি কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। ইহারা যাবজ্জীবন অপরিমেয় বিষয়ার্জ্জন ও রক্ষণ-চিন্তায় বিব্রত থাকে এবং বিষয়-ভোগকে পুরুষার্থ মনে করে। শত আশাপাশে বদ্ধ, কাম-ক্রোধপরায়ণ হইয়া কাম-ভোগের জন্য অন্যায়-পূর্ব্বক অর্থ-সঞ্চয়ের চেষ্টা করে। কাম, ক্রোধ ও লোভ এই তিনটি নরকের দ্বার।

গীতা বলেন, যে শাস্ত্রবিধি বর্জ্জন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হয়, সে কখনই সিদ্ধি, সুখ ও উৎকৃষ্ট গতি লাভ করিতে পারে না। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-নির্ণয়ে শাস্ত্রই প্রমাণ। যাহারা শাস্ত্রীয় মার্গ বর্জ্জন করিয়া কাম-রাগ-সমন্বিত এবং দম্ভ-অহংকার-সংযুক্ত হইয়া ঘোর তপস্যা করে, এবং অতিশয় কঠোর আচরণ-দ্বারা শরীরস্থ ভৌতিক পদার্থগুলিকে বিশুষ্ক করিয়া আত্মাকেও নিপীড়িত করে, তাহারা আসুরী-নিষ্ঠাসম্পন্ন।

ফলাকাঙ্ক্ষা-পরিশূন্য হইয়া কর্ত্তব্যবোধে শাস্ত্রানুসারে যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা সাত্ত্বিক; ফলকামনা করিয়া কিংবা যশোলোভে যে যজ্ঞ করা হয়, তাহা রাজস। বিধিহীন, অন্নদানবিহীন ও দক্ষিণাবিহীন যজ্ঞ তামস।

শারীর, বাঙ্ময় ও মানসভেদে তপ ত্রিবিধ। দেব-দ্বিজ-গুরু ও পণ্ডিতের পূজা, শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসা শারীর তপ। অন্যের দুঃখের অনুৎপাদক, সত্য, প্রিয় ও হিত, বাক্য এবং বেদাভ্যাস বাঙ্ময় তপ। মনের প্রসাদ

(বিষয়-চিন্তা-ব্যাকুলতা শূন্যতা), সৌম্যত্ব (সর্ব্ব-লোকহিতৈষিতা), মৌন, আত্মনিগ্রহ (বিষয় হইতে মনের প্রত্যাহার) ও ভাব-সংশুদ্ধি (কাম-ক্রোধ-লোভাদি-মল-নিবৃত্তি) মানস তপ। এই ত্রিবিধ তপস্যা যখন ফলাকাঙ্ক্ষা-বর্জ্জিত হইয়া শ্রদ্ধাসহকারে অনুষ্ঠিত হয়, তখন তাহা সাত্ত্বিক। মূঢ়তার বশে পরের বিনাশের উদ্দেশ্যে শরীরের পীড়া জন্মাইয়া যে তপ কৃত হয়, তাহা তামস। আর সৎকার, সম্মান ও পূজা-লাভের জন্য যে তপ কৃত হয়, তাহা রাজস।

কর্ত্তব্যবোধে অনুপকারী লোককে উপযুক্ত কালে ও স্থানে যে দান করা যায়, তাহা সাত্ত্বিক। প্রত্যুপকার কিংবা ফল কামনা করিয়া মনের কষ্টের সহিত যে দান করা হয়, তাহা রাজস, এবং দেশকাল বিবেচনা না করিয়া অপাত্রে অহংকার ও অবজ্ঞার সহিত যে দান করা হয়, তাহা তামস।

ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ

ব্রহ্ম-নির্বাণ শব্দ গীতায় একাধিক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে। "সর্ব্ব কামনা পরিত্যাগ করিয়া যে পুরুষ নিস্পৃহ, নির্মম ও নিরহংকার হইয়া বিচরণ করেন, তিনি শান্তি প্রাপ্ত হন। ইহাই ব্রাহ্মী স্থিতি। ইহা যিনি প্রাপ্ত হন, তিনি মোহ প্রাপ্ত হন না। মরণকালে এই অবস্থায় স্থিত হইয়া তিনি ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন (২।৭২)।" "যে যোগী অন্তঃসুখ, অন্তরারাম ও অন্তর্জ্যোতি, তিনি ব্রহ্মভূত হইয়া ব্রহ্মনির্ব্বাণ প্রাপ্ত হন (৫।২৪)।" "সর্ব্বভূতহিতে রত, যতাত্মা, দ্বৈধমুক্ত, ক্ষীণপাপ ঋষিগণ ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন (৫।২৫)।" "কামক্রোধ-বিযুক্ত যতচিত্ত বিদিতাত্মা যতিদিগের চতুর্দিকে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বর্ত্তমান থাকে (৫।২৬)।" এই ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ ব্রহ্মে লয়। কিন্তু এই লয় জীবাত্মার নহে। গীতায় জীবকে সনাতন বলা হইয়াছে। "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।" 'যাহাদের মন সাম্যে অবস্থিত, (যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি), তাঁহারা ইহ জন্মেই সংসার (জন্মমৃত্যু) অতিক্রম করিয়াছেন (৫।১৯)।" ইহজন্মে যিনি জন্মমৃত্যু অতিক্রম করেন, তিনিই ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্থিত (৫।২৪), এবং তিনি ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন। তাঁহার চতুর্দিকে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বর্ত্তমান। সুতরাং ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ কাম, ক্রোধ এবং অসমদৃষ্টির লয়, জীবাত্মার লয় নহে। গীতায় কোথাও জীবাত্মার ঐকান্তিক বিনাশের কথা নাই, আছে ঈশ্বরের সাধর্ম্য-প্রাপ্তির কথা। "এই জ্ঞান আশ্রয় করিয়া আমার সাধর্ম্য-প্রাপ্ত হইয়া মুনিগণ সৃষ্টিকালে উৎপন্ন হন না, প্রলয়কালে ব্যথিত হন না (১৪।২)।" এই সাধর্ম্যই গীতার মুক্তি বা ব্রহ্ম-নির্ব্বাণ।

"সাধর্ম্য" শব্দের অর্থ পুরুষোত্তমের সরূপতা। ইহাই গুণাতীত অবস্থা। "যাঁহার নিকট সুখদুঃখ, লোষ্ট্র, প্রস্তর, কাঞ্চন সমান, প্রিয় ও অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতি, মান ও অপমান, অরি ও মিত্র তুল্য, যিনি সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী (সকল সকাম-কর্ম্মত্যাগী), তিনিই গুণাতীত (১৪।২৫)।" মুক্ত আত্মা ব্রহ্মের মধ্যে বাস করেন, কিন্তু তাঁহার ব্যক্তিত্বের বিনাশ হয় না। তিনি পুরুষোত্তমের "ভাব" (সাধর্ম্য) প্রাপ্ত হন (মদ্‌ভাবমাগতাঃ) (৪।১০)। "মদ্‌ভক্তা যান্তি মাম্" (৭।২৩)—পুরুষোত্তমের ভক্তগণ তাঁহাতে গমন করেন। গীতার যিনি বক্তা, তিনি নির্গুণ ব্রহ্ম নহেন, সগুণ ঈশ্বর—পুরুষোত্তম। তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়ার অর্থ তাঁহার সহিত এক হইয়া ব্যক্তিত্ব হারানো নহে; তাঁহার সাদৃশ্যলাভ করিয়া তাঁহার সমীপে বাস করা ও তাঁহার আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া, তাঁহার সনাতন আলোকের মধ্যে বাস করা। মুক্ত পুরুষকে গুণাতীত বলা হইলেও, তিনি নিরতিশয় সুখ উপভোগ করেন। "ব্রহ্মভূত, অকল্মষ, প্রশান্তমনা, শান্ত-রজঃ (রজোগুণ-মুক্ত) যোগীর নিকট উত্তম সুখ উপস্থিত হয় (৬।২৭)।" তাঁহার রজোগুণ (তমোগুণ তো বটেই) শান্ত, কিন্তু সত্ত্বগুণের শান্তির কথা নাই।

গীতায় নির্গুণ ব্রহ্ম যে অস্বীকৃত হইয়াছেন, তাহা নহে। নির্গুণ ও সগুণ ব্রহ্ম (পুরুষোত্তম) একই ব্রহ্মের দুই রূপ। কিন্তু মানুষের নিকট তিনি সগুণ ব্রহ্মরূপেই প্রকাশিত। পুরুষোত্তমই নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা-ভূমি। অসীম গুণাতীত অসঙ্গ ব্রহ্মের সার্বিকতার সহিত গুণাকর পুরুষোত্তমের সামঞ্জস্য কিরূপে হয়, তাহা আমাদের ধারণার অতীত। কিন্তু যাহা চরম সত্তা, তাহা আমাদের নিকট সগুণ ঈশ্বর বা পুরুষোত্তমরূপেই প্রকাশিত হন। তাঁহার এই রূপ যুক্তির নিকট প্রকাশিত হয় না, ভক্তির নিকট প্রকাশিত হয়। বুদ্ধির নিকট সেই চরম সত্য, সর্ব্বসম্বন্ধ-বিবর্জিত, নিষ্ক্রিয়, বাক্য-মনের অতীত সার্বিক সত্তারূপে প্রতিভাত; কিন্তু বুদ্ধির উপরে যে "বোধি", তাহাতে তিনি সগুণ ঈশ্বররূপে প্রকাশিত। সগুণত্ব ও নির্গুণত্বের এই সমন্বয় আমাদের বুদ্ধির অতীত।

পুরুষোত্তম অসীম, যাবতীয় সত্তা তাঁহার অন্তর্গত। তাঁহার বাহিরে কিছুই নাই, সুতরাং বহিঃস্থ কিছুর সহিত তাঁহার সম্বন্ধ নাই। তিনি অসঙ্গ (absolute)। তিনি গুণাতীত, তিনি দেশ ও কালের অতীত। কিন্তু যাবতীয় গুণ ও কাল তাঁহার মধ্যে বর্তমান। যে সকল গুণের সহিত আমাদের পরিচয় আছে, তাহারা তাঁহাকে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতে পারে না, তাই তিনি গুণাতীত। অসঙ্গ অসীম চরম সার্বিক (Highest universal)। ব্যক্তিত্ব

(Personality) সার্বিকত্বের বিপরীত। সুতরাং অসঙ্গ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ঈশ্বর (Personal God) হইতে পারেন না, এই যুক্তিতে চরম সত্যকে অনেকে সগুণ ব্রহ্ম বলিতে স্বীকৃত নহেন। কিন্তু ঈশ্বরের ব্যক্তিত্ব ও সার্বিকত্বের মধ্যে কোনও বিরোধ নাই। তাঁহাতে গুণের আরোপ করিলে তাঁহার অসীমত্ব সঙ্কুচিত হয়, এ আশঙ্কার কারণ নাই। কেন না তিনি যাবতীয় গুণের আধার হইলেও তাহাদের অতীত। কোন গুণই তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তাঁহার অসীমত্ব এবং ব্যক্তিত্ব উভয়ই গীতায় বর্ণিত হইয়াছে, এবং সগুণ ব্রহ্ম নির্গুণ ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বলিয়া সগুণ ব্রহ্মের ধারণা নির্গুণ ব্রহ্মের ধারণা অপেক্ষা যে উচ্চতর (a higher category), তাহাও বলা হইয়াছে।

ব্রহ্মের যে ইচ্ছা আছে, তাহা উপনিষদে স্বীকৃত হইয়াছে। ইচ্ছাই ব্যক্তিত্বের প্রধান লক্ষণ। ঈশ্বরের ইচ্ছা রাগ-দ্বেষের বশীভূত নহে। "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু, ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি, ন প্রিয়ঃ। যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা, ময়ি তে, তেষু চাপ্যহম্॥"—আমি সর্ব্বভূতের নিকটই সমান। আমার দ্বেষ্য অথবা প্রিয় কেহ নাই। ভক্তিপূর্ব্বক যাহারা আমার ভজনা করে, তাহারা আমাতে অবস্থান করে এবং আমি তাহাদের মধ্যে অবস্থান করি (৯।২৯)। ইহারই প্রতিধ্বনি শ্রীমদ্‌ভাগবতে—

> "ন চাস্য কশ্চিৎ দয়িতঃ সুহৃৎ-তমঃ।
> ন চাপ্রিয়ঃ, দ্বেষ্যঃ, উপেক্ষ্যঃ এব বা॥
> তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথাতথা।
> সুরদ্রুমঃ যদ্বৎ উপাশ্রিতোঽর্থদঃ॥

তাঁহার কেহ দয়িত বা শ্রেষ্ঠতম সুহৃৎ নাই। তাঁহার অপ্রিয়, দ্বেষ্য অথবা উপেক্ষ্যও কেহ নাই। তবুও ভক্তগণের মধ্যে যে যেরূপে তাঁহার ভজনা করে, তিনি সেই রূপে তাহাকে কৃতার্থ করেন, স্বর্গের কল্পবৃক্ষ যেমন আশ্রিতের কামনা পূর্ণ করে (ভাগবত—১০৩৮।২২)।

☞ ভুল সংশোধন—২৯৪ পৃষ্ঠায় ১৪ পংক্তিতে "মুনীতি" স্থলে "সুনীতি", ঐ পৃষ্ঠায় ২৫, ২৬ ও ২৭ পংক্তিতে "সূত্র" স্থলে "সূক্ত" এবং ২৯৬ পৃষ্ঠায় ২৩ ও ২৪ পংক্তিতে "মুক্ত" স্থলে "সূক্ত" পড়িতে হইবে।

১২

বৌদ্ধ সংঘে মতভেদ

Appearance and Reality গ্রন্থের ভূমিকায় ব্রাড্‌লে লিখিয়াছেন, যে তিনি তাত্ত্বিক দর্শনের উপর অতিরিক্ত গুরুত্ব কখনও আরোপ করেন নাই। তাই এক সময়ে তিনি লিখিয়াছিলেন "যাহা সহজাত সংস্কার-বশে আমরা বিশ্বাস করি, তাহার জন্য ভ্রান্ত যুক্তির অনুসন্ধানই তাত্ত্বিক দর্শন (Metaphysics)। কিন্তু এবংবিধ যুক্তির অনুসন্ধানও সহজাত সংস্কারের ফল।" ব্রাড্‌লের মতে প্রতিভাস হইতে স্বতন্ত্রভাবে সৎকে জানিবার প্রচেষ্টা, অথবা প্রথম তত্ত্বাবলী বা চরম সত্যের অনুশীলন, অথবা বিশ্বকে খণ্ডশঃ না বুঝিয়া সমগ্র ভাবে বুঝিবার প্রচেষ্টাই তাত্ত্বিক দর্শন। বুদ্ধ তাঁহার উপদেশে তাত্ত্বিক বিষয়ের আলোচনা সযত্নে পরিহার করিতেন, এবং সে সম্বন্ধে আলোচনা করিতে শিষ্যদিগকে নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার মৃত্যুর পরে তাত্ত্বিক বিষয়ে মতভেদের জন্য তাঁহার শিষ্যগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে।

বুদ্ধের উপদেশসকল প্রথমে মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছিল। তাহাদিগকে একত্র সংগ্রহ করিবার জন্য একাধিক সংগীতির অধিবেশন হয়। প্রথম সংগীতি আহূত হয় রাজগৃহে, বুদ্ধের পরিনির্বাণলাভের কিছু পরে। এই সভায় সন্ন্যাসের কঠোরতা হ্রাস করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু তাহাতে প্রাচীনগণ প্রবল বাধা দান করেন। দ্বিতীয় সংগীতির অধিবেশন হয় ইহার একশত বৎসর পরে বৈশালী নগরে। এ সভাতেও সংঘের নিয়মাবলী আলোচিত এবং তাহাদের কঠোরতা হ্রাস করিবার চেষ্টা হয়। কিন্তু স্থবিরদিগের বিরুদ্ধতা-বশতঃ সে চেষ্টা এবারও বিফল হয়। তখন সংস্কারপন্থিগণ (মহাসাংঘিক) স্বতন্ত্রভাবে এক মহাসংগীতির আহ্বান করেন। দীপবংশে লিখিত আছে, যে এই সভায় প্রাচীন শাস্ত্র বিপর্য্যস্ত হয় এবং বুদ্ধের উপদেশের বিকৃত অর্থ করা হয়। স্থবিরদিগের মতে বিনয়পিটকে যে সকল নিয়ম বিহিত আছে, কেবল তাহাদিগের সম্পূর্ণ পালন করিলেই বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু সংস্কারপন্থীদিগের মতে প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই বুদ্ধত্ব শক্যরূপে বর্ত্তমান এবং ইহার যথোচিত বিকাশদ্বারা প্রত্যেকেই তথাগত হইতে পারে। স্থবিরবাদই সিংহলের বৌদ্ধ ধর্ম্মের (হীনযান মতের) মূল।

বুদ্ধের মৃত্যুর পরে দুইশত বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম ১৮ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়ে। বুদ্ধের মৃত্যুর পর ২১০ বৎসর পরে অশোক বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত

হন। তখন বৌদ্ধ ধর্ম্ম সমগ্র ভারতে এবং ভারতের বাহিরেও প্রচারিত হয়। খৃঃ পূ ৩য় শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম কাশ্মীর, সিংহল, নেপাল, তিব্বত, চীন, জাপান এবং মঙ্গোলিয়ায় প্রবেশ করে। অশোকের পুত্র মহেন্দ্র সিংহলে গমন করেন এবং তথায় বৌদ্ধ সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। অশোকের সময়ে পাটলীপুত্রে তৃতীয় সংগীতির অধিবেশন হয়, এবং বৌদ্ধ সংঘে যে সকল অনাচার প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা দুর করিবার চেষ্টা হয়। অশোকের সময় হইতে কয়েক শতাব্দী বৌদ্ধ ধর্ম্ম ভারতে প্রবল থাকে। কিন্তু গুপ্ত সম্রাটদিগের সময় ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম পুনরুজ্জীবিত হয়, এবং বৌদ্ধমত খণ্ডনের জন্য প্রবল প্রয়াস উদ্ভূত হয়। তখন এই সকল আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ মত ব্যাখ্যাত হইতে থাকে। বুদ্ধ তখন দেবতারূপে গৃহীত হন এবং তাঁহার মূর্ত্তির পূজা আরব্ধ হয়। এই সময়ে নাগার্জুন (কনিষ্কের সময়ে) মহাযান সম্প্রদায় সুগঠিত করেন। থেরাবাদীদিগের হইতে মহাসংঘিকদিগের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিণতি মহাযান সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠায়। কনিষ্কের সময় জলন্ধরে যে সংগীতির অধিবেশন হয়, তাহাতে মহাযান মত স্থিরীকৃত হয়। হীনযান সম্প্রদায়ের দাবী এই, যে বুদ্ধের উপদেশের বিশুদ্ধি তাহারাই রক্ষা করিয়াছেন, এবং বুদ্ধ যে সকল নিয়মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, অবিকৃত অবস্থায় তাহা তাঁহাদের সম্প্রদায় প্রচলিত রাখিয়াছে। সিংহল ও ব্রহ্মদেশে হীনযান, এবং নেপাল, তিব্বত, চীন, মঙ্গোলিয়া, কোরিয়া ও জাপানে মহাযান প্রচলিত। হীনযান অন্তর্মুখী এবং বৈরাগ্যপ্রধান। মহাযান জাগতিক অবস্থার সহিত সমন্বয়সাধক। কনিষ্কের আহুত সংগীতিকে হীনযানিগণ স্বীকার করেন না। মহাযানিগণ নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত। তাহাদের সর্ব্বস্বীকৃত শাস্ত্রগ্রন্থ নাই। তাহাদের অনেকে সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

হীনযান বৌদ্ধধর্ম্ম

পালি ভাষায় রচিত ত্রিপিটক ও মিলিন্দ পন্‌হে" যাহা অসংবদ্ধ ভাবে বিবৃত আছে, তাহাই বৈভাবিকদিগের অভিধর্ম্ম। বুদ্ধঘোষের গ্রন্থাবলী এবং অভিধর্ম্ম-সংগ্রহে শৃঙ্খলাবদ্ধ দর্শনের আকারে এই মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। হীনযান মতে "যৎ সৎ, তৎ ক্ষণিকম্" (সর্ব্ব বস্তুই ক্ষণিক)। আকাশ ও নির্ব্বাণকে স্থায়ী বলা হয়, কিন্তু তাহাদের অস্তিত্বই নাই। তাহারা অভাবের নাম। কোন বস্তুতেই ক্ষণিক ভিন্ন কিছু নাই। মনন (চিন্তা) আছে, কিন্তু মন্তা কেহ নাই, বেদনা আছে, কিন্তু বেত্তা নাই যে ক্ষণিক বস্তুদ্বারা সকল বস্তু

গঠিত ; তাহাকে 'ধর্ম্ম' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ধর্ম্মসকল সূক্ষ্ম, অন্যনিরপেক্ষ, কিন্তু ক্ষণমাত্রস্থায়ী। তাহারা সৎ, কিন্তু ধ্বংসশীল। কোনও দ্রব্যের (substance) অথবা ব্যক্তির অস্তিত্ব এই মতে নাই। কারণ ও কার্য্যরূপে দলবদ্ধ হইয়া আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মগণই ভ্রান্ত ব্যক্তির (Pseudo indivi-duals) সৃষ্টি করে। ধ্যান ও ধারণা বলে প্রত্যেক ব্যক্তিই স্বীয় চেষ্টাদ্বারা মুক্ত হইয়া অর্হৎ হইতে পারে। ইহাই পুরুষার্থ। বিজ্ঞানের নিবৃত্তিই নির্বাণ। বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন কিছুর অনুভবই তৃষ্ণা। বিজ্ঞানই বন্ধ। হীনযান অবিমিশ্র প্রতিভাসবাদ। ইহাতে স্থায়ী কিছুর অস্তিত্ব অস্বীকৃত, ব্যক্তির অস্তিত্ব (সত্তা অস্তিত্ব) এই মতে নাই। (পুদ্গল নৈরাত্ম্য-বাদ)। অর্হৎগণ বুদ্ধত্ব লাভ করেন কিনা, সে সম্বন্ধে হীনযানের কোনও নিশ্চিত মত নাই, এবং প্রত্যেক ব্যক্তিই যে স্বীয় চেষ্টাদ্বারা বুদ্ধত্বলাভ করিতে পারে, তাহাও এই মতে নাই। অর্হৎ অবস্থায় সর্ব্বকামনার নিবৃত্তি হয়, তাহাই সর্ব্বোত্তম অবস্থা। ইহার জন্য অন্য কাহারও—কোনও অপ্রাকৃত শক্তির—অনুগ্রহের প্রয়োজন নাই। বুদ্ধ স্বীয় জীবনে নির্ব্বাণলাভ করিয়া যে দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন, তাহার জন্যই তাঁহাকে ভক্তি করিতে হইবে, অন্য কিছুর জন্য (তাঁহার কৃপার জন্য) নহে। সংসার হইতে দূরে নির্জ্জনে সাধনাদ্বারা হীনযানিগণ জীবনের লক্ষ্যে উপনীত হইতে সচেষ্ট। পারিবারিক ও সামাজিক জীবন তাঁহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। সমাজে বাস করিলেই স্নেহ-মমতায় বদ্ধ হইতে হয়, তাহার ফল দুঃখ। রাস্তায় চলিবার সময় চক্ষু মুদিত করিতে হইবে, বাহ্য সৌন্দর্য্য যাহাতে দৃষ্টিগোচর না হয়। বিবাহিত জীবন জলন্ত অগ্নিকুণ্ড সদৃশ। সংসার ও মানবজীবন যে ক্ষণবিধ্বংসী, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিবার জন্য শ্মশানে বাস উপদিষ্ট হইয়াছে। প্রেম ও কর্ম্মদ্বারা পুরুষার্থ লব্ধ হয় না। কিন্তু প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্ম্মে দুঃখীর দুঃখমোচন কর্ত্তব্য বলিয়া বিহিত হইয়াছে, অক্রোধদ্বারা ক্রোধকে জয় করিতে বলা হইয়াছে ; সংসারে থাকিয়াই নির্লিপ্ত হইতে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে।

হীনযান সম্প্রদায়ে পরে বহু দেবতা এবং তাহাদিগের উপরে এক পরম দেবতায় বিশ্বাস প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল এবং বুদ্ধ দেবত্বে উন্নীত হইয়াছিলেন। বুদ্ধ "দেবাতিদেব", সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। প্রাচীন হীনযানী সম্প্রদায়ে তিনি মানুষ-রূপেই পূজিত হইতেন। তাঁহার পূজার অর্থ ছিল, তাঁহার স্মৃতির সম্মান করা।

এইরূপে হীনযান সম্প্রদায়ে বুদ্ধের অদৃষ্ট বিষয়-সম্বন্ধে আলোচনার নিষেধ-

উপদেশ অবহেলিত হইয়াছিল, এবং metaphysics প্রবেশলাভ করিয়াছিল। হীনযানিগণ সৎকর্ম্মদ্বারা স্বর্গলোক-প্রাপ্তির এবং পরিণামে বুদ্ধ হইবার আশা পোষণ করেন। বুদ্ধকে ঈশ্বরত্বে উন্নীত করিয়া এবং হিন্দু দেবতাদিগকে স্বীকার করিয়া তাঁহারা বহুদেববাদ, স্বর্গ ও নরকের অস্তিত্ব এবং অর্হৎদিগের অনুগ্রহ-বলে ব্রহ্মলোক (ব্রহ্মার লোক)-প্রাপ্তিতে বিশ্বাস অবলম্বন করিয়াছেন।*

মহাযান

"যান" শব্দের দুই অর্থ মার্গ (যেমন দেবযান, পিতৃযান প্রভৃতিতে) ও বাহন (যেমন জলযান, ব্যোমযান প্রভৃতিতে)। কেহ কেহ বলেন "মহাযান" শব্দের অর্থ—বৃহৎ অথবা প্রশস্ত মার্গ, যে মার্গে সকলেই প্রবেশ করিতে পারে, এবং হীনযান ক্ষুদ্র, সংকীর্ণ মার্গ, যাহাতে বহু লোকে প্রবেশ করিতে পারে না। অন্য মতে মহাযান শব্দের অর্থ উত্তম মার্গ বা বাহন, এবং হীনযান শব্দের অর্থ নিকৃষ্ট মার্গ বা বাহন।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের আবির্ভাব হইতে অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম্ম-গ্রহণ পর্য্যন্ত বৌদ্ধ সংঘে যে সকল মত প্রচলিত ছিল, তাহারাই বৌদ্ধ ধর্ম্মের আদিম রূপ। অশোকের সময় যে মত প্রচলিত হয়, তাহা হীনযান। অশোক হইতে কনিষ্ক পর্য্যন্ত যুগে যে সকল মত ক্রমশঃ ধর্ম্মে প্রবেশলাভ করিয়াছিল, তাহারাই পরে সুসংবদ্ধ হইয়া মহাযান নামে পরিচিত হয়। হীনযান ধর্ম্ম নীরস; তাহাতে ভক্তির স্থান নাই, তাহাদ্বারা মানুষের অন্তরের ধর্ম্মপিপাসা পরিতৃপ্ত হয় না। বুদ্ধের জীবনের সৌন্দর্য্যে হীনযানীদিগের মন মুগ্ধ এবং ভক্তিরসে আপ্লুত হইত। তিনি দেবত্বে উন্নীতও হইয়াছিলেন; কিন্তু পণ্ডিতদিগের মতে তিনি নৈতিক আদর্শের প্রতীকের অতিরিক্ত কিছু ছিলেন না। তিনি যে উপদেশ রাখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন তাঁহার নিকট হইতে অন্য কিছু পাইবার ছিল না। কিন্তু মানুষের অন্তরতম প্রদেশে একটি চরম-আশ্রয়লাভের আকাঙ্ক্ষা বর্ত্তমান। হীনযান বুদ্ধকে দেবত্বে উন্নীত করিয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহাকে এতাদৃশ আশ্রয়-স্থানে পরিণত করিতে পারে নাই। সংসার হইতে নিবৃত্ত হইয়া জীবনের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা-বিসর্জ্জনের আদর্শও সকলে সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করিতে পারে নাই। মানুষ সংসারের সহিত বদ্ধ। বুদ্ধ এই সংসারবন্ধন ছেদন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, সংসারে আসক্তি বর্জ্জন করিতে বলিয়াছিলেন,

*Dr. Radha Krishnan's Indian Philosophy.

কিন্তু সংসারী জীবের দুঃখনাশের জন্য চেষ্টা করিতেও বলিয়াছিলেন। সংসারের দিকে অন্ধ হইতে বলেন নাই। কিন্তু হীনযান সংসারকে একেবারে বর্জন করিয়া তাহার সর্ব্ব ব্যাপার তুচ্ছ করিতে উপদেশ দিত। ইহা সকলের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। হীনযানের লক্ষ্য নির্ব্বাণের অর্থ জীবের ঐকান্তিক বিনাশ—ব্যক্তিত্বের ঐকান্তিক বিনাশ। ইহা সাধারণ লোকের কাম্য হইতে পারে না। হীনযান দার্শনিক পণ্ডিতের গ্রাহ্য হইলেও, তাহার অনাত্মমূলক দর্শন সর্ব্বসাধারণের ধর্ম্মের ভিত্তি হইতে অসমর্থ।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম যখন নানা জাতির মধ্যে প্রচারিত হইল, অসভ্য অনেক জাতি যখন এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিল, তখন তাহাদের অনেক বিশ্বাস ও কুসংস্কারও এই ধর্ম্মের মধ্যে প্রবেশ লাভ করিল। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম্মের আকার পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সংস্কারপন্থী বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মকে সাধারণের গ্রহণ যোগ্য করিবার জন্য তদানীন্তন হিন্দু সমাজের অনেক মত গ্রহণ করিলেন। ফলে বৌদ্ধ ধর্ম্ম যে সংস্কৃত রূপ গ্রহণ করিল, তাহাই মহাযান। তাঁহারা বলিলেন, "বুদ্ধ বলিয়াছেন, যাহাদিগের কোনও রক্ষাকর্ত্তা নাই, আমি তাহাদিগকে রক্ষা করিব, পথচারীদিগের ও সমুদ্রগামী জাহাজের পথপ্রদর্শক হইব, তাহাদিগকে তৃষ্ণার জল সরবরাহ করিব, সংসার-সমুদ্রের পারযাত্রীদিগকে পারে পৌঁছাইয়া দিব, যাহাদিগের আলোকের প্রয়োজন তাহাদিগের নিকট প্রদীপ হইব, ক্লান্ত পথিকের শয্যা হইব, যাহাদের ভৃত্যের প্রয়োজন, তাহাদের দাস হইব" (বোধিচর্য্যাবতার)। সাধারণ লোকে আগ্রহের সহিত এই সকল কথা শুনিল; মহাযানিগণ বলিলেন, বুদ্ধ যে ধর্ম্মচক্রের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, তাহা সকলের বিভিন্ন প্রয়োজনের উপযোগী। হীনযানী জ্ঞানের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন, এবং ব্যক্তির নির্ব্বাণ-প্রাপ্তিই তাহার পুরুষার্থ। মহাযানী করেন প্রেমের মাহাত্ম্য-কীর্ত্তন, এবং প্রত্যেক জীবের মুক্তিই তাহার লক্ষ্য। মহাযানীর নির্ব্বাণ জীবের আত্যন্তিক বিনাশ নহে, তাহা ব্যক্তিত্বের সীমাবচ্ছিন্ন সৎ পদার্থ। মহাযান সংসার বর্জ্জন করিতে বলেন না, সংসারের মধ্যে যে সকল দোষ আছে, তাহা দূর করিতে বলেন। হীনযান জ্ঞানমার্গীর ধর্ম্ম, মহাযান ভক্তিমার্গীর ধর্ম্ম।

হীনযান মতে জীবাত্মা কতকগুলি অনিত্য স্কন্ধের সমবায়। মহাযানমতে এই সকল স্কন্ধের বাস্তব অস্তিত্ব নাই। হীনযান মতে স্কন্ধদিগের আধার-স্বরূপ কোনও স্থায়ী সৎ বস্তু নাই। কিন্তু মহাযান এক স্থায়ী দ্রব্যের (substance) অস্তিত্ব স্বীকার করে। এই বস্তুর নাম "ভূত-তথতা"।

ইহা সর্ব্ব বস্তুর সার। ইহাকে "ধর্ম্মকায়"ও বলে—সর্ব্ব "ধর্ম্মে"র কায় বা আধার। এই ধর্ম্মকায় ক্লিষ্ট মানব-মনে শান্তির বিধান করে বলিয়া ইহাকে "নির্ব্বাণ"ও বলে। ইহা জ্ঞানস্বরূপ—ইহাই বোধি। ইহাদ্বারাই জগৎ পরিচালিত। জগতের যাবতীয় বস্তু স্বরূপে এক। কিন্তু ইহার স্বরূপ বর্ণনার অযোগ্য। ইহার পরিবর্ত্তনও নাই, বিনাশও নাই। যাবতীয় বস্তু একই আত্মার প্রকাশ। এই আত্মাই "তথতা"। যে কথা বলে, তাহার যেমন অস্তিত্ব নাই, যাহা বলে তাহারও অস্তিত্ব নাই, যাহা মনন করে, তাহারও অস্তিত্ব নাই। তথতা অসঙ্গ, সর্ব্ব আপেক্ষিকতা-বর্জ্জিত। ইহার কোনও কারণ নাই, ইহা স্ব-প্রতিষ্ঠ, এবং সর্ব্ব বস্তুর প্রতিষ্ঠা-ভূমি। ইহা জ্ঞানের জ্যোতি, "ধর্ম্মধাতু"র (বিশ্বের) সার্বিক জ্যোতি, সত্য জ্ঞান, বিশুদ্ধ এবং নির্ম্মল মন, শাশ্বত, সুখময়, স্ব-নিয়ত, অপরিণামী এবং স্বতন্ত্র।

ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগৎ প্রাতিভাসিক, সত্য নহে। ইহা স্বপ্নের মতো, কিন্তু অর্থহীন নহে। ইহা মায়া, মরীচিকা, অথবা বিদ্যুৎ-প্রকাশের মতো। প্রত্যেক বস্তুরই তিন রূপ (১) দ্রব্য, (২) গুণ ও (৩) ক্রিয়া। গুণ ও ক্রিয়ার উৎপত্তি ও বিলয় আছে, কিন্তু দ্রব্যত্বের বিনাশ নাই। সমুদ্রের তরঙ্গের উৎপত্তি ও লয় আছে। কিন্তু সমুদ্রের জলের হ্রাসবৃদ্ধি নাই। বিশ্বের দুইটি রূপ, একটি অপরিবর্ত্তনীয় অপরটি পরিবর্ত্তনীয়। ভূত-তথতা তাহার অপরিবর্ত্তনীয় রূপ। ইহা যাবতীয় পরিবর্ত্তনের ভিত্তিরূপে অপরিবর্ত্তিত থাকে। ইহাই নাম ও রূপের আবির্ভাবে বহুরূপে প্রতিভাত হয়। জগৎ সত্যও নহে, মিথ্যাও নহে, ইহার ব্যাবহারিক সত্তা আছে, কিন্তু পারমার্থিক সত্তা নাই। ইহার সত্তা প্রাতিভাসিক, অস্থায়ী ও পরিণামী। সকল প্রতিভাসের মধ্যে সৎ অনুপ্রবিষ্ট। সুতরাং প্রত্যেক বিশিষ্ট বস্তুর মধ্যে সমগ্রতা শক্যরূপে বর্ত্তমান। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধত্ব শক্যরূপে অবস্থিত। তথাগতের মধ্যে যে পূর্ণজ্ঞান বর্ত্তমান, এমন জীব নাই যাহার মধ্যে তাহা নাই। কিন্তু মিথ্যা চিন্তায় তাহা আচ্ছাদিত থাকে বলিয়া সকলে তাহা অবগত নহে। যাহার পুনর্জন্ম হয়, তাহা অহংরূপী আত্মা (হীন আত্মা), অবিনশ্বর আত্মা নহে। হীন আত্মার মধ্যেও তথতা বর্ত্তমান।

অবিদ্যাই জগতের উৎপত্তির কারণ। আমাদের মনের বিভ্রান্তিবশতঃ সকল বস্তু বিশিষ্ট রূপে পরিদৃষ্ট হয়। এই বিভ্রান্তি হইতে মুক্ত হইতে পারিলে বস্তুদিগের মধ্যে ভেদরেখাসকল বিদূরিত হয়, এবং জগতের কোনও চিহ্নই থাকে না। প্রত্যেকের মন স্বরূপে বিশুদ্ধ এবং নির্ম্মল। যখন অবিদ্যা-বায়ু

ইহার উপর দিয়া প্রবাহিত হয়, তখন বিভিন্ন মানসিক তরঙ্গ উত্থিত হয়। কিন্তু মন, অবিদ্যা ও মানসিক ভাবের কাহারও পারমার্থিক সত্তা নাই। মনকে যখন শূন্য করা যায়, তখন বিশুদ্ধ আত্মা শাশ্বত ও অপরিণামীরূপে দৃষ্ট হন, যাবতীয় বিশুদ্ধ বস্তুর আধার-রূপে। প্রকৃত পক্ষে জগতের অস্তিত্ব নাই, অবিদ্যা হইতেই ইহার উদ্ভব হয়। কিন্তু অবিদ্যার উদ্ভব কোথা হইতে হয়, তাহার কোনও ব্যাখ্যা নাই। অশ্বঘোষ অবিদ্যাকে বিশুদ্ধ সত্তার অতল গহ্বর হইতে উত্থিত স্ফুলিঙ্গ বলিয়াছেন। তাঁহার মতে সংবিদ্‌ই অবিদ্যা। সংবিদের প্রথম উদ্বুদ্ধি জগতের আবির্ভাবের প্রথম সোপান। তাহার পরে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ উদ্ভূত হয়। মূল তথতার মধ্যে বিষয়ী ও বিষয় একীভূত ছিল। তাহা সম্পূর্ণ অভাবের অবস্থা না হইলেও বর্ণনার অযোগ্য। বোধিতে এই বিষয়ী-বিষয়হীন অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই অবস্থা হইতে জাগরিত হইবামাত্র আমরা বিভেদ ও সম্বন্ধযুক্ত জগতে প্রত্যাগত হই। ইহা ব্যক্তিগত ব্যাপার। বিশ্বের সৃষ্টিও অবিদ্যা-সম্ভূত। অবিদ্যা তথতার (absolute) মধ্যেই বর্তমান; "মণিপদ্মে হুঁ"—পদ্মের মধ্যে মণি বর্তমান, অসঙ্গের মধ্যে তাহার সৃষ্টিশক্তি বর্তমান। সৎ ও প্রতিভাস একান্ত ভিন্ন নহে—এক বস্তুর দুই দিক। এই বিশ্ব অসঙ্গেরই প্রকাশ, সতেরই প্রতিভাস। তাহা যদি না হইত, বিশ্ব অর্থহীন হইত। জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে অমৃতই প্রকাশিত। দেশ ও কালে অসঙ্গের প্রকাশই বিশ্ব।*

মহাযানের এই দার্শনিক তত্ত্ব মহাযান ধর্মে রূপ গ্রহণ করিয়াছিল। বুদ্ধ বলিয়াছিলেন (মজ্ঝিমনিকায় ২২) "যাহারা অষ্টাঙ্গ মার্গে প্রবিষ্ট হয় নাই, তাহাদেরও যদি আমাতে ভক্তি ও বিশ্বাস থাকে, তাহারা স্বর্গ প্রাপ্ত হইবে।" ইহার উপর মহাযান ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। বিভিন্ন দেশে এই ধর্ম বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল। ইহার কারণ বৌদ্ধ প্রচারকগণের পরমত-সহিষ্ণুতা। জীবে দয়া, জীবনের মূল্য এবং আত্মসমর্পণই প্রধানতঃ তাহাদের শিক্ষার বিষয় ছিল। বৌদ্ধনীতি পালন করিয়া সংঘের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত কাহারও ধার্মিক অনুষ্ঠানের উপর তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতেন না। চরিত্র যদি উন্নত হয়, তাহা হইলে কে কোন্ দেবতার উপাসনা করে, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। ইহাই ছিল তাহাদের মত। কেননা সকল

---

* ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের গ্রন্থে উদ্ধৃত সুজুকির Awakening of Faith ৯৩-১২৬।

ধর্ম্মেই ধর্ম্মকায়েরই প্রকাশ, এবং প্রত্যেক ধর্ম্মেই কিছু না কিছু সত্য আছে।

মহাযানে বহু বুদ্ধের কথা আছে। তাহাদের মধ্যে আদি বুদ্ধ শাশ্বত ঈশ্বর। তিনিই জগতের স্রষ্টা। পরবর্ত্তী বুদ্ধগণ জগতের পালন করেন। তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ ও প্রেমময়। এ পর্য্যন্ত অসংখ্য বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে ও অসংখ্য বুদ্ধ আবির্ভূত হইবেন। মুক্তিলাভ করিয়াও বুদ্ধগণ জীবের মঙ্গলের জন্যে মুক্তি গ্রহণ করেন না। গৌতম বুদ্ধ এই বুদ্ধদিগের মধ্যে এক জন, কিন্তু তিনি "তথতা" নহেন—তিনি বহু দেবের মধ্যে এক জন। তাঁহার এক পার্শ্বে বোধিসত্ত্ব অমিতাভ এবং অন্য পার্শ্বে বোধিসত্ত্ব করুণাময় অবলোকিতেশ্বর উপবিষ্ট। নাগার্জুন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব ও কালীর উপাসনার বিধি দিয়াছেন। হিন্দু দেবতাদিগের যথানির্দিষ্ট স্থান মহাযান ধর্ম্মে প্রদত্ত হইয়াছে। বহুসংখ্যক বোধিসত্ত্বের অস্তিত্বও স্বীকৃত হইয়াছে।

হীনযানে অর্হৎই মানব-জীবনের আদর্শ। মহাযানের আদর্শ বোধিসত্ত্ব। "বোধিসত্ত্ব" শব্দের অর্থ "বোধি বা পূর্ণজ্ঞান যাহার স্বরূপ, তাদৃশ সত্ত্ব বা জীব।" কিন্তু যিনি এখন পর্য্যন্ত বোধি লাভ না করিলেও তাহার সন্নিকটে উপনীত হইয়াছেন, তিনিও বোধিসত্ত্ব। গৌতম বুদ্ধ যখন নির্ব্বাণলাভের জন্য সাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন, তখন তিনি বোধিসত্ত্ব ছিলেন। ভাবী বুদ্ধ, যিনি ইহজন্মে অথবা পরজন্মে বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন, তাহাতেও "বোধিসত্ত্ব" শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। নির্ব্বাণ অধিগত হইলেও জীবের প্রতি অপার করুণাবশতঃ বোধিসত্ত্বগণ তাহা গ্রহণ করেন না। দুর্ব্বল জীবকে নির্ব্বাণের পথে সাহায্য করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা মুক্তি প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু অর্হৎ স্বকীয় মুক্তি-কামনায় সংসারে নির্লিপ্ত ও একাকী নির্ব্বাণ-সাধনায় মগ্ন। মহাযান মতে কেবল নিজের মুক্তি-সাধন স্বার্থপরতা—মারের প্রলোভন ইহার মূলে। বোধিসত্ত্বের স্বরূপ করুণা ও প্রজ্ঞা। নাগার্জ্জুন বলেন, বোধিসত্ত্বের প্রকৃতির সারভাগ হইতেছে তাহাদের "মহাকরুণা", যাবতীয় জীবই তাহাদের করুণার পাত্র। এই জন্যই জীবদিগকে দুঃখমুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা আধ্যাত্মিক প্রবলশক্তিসমন্বিত হইয়াও জন্ম ও মৃত্যুর গ্লানি স্বীকার করেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া আপনাদিগকে জন্মমৃত্যুর নিয়মের অধীনতায় স্থাপিত করিলেও তাঁহাদের অন্তঃকরণ পাপ ও আসক্তিমুক্ত। মলিন পঙ্ক হইতে উদ্‌ভূত পদ্মে যেমন পঙ্কের মলিনতা সংক্রামিত হয় না, বোধিসত্ত্বদিগকেও তেমনি সংসারের মলিনতা স্পর্শ করে না।

তাঁহারা স্বকীয় পুণ্যের ফল জীবকে অর্পণ করিয়া তাহাদের পাপ গ্রহণ করেন (পরিবর্ত্ত) এবং তাহা হইতে উদ্‌ভূত দুঃখ ভোগ করেন।

মহাযানদর্শন অদ্বৈতবাদ। এই মতে তথাত্বই একমাত্র সত্য বস্তু। তথাত্ব যিনি প্রাপ্ত হন, তিনি তথাগত। এই অদ্বৈতবাদ হইতে উদ্‌ভূত ধর্ম্মে বহু দেবতার স্থান থাকিলেও, সকল দেবতাই এক পরম দেবতার অধীন। মহাযান ধর্ম্মে ত্রিবিধ কায়ের বর্ণনা আছে। "ধর্ম্মকায়," "সম্ভোগকায়" এবং "নির্ম্মাণকায়"। ধর্ম্মকায় কালাতীত, কারণহীন, আধ্যাত্মিক পারমার্থিক সত্তা। ইহা কোনও পুরুষ নহে, কিন্তু যাবতীয় সত্তার মধ্যে বর্ত্তমান ও তাহাদের ভিত্তি। ইহা বহু রূপে প্রকাশিত হইলেও নিজে অপরিবর্ত্তিত থাকে—বেদান্তের নির্গুণ ব্রহ্মের সদৃশ। ইহা হইতে যাবতীয় সত্তার উদ্‌ভব হয়। নাম ও রূপের সহযোগে ধর্ম্মকায় হইতে সম্ভোগ-কায় উদ্‌ভূত হয়। সম্ভোগ-কায় বিষয়ী ও ভোক্তা। এই রূপই ঈশ্বর। তিনি আদি বুদ্ধ, নাম ও রূপকর্ত্তৃক বিশিষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বশক্তিমান, অন্যান্য বুদ্ধদিগেরও অধীশ্বর। ইনিই "নির্ম্মাণ-কায়" ধারণ করিয়া মর্ত্তে অবতীর্ণ হন।

প্রত্যেক জীবের মধ্যে এই তিন কায়ই বর্ত্তমান। ধর্ম্মকায় তাহার কালাতীত ভিত্তি। তাহার উপর সম্ভোগকায় ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ভোক্তা। তাহার উপর নির্ম্মাণকায়—পাপ পুণ্যের আধার।

বুদ্ধদিগের সংখ্যা বহু হইলেও বোধিই প্রত্যেক বুদ্ধের স্বরূপ। কিন্তু নির্ব্বাণ-লাভের পূর্ব্বে প্রত্যেক বুদ্ধই স্বকৃত কর্ম্মের ফল ভোগ করেন। তখন তিনি বোধিসত্ত্ব, সম্ভোগকায়সমন্বিত। বোধিসত্ত্বগণ বিভিন্ন লোকের অধীশ্বর। তাঁহারা মানবজাতির মুক্তির জন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন।

শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যখনই ধর্ম্মের গ্লানি এবং অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখনই তিনি জন্মগ্রহণ করেন। মহাযানিগণ গৌতম বুদ্ধের এই প্রকার এক বাণীর উল্লেখ করেন। "বহু বুদ্ধের মধ্যে আমি একজন। তাহাদের অনেকে ইতিপূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অনেকে পরে জন্মগ্রহণ করিবেন। যখন পৃথিবীতে দুষ্কৃতি ও পাশবিক শক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তখন ধর্ম্মরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহারা জন্মগ্রহণ করেন।" "অঙ্গুত্তরনিকায়ে" আছে "ভগবান্ অনুকম্পাবশে বহু লোককে মুক্তি এবং বহু লোককে আনন্দ দান করিবার জন্য জগতে আবির্ভূত হন।"

ডাঃ রাধাকৃষ্ণনের মতে গীতার ধর্ম্ম এবং মহাযান ধর্ম্মের মধ্যে কোনও পার্থক্য নাই। গীতার ব্রহ্ম এবং মহাযানের ধর্ম্মকায় অভিন্ন। কৃষ্ণ আপনাকে

“সর্ব্বলোক-মহেশ্বর” বলিয়াছেন। বুদ্ধও পরমেশ্বর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি দেবতাদিগের অধীশ্বর, তিনি বোধিসত্ত্বদিগেরও সৃষ্টিকর্ত্তা। তিনি যে গয়াধামে বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ইহা কল্পনামাত্র। তিনি শাশ্বত, পরম কারুণিক। তিনি বলিয়াছেন “যাহারা আমাতে বিশ্বাস করে, আমি তাহাদের মঙ্গল করি। যাহারা আমাকে আশ্রয় করে, তাহারা আমার সুহৃৎ।”

বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর সাধনার প্রারম্ভেই সংকল্প করিয়াছিলেন, যে যত দিন একটি ধূলিকণাও অবিমুক্ত থাকিবে, তত দিন তিনি নির্ব্বাণ গ্রহণ করিবেন না। মহাযানে অর্হত্ত্বের উপরে মুক্তির আরও দুইটি ক্রম অঙ্গীকৃত—বোধিসত্ত্বত্ব এবং বুদ্ধত্ব। বোধিসত্ত্বের বিশেষত্ব সর্ব্বজীবে (ইতর জীব ও মনুষ্যে) প্রসারিত অপার প্রেম। ইহা ব্যতীত বুদ্ধত্ব-লাভ হয় না।

দান, বীর্য্য (তিতিক্ষা), শীল (সুনীতি), ক্ষান্তি (ধৈর্য্য), ধ্যান এবং প্রজ্ঞা—এই সকল গুণ নৈতিক জীবনলাভের জন্য প্রয়োজনীয়। সন্ন্যাসগ্রহণ মুক্তির জন্য অপরিহার্য্য নহে। বিবাহিত জীবনেও মুক্তিলাভ সম্ভবপর। দারিদ্র্য ও সংসারত্যাগ সকলের জন্য বিহিত হয় নাই। কিন্তু বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি মুক্তির জন্য অপরিহার্য্য। নিজের শক্তিতে মুক্তিলাভ মহাযান মতে অসম্ভব। তাহার জন্য মুক্তিদাতার সহায়তা অত্যাবশ্যক। হীনযান মতে মুক্তি সকলের অধিগম্য নহে। অল্পসংখ্যক লোকই মুক্তিলাভ করিতে পারে, তাহাও সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়া। কিন্তু মহাযান মতে সকলেই মুক্তিলাভে সমর্থ। হীনযান মতে সুনীতি নিষেধাত্মক। দুষ্কৃতি হইতে নিবৃত্তি এবং মনকে কামনা এবং অসৎ চিন্তা হইতে মুক্ত করাই সুনীতি। মহাযানের সুনীতি বিধিমূলক—দয়া, দান প্রভৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। “পরিবর্ত্ত”—পাপীকে স্বীয় পুণ্যফল দান করিয়া তাহার পাপ গ্রহণ করা উহার অন্তর্গত। কিন্তু জগতে কিছুই যদি সত্য না হয়, সকলই যদি মায়া হয়, তাহা হইলে এই পরোপকারেরই বা মূল্য কি? ইহাও তো মায়া?

নির্ব্বাণ ঐকান্তিক নাশ নহে। বিশ্বের আত্মার সহিত মিলনই নির্ব্বাণ—বন্ধনহীন স্বাধীন অবস্থা, অবিদ্যার অতীত অবস্থা। নির্ব্বাণলাভের পরেও বুদ্ধগণের অস্তিত্ব থাকে। বোধিসত্ত্বত্ব-লাভের পূর্ব্বে সাধকগণ বিভিন্ন স্বর্গলোকে বাস করেন।

বৌদ্ধ দর্শন

বিভিন্ন বৌদ্ধ দার্শনিক সম্প্রদায়

বুদ্ধ প্রত্যক্ষ জ্ঞানের উপর তাঁহার ধর্মের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অপ্রত্যক্ষ বিষয়ে গবেষণা নিষেধ করিয়াছিলেন বলিয়া, এবং প্রত্যক্ষ জগতে আমাদের দৃষ্টি আবদ্ধ রাখিতে বলিয়াছিলেন বলিয়া বুদ্ধের মতকে প্রত্যক্ষ বাদ (Positivism) অথবা অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism) বলা যায়। জগতে কোনও স্থায়ী বস্তুর কথা তিনি বলেন নাই, পরন্তু জাগতিক সকল বস্তুই অনিত্য এবং সমুৎপাদিক বলিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার মতকে সমুৎপাদিক বাদও (Phenomenalism) বলা যায়। সক্রেটিসের মৃত্যুর পরে তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে তাঁহার মতের অর্থ লইয়া যেমন মতভেদের উৎপত্তি হইয়াছিল, বুদ্ধের মৃত্যুর পরেও তেমনি তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে মতভেদের উৎপত্তি হয়। তাঁহার প্রকৃত মত কি ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য বহু সংগীতির অধিবেশন হয়। এই সকল সংগীতিতে সর্ব্বসম্মত কোনও মীমাংসা হয় নাই। ফলে বৌদ্ধ সংঘ দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে—হীনযান ও মহাযান। উভয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মত পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে। উভয় সম্প্রদায়ে কালক্রমে বহুবিধ দার্শনিক মতের উদ্ভব হয়। তাহাদের সকলের মতের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। ইহাদের মধ্যে চারিটি প্রস্থান প্রসিদ্ধি লাভ করে: (১) বৈভাষিক, (২) সৌত্রান্তিক, (৩) যোগাচার ও (৪) মাধ্যমিক। প্রথম দুইটি হীনযান প্রস্থান, শেষের দুইটি মহাযান প্রস্থান। এই সকল মত কনিষ্কের পরে সুসংবদ্ধ হইয়া প্রচারিত হয়। ষড়্দর্শনে এই সকল মতের উল্লেখ আছে, ইহা হইতে মনে হইতে পারে, যে ইহারা ষড়্দর্শনের পূর্ব্ববর্ত্তী। কিন্তু মাক্সমূলার বলেন, যে ষড়্দর্শনে যে সকল মত বিবৃত আছে, তাহাদের অনুরূপ মত বৌদ্ধ সূত্রদিগের রচনাকালে প্রচলিত ছিল। তাহার প্রমাণ ঐ সূত্রগুলির মধ্যে আছে। (Six Systems P. 119)। সে যাহা হউক, খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে উপরিউক্ত বৌদ্ধ দর্শনগুলি সুসংবদ্ধ ও লিপিবদ্ধ হইয়াছিল ইহা মনে করা যাইতে পারে। বুদ্ধের মৃত্যুর পরে তৃতীয় শতকে বৈভাষিক দর্শন, এবং চতুর্থ শতকে (খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দী) সৌত্রান্তিকদর্শন প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। বুদ্ধের মৃত্যুর পাঁচ শত বৎসর পরে মাধ্যমিক মতের উদ্ভব হয়, ইহা আর্য্যদেবের গ্রন্থে লেখা আছে। যোগাচার সম্প্রদায়ের

প্রতিষ্ঠাতা অসঙ্গ খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন। খৃষ্টীয় ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং ৭ম শতাব্দীতে বৌদ্ধ দর্শন উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল।

বৈভাষিক দর্শন

বুদ্ধ প্রত্যক্ষের অতীত দশটি বিষয়ের আলোচনা নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন, এবং এই সকল বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করিলে তিনি মৌনী থাকিতেন। তাঁহার শিষ্যদিগের মধ্যে কাহারও মতে বুদ্ধের এই নিষেধ ও মৌনের মূলে ছিল তাঁহার সংশয়বাদ (Scepticism)—এই সকল বিষয়ে সত্য জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব, এই বিশ্বাস। কিন্তু কাহারও কাহারও মতে বুদ্ধের মৌনদ্বারা প্রমাণিত হয় না, যে বুদ্ধ ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের অস্তিত্ব অথবা প্রত্যক্ষের অতীত বিষয়ের জ্ঞানলাভ অস্বীকার করিতেন। ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের বর্ণনা করা অসম্ভব, ইহাই ছিল বুদ্ধের মত। বুদ্ধ নির্বাণের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন, এবং তাহা লাভ করা সম্ভবপর, ইহাও বলিয়াছেন। নির্বাণে যে অনুভূতি হয়, তাহা অতীন্দ্রিয় হইলেও বুদ্ধ তাহাকে পরম সত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বুদ্ধ অনেক সময় বলিতেন তিনি এমন অনেক বস্তুর অনুভব লাভ করিয়াছেন, যাহা বহুদূরে অবস্থিত এবং যাহা যুক্তিদ্বারা বুঝিতে পারা যায় না। কেবল জ্ঞানিগণই তাহা বুঝিতে সক্ষম। এই সকল বস্তুর যদি অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে বুদ্ধ তাহাদের কথা বলিয়াছিলেন কেন? বুদ্ধ যাহার নিষেধ করিয়াছিলেন, তাঁহার শিষ্যদিগের অনেকে তাহার আলোচনায় নিবিষ্ট হইয়া অপ্রত্যক্ষ দর্শনের সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে বহু দার্শনিক প্রস্থানের উদ্ভব হয়। তাহাদের মধ্যে বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক দর্শনই সর্ব্বাধিক প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

বৈভাষিক মত "অভিধর্ম্ম" পিটকের বিভাষা বা ভাষ্যের উপরে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বৈভাষিক আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। বৈভাষিকদিগের বিরোধী সম্প্রদায়ের ভাষা "বিরুদ্ধ ভাষা" অথবা স্ববিরোধী বলিয়া তাঁহারা গণ্য করিতেন, এইজন্য তাঁহারা বৈভাষিক নামে খ্যাত, ইহাও কেহ কেহ বলেন। বৈভাষিকগণ সূত্রপিটকের প্রামাণ্য অস্বীকার করেন এবং কেবল অভিধর্ম্ম পিটকের প্রামাণ্য স্বীকার করেন।

বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক উভয় দর্শনই সর্ব্বাস্তিবাদী দর্শন বলিয়া খ্যাত। সর্ব্বাস্তিবাদ হেতুবাদ বলিয়াও পরিচিত। বৈভাষিক ও সৌত্রান্তিক উভয় মতেই

বাস্তববাদী। উভয় মতেই ভৌতিক ও মানসিক উভয়বিধ পদার্থের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকৃত।

সর্বাস্তিবাদীদিগের সাত খানা গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। তাহাদের মধ্যে কাত্যায়নী পুত্র রচিত "জ্ঞান প্রস্থান" প্রধান। এই গ্রন্থ বুদ্ধের মৃত্যুর তিন শত বৎসর পরে রচিত বলিয়া কথিত হয়। "মহাভাষ্য" নামে ইহার ভাষ্য বসুমিত্র ও তাঁহার সহযোগী তিন শত অর্হৎকর্তৃক কণিষ্ক-আহূত সঙ্গীতির অধিবেশনের পরে রচিত হয়। বসুবন্ধু-রচিত "অভিধর্ম কোষে" এই ভাষ্যের সারভাগ রক্ষিত আছে। যশোমিত্র-রচিত "অভিধর্মকোষ ব্যাখ্যা" আর এক খানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অশ্বঘোষের "বুদ্ধ চরিত" এবং আর্যশূরের "জাতকমালা" ও এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। ভদন্ত, ধর্মত্রাত এবং ঘোষকও এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

বৈভাষিক দর্শন অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ হইতে লব্ধ জ্ঞানই অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বাহ্য জগতের জ্ঞান লাভ করি। এই জ্ঞান সত্য। অনুমানদ্বারা বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ হয় না। ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব অনুমিত হয় সত্য, কিন্তু অতীতে অগ্নি ও ধূম একত্র দেখিয়াছি বলিয়াই অনুমান সম্ভবপর হয়। যে কখনও অগ্নি দেখে নাই, সে কখনও ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারে না। সৌত্রান্তিকদিগের মতে বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় নহে। তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে তাহাদের মানসিক প্রতিকৃতি হইতে তাহাদের অস্তিত্বের অনুমান করা সম্ভবপর হইত না। বাহ্য বস্তুর সহিত যাহার পরিচয় হয় নাই, তাহার নিকট বাহ্য বস্তুর মানসিক রূপ তাহাদের প্রতিকৃতি মাত্র বলিয়া প্রতিভাত হইবে না। তাহা স্বতন্ত্র বস্তুরূপেই অনুভূত হইবে। মনের বহিঃস্থ কোনও বস্তু হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাদের অনুভব হইবে না। সুতরাং বিজ্ঞানবাদকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বৈভাষিক মত বাহ্য-প্রত্যক্ষ বাদ।

বৈভাষিক মত বাহ্য জগৎ এবং মন উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে। মন বিষয়কে জানিতে পারে। আমাদের জ্ঞান মনের সৃষ্টি নহে—আবিষ্কার (discovery)। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন কালেই বস্তুর স্থায়ী অস্তিত্ব আছে।

বিষয় বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। ভূত ও ভৌতিক বস্তুই বাহ্য বিষয়। চিত্ত (বুদ্ধি) এবং চৈত্য বস্তু আভ্যন্তর। ক্ষিতি, অপ্, অগ্নি ও বায়ু ইহারাই ভূত। ইহারা পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। পরমাণু-পুঞ্জ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য,

কিন্তু প্রত্যেক পরমাণু অতি সূক্ষ্ম; তাহাদের স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করা যায় না। পরমাণুগণ অবিভাজ্য। মৌলিক ভূতদিগের মিশ্রণ হইতে যে যৌগিক দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, তাহারাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। প্রত্যেক পরমাণুর রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারি গুণ আছে। অনেক পরমাণু মিলিত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। পরমাণুদিগের গুণ-ভেদ নাই। প্রত্যেক জড় বস্তুর মধ্যে উপরি উক্ত চারি ভূত থাকিলেও, কোনও কোনও বস্তুর মধ্যে কোনও কোনও ভূতের গুণ প্রকাশিত এবং কোনও কোনও ভূতের গুণ অপ্রকাশিত শক্য অবস্থায় থাকে। কঠিন বস্তুতে ক্ষিতিভূত, তরল বস্তুতে অপ্‌ভূত, জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় অগ্নি ভূত প্রবল। বাহ্য জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত—ভাজনলোক (জড়) ও সত্বলোক (জীবলোক)। ভাজনলোক জীবলোকের প্রয়োজন সাধন করে।

বসুবন্ধু তাঁহার অভিধর্ম্মকোষে আভ্যন্তর ধর্ম্মদিগকে (১) পঞ্চ স্কন্ধ (২) দ্বাদশ আয়তন এবং (৩) অষ্টাদশ ধাতু—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। বাহ্য ধর্ম্ম মুখ্যতঃ (১) সংস্কৃত (যৌগিক) এবং (২) অসংস্কৃত (অযুক্ত) এই দুই ভাগে বিভক্ত। এখানে ধর্ম্ম শব্দ "বিষয়" (Object) অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অসংস্কৃত ধর্ম্ম তিনটি, (১) আকাশ, (২) প্রতিসংখ্যা-নিরোধ ও (৩) অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধ। আকাশ সর্ব্বভেদ-রহিত ও অসীম শাশ্বত এবং সর্ব্বব্যাপী ভাব-বস্তু। জড়ীয় না হইলেও ইহার অস্তিত্ব আছে। প্রত্যয়ের (সহকারী কারণের—Condition) অভাব বশতঃ ধর্ম্মের অননুভব (non-perception) অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধ। যখন এক বিষয়ে প্রগাঢ় মনোযোগ-বশতঃ অন্য কোনও বিষয়ের অনুভব হয় না, তখন ইহার উদ্ভব হয়। অপরোক্ষ (অতীন্দ্রিয়) জ্ঞানের ফলই প্রতিসংখ্যা-নিরোধ। ইহাই সর্ব্বাস্তিবাদীদিগের চরম লক্ষ্য। ইহাই নির্ব্বাণ। ইহা স্কন্ধবিযুক্ত অবস্থা নহে। কেননা স্কন্ধদিগের পরমাণু অবিনশ্বর। আচার্য্য শঙ্কর অসংস্কৃত তিন ধর্ম্মকে অবস্তু (অভাবাত্মক) বলিয়াছেন।

গ্রহণ (প্রতীতি—Perception) এবং অধ্যবসায় (সম্প্রতীতি—Conception) জ্ঞানের দ্বার। গ্রহণদ্বারা সত্যজ্ঞান-লাভ হয়। ইহাতে কল্পনার স্থান নাই। কিন্তু এই জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন অনির্দিষ্ট (indefinite)। অধ্যবসায় কল্পনামিশ্রিত; তাহাদ্বারা সত্যজ্ঞানলাভ হয় না। কিন্তু গ্রহণ যদি অনির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাদ্বারা যে সত্যজ্ঞান লাভ হয়, তাহা বলা যায় কিরূপে?

বাস্তববাদী। উভয় মতেই ভৌতিক ও মানসিক উভয়বিধ পদার্থের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকৃত।

সর্ব্বাস্তিবাদীদিগের সাত খানা গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। তাহাদের মধ্যে কাত্যায়নী পুত্র রচিত "জ্ঞান প্রস্থান" প্রধান। এই গ্রন্থ বুদ্ধের মৃত্যুর তিন শত বৎসর পরে রচিত বলিয়া কথিত হয়। "মহাভাষ্য" নামে ইহার ভাষ্য বসুমিত্র ও তাঁহার সহযোগী তিন শত অর্হৎকর্তৃক কণিষ্ক-আহূত সংগীতির অধিবেশনের পরে রচিত হয়। বসুবন্ধু-রচিত "অভিধর্ম্ম কোষে" এই ভাষ্যের সারভাগ রক্ষিত আছে। যশোমিত্র-রচিত "অভিধর্ম্মকোষ ব্যাখ্যা" আর এক খানা উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। অশ্বঘোষের "বুদ্ধ চরিত" এবং আর্য্যশূরের "জাতকমালা" ও এই সম্প্রদায়ের গ্রন্থ। ভদন্ত, ধর্ম্মত্রাত এবং ঘোষকও এই সম্প্রদায়ভুক্ত।

বৈভাষিক দর্শন অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের স্পর্শ হইতে লব্ধ জ্ঞানই অভিজ্ঞতা। অভিজ্ঞতা হইতে আমরা বাহ্য জগতের জ্ঞান লাভ করি। এই জ্ঞান সত্য। অনুমানদ্বারা বাহ্য বস্তুর জ্ঞান লাভ হয় না। ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব অনুমিত হয় সত্য, কিন্তু অতীতে অগ্নি ও ধূম একত্র দেখিয়াছি বলিয়াই অনুমান সম্ভবপর হয়। যে কখনও অগ্নি দেখে নাই, সে কখনও ধূম দেখিয়া অগ্নির অস্তিত্ব অনুমান করিতে পারে না। সৌত্রান্তিকদিগের মতে বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিষয় নহে। তাহা যদি সত্য হইত, তাহা হইলে তাহাদের মানসিক প্রতিকৃতি হইতে তাহাদের অস্তিত্বের অনুমান করা সম্ভবপর হইত না। বাহ্য বস্তুর সহিত যাহার পরিচয় হয় নাই, তাহার নিকট বাহ্য বস্তুর মানসিক রূপ তাহাদের প্রতিকৃতি বা চিহ্ন বলিয়া প্রতিভাত হইবে না। তাহা স্বতন্ত্র বস্তুরূপেই অনুভূত হইবে। মনের বহিঃস্থ কোনও বস্তু হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাদের অনুভব হইবে না। সুতরাং বিজ্ঞানবাদকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। বৈভাষিক মত বাহ্য-প্রত্যক্ষ বাদ।

বৈভাষিক মত বাহ্য জগৎ এবং মন উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করে। মন বিষয়কে জানিতে পারে। আমাদের জ্ঞান মনের সৃষ্টি নহে—আবিষ্কার (discovery)। অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ তিন কালেই বস্তুর স্থায়ী অস্তিত্ব আছে।

বিষয় বাহ্য ও আভ্যন্তর ভেদে দ্বিবিধ। ভূত ও ভৌতিক বস্তুই বাহ্য বিষয়। চিত্ত (বুদ্ধি) এবং চৈত্য বস্তু আভ্যন্তর। ক্ষিতি, অপ, অগ্নি ও বায়ু ইহারাই ভূত। ইহারা পরমাণুর সমবায়ে গঠিত। পরমাণু-পুঞ্জ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য,

কিন্তু প্রত্যেক পরমাণু অতি সূক্ষ্ম; তাহাদের স্বতন্ত্র ভাবে গ্রহণ করা যায় না। পরমাণুগণ অবিভাজ্য। মৌলিক ভূতদিগের মিশ্রণ হইতে যে যৌগিক দ্রব্যের উৎপত্তি হয়, তাহারাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। প্রত্যেক পরমাণুর রূপ, রস, গন্ধ ও স্পর্শ এই চারি গুণ আছে। অনেক পরমাণু মিলিত হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হয়। পরমাণুদিগের গুণ-ভেদ নাই। প্রত্যেক জড় বস্তুর মধ্যে উপরি উক্ত চারি ভূত থাকিলেও, কোনও কোনও বস্তুর মধ্যে কোনও কোনও ভূতের গুণ প্রকাশিত এবং কোনও কোনও ভূতের গুণ অপ্রকাশিত শক্য অবস্থায় থাকে। কঠিন বস্তুতে ক্ষিতিভূত, তরল বস্তুতে অপ্‌ভূত, জ্বলন্ত অগ্নিশিখায় অগ্নি ভূত প্রবল। বাহ্য জগৎ দুই ভাগে বিভক্ত—ভাজনলোক (জড়) ও সত্ত্বলোক (জীবলোক)। ভাজনলোক জীবলোকের প্রয়োজন সাধন করে।

বসুবন্ধু তাঁহার অভিধর্ম্মকোষে আভ্যন্তর ধর্ম্মদিগকে (১) পঞ্চ স্কন্ধ (২) দ্বাদশ আয়তন এবং (৩) অষ্টাদশ ধাতু—এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। বাহ্য ধর্ম্ম মুখ্যতঃ (১) সংস্কৃত (যৌগিক) এবং (২) অসংস্কৃত (অযুক্ত) এই দুই ভাগে বিভক্ত। এখানে ধর্ম্ম শব্দ "বিষয়" (Object) অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। অসংস্কৃত ধর্ম্ম তিনটি; (১) আকাশ, (২) প্রতিসংখ্যা-নিরোধ ও (৩) অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধ। আকাশ সর্ব্বভেদ-রহিত ও অসীম শাশ্বত এবং সর্ব্বব্যাপী ভাব-বস্তু। জড়ীয় না হইলেও ইহার অস্তিত্ব আছে। প্রত্যয়ের (সহকারী কারণের—Condition) অভাব বশতঃ ধর্ম্মের অননুভব (non-perception) অপ্রতিসংখ্যা-নিরোধ। যখন এক বিষয়ে প্রগাঢ় মনোযোগ-বশতঃ অন্য কোনও বিষয়ের অনুভব হয় না, তখন ইহার উদ্‌ভব হয়। অপরোক্ষ (অতীন্দ্রিয়) জ্ঞানের ফলই প্রতিসংখ্যা-নিরোধ। ইহাই সর্ব্বাস্তিবাদীদিগের চরম লক্ষ্য। ইহাই নির্ব্বাণ। ইহা স্কন্ধবিযুক্ত অবস্থা নহে। কেননা স্কন্ধদিগের পরমাণু অবিনশ্বর। আচার্য্য শঙ্কর অসংস্কৃত তিন ধর্ম্মকে অবস্তু (অভাবাত্মক) বলিয়াছেন।

গ্রহণ (প্রতীতি—Perception) এবং অধ্যবসায় (সম্প্রতীতি—Conception) জ্ঞানের দ্বার। গ্রহণদ্বারা সত্যজ্ঞান-লাভ হয়। ইহাতে কল্পনার স্থান নাই। কিন্তু এই জ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন অনির্দ্দিষ্ট (indefinite)। অধ্যবসায় কল্পনামিশ্রিত; তাহাদ্বারা সত্যজ্ঞানলাভ হয় না। কিন্তু গ্রহণ যদি অনির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহাদ্বারা যে সত্যজ্ঞান লাভ হয়, তাহা বলা যায় কিরূপে ?

যিনি 'গ্রহণ' করেন, যিনি উপলব্ধি করেন—উপলব্ধা—তিনি বিজ্ঞান। বিজ্ঞানই চিত্ত অথবা মনের স্থায়ী তত্ত্ব। স্মৃতি চিত্তের ধর্ম্ম বা গুণ। বর্ণ, রস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দ (রূপ) ইহারাই ইন্দ্রিয়ের বিষয়, ইহাদের উপলব্ধির জন্য পঞ্চ ইন্দ্রিয়। ইহাদিগকে গ্রহণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণ চিত্ত এবং বিজ্ঞানের উদ্বোধন করে। ইন্দ্রিয়গণ তাহাদের গ্রাহ্য বিষয় ভিন্ন ভিন্ন রূপে গ্রহণ করে। বিবিধ বর্ণের ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান। বিবিধ শব্দেরও ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান হয়। কিন্তু মনদ্বারা তাহাদের সামান্যের জ্ঞানও হয় ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের জ্ঞানের ভিন্ন ভিন্ন শব্দের জ্ঞানের সঙ্গে তাহাদের সামান্যের জ্ঞানও হয়। চিত্ত, মন ও বিজ্ঞান এক ও অভিন্ন।

সর্ব্বাস্তিবাদীদিগের কাহারও কাহারও মতে কারণ ও কার্য্য একই বস্তুর দুই রূপ। জল, বরফ ও বাষ্প একই বস্তু। বরফ ও বাষ্প জলেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা। এই সকল অবস্থা ক্ষণস্থায়ী। কিন্তু যে বস্তু এই সকল অবস্থাপ্রাপ্ত হয়, তাহা চিরস্থায়ী। তাহাই কারণ। কারণের ধ্বংস নাই, কিন্তু যখন তাহা কার্য্যে পরিবর্ত্তিত হয়, তখন নূতন নাম গ্রহণ করে।

সৌত্রান্তিক দর্শন

বৈভাষিক দর্শনের ন্যায় সৌত্রান্তিক দর্শনও সর্ব্বাস্তিবাদী। সৌত্রান্তিকগণ তাহাদের দর্শন সূত্র-পিটকের উপর প্রতিষ্ঠিত বলিয়া দাবী করেন। ইহা হইতেই সৌত্রান্তিক নামের উৎপত্তি। এই দর্শন বাহ্যানুমেয়বাদ নামেও পরিচিত। কেননা ইহাতে বাহ্য বস্তু অনুমানগম্য বলিয়া স্বীকৃত। বাহ্য বস্তু এই মতে প্রত্যক্ষের বিষয় হয় না।

সৌত্রান্তিক মন এবং বাহ্য বস্তু উভয়ের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব স্বীকার করেন। বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে, বাহ্য বস্তুরূপে তাহাদের যে প্রতীতি হয়, তাহার ব্যাখ্যা করা যায় না। কেহ যদি কখনও কোনও বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষ করিয়া না থাকে, তাহা হইলে "বিজ্ঞান বাহ্যবস্তুরূপে আবির্ভূত হয়"—এ কথা তাহার পক্ষে বলা সম্ভবপর হয় না। "বন্ধ্যা মাতার সন্তান" যেমন অর্থহীন, বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষ না হইলে "বাহ্য বস্তু সদৃশ" এই কথা তেমনি অর্থহীন হইয়া পড়ে। বিজ্ঞানবাদিগণ বাহ্য বস্তুর অস্তিত্বই যখন স্বীকার করেন না, তখন তাঁহাদের মুখে "বাহ্য বস্তুর মতো" এই কথা অর্থহীন। বিজ্ঞান ও তাহার বিষয় সমকালীন অর্থাৎ একই সময়ে আবির্ভূত হয় বলিয়া বিজ্ঞান বিষয়-রূপে পরিগণিত হয়, বিজ্ঞানবাদীদের এই যুক্তির মূলে কোনও প্রমাণ নাই, কেননা যখনই

কোন বস্তু প্রত্যক্ষের বিষয় হয়, তখন সেই বস্তু বহির্জগতে স্থিত, এবং তাহার বিজ্ঞান মনে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। বস্তুর প্রতীতির আরম্ভ হইতেই তাহা বিজ্ঞান হইতে ভিন্ন রূপে অনুভূত হয়। প্রত্যক্ষের বিষয় যদি বিজ্ঞান হইতে অভিন্ন হইত, তাহা হইলে প্রত্যক্ষকারী বলিত "আমি ঘট"। যদি কোনও বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিত, তাহা হইলে ঘটের বিজ্ঞান ও পটের বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য থাকিত না। বিজ্ঞান-রূপে উভয়ে এক, কিন্তু বিষয়রূপে ভিন্ন। উভয়ের বিজ্ঞানের মধ্যে যে পার্থক্য, ঘট ও পট বিজ্ঞান-বাহ্য না হইলে এই পার্থক্যের কোনও কারণ থাকিত না। বিজ্ঞানের বাহ্য বিষয়ই বিভিন্ন বিজ্ঞানের মধ্যে পার্থক্যের কারণ।

সৌত্রান্তিকদিগের মতে বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব আমরা অবগত হই অনুমান-দ্বারা। তাহারা প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। বিজ্ঞান বাহ্য বস্তুর রূপ ধারণ করে, আমরা সেই রূপের জ্ঞান লাভ করি, এবং তাহার কারণ স্বরূপ বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব অনুমান করি। শুধু মনের উপর বাহ্য বস্তুর জ্ঞান নির্ভর করে না। তাহার সহকারী কারণও আছে। মন, ইন্দ্রিয় ও বাহ্য বস্তু থাকিলেই বাহ্য বস্তুর জ্ঞান হইবে না। চক্ষুদ্বারা দৃষ্টি-জ্ঞানের জন্য আলোক, বস্তুর দর্শনোপযোগী অবস্থা এবং তাহার দর্শনযোগ্য পরিমাণ না থাকিলে, দৃষ্টিজ্ঞান হইবে না। অন্যান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্ধেও এইরূপ। এই সকলের সহযোগে মনে বস্তুর যে রূপ উৎপন্ন হয়, বস্তু তাহার কারণ-রূপে অনুমিত হয়। বস্তু নিজে জ্ঞানের মধ্যে প্রবেশ করে না। মন যাহা অব্যবহিত ভাবে অনুভব করে, তাহা বস্তু নহে, তাহার রূপ, কিন্তু মনের উপর যাহার ক্রিয়ার ফলে মনে তাহার রূপ উৎপন্ন হয়, সেই বাহ্য বস্তুর অস্তিত্ব ক্ষণিক। সকল বস্তুই ক্ষণিক, কিন্তু বস্তু যদি ক্ষণিক হয়, তাহা হইলে তাহা স্থায়ী বলিয়া অনুভূত হয় কেন? ইহার উত্তরে সৌত্রান্তিকগণ বলেন, ক্ষণিক বস্তুর প্রতিবিম্ব একটির পর একটি অতি দ্রুত গতিতে বুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করে বলিয়া এই ভ্রমের উৎপত্তি হয়।

বাহ্য বস্তুর জ্ঞান সম্পর্কে বৈভাষিক মত সৌত্রান্তিক মত হইতে ভিন্ন। বৈভাষিক মতে যখন কোনও বৃক্ষের জ্ঞান হয়, তখন বৃক্ষটির অবয়ব দেখি, বৃক্ষের প্রতিবিম্ব দেখি না।

সৌত্রান্তিকগণ স্ব-সংবিদের (Self-consciousness) অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে চিন্তা (মনন) আপনার চিন্তা করিতে পারে। অঙ্গুলির অগ্রভাগ নিজকে স্পর্শ করিতে পারে না বটে, কিন্তু প্রদীপ যেমন অন্য বস্তু আলোকিত করে, তেমনই আপনাকেও আলোকিত করে।

বসুমিত্রের অভিধর্ম্মকোষের ভাষ্যকার যশোমিত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন ঈশ্বর, পুরুষ বা প্রধান, কেহই জীবদিগের সৃষ্টি করে নাই। মহাদেব, বাসুদেব অথবা অন্য কেহ যদি সৃষ্টির একমাত্র কর্ত্তা হইতেন, অথবা পুরুষ অথবা জড় প্রকৃতি যদি সৃষ্টির কারণরূপে বর্ত্তমান থাকিত, তাহা হইলে জগৎ ক্রমে ক্রমে অভিব্যক্ত হইত না, তাহার সমস্ত অভিব্যক্তি এক সঙ্গে হইত। কারণ থাকিলেই তাহা হইতে কার্য্য উদ্ভূত হইবেই। সুতরাং এরূপ কোনও সময়ই ছিল না, যখন জগতের কারণ হইতে তাহার কার্য্য (জগৎ) উৎপন্ন হয় নাই। আমরা দেখিতে পাই সকল জীব একসঙ্গে উদ্ভূত হয় নাই, ক্রমে ক্রমে উদ্ভূত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং জগতের কারণ-স্বরূপে একমাত্র কারণের কল্পনা না করিয়া কারণ-শ্রেণীর (Series of causes) কল্পনা করিতে হয়। বিভিন্ন সময়ে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছা হইতে জগতের উৎপত্তি হইতেছে যদি বল, তাহা হইলে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ঈশ্বরের ভিন্ন ভিন্ন ইচ্ছাকেই জগতের কারণ বলিতে হয়। সুতরাং এক আদিকারণের কথা বর্জ্জন করিতে হয়। আবার ঈশ্বর দ্বৈতরহিত এবং এক বলিয়া তাঁহার বহু ইচ্ছাও একই সময়ে ভিন্ন উদ্ভূত হইতে পারে না। জগতের অভিব্যক্তির আদি নাই, ইহাই বৌদ্ধদিগের মত।

যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ

অসঙ্গ (আর্য্যসঙ্গ) এবং তাঁহার ভ্রাতা বসুবন্ধু বিজ্ঞানবাদের প্রবর্ত্তক। প্রসিদ্ধ দিঙ্‌নাগ ছিলেন বসুবন্ধুর গুরু। অসঙ্গ সর্ব্বাস্তিবাদী দর্শনের আচার্য্য ছিলেন। পরে তিনি যোগাচারের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার "যোগাচার ভূমিশাস্ত্র" এবং "মহাযান সূত্রালংকার" গ্রন্থে ও শেষোক্ত গ্রন্থের স্বরচিত ভাষ্যে যোগাচার মত ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে বসুবন্ধু ও অসঙ্গ খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে, কাহারও কাহারও মতে পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ তাঁহাদিগকে তৃতীয় শতাব্দীতেও স্থাপিত করিয়াছেন। কনৌজরাজ হর্ষবর্দ্ধন বসুবন্ধুর শিষ্য গুণপ্রভার শিষ্য ছিলেন। বসুবন্ধু প্রথমে হীনযান সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন এবং তখন "অভিধর্ম্মকোষ" রচনা করেন। মহাযান মতে দীক্ষিত হইয়া তিনি মহাযান মতের কয়েকখানি ভাষ্যের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। অশ্বঘোষও যোগাচার সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। "মহাযান-শ্রদ্ধোৎপাদক" তাঁহার প্রধান গ্রন্থ। জাপানী অধ্যাপক সুজুকী ইংরাজী ভাষায় এই গ্রন্থের অনুবাদ করিয়াছেন। অশ্বঘোষ

ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কণিষ্কের গুরু ছিলেন। কণিষ্ক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর লোক। অশ্বঘোষ-রচিত বুদ্ধ চরিত একখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। তাঁহার "লঙ্কাবতারসূত্রে" লঙ্কাধিপতি রাবণের সহিত বুদ্ধের সাক্ষাৎকার বর্ণিত হইয়াছে। "অভিসময়ালংকারালোক"-এবং "বোধিসত্ত্বভূমি" যোগাচার সম্প্রদায়ের অন্য দুইখানা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই মতে চরম সত্য বা বোধিই কেবল যোগলভ্য। এইজন্য ইহার নাম যোগাচার।

নন্দ, দিঙ্‌নাগ, ধর্ম্মপাল এবং শীলভদ্র যোগাচার সম্প্রদায়ের আচার্য্য ছিলেন। শীলভদ্র নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিতেন। হুউয়ান চুয়াং তাঁহার নিকট বৌদ্ধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। "শার্ঙ্গধর সুভাষিত সংগ্রহের" রচয়িতা দিঙ্‌নাগ বসুবন্ধুর শিষ্য ছিলেন। কালিদাসের মেঘদূতে "দিঙ্‌নাগানাম্ পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্" এই চরণ দিঙ্‌নাগকে লক্ষ্য করিয়া লিখিত হইয়াছিল, ইহা কাহারও কাহারও মত।

সৌত্রান্তিক মতে বাহ্য জগতের অস্তিত্ব আছে। কিন্তু বাহ্য জগৎ প্রত্যক্ষের বিষয় নহে। যাহা আমাদের প্রত্যক্ষ বিষয়, তাহা আমাদের মানসিক অবস্থা, এবং এই মানসিক অবস্থার কারণরূপে আমরা বাহ্য জগতের অনুমান করি। যোগাচার মতে বাহ্য জগতের অস্তিত্বই নাই। যাহা আমরা বাহ্য জগৎ বলিয়া অনুমান করি, তাহার স্থিতি আমাদের মনের মধ্যে, তাহারা মনের অবস্থা, মনেই উৎপন্ন ও বিলীন হয়, মনের বাহিরে তাহাদের কোনও উৎপাদক কারণ আছে, ইহা মনে করিবার হেতু নাই। আমাদের বিজ্ঞানের (Consciousness) দুইটি ক্রিয়া—খ্যাতিবিজ্ঞান ও বস্তুবিকল্পবিজ্ঞান, জ্ঞাত-বিষয়-ধারণ এবং তাহাদিগকে সুবিন্যস্ত করা। এই দুই ক্রিয়া "অভিন্ন লক্ষণ ও অন্যোন্যহেতুক", একটি হইতে অন্যটিকে পৃথক করা যায় না। অনাদি কাল হইতে এই ক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে। "বাসনা"ই ইহাদের হেতু। বহুবিধ বাসনার নিরোধ করিতে পারিলে মনের এই দুই ক্রিয়াও বন্ধ করিতে পারা যায়। নতুবা ইহারা চলিতে থাকিবে। আমাদের সমুৎপাদিক জগতের জ্ঞানের মধ্যে কোনও সত্য নাই, তাহা "নিঃস্বভাব"। তাহা মায়ার সৃষ্টি, মরীচিকা ও স্বপ্নের মতো। মনের বাহিরে কোনও বস্তুই নাই। যাহা বাহিরে আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা স্বচিত্তের সৃষ্টি। অনন্তকাল হইতে চিত্ত এই সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে। সৃষ্টিকারী এই চিত্ত "উৎপাদ-স্থিতি-ভঙ্গ" বর্জ্জিত—ইহার উৎপত্তি নাই, স্থিতি নাই, নাশও নাই। ইহার নাম "আলয়-বিজ্ঞান"। যে সকল জ্ঞান উদ্ভূত হয় তাহাদের

ব্যাখ্যার জন্য আলয়-বিজ্ঞানের অস্তিত্ব কল্পিত হয়। ইহার নিজের স্বরূপ কি, তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

মনের বাহিরে স্থিত কোনও বস্তুদ্বারা যদি সমুৎপাদদিগের জ্ঞানের উৎপত্তি না হয়; তাহা হইলে তাহার উৎপত্তি হয় কিরূপে? প্রথমতঃ চিত্ত। দ্বিতীয়তঃ সমুৎপাদক ও প্রাতিভাসিক জগৎ ও তাহার অস্তিত্বে বিশ্বাস করিবার অনাদিকাল সম্ভূত উন্মুখতা (tendency)। তৃতীয়তঃ জ্ঞানের প্রকৃতিবশতঃ জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় রূপে তাহার বিভাগ। চতুর্থতঃ বিভিন্ন বিষয় অনুভব করিবার জন্য মনের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। এই চারি কারণবশতঃ আলয় বিজ্ঞানে "প্রবৃত্তি বিজ্ঞানের" (ইন্দ্রিয়ানুভবের) বুদ্বুদ্ উত্থিত হয়। এই বিজ্ঞান আলয়বিজ্ঞান হইতে ভিন্নও নহে, তাহা হইতে অভিন্নও নহে—সমুদ্রের তরঙ্গ যেমন সমুদ্রের সহিত একও নহে, তাহা হইতে ভিন্নও নহে। আলয়বিজ্ঞান তাহার বিভিন্ন বৃত্তিতে সমুদ্রের ন্যায় নৃত্যপর। চিত্তরূপে ইহা কর্ম্মসংস্কার ধারণ করে, মনরূপে ইহা ইহার আধেয়দিগকে সুবিন্যস্ত ভাবে সংযুক্ত করে (synthesises) এবং বিজ্ঞানরূপে ইহা পঞ্চবিধ ইন্দ্রিয়ানুভবের সৃষ্টি করে।

জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় রূপে যে জ্ঞান হয়, ইহার কারণ মায়া। জ্ঞানে যাহা আবির্ভূত হয়, তাহা প্রতিভাসমাত্র (সংবৃতি-সত্যতা)। তাহাদের ভাব সত্যই আছে কি নাই, তাহা বলিতে পারা যায় না।

বিজ্ঞান ব্যতীত যোগাচার অন্য কিছুর অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়-সমন্বিত আলয়বিজ্ঞান একটি স্বতন্ত্র জগৎ। ইহা অনবরত পরিবর্তমান বিজ্ঞান-স্রোত। ইহাকে সদা ক্রিয়াশীলও বলা হইয়াছে। যে সকল বিজ্ঞান অনুভবের বিষয়, ইহা কেবল তাহা নহে। কিন্তু যোগিগণ ধ্যানবলে যে বিপুল চৈতন্য ভাণ্ডারের সাক্ষাৎ লাভ করেন, ইহা সেই চৈতন্য-ভাণ্ডার। আমাদের জাগ্রৎ চৈতন্য আলয়-বিজ্ঞানের উপরিভাগে ভাসমান—তাহার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। প্রত্যেক জীবের মধ্যে এই বিরাট চৈতন্য সমগ্রভাবে বর্তমান, কিন্তু সে তাহা অবগত নহে। এই আলয় বিজ্ঞান আমাদের সমস্ত বেদনা ও জ্ঞানের তলদেশে বর্তমান। বিশ্বের সমগ্র বস্তু (বিজ্ঞানরূপে) ইহার মধ্যে অবস্থিত। যিনি মনন করেন, তিনি কেবল "ব্যক্তি" নহেন। তিনি যাহা জানেন, তাহার এক অংশ তিনি এবং যাহা তিনি জানেন, তাহা তাঁহার এক অংশ; চিন্তাই একমাত্র সত্য বস্তু। জ্ঞাতাও চিন্তা। জ্ঞাতও চিন্তা। আলয়-বিজ্ঞান দেশ ও কালাতীত সমগ্র সত্তা। আলয়-বিজ্ঞানই অনন্ত (absolute)। ইহাই সার্বিক বিষয়ী।

ইহা হইতে মনে হইতে পারে 'আলয়-বিজ্ঞান' ও বেদান্তের ব্রহ্ম এক এবং অশ্বঘোষের "তথাত" মতের সহিতও ইহার সামঞ্জস্য আছে। কিন্তু লঙ্কাবতার সূত্রে আমরা দেখিতে পাই, রাবণ বুদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন "আপনার তথাগত-গর্ভ মত এবং অন্য দর্শনের আত্মবাদ এক নহে বলিতেছেন কিরূপে? কেননা আত্মাও তো সনাতন, কর্তা, নির্গুণ, বিভু এবং অপরিণামী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।" ইহার উত্তরে বুদ্ধ বলিয়াছিলেন "কোনও বস্তুর মধ্যে স্থায়ী কিছু নাই, আত্মারও অস্তিত্ব নাই, শুনিলে অনেকে ভয় পাইবে। এই জন্যই আমি সকল বস্তুই তথাগতগর্ভ বলিয়াছি। আমাদের মত ও "আত্মন্ মত" এক নহে।"

বুদ্ধ ব্যতীত অন্য সকলের চিন্তা ত্রিবিধলক্ষণান্বিত:—(১) তাহাদের কল্পিতরূপ (পরিকল্পিত), (২) কারণোদ্ভূত রূপ (পরতন্ত্র), (৩) পারমার্থিক (পরিনিষ্পন্ন) রূপ। স্বপ্নের অভিজ্ঞতা কল্পিত রূপের দৃষ্টান্ত। দৈহিক ইন্দ্রিয় ও তদ্দ্বারা জ্ঞাত বস্তুসকল স্বপ্নের মতই কল্পিত। অহং দৃষ্টিতে (অহংএর জ্ঞান) চিন্তা বিষয়ী ও বিষয়রূপে আপনাকে আপনার নিকট উপস্থাপিত করে। বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ হইতে সৎ, অসৎ, সার প্রভৃতি চিন্তার উদ্ভব হয়। তথাকথিত বিষয়দিগকে আমরা চিন্তা হইতে স্বতন্ত্র ও চিন্তার বাহিরে অবস্থিত বলিয়া মনে করি বলিয়া বিষয়ী-বিষয়ভেদ উদ্ভূত হয়। কিন্তু চিন্তাসকল কোথা হইতে আসে? তাহারা সুবিন্যস্ত হইয়াই বা আসে কিরূপে? তাহারা তো বাহ্য বস্তুদ্বারা উৎপন্ন হয় না, অপরিণামী আত্মা হইতেও তাহাদের উদ্ভব হয় না (আত্মা বলিয়াই তো কিছু নাই)। তাহারা স্বতন্ত্রও নহে। তাহাদের উদ্ভব হয় কিরূপে?" পুসেন (M. Pussain) লিখিয়াছেন যে কর্ম্মবাদী সকল বৌদ্ধ দার্শনিকই স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, যে চিন্তা যদিও ক্ষণিক, তথাপি তাহার সম্পূর্ণ বিনাশ হয় না। তাহা হইতে নূতন চিন্তার উদ্ভব হয় কখনও কখনও দীর্ঘকাল পরেও হয়। যতদিন তাঁহারা ভৌতিক বস্তুর অস্তিত্বে বিশ্বাস করিতেন, এবং মানুষকে ভৌতিক ও মানসিক উপাদানে গঠিত বলিয়া গণ্য করিতেন, ততদিন চিন্তাসকলের পরস্পরের উপর নির্ভর-শীলতার ব্যাখ্যা করা কঠিন হয় নাই। কিন্তু জড়ের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া, তাঁহাদিগকে মানসিক সমুৎপাদের যখন ব্যাখ্যা করিতে হইল, তখন তাঁহারা বলিলেন, বাস্তববাদিগণ যে সকল জ্ঞানের কথা বলেন—(স্মৃতি, প্রতীতি প্রভৃতি) তাহারা ভাবী জ্ঞানের বীজের সৃষ্টি করে। এই সকল বীজ উপযুক্ত সময়ে সুপক্ক হইয়া নূতন জ্ঞানের

উৎপাদন করে। এই সকল বীজের বপন এবং পরিপক্বতা-প্রাপ্তির মধ্যে যে সকল জ্ঞান উদ্ভূত হয়, তাহারা তাহাদের অংশ নহে। আগামী কল্য যে নীল বর্ণের অনুভব হইবে, তাহা হয় তো গত কল্যের কোনও জ্ঞানের বীজ হইতে উদ্ভূত, কিন্তু আজ আমার যে সমস্ত জ্ঞানের অনুভব হইয়াছে, তাহা তাহাদের মধ্যে নাই। সুতরাং যে ছয় প্রকার জ্ঞানের কথা বৌদ্ধ দার্শনিকগণ বলিয়াছেন, তাহাদের অতিরিক্ত আর এক প্রকার জ্ঞানের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ইহা বর্ত্তমান মনোবৈজ্ঞানিকদিগের স্বীকৃত অবচেতন মনের জ্ঞান। তাহা হইতে প্রকাশিত জ্ঞানের উদ্ভব হয়। প্রকাশিত জ্ঞান-শ্রেণীর তলদেশে অবচেতন মনে অপ্রকাশিত ক্ষণিক জ্ঞান-শ্রেণী অবিরল প্রবাহিত হইতেছে। ইহাতে পুরাতন জ্ঞান-বীজের সহিত নূতন বীজ সংযুক্ত হইতেছে, এবং ইহার অন্তর্গত বীজসকলের ফলোৎপত্তির সহিত যদি নূতন বীজের উৎপত্তি বন্ধ হয়, তবেই এই প্রবাহ রুদ্ধ হইবে। নূতন বীজের উৎপত্তি যখন বন্ধ হয়, এবং পুরাতন বীজ-ভাণ্ডার নিঃশেষ হয়, তখন আমরা জ্ঞানের "পরতন্ত্র" রূপ অতিক্রম করিয়া পরিনিষ্পন্ন রূপে উপনীত হই। তখন জ্ঞানে বিষয়ী ও বিষয়ের ভেদ কল্পনাপ্রসূত বলিয়া অনুভূত হয়। চিন্তার প্রকৃত স্বরূপ জানিতে হইলে জ্ঞানের মধ্যগত এই ভেদ অতিক্রম করিতে হইবে। বিষয়ী-বিষয়-ভেদহীন চিন্তা বর্ণনার অযোগ্য। ইহা "বস্তুমাত্র" অথবা "চিন্তামাত্র" বলিয়া উক্ত হইয়াছে। নাগার্জ্জুন পরিকল্পিত এবং পরতন্ত্র সত্যকে এক "সংবৃতি সত্য" নামে অভিহিত করিয়াছেন এবং পরিনিষ্পন্ন সত্যকে বলিয়াছেন পরমার্থ। পরিকল্পিত জ্ঞান মিথ্যা জ্ঞান। পরতন্ত্র জ্ঞান আপেক্ষিক, অন্যাপেক্ষ। অসঙ্গের জ্ঞান এই দুই প্রকার জ্ঞানের অনধিগম্য। সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবস্থা দ্বৈতবর্জ্জিত, তাহার মধ্যে ভাব ও অভাব এক ও অভিন্ন (ভাবাভাব-সমানতা)। ইহার নাম "তথতা"।*

যোগাচার মতেও বিশ্ব সংস্কৃত (যৌগিক) এবং অসংস্কৃত, দুই ভাগে বিভক্ত। সংস্কৃত ধর্ম্মদিগের মধ্যে যোগাচার-মতে চিত্তই প্রধান। চিত্ত হইতেই যাবতীয় বস্তুর উদ্ভব হয়। চিত্তের দুই রূপ লক্ষণ ও ভাব। লক্ষণ প্রাতিভাসিক রূপ, ভাব পারমার্থিক। লক্ষণ রূপ পরিবর্ত্তনশীল, ভাবরূপ অবিনাশী। চিত্তের ধর্ম্ম আটটি—পাঁচটি ইন্দ্রিয়জ (রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ), মন (অন্তরিন্দ্রিয়), বিজ্ঞান এবং আলয়-বিজ্ঞান। অসংস্কৃত ধর্ম্ম

* (রাধাকৃষ্ণণের ভারতীয় দর্শন—৬৩২-৩৮ পৃষ্ঠা)।

ছয়টি—আকাশ, প্রতিসংখ্যা নিরোধ, অপ্রতিসংখ্যা নিরোধ, অচল, সংজ্ঞা-বেদনা-নিরোধ, এবং তথতা। আকাশ অনন্ত ও অবিকারী। সর্ব্বক্লেশ-নিবৃত্তি, পূর্ণজ্ঞানলব্ধ ধর্ম্ম প্রতিসংখ্যানিরোধ। পূর্ণজ্ঞান ব্যতীতও ক্লেশ নিবৃত্তি অপ্রতিসংখ্যানিরোধ। ক্ষমতা ও সুখের প্রতি বিরাগ "অচল", সংজ্ঞা (ইন্দ্রিয়-প্রতীতি) ও বেদনার নিষ্ক্রিয়তা সংজ্ঞা-বেদনা-নিরোধ। এই পাঁচটি ধর্ম্ম প্রকৃতপক্ষে স্বতন্ত্র নহে, ইহারা বিশ্বের অপরিণামী তত্ত্বের বিভিন্ন রূপ। ইহাদের পরে "তথতা"। তথতা প্রত্যেক বস্তুর ইন্দ্রিয়াতীত অবস্থা—'সনাতন সত্য',—বর্ণনাতীত। ইহাই ভাব—অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্তা। ইহার জন্ম-মৃত্যু, হ্রাস-বৃদ্ধি নাই। ইহা পবিত্রও নহে, অপবিত্রও নহে। তথতার মধ্যে "বিশেষ" তত্ত্ব প্রবিষ্ট হইলে আলয়-বিজ্ঞানের উদ্ভব হয়। আলয়-বিজ্ঞানের মধ্যে ভেদ চির বর্ত্তমান।

তথতাই সৃষ্টির প্রথম তত্ত্ব। অবিদ্যাসংযুক্ত আলয়-বিজ্ঞান দ্বিতীয় তত্ত্ব। তাহার পরে বিষয়ী ও বিষয়। প্রত্যেক জ্ঞানের মধ্যে তথতা বর্ত্তমান, আমিত্ব-সংযুক্ত। অবিদ্যা হইতে আমিত্বের প্রবৃত্তি (ক্রিয়া), তাহা হইতে সংসারের উদ্ভব। বাসনা ও কর্ম্মদ্বারা সংসার-চক্র নিত্য ঘূর্ণিত। চিত্তের (আলয়) মধ্যে আমাদের জ্ঞানগম্য যাবতীয় বিষয়ের বীজ বর্ত্তমান। আমাদের অতীত কর্ম্মের ফলও চিত্তের মধ্যে বর্ত্তমান। যাবতীয় ধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ সকলই চিত্তের মধ্যস্থ বীজ হইতে উদ্ভূত।

তথতা সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান বলিয়া সকলেই নির্ব্বাণ-লাভে সমর্থ। কিন্তু তাহার জন্য সহকারী কারণ সৃষ্টি করা প্রয়োজন। সে সকল বুদ্ধের উপদেশের মধ্যে আছে।

মনের বিশুদ্ধ নির্ম্মল অবস্থায় তাহার আদিম উজ্জ্বল স্বচ্ছতায় পুনঃ প্রতিষ্ঠাই নির্ব্বাণ। অবিচ্ছিন্ন ধ্যান-বলে সমস্ত বিষয়ের মায়িক জ্ঞান হইতে বিমুক্ত অবস্থার নাম "মহোদয়"। ইহাই নির্ব্বাণ মুক্তি। নির্ব্বাণ চতুর্বিধ—

(১) ধর্ম্মকায়—যাহা প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে বর্ত্তমান। বিশুদ্ধ নির্ম্মল অবস্থায় ইহা প্রত্যেক জীবে বর্ত্তমান।

(২) উপাধি-শেষ নির্ব্বাণ—ইহাতে উপাধি অবশিষ্ট থাকে। জড়ের প্রভাব হইতে ইহা সম্পূর্ণ মুক্ত নহে।

(৩) অনুপাধিশেষ নির্ব্বাণ—ইহা সর্ব্ববন্ধন মুক্ত।

(৪) পূর্ণ জ্ঞানযুক্ত নির্ব্বাণ—অন্যের উপকারই ইহার লক্ষ্য।

যোগাচারে "আলয়-বিজ্ঞান" শব্দ নানাস্থলে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

কোনও কোনও স্থলে "তথাগত"-র সহিত আলয়-বিজ্ঞান অভিন্ন বলা হইয়াছে। তখন তথতা=(বিশুদ্ধ সত্তামাত্র) আলয়-বিজ্ঞান। সত্তার যাবতীয় রূপ হইতে তাহার প্রত্যেক রূপ বর্জিত হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাই বিশুদ্ধ সত্তা, তাহাই তথতা, তাহাই আলয়-বিজ্ঞান। কোনও কোনও স্থলে 'আলয়-বিজ্ঞান' মনের সমষ্টির রূপে বর্ণিত হইয়াছে। বিশ্বের সার্বিক মন অর্থেও এই শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে বিজ্ঞান-প্রবাহ অর্থেও ইহার প্রয়োগ হইয়াছে। আলয়-বিজ্ঞানের স্বরূপ অনির্দিষ্ট রহিয়া গিয়াছে।

শূন্যবাদ

নাগার্জ্জুন

শূন্যবাদ বা মাধ্যমিকবাদের প্রবর্ত্তক নাগার্জ্জুন ভারতীয় দার্শনিকদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতমদিগের অন্যতম। নাগার্জ্জুন দাক্ষিণাত্যে এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কাহারও মতে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী তাঁহার আবির্ভাবকাল। শরৎচন্দ্র দাস বলেন তিব্বতের দালাই লামার পুস্তকালয়ে রক্ষিত এক গ্রন্থে আছে যে নাগার্জ্জুন ধর্ম্মভদ্রকে বৌদ্ধ ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন। ধর্ম্মভদ্র খৃঃ পূঃ ৫৬ অব্দে জীবিত ছিলেন। হুয়েন সাং লিখিয়া গিয়াছেন যে নাগার্জ্জুন বুদ্ধের মৃত্যুর ৪০০ বৎসর পরে বর্ত্তমান ছিলেন। ডাঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের মতে ৩০০ খৃষ্টাব্দে তিনি বর্ত্তমান ছিলেন। ৪০১ খৃষ্টাব্দে কুমারজীব চীনা ভাষায় তাঁহার জীবনচরিতের অনুবাদ করেন। "উপায়-কৌশল্য-হৃদয়" এবং "বিগ্রহব্যাবর্ত্তনী কারিকা" নামক ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে দুই খানি গ্রন্থ নাগার্জ্জুন রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার "মাধ্যমিক সূত্র" শূন্যবাদের প্রধান গ্রন্থ। এই গ্রন্থের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন চন্দ্রকীর্ত্তি—৭ম শতাব্দীতে। "বোধিচর্য্যাবতার" এবং "শিক্ষা সমুচ্চয়ের" রচয়িতা শান্তিদেব (৭ম শতক) অনেকের মতে শূন্যবাদী ছিলেন। যদিও কেহ কেহ তাঁহাকে যোগাচার সম্প্রদায়ের লোক বলিয়াছেন।

যোগাচার মতে যাবতীয় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাহ্য বস্তু মনের প্রত্যয় (Ideas); মনের বাহিরে তাহাদের অস্তিত্ব নাই। মাধ্যমিক মতে মানসিক প্রত্যয়-দিগেরও অস্তিত্ব নাই—মনেরই অস্তিত্ব নাই। এই মতে বিষয়ী, বিষয় ও

জ্ঞান পরস্পর সম্বন্ধ। ইহাদের একটি না থাকিলে অন্য দুইটির অস্তিত্ব থাকে না। যেমন যদি কাহারও সন্তান না থাকে, তাহা হইলে তাহার পিতৃত্ব অর্থহীন ও মিথ্যা। যখন কোনও রজ্জুতে সর্পজ্ঞান হয়, তখন সর্পের অস্তিত্ব নাই। সুতরাং এখানে জ্ঞাতবস্তুর (বিষয়ের) অভাব হইতেছে। কাজেই জ্ঞাতার অভাবও ইহা দ্বারা প্রমাণিত হয়। সর্পজ্ঞান তো মিথ্যাই। জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞান সকলই মিথ্যা, কিছুরই অস্তিত্ব নাই। এই বিশ্বে কিছুই নাই, সবই শূন্য। এই অর্থে নাগার্জুনের দর্শন এদেশে গৃহীত হইয়াছে। এই জন্যই ইহাকে শূন্যবাদ বলে। "শূন্য" শব্দটি এই দর্শনে বহু স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়াই সম্ভবতঃ এই ধারণা উদ্ভূত হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন এই দর্শনে সমুৎপাদিক (Phenomenal) জগতের অস্তিত্বই অস্বীকৃত হইয়াছে। কিন্তু সমুৎপাদদিগের তলদেশে এক সৎ পদার্থের অস্তিত্ব অস্বীকৃত হয় নাই। এই সতের কোনও লক্ষণ দৃষ্ট হয় না বলিয়া ইহা অবর্ণনীয়, এবং এই জন্যই তাহাকে "শূন্য" বলা হইয়াছে।

বুদ্ধ অতিরিক্ত কৃচ্ছ্রতা এবং বিলাসবহুল জীবন উভয়ই বর্জ্জনীয় বলিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপদিষ্ট পন্থাকে মধ্যপন্থা নাম দিয়াছিলেন। দর্শনের ক্ষেত্রেও তিনি মধ্যপন্থা গ্রহণ করিয়া সকল বস্তুরই অস্তিত্ব আছে, এবং কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব নাই, এই দুইটি বিরুদ্ধ চরম মত বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। নাগার্জুনের দর্শনের দাবী এই যে তাহাতে এই মধ্যপন্থাই গৃহীত হইয়াছে।

যাহা সৎ, তাহা স্বয়ং-প্রতিষ্ঠ। অন্য কিছুর উপর তাহার অস্তিত্ব নির্ভর করে না। কিন্তু এ জগতে আমাদের জ্ঞাত সমস্ত পদার্থই অন্য পদার্থের উপর নির্ভরশীল। এই জন্য কোনও পদার্থকেই 'সৎ' বলা যায় না। আবার কোনও বস্তুকে অসৎ (অস্তিত্বহীন) ও বলা যায় না। আকাশ-পুষ্প অসৎ, কেন না ইহা কখনও দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু জাগতিক যাবতীয় বস্তুই ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত, এই জন্য তাহাদিগকে অসৎও বলা যায় না। তাহারা সৎও নহে, অসৎও নহে।

নাগার্জুন বলিয়াছেন "কোন বস্তুর এমন কোনও ধর্ম্ম নাই, যাহা অন্য কোনও ধর্ম্মের অপেক্ষা করে না। সুতরাং শূন্য নহে, এমন কোনও ধর্ম্ম নাই।" প্রতীত্য সমুৎপাদ মতে কোন ধর্ম্মই তাহার উৎপত্তির জন্য ধর্ম্মান্তর নিরপেক্ষ নহে। এই জন্যই কোনও ধর্ম্ম সৎ নহে, সকল ধর্ম্মই "শূন্য"। এই জগতে সকলই নশ্বর, সকলই ক্ষণিক, কিন্তু এই সকল বস্তু আবির্ভূত হয়, ও বিনষ্ট হয়। তাহারা যদি না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের আবির্ভাবও নাই,

যে যুক্তির উপর তাহাদের ক্ষণিকত্ব এবং শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠিত, তাহাও তাহা হইলে অর্থহীন হইয়া পড়ে। প্রত্যেক বস্তুর প্রত্যেক ধর্ম্ম অন্য কিছুর সহিত সম্বন্ধ, যাহা না থাকিলে সে বস্তু ও তাহার ধর্ম্মেরই অস্তিত্ব থাকে না। সুতরাং প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্ব আপেক্ষিক। শূন্যবাদে এই কথাই বলে। অনুভবলব্ধ কোনও বস্তু অথবা সমুৎপাদের স্থির ও স্বতন্ত্র কোনও রূপ নাই। তাহার "স্বভাব" (তাহার মধ্যগত কোনও সার—Essence) নাই, সুতরাং তাহার যে বর্ণনাই কর না কেন, তাহা অনপেক্ষ ভাবে সত্য হইবে না। ইহাই কেহ কেহ শূন্যবাদের ব্যাখ্যা বলিয়া থাকেন।

নাগার্জুন দ্বিবিধ সত্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন—সংবৃতি সত্য এবং পারমার্থিক সত্য। যাহা আবরণ করে তাহাই সংবৃতি। নাগার্জুন বলিয়াছেন বুদ্ধ ধর্ম্ম-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে দ্বিবিধ সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়—একটি অনুভবলব্ধ (সংবৃতি—Empirical), অন্যটি অতীন্দ্রিয়, অনপেক্ষ। প্রথমোক্ত সত্য সাধারণ লোকের জন্য। যাহারা ইহা বুঝিতে পারে না, তাহারা বুদ্ধের উপদেশের গভীর মর্ম্মও বুঝিতে পারে না। সংবৃতি সত্য পারমার্থিক সত্যের সোপানমাত্র। নির্বাণের অনুভব আমাদের অভিজ্ঞতার অতীত। তাহাকে নেতি নেতি বলিয়াই বর্ণনা করা যায়। তাহা অজ্ঞাত, অলব্ধ, অ-নশ্বর ও অজাত। যিনি নির্বাণপ্রাপ্ত হন, যিনি তথাগত, তাঁহার স্বরূপও অবর্ণনীয়। মাধ্যমিক দর্শনের সহিত শঙ্কর দর্শনের এইখানে সাদৃশ্য আছে।

চন্দ্রকীর্ত্তি "মাধ্যমিক কারিকায়" লিখিয়াছেন, কোনও বস্তুর উৎপত্তি আপনা হইতে হইতে পারে না। অন্য কিছু হইতেও হইতে পারে না, উৎপদ্যমান বস্তুর অন্য কিছুর সহিত সমবায় হইতেও হইতে পারে না। বুদ্ধ যে প্রতীত্য সমুৎপাদের কথা বলিয়াছেন, তাহা বুদ্ধিতে ও ইন্দ্রিয়ে যে সকল মায়িক (illusory) আবির্ভাব হয়, তাহাদিগের সমুৎপাদ। তাহাদের উদ্ভব হয় অবিদ্যা হইতে। নির্ব্বাণ ব্যতীত অন্য সকল জ্ঞান এবং প্রতিভাসই মিথ্যা এবং বিনশ্বর। নির্ব্বাণই একমাত্র "অমোষধর্ম্ম" (অবিনশ্বর)।

প্রতিবাদিগণ বলিতে পারেন সত্য যদি কিছুই না থাকে, তাহা হইলে তোমাদের মাধ্যমিক মতও সত্য নহে। উত্তরে চন্দ্রকীর্ত্তি বলিয়াছেন "মৌনই" (Silence) একমাত্র সত্য। তবে অন্য মতাবলম্বীদিগের বুঝিবার সুবিধার জন্য তাহাদের অবলম্বিত পদ্ধতিতে শূন্যবাদিগণ তাহাদের সহিত আলোচনা করেন। অভিজ্ঞতায় প্রতিভাসের অস্তিত্ব আছে বলিয়াই প্রতিভাস সত্য

নহে। কেন না অভিজ্ঞতা মায়িক, সত্য নহে। তাহাতে যাহা অনুভূত হয়, তাহার মধ্যে কোনও সত্য নাই। যাহাদ্বারা সকল তৃষ্ণার নিবৃত্তি হয় এবং শান্তি অধিগত হয়, তাহা, "সংবৃতি"দ্বারা আচ্ছাদিত। প্রকৃত পক্ষে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নাই। অস্তিত্বের বিনাশ নাই—জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। শূন্যই এক মাত্র সত্য। অর্থাৎ বিশেষত্ব-প্রাপ্ত স্থূল (Concrete individual) কিছুর অস্তিত্বও নাই, বিনাশও নাই। সংবৃতির সহিত তুলনায়ই "শূন্য" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। নাগার্জুন বুদ্ধের এই বাণী উদ্ধৃত করিয়াছেন "কোনও নারী নাই, কোনও নর নাই, কোনও প্রাণী নাই, কোনও আত্মা নাই। এই সকল "ধর্ম্ম" অসৎ, স্বপ্নের মত মিথ্যা, জলচন্দ্রের মত অস্তিত্বহীন।" কিন্তু সকল প্রতিভাসের তলদেশে এক পারমার্থিক সত্যের অস্তিত্ব নাগার্জুন অস্বীকার করেন নাই, ইহা অনেকের মত। ব্যবহারিক, পারমার্থিক কোন পদার্থেরই অস্তিত্ব নাই, এই অর্থে শঙ্কর ও উদয়ন শূন্যবাদ বুঝিয়াছেন। কিন্তু কুমারজীব (৪০১ খৃঃ) লিখিয়াছেন "শূন্যতার জন্যই সকল বস্তুর সম্ভব হয়। শূন্যতা ব্যতীত কিছুরই সম্ভাবনা থাকে না।" ইহা হইতে অনুমিত হইতে পারে যে যাহার কোনও কারণ নাই, ও যাহার উৎপত্তি ও বিনাশ নাই এবং যাহা অপরিমেয়, তাহাই শূন্য—তাহার পারমার্থিক অস্তিত্ব নাগার্জুন স্বীকার করিতেন। নাগার্জুনের শূন্য ও প্লোটিনাসের One এবং হারবার্ট স্পেনসারের Unknown সকলই জাগতিক প্রতিভাসের অন্তরালে যে পরম সত্য বর্ত্তমান, তাহারই বাচক।

কিন্তু সমুৎপাদিক কিছুরই যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে জাগতিক দুঃখেরও অস্তিত্ব নাই। দুঃখের যদি অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে নির্ব্বাণকে যে ক্লেশমুক্ত অবস্থা বলা হয়, তাহা অর্থহীন হইয়া পড়ে। ইহার উত্তরে মাধ্যমিকগণ বলেন তাঁহারা নির্ব্বাণশব্দ ক্লেশমুক্ত অবস্থা অর্থে ব্যবহার করেন না। নির্ব্বাণে কিছু উৎপন্নও হয় না (অনুৎপন্ন), কিছু নিরুদ্ধও হয় না (অনিরুদ্ধ)। নির্ব্বাণে যাবতীয় প্রতিভাস বিলয় প্রাপ্ত হয়, কিন্তু রজ্জুতে সর্পের যেমন কোনও অস্তিত্ব কখনও ছিলনা, তেমনি জাগতিক প্রতিভাস যাহা নির্ব্বাণে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহারও কোনও অস্তিত্ব কখনই ছিল না। নির্ব্বাণ কোনও ভাব-বাচক (positive) বস্তু নহে। সকল ভাব-বস্তুই কারণসমূহের সমবায় হইতে উৎপন্ন এবং বিনাশশীল। নির্ব্বাণ অভাব-বাচকও নহে। কারণ "ভাব" যদি না থাকে তবে "অভাবও" থাকে না। প্রতিভাসসকল কখনও উৎপন্ন হয় বলিয়া প্রতীত হয়, কখনও বিনষ্ট হয় বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু তাহাদিগকে সৎ অথবা অসৎ

কিছুই বলা যায় না। এই "প্রপঞ্চ-নিবৃত্তি"—প্রতিভাসদিগের আবির্ভাব ও তিরোভাবের নিবৃত্তিই নির্ব্বাণ। "ভাব" ও "অভাব" শব্দ প্রতিভাস-সম্বন্ধেই প্রযোজ্য। নির্ব্বাণে কিছুরই জ্ঞান থাকে না। প্রতিভাসদিগের যে বিলয় হইয়াছে, এ জ্ঞানও তখন হয় না। বুদ্ধ নিজেও প্রতিভাস-মাত্র, মরীচিকা মাত্র; স্বপ্নমাত্র; তাঁহার উপদেশাবলীও তাহাই।*

নাগার্জ্জুন যুক্তির সহিত শূন্যবাদ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেও এই মত মহাযান সম্প্রদায়ে প্রচলিত ছিল। মহাযান সূত্রাবলীর অনেক সূত্রেও এই মত বর্ণিত আছে। অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতায় সুভূতি বুদ্ধকে বলিতেছেন যে বেদনা, সংজ্ঞা ও সংস্কার সকলই মায়া। যাবতীয় স্কন্ধ, ধাতু এবং আয়তন শূন্যমাত্র। প্রত্যেক বস্তুই শূন্য, এই জ্ঞানই সেই বস্তুর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। স্কন্ধ, ধাতু ও আয়তন সকলই শূন্য। ধর্ম্মদিগের এই আত্যন্তিক নিবৃত্তিই প্রজ্ঞাপারমিতা বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান। সকল দ্রব্যই যখন শূন্য, তখন প্রকৃতপক্ষে কোন গতিও নাই, তাহার নিবৃত্তিও নাই। যাহা সত্য, তাহা শাশ্বতও নহে, অশাশ্বতও নহে। তাহা একান্ত শূন্য। আপনাকে তথতায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া সকল দ্রব্যকে শূন্য দেখাই বোধিসত্ত্বের লক্ষ্য। দান-পারমিতা, শীল-পারমিতা, ক্ষান্তি-পারমিতা, বীর্য্য-পারমিতা এবং ধ্যান-পারমিতা এই সকল গুণ বোধিসত্ত্বকে অর্জ্জন করিতে হয়। (পারমিতা = পারগত = শেষসীমা-প্রাপ্ত)। অসংখ্য জীবকে নির্ব্বাণলাভে সাহায্য করিতে বোধিসত্ত্ব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন জীবেরই অস্তিত্ব নাই, বন্ধনমুক্তিও নাই। বোধিসত্ত্ব ইহা ভালরূপেই জানেন, কিন্তু তিনি বিচলিত না হইয়া মায়িক অস্তিত্বহীন জীবের মায়িক বন্ধন হইতে মায়িক মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন। তাঁহার পারমিতাদিগের (অর্জ্জিতগুণের) শক্তিতে তিনি কার্য্য করিয়া যান, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মুক্তিলাভ করিবার কেহ নাই। মুক্তি-লাভে সাহায্য করিবারও কেহ নাই। "যঃ অনুপলম্ভঃ সর্ব্বধর্ম্মাণাম্ স প্রজ্ঞাপারমিতা ইত্যুচ্যতে।" সর্ব্বধর্ম্মের নিবৃত্তিই প্রজ্ঞাপারমিতা।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত

---

* মাধ্যমিক বৃত্তি—দাসগুপ্তের গ্রন্থে উদ্ধৃত—১৪২ পৃষ্ঠা।